প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

১ম ধাপের মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলা পরিচিতি

Facebook Page: Matrix BCS Series

টাঙ্গাইল জেলা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর নং: ১১

সেক্টর কমান্ডার:

- মেজর আবু তাহের (এপ্রিল- নভেম্বর)
- ফ্লাইট লেঃ এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর -ডিসেম্বর)

উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা:

- বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম
- আব্দুর সবুর খান বীরবিক্রম

কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি:

- নবাব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী
- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
- প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ
- যাদুসম্রাট পিসি সরকার
- বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী

Matrix

সংসদীয় আসন: **৮টি**

১৩০	টাঙ্গাইল-১	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৩১	টাঙ্গাইল-২	ছোট মনির	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৩২	টাঙ্গাইল-৩	আমানুর রহমান খান রানা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৩৩	টাঙ্গাইল-৪	মোহাম্মদ হাছান ইমাম খাঁন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৩৪	টাঙ্গাইল-৫	মোঃ ছানোয়ার হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৩৫	টাঙ্গাইল-৬	আহসানুল ইসলাম (টিটু)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৩৬	টাঙ্গাইল-৭	খান আহমেদ শুভ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৩৭	টাঙ্গাইল-৮	মোঃ জোয়াহেরুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৬৯
উপজেলা: ১২টি
ইউনিয়ন: ১১০টি
যে নদীর তীরে অবস্থিত: যমুনা
জেলার ঐতিহ্য: **তাঁতশিল্প, মিস্টি শিল্প, কাঁসা ও পিতল শিল্প**

ভৌগলিক পরিচিতি:

ঢাকা হতে প্রায় একশত কি মি দূরে অবস্থিত এ জেলার পূর্বে রয়েছে ময়মনসিংহ ও গাজীপুর, পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ, উত্তরে জামালপুর, দক্ষিণে ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলা।

আয়তন: ৩৪২৪.৩৮ বর্গ কি.মি.

চতুর্সীমা: পূর্বে ময়মনসিংহ ও গাজীপুর, পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ, উত্তরে জামালপুর, দক্ষিণে ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলা।

ভৌগলিক আয়তন ও অবস্থান

টাঙ্গাইল জেলা ২৩°৫৯"৫০' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪°৪৮"৫১' উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯°৪৮"৫০' পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯০°৫১"২৫'পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত।

জেলার পটভূমি

নামকরণের ইতিহাস

টাঙ্গাইলের নামকরণ বিষয়ে রয়েছে বহুজনশ্রুতি ও নানা মতামত। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রেনেল তাঁর মানচিত্রে এ সম্পূর্ণ অঞ্চলকেই আটিয়া বলে দেখিয়েছেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের আগে টাঙ্গাইল নামে কোনো স্বতন্ত্র স্থানের পরিচয় পাওয়া যায় না। টাঙ্গাইল নামটি পরিচিতি লাভ করে ১৫ নভেম্বর ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা সদর দপ্তর আটিয়া থেকে টাঙ্গাইলে স্থানান্তরের সময় থেকে। টাঙ্গাইলের ইতিহাস প্রণেতা খন্দকার আব্দুর রহিম সাহেবের মতে, ইংরেজ আমলে এদেশের লোকেরা উচু শব্দের পরিবর্তে 'টান' শব্দই ব্যবহার করতে অভ্যস্ত

Matrix BCS Series

ছিল বেশি। এখনো টাঙ্গাইল অঞ্চলে 'টান' শব্দের প্রচলন আছে। এই টানের সাথে আইল শব্দটি যুক্ত হয়ে হয়েছিল টান আইল। আর সেই টান আইলটি রূপান্তরিত হয়েছে টাঙ্গাইলে। আরেক জনশ্রুতি মতে নীলকর টেংগু সাহেবের গল্পই সব চেয়ে বেশি প্রচলিত। বৃটিশ শাসনের প্রায় প্রারম্ভে আকুরটাকুর ও শাহবালিয়া মৌজার মধ্যবর্তী এলাকায় টেংগু সাহেবের নীল চাষ ও নীলের কারখানা ছিল। পূর্বোক্ত দুই মৌজার সীমানা বরাবর তিনি উচু মেটোপথ বা আইল যাতায়াতের জন্য তৈরী করেছিলেন। ক'জন সাধারণ এই আইল কে টেংগু সাহেবের আইল বলে উল্লেখ করতো। সুতরাং অনুমান করা হয় যে, টাঙ্গাইল শব্দটি টেংগু সাহেবের আইল নামেরই অপভ্রংশ। আবার তরুণ গবেষক ইতিহাসবিদ, অনুবাদক জনাব খুররম হোসাইন তার 'টাঙ্গাইলের স্থান নামঃ ইতিহাস ও কিংবদন্তী'নামক এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, সুবাদার শায়েস্তাখান সামরিক উর্দির নীচে ছিল যার অসাধারণ কুটবুদ্ধি আর প্রশাসনিক দক্ষতা। মগ আর পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন করা যখন কোন ক্রমেই সম্ভব হচ্ছিলো না। তখন তাঁর চিন্তায় আসে দক্ষিণ ভারতের মালাবর অঞ্চলের মোপলাদের কথা, সমুদ্র পাড়ের এই সব মোপলা, যারা অসম সাহসী যোদ্ধা, সম্মুখ যুদ্ধে যারা কখনও পিছু হটে না, সেই সব মোপলাদের নিয়ে এলেন রংরুট করে। জলদস্যুদের উৎপাত যখন কিছুটা দমিত হলো তখন তাদের বসতির স্থান নির্ধারণ করলেন বর্তমান টাঙ্গাইল শহরের পশ্চিম প্রান্তে। মোপলাদের ধর্মগুরুকে তারা নিজস্ব ভাষায় তাংগাইল বলে টাঙ্গাইল এই মোপলা সম্প্রদায় আজও টিকে আছে। এই অঞ্চলের যারা নিজেদের পরিচয় দেয় মাহিফরাস বলে। মৎস্য ব্যবসা যাদের প্রধান জীবিকা। টাঙ্গাইল অঞ্চলের লোকজন তাদেরকে নিকারি বলে জানে। পূবোল্লিখিত বিষয়গুলো বিচার করে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, মোপলাদের সর্দারকে যে স্থানে জায়গা দেয়া হয়েছিল সেই স্থানটিই ক্রমে টাঙ্গাইল নামে পরিচিত হতে থাকে। এমতটির পেছনে রয়েছে যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণাদি। ডঃ তারা চাঁদের "The influence of Islam on Indian culture"- গ্রন্থেও এ বিষয়ে সাক্ষ্য মেলে। টাঙ্গাইলের নামকরণ নিয়ে আরো বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ে নানা মত প্রকাশ করেছেন। কারো কারো মতে, বৃটিশ শাসনামলে মোগল প্রশাসন কেন্দ্র আটিয়াকে আশ্রয় করে যখন এই অঞ্চল জম-জমাট হয়ে উঠে। সে সময়ে ঘোড়ার গাড়িছিল যাতায়াতের একমাত্র বাহন, যাকে বর্তমান টাঙ্গাইলের স্থানীয় লোকেরা বলত 'টাঙ্গা'। বর্তমান শতকের মাঝামাঝি পর্যন্তও এ অঞ্চলের টাঙ্গা গাড়ির চলাচল স্থল পথে সর্বত্র। আল শব্দটির কথা এ প্রসঙ্গে চলে আসে। বর্তমান টাঙ্গাইল অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের নামের সাথে এই আল শব্দটির যোগ লক্ষ্য করা যায়। আল শব্দটির অর্থ সম্ভবত সীমা নির্দেশক যার স্থানীয় উচ্চারণ আইল। একটি স্থানকে যে সীমানা দিয়ে বাঁধা হয় তাকেই আইল বলা হয়। টাঙ্গাওয়ালাদের বাসস্থানের সীমানাকে 'টাঙ্গা+আইল'এভাবে যোগ করে হয়েছে 'টাঙ্গাইল' এমতটি অনেকে পোষণ করেন। ইতিহাসবিদ মুফাখখারুল ইসলামের মতে, কাগমারি পরগণার জমিদার ইনাযাতুল্লাহ খাঁ চৌধুরী (১৭০৭-১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ) লৌহজং নদীর টানের আইল দিয়া কাগমারী আধামাইল দূরে খুশনুদপুর (খুশির জায়গা যার সংস্কৃতায়ন করলে সন্তোষ) তাঁর সদর কাচারিতে যাতায়াতে করতেন। এই টানের আইল বা টান আইল বলিয়া বলে দীর্ঘদিন ধরে উচ্চারিত হতে হতে টাঙ্গাইল নামকরণ হয়েছে। অন্য মতবাদে জানা যায় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ সরকারের আদেশ অনুযায়ী পারদীঘুলিয়া মৌজায় অন্তর্গত আতিয়া নামক গ্রামে টান-আইল থানার সদর স্থপন করা হয়। গত শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালীণ সময়ে টান-

Matrix BCS Series

টাঙ্গাইল অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস

ইতিহাসের দৃষ্টি প্রসারিত আছে অনেক পিছনে। আমাদের বঙ্গীয় 'ব'দ্বীপে কবে মানব বসতি শুরু হয়েছে, কবেই বা এই নিম্নাঞ্চলে সমুদ্র গর্ভ হতে মাথাউঁচু করেছে আমরা কি তার সঠিক যুক্তিনির্ভর ইতিহাস উদ্ধারে সামর্থ হয়েছি? না হইনি। কারণ এসব বিষয়ে রয়েছে নানামত, নানাপথ। মূলতঃ বঙ্গীয় 'ব' দ্বীপ তথা সমগ্র ভারত বর্ষের ইতিহাস অনেকটা অসংলগ্ন। গ্রীস, রোম ও ইংল্যান্ডের ইতিহাসের মতো সুসংগঠিত ভাবে সংরক্ষিত নয়। তবুও বিভিন্ন গবেষণা পরম্পরায় আবিষ্কৃত নিত্য নতুন তথ্যে ইতিহাস একটু হলেও ভিন্ন আলোয় প্রতিভাত হয়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় আজ থেকে পাঁচ, সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে বৃহত্তর ময়মনসিংহের অধিকাংশ অঞ্চলই সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিলো। শুধু মাত্র মধুপুর ভাওয়াল বনাঞ্চল শৈল শিলার উচ্চতা নিয়ে বিরাজ করেছিলো। ধারণা করা হয় যে, সোমেশ্বরী নদীর পাড়ের গারো পাহাড় হতে ভাওয়াল গড় পর্যন্ত যে পাহাড়মালা তাই হচ্ছে বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম স্থলভাগ। এই স্থলভাগের বড় অংশ টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত। কাজেই এ জেলার জনবসতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সু-প্রাচীন। প্রাচীনকালে (৬২৯-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ) পরিব্রাজক হিউ-এন্থ-সঙ্গ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। হিউ-এন্থ সঙ্গ এর ভ্রমণ কাহিনী পাঠে জানা যায় বঙ্গভূমি ছয়টি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিলো।

১। পৌন্ড্র, (উত্তর বঙ্গ, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ভাগ) ২। কামরূপ (ময়মনসিংহের পূর্বভাগসহ পূর্ববঙ্গ ও আসাম) ৩। সমতট (ঢাকা-ফরিদপুর) ৪। কমলাহ্ন (ত্রিপুরা বা কুমিল্লা) ৫। তাম্রলিপ্ত (দক্ষিণ পশ্চিম ভাগ) ও ৬।কর্ণ সুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গ) উপরের বর্ণনায় প্রতীয়মান আমাদের টাঙ্গাইল জেলা তৎকালে কামরূপ রাজ্যের বা প্রাগ জ্যোতিষপুর রাজ্যাংশ- যাকে বলা হয় 'ভাটির মুলুক'এর অন্তর্গত ছিলো। মহাভারত কাব্যগ্রন্থের কামরূপ রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত বলা হয়েছে। হিন্দু শাসন আমলে খ্রি. দশম শতাব্দীতে বাঙ্গালা সেনও পাল রাজ বংশের আবির্ভাব হয়। এই উভয় বংশের নৃপতিবর্গ বঙ্গভূমির বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করতো। ক্রমে কামরূপ রাজ্যেও তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। জানা যায় টাঙ্গাইল অঞ্চল খ্রি. দশম হতে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ১২০ বছর কাল পাল রাজেন্যবর্গ এই অঞ্চল শাসন করেছে। এই সময়ে ময়মনসিংহর দক্ষিণ অংশ বর্তমান কাপাসিয়া, রায়পুরা ও ধামরাই নামক স্থানত্রয়ে শিশুপাল, হরিশ্চন্দ্র পাল ও যশোপাল নামক পাল বংশীয় তিনজন ক্ষুদ্র নৃপতির রাজ্য ও পশ্চিমাংশে মধুপুরে পাল রাজ ভগদত্তের ক্ষুদ্র রাজ্য অল্পে অল্পে বর্ধিষ্ণু ছিলো। আজ পর্যন্তও ভাওয়ালের অরণ্য মধ্যে শিশুপালের বিশাল দিঘি ও বিরাট রাজধানীর ভগ্ন কঙ্কাল বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করছে। মধুপুর ভগদত্তের গৃহভগ্নাবশেষে, পুষ্করিণী- 'বারতীর্থ দিঘি, দেবলায়, মদন গোপালের বাড়ি প্রভৃতির চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। ভগদত্তের প্রতিষ্ঠিত 'বারতীর্থ'ক্ষেত্র এখনও প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে 'মেলা'হয়ে থাকে। প্রবাদ এই যে, রাজা ভগদত্ত স্বীয় পুণ্যশীলা জননীর আজ্ঞামতে বারতীর্থের পুণ্যোদক আনিয়া নিজ রাজধানীকে 'বারতীর্থাশ্রম'করে ছিলেন। সেই 'বারতীর্থাশ্রমের'পুণ্যনাম আজও তিরোহিত হয়নি। এর পর দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন বংশের নৃপতি সেনের আমলে টাঙ্গাইল জেলা সেনদের অধিকারে আসে। সেন রাজবংশের অভ্যুদয়ে এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো লয় প্রাপ্ত হয়ে যায়। এয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে সোনার গাঁ পতনের সময় পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ সেন রাজ্য বংশের শাসনাধীন

Matrix BCS Series

জেলাসহ সমগ্র পূর্ববাংলা, দক্ষিণ বাংলা এবং উত্তর বাংলা কিয়দংশ ঢাকার নায়েব-নাজিমের অধীনে চলে আসে। মির্জা লুৎফুল্লাহ্ ওরফে দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খান তাঁর এলাকায় সামগ্রিক উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্নবান হন। কবিতা রচনায় এবং হস্তলিপিতে তাঁর রুচিবোধের পরিচয় মিলে। দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খানের পর ঢাকার নায়েব-নাজিম হিসাবে নিযুক্ত হন সরফরাজ খান। তাঁর অবর্তমানে তাঁর সহকারী সৈয়দ গালিব আলী খান শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। সরফরাজ খানের দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হন যশোবন্ত রায়। যশোবন্ত রায় ছিলেন খুবই দক্ষ শাসক। ফলে ঢাকা বিভাগে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসে নবাব শায়েস্তা খানের আমলের ন্যায়। জিনিসের দাম, বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্যের দাম উল্লেখ করার মত। এই শাসক সম্পর্কেও স্যার যদুনাথ সরকারের উক্তি প্রণিধান যোগ্য। এর ফলস্বরূপ, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য এত কমে যে শায়েস্তা খানের আমলের মত আট মন চালের বিনিময় মূল্য হয়েছিল এক টাকা। সরফরাজ খানের পর ঢাকার নাজিম হন মুরাদ আলী খান। তাঁর স্বল্পকালীন শাসনকালে বাংলার আকাশ ছিল খুবই দুর্যোগপূর্ণ। এ অবস্থার সুযোগ নিলেন নবাব আলীবর্দী খান। তিনি মুগল বাদশাহ মোহাম্মদ শাহের ফরমান বলে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে। নবাব আলীবর্দী খান মসনদে আসীন হয়ে তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র নাওয়াজিস মোহাম্মদকে ঢাকার নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করেন। তাঁর সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন হুসেন কুলী খান। নবাব আলীবর্দী খানের পর বাংলার মসনদে খুব অল্প সময়ের জন্য আসীন ছিলেন তাঁর পৌত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলা। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিভূ বরার্ট ক্লাইভের হস্তে পরাজয় বরণ করলে বাংলার ইতিহাসে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয়। পলাশী যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম যুগে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে নবাব শাহ্ সুজা প্রবর্তিত 'সরকার বাজুহার'কে তিনটি রাজস্ব অঞ্চলে ভাগ করেন- ১) জমিদারি রাজশাহী, ২) আটিয়াদিগর, ৩) জামালপুর, ঢাকা। আটিয়া দিগরের অধীনে আটিয়া, বড়বাজু ও কাগমারী পরগণা অন্তর্ভূক্ত ছিল। ঈশা খাঁর আমলে আটিয়া পরগণার সবটাই মহৎ কাজের উদ্দেশ্যে বাবা আদম কাশ্মিরীকে দান করেন। বাবা আদম কাশ্মিমীরীর মৃত্যুর পূর্বে সাঈদ খাঁ এই পরগণার বন্দোবস্ত পান। সাঈদ খাঁর পরবর্তী বংশধরগণই করটিয়ার পন্নী জমিদার এই টাঙ্গাইল অঞ্চলের সবচেয়ে প্রতাপশালী জমিদার। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পলাশী যুদ্ধের পরই বাংলায় ব্রিটিশ রাজত্ব পরোক্ষভাবে স্থাপিত হলেও ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এ এলাকার উপর ব্রিটিশের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পলাশি যুদ্ধের পর ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ, দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট থেকে ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হ'লে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন বাংলার উপ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে টাঙ্গাইল জেলা ঢাকার নায়েব-নাজিমের অধীন থেকে কোম্পানীর শাসনাধীনে চলে আসে। তখন ঢাকার নায়েব-নাজিম পদের আসীন ছিলেন নবাব জাসারত খান (১৭৫৪-১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ) নবাব কাজিম আলী খান তখন বাংলার সুবাদার ছিলেন। এসময় তাঁকে কয়েক বৎসর পাটনা অবস্থান করতে হয়। ঢাকায় তাঁর অবর্তমানে কোম্পানীর পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করেছিলেন জনৈক স্কটল্যান্ডবাসী লেফটেনান্ট (পরে ক্যাপ্টেন) সুইন্টন। কোম্পানীর রাজত্ব শুরু হওয়ার পর থেকে ঢাকার নায়েব-নাজিমগণের ক্ষমতা বিভাগীয় শাসকের পর্যায় থেকে আস্তে আস্তে স্থানীয় জমিদারদের ক্ষমতায় সংকুচিত হয়। ঢাকার নায়েব-নাজিমগণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তখন থেকে শুরু করে কোম্পানীর রাজত্বের

Matrix BCS Series

খ্রিস্টাব্দে আটিয়া থানায় রূপান্তর করে ময়মনসিংহ কালেক্টরেটের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। টাঙ্গাইলের অধিকাংশ মৌজা তখন এই আটিয়ার অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার পারদিঘুলিয়া মৌজার অন্তর্গত আটিয়া পরগণায় টানআইল থানা পত্তন করে। যা পরে টাঙ্গাইল নামে রূপান্তরিত হয়। এরপর বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার আটিয়া থানা ঢাকা জেলায়, মধুপুর থানা ময়মনসিংহ সদর মহকুমা এবং অন্যান্য অঞ্চল জামালপুর মহকুমা অন্তর্ভূক্ত হয়। ৩ মে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে আটিয়া, পিংনা ও মধুপুর থানা সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় আটিয়া মহকুমা। ১৫ নভেম্বর ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে আটিয়া থেকে টাঙ্গাইলে মহকুমা সদর দপ্তর স্থানান্তর করা হয়। জনাব ব্রহ্মনাথ সেন ছিলেন টাঙ্গাইল মহকুমার প্রথম মহকুমা প্রশাসক। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে যমুনা নদীকে বগুড়া ও ময়মনসিংহ জেলার সীমানা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ময়মনসিংহ জেলার ১৬৫টি গ্রামকে বগুড়া জেলার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মপুত্রকে রংপুর ও ময়মনসিংহের এবং ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে যমুনাকে পাবনা ও ময়মনসিংহের সীমানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিভিন্ন পরগণার নিম্নে বর্ণিত অংশসমূহ তৎকালীন টাঙ্গাইল মহকুমা অন্তর্ভূক্ত ছিল। ক) পরগণা আটিয়া, এলাকা ৭৭৯.৬৯ বর্গমাইল, মহাল- ১৪৭টি। খ) পরগণা জাফরশাহি, এলাকা ২৩২.৬৩ বর্গমাইল, মহাল- ১০টি। গ) পরগণা কাগমারি, এলাকা ৩৪৪ বর্গমাইল, মহাল- ৪৫২টি। ঘ) পরগণা কাশীপুর, এলাকা ১.৬০ বর্গমাইল, মহাল- ৬৬টি। ঙ) পরগণা পুখুরিয়া, এলাকা ৫১৫.২৫ বর্গমাইল, মহাল- ৬০৪টি। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল মহকুমার আয়তন ছিল ১০৪১ বর্গমাইল। তখন মহকুমায় টাঙ্গাইল, কালিহাতী ও গোপালপুর এই তিনটি থানা এবং নাগরপুর, মির্জাপুর, ঘাটাইল ও জগন্নাথগঞ্জ- এই চারটি ফাঁড়ি থানা ছিল। মধুপুর থানা তখন ময়মনসিংহ সদর মহকুমার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে জগন্নাথগঞ্জ ফাঁড়ি থানাকে পাবনা এবং মধুপুর থানাকে টাঙ্গাইলের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় জেলাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। জেলার কালেক্টর এই বোর্ডের সভাপতি মনোনীত হতেন। সদস্যগণের মধ্য হতে ১ জন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হতো।সহ-সভাপতি সহ মোট ২৫ জন এই বোর্ডের সভ্য ছিলেন। তন্মধ্যে ১২ জন লোকাল বোর্ডের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত। বাকী ১২ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন।ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের আয়তন ছিল ৬২৭৮ বর্গকিলোমিটার। ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের অধীনে ৫ টি লোকাল বোর্ড স্থাপন করা হয়। লোকাল বোর্ড গুলো হলো- ময়মনসিংহ সদর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও টাঙ্গাইল। ১৬ জুন ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নাগরপুর, মির্জাপুর, ঘাটাইল ও জগন্নাথগঞ্জ ফাঁড়ি থানাকে পূর্ণাঙ্গ থানায় রূপান্তরিত করা হয়। ই. ভি. লেবিঞ্জ (খবারহমব) এর সভাপতিত্বে গঠিত Administration Commnittee এর Reprot এ পুনরায় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহকে বিভক্ত করে ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও গোপালপুর জেলা স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। উল্লেখ্য ধনবাড়ির জমিদার সৈয়দ নওয়াব নবাব আলী চৌধুরী গর্ভণরের নির্বাহী পরিষদ সদস্য থাকাকালীন সময়ে ময়মনসিংহ, জেলাকে বিভক্ত করাসহ ধনবাড়িতে একটা মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ধনবাড়িতে মহকুমা স্থাপনের জন্য ৫৫.৫ একর জমি হুকুম দখল করা হয়। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলনে এই পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হতে পারেনি।১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের নিকট

Matrix BCS Series

ময়মনসিংহ জেলা সদর সুর্বণখালীতে স্থানান্তরের পরমর্শ রেখেছিলেন। সরকারের নিকট গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে - The towns of Maymenshingh are not sufficient impertinence to merit special attention in this chapter. In 1869 civil surgeon recommended the transfer of the head quarters of the district to Seaborne Khaki or Jamalpur. ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ঝরৎ অহফৎবি ঋৎধংবৎ ময়মনসিংহ জেলা বিভক্ত করে পৃথক জেলা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আবার আলোচনায় নিয়ে আসেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ ভঙ্গ হলেও বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম সরকার এক প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলা সদরের দুই প্রান্তে পৃথক দু'টি জেলা সদর স্থাপন করে ময়মনসিংহকে দু'টি পৃথক জেলায় রূপান্তর করার বিষয়ে জনমত জরিপের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রস্তাবটি বিরোধিতার সম্মুখীন হলে টাঙ্গাইল জামালপুর মহকুমা নিয়ে পৃথক একটি জেলা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্বক জনমত জরিপের ব্যবস্থা করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এ বিষয়ে ময়মনসিংহ জেলা শহরে একটি বড় জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ধনবাড়ির অনারেবল নবাব স্যার নওয়ার আলী চৌধুরী সি.আই.ই সাহেব ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল মহকুমার কতিপয় জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যাক্তিকে নিয়ে ধনবাড়িতে এক সভার আঞ্জাম করেছিলেন। সেই সভাতেই প্রথম সুবৃহৎ মোমেনশাহী জেলাকে বিভক্ত করার দাবী উত্থাপিত হয়েছিল। অনারেবল নবাব স্যার নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব ছিলেন ইংরেজ লাট সাহেবের কাউন্সিলর। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে ছিলেন প্রভাবশালী জমিদার স্যার আবদুল হালীম গজনবী সাহেব। তিনি ছিলেন রেলওয়ের বোর্ডের সদস্য। তাদের মিলিত প্রচেষ্টায় সমগ্র টাঙ্গাইল মহকুমা ও জামালপুর মহকুমার কিয়দংশ নিয়ে একটা স্বতন্ত্র জেলা প্রতিষ্ঠার দাবী পেশ করা হয়েছিল। দাবী করা হয়েছিল প্রস্তাবিত জেলার সদর স্থাপনের জন্য ধনবাড়িকে মনোনীত করা হোক। কেবল তাই নয় ধনবাড়ি হয়ে টুঙ্গি-টাঙ্গাইল-জামালপুর একটা নতুন রেল পথ স্থাপনেরও পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছিল ইংরেজ সরকারের কাছে। ময়মনসিংহ জেলা বিভক্তি করণের বিষয়টি সাধারণ জনগণের মনে তেমন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেনি এবং আগ্রহও দেখায়নি। কারণ জনগণ থেকে প্রশাসন ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার অবস্থান ছিল অনেক দূরত্বে। তারা প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা থেকেও বরাবর বঞ্চিত ছিল। প্রস্তাবনার পক্ষে বা বিপক্ষে তাদের তেমন অবস্থান ছিল না। তবে শিক্ষিত সুধিমহল বিশেষতঃ উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী, জমিদার, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পেশাজীবি লোকজন জেলা বিভাজনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থ জরিত থাকার কারণে তারা ময়মনসিংহ জেলা সদরের বাইরে অন্য কোথায়ও জেলা সদর স্থাপনের বিরোধিতা করেছেন। প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ আছে- The protests appeared to come almost entirely from the pleader class. These are supported by the numerous classes of touts, hotel keepers and other persons nourished by litigation. A small number of zaminders, whose house were in Mayenshing and lands in some outlying part of the district, were also very naturally impressed by the inconvenience that would be caused to them selves. This person also put for word the argument,

Matrix BCS Series

which appealed to a winder section- That the importance of the district ant of it's local bodies, official & non official, would be diminished, while such head quarters institutions as schools, colleges, water, works, dispensaries & like would suffer... বাংলার বিভিন্ন জেলা সমূহে বিদ্যমান অসুবিধা ও জটিল পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য সরকার ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর ৬ সদস্য বিশিষ্ট Bengal District Administration committee গঠন করেন। কমিটির মেয়াদকাল ছিল ১৯১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দ। মিঃ ই.ভি লিভিঞ্জ ছিলেন কমিটির সভাপতি এবং সদস্য সচিব ছিলেন মিঃ সি.ই.লো। কমিটির সম্মানিত সদস্য ছিলেন মিঃ এইচ. ভি. লোভেট, মিঃ এন.ডি বিটসন বেল, মিঃ কে.সি.দে এবং মিঃ ই.এন. ব- ান্ডি। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর তারিখে কমিটি কাজ শুরু করেন। উক্ত কমিটি সরকারের বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ, বিগত কমিটি সমূহের রিপোর্ট পর্যালোচনার পাশা পাশি বিভিন্ন জেলায় সরোজমিনে পরিদর্শণ ও সুধিমহলের সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে নিজস্ব সুপারিশ বা প্রস্তাবনা সরকারের নিকট পেশ করেন। তাদের সুপারিশ মালায় ময়মনসিংহ জেলা বিভিক্ত করে তিনটি পৃথক জেলা প্রতিষ্ঠা (ময়মনসিংহ, গোপালপুর ও কিশোরগঞ্জ) এবং বিদ্যমান পাঁচটি মহকুমার স্থলে নয়টি মহকুমার স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল। প্রস্তাবিত গোপালপুর জেলার রূপরেখা ও কাঠামোঃ নালিতাবাড়ি থানা ব্যতীত সমগ্র জামালপুর এবং টাঙ্গাইল মহকুমা নিয়ে প্রস্তাবিত গোপালপুর জেলা গঠিত হবে। জেলা সদরের জন্য স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে টাঙ্গাইল ও জামালপুর শহরের অধিবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা বিরাজমান ছিল। উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল লক্ষনীও। জামালপুর ও টাঙ্গাইলের মধ্যে টাঙ্গাইল মহকুমা ছিল বড় ও গুরুত্বপূর্ণ। তবে টাঙ্গাইল সদর শহর ছিল খুবই অস্বাস্থ্যকর। টাঙ্গাইল অথবা জামালপুর শহরের যে কোন একটিকে প্রস্তাবিত জেলা হিসেবে বেছে নিলে তা জেলার এক প্রান্তে অবস্থিত থাকবে। সেজন্য প্রশাসনিক যে অসুবিধা দেখা দিবে তা মোকাবেলার জন্য আবারও নতুন মহকুমা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। এসমস্ত অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার কথা বিবেচনা করে কমিটি টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত গোপালপুর থানাতে জেলা সদর স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রস্তাবিত জামালপুর-টাঙ্গাইল এবং সুর্বণখালী-ময়মনসিংহের রেলপথের সংযোগস্থলের নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকর একটি জায়গাতে জেলা সদর নির্মাণের স্থান বাছাই করা হয়। প্রস্তাবিত গোপালপুর জেলায় মহকুমা ছিল তিনটিঃ

ক) সদর মহকুমা, খ) জামালপুর মহকুমা, গ) টাঙ্গাইল মহকুমা।

ক) সদর মহকুমাঃ সরিষাবাড়ি, গোপালপুর, কালিহাতী ও ঘাটাইল থানা নিয়ে গঠিত। এর আয়তন ৬১৬ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ৫৫৪৩১৫ জন। গ্রাম- ৮৯টি। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে উল্লেখিত থানা সমূহে পুলিশ কেসের সংখ্যা ছিল ৬৬১টি।

খ) জামালপুর মহকুমাঃ জামালপুর-মেলান্দ, শেরপুর, দেওয়ানগঞ্জ ও মাদারগঞ্জ থানা সমন্বয়ে গঠিত। এর আয়তন ৯৪৮ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৬৮৮৭৫৩ জন। গ্রাম- ৯৬টি। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে থানা সমূহে নথিভূক্ত পুলিশ কেস ছিল ৬৫২টি।

গ) টাঙ্গাইল মহকুমাঃ টাঙ্গাইল, বাসাইল, মির্জাপুর ও নাগরপুর থানা সমন্বয়ে গঠিত। এর আয়তন ৪৪৬ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৪৯৫৪৫৭ জন। গ্রাম- ৮৭ টি। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এসব

Matrix BCS Series

থানায় পুলিশ কেস ছিল ৬৭১টি। প্রস্তাবিত গোপালপুর জেলায় মোট থানার সংখ্যা ১৩টি, জনসংখ্যা ১৭৩৮৫২৫ জন। আয়তন ২০০৯ বর্গ মাইল। মোট গ্রাম- ২৭২ এবং ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মোট পুলিশ কেসের সংখ্যা ছিল ১৯৮৪ টি। প্রস্তাবিত জেলার প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সরকারী কর্মকর্তা (Civil Executive Staff) ছিল নিম্নরূপঃ

১। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটঃ ০১ জন।

২। মহকুমা প্রশাসকঃ ০১ জন করে প্রতি মহকুমায়।

৩। প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট ০২ জন (জেলা সদরের জন্য)।

৪। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও সাব ডেপুটি ম্যাজিস্টেট (২য় শ্রেণী/৩য় শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পন্ন) জেলা সদরের জন্য।

৫। টাঙ্গাইল ও জামালপুর মহকুমার জন্য ২য় শ্রেণী ক্ষমতা সম্পন্ন ২ জন করে সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ১৯১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দে Bengal District Administration Committee টাঙ্গাইল ও জামালপুর, সদর মহকুমা সমন্বয়ে প্রস্তাবিত 'গোপালপুর জেলার' রূপরেখা ও কাঠামো চুড়ান্ত করার পাশাপাশি জেলা ও মহকুমা সমূহের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি নজর রেখেছিলেন। কারণ জলাভূমি, নদ-নদী, উপনদী, খালবিল নালার কারণে তৎকালীন স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। এলাকার উন্নয়ন ও গতিশীল প্রশাসনের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য এজন্য কমিটি টাঙ্গাইল থেকে ময়মনসিংহ-সিংঝানি এবং যমুনা নদী তীরবর্তী বিখ্যাত বন্দরনগরী সুবর্ণাখালী হতে ময়মনসিংহ, ভৈরব বাজার হতে কিশোরগঞ্জ হয়ে ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও ধারানগিরি কয়লা খনি পর্যন্ত নতুন রেলপথ স্থাপনেরও সুপারিশ করেছিলেন। প্রস্তাবিত গোপালপুর জেলা বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বৃটেন প্রথম মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পরে। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল উত্তপ্ত। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতীয় উপমহাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেই তৎকালীন বৃটিশ সরকার মিঃ ই.ভি.লিভিঞ্জ কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে উৎসাহী হয়নি। পরবর্তী কালে জেলা বিভাজন ও নতুন জেলা সৃষ্টির প্রস্তাব ও পরিকল্পনা সরকারী ও স্থানীয় ভাবে একাধিকবার আলোচনায় এসেছে। কিন্তু প্রস্তাবিত 'গোপালপুর জেলার' কথা রহস্যজনক কারণে অন্ধকারেই থেকে গেছে। প্রস্তাবিত 'গোপালপুর জেলা'বাস্ড়বায়িত হলে ময়মনসিংহ জেলার সমগ্র পশ্চিম অঞ্চলের জনগণ অধিক লাভবান হতো। টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলার অবস্থান উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি। দু'প্রান্তে দু'টি মহকুমা সদর ও মাঝখানে জেলা সদর প্রতিষ্ঠিত হলে সমগ্র অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, রাস্তা-ঘাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রকাশ ঘটতো প্রায় শতবর্ষ পূর্বেই। মিঃ ই.ভি.লিভিঞ্জ কমিটির (১৯১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দের) প্রস্তাবিত গোপালপুর জেলা এখন স্থানীয় আঞ্চলিক ইতিহাসে উপাত্ত মাত্র। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়। মওলালা মুহম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলী এই আন্দোলনকে মহাত্মাগান্ধী সমর্থন করেন। ফলে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের খেলাফত আন্দোলন বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। খেলাফত আন্দোলনের জন্য টাঙ্গাইলকে জেলা করার পরিকল্পনা স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৩৮, ১৯৪৩, ১৯৪৮, ১৯৫৪ ও ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন মূখ্যমন্ত্রী ও বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে যুক্তিক দাবী দাওয়া উত্থাপন ও সরকারী পর্যায়ে সমর্থিত হবার এক পর্যায়ে ১৯৬০,১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান

Matrix BCS Series

অর্থনৈতিক কাউন্সিল মোমেনশাহীকে ভেঙ্গে টাঙ্গাইল, কাইদাবাদ ও নাসিরাবাদ জেলা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময় বাংলার দুই তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে মারা যায়। মানুষ কচু ঘেচু নানারকম অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে অকালে প্রাণ ত্যাগ করতে থাকে। ইংরেজ সরকার কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ রোধ করার জন্য চেষ্টা করেন। বাংলার বাইরে থেকে খাদ্যশস্য এনে জেলাওয়ারী খাদ্যশস্য বন্টন করে দুর্ভিক্ষ রোধ করার চেষ্টা করা হয়। এই সময় অবিভক্ত বাংলার খাদ্য মন্ত্রী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব। টাঙ্গাইলের লোকজন টাঙ্গাইলের জন্য আরো খাদ্য শস্য বরাদ্দের জন্য খাদ্য মন্ত্রীর নিকট দাবি জানায়। শহীদ সাহেব সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই টাঙ্গাইলকে আলাদা একটি জেলায় উন্নীত করার প্রস্তাব করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন টাঙ্গাইল থেকে উপ-নির্বাচনের প্রার্থী হয়েছিলেন। সে সময় মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অছিয়তে তরুণ অগ্নিবর্ষী নেতা শামছুল হকের নেতৃত্বে টাঙ্গাইলবাসী ১৭ দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারক লিপি পেশ করেছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে। সেই ১৭ দফার মধ্যে প্রধান ছিল টাঙ্গাইলকে পৃথক জেলায় পরিণত করার দাবী। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট র‍্যাডক্লিফ সীমানা কমিশন বাংলাকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশের কিছু জেলার সীমানা পরিবর্তন ঘটে। তবে ময়মনসিংহ জেলার সীমানা আগের মত বহাল রাখা হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে উপ-মহাদেশ বিভক্তের পর ময়মনসিংহ জেলাকে ৩ টি জেলায় ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। প্রস্তাবিত জেলাগুলোর নাম হলো- নাসিরাবাদ, কায়দাবাদ ও টাঙ্গাইল। এমনকি ময়মনসিংহ জেলার ৫টি মহকুমাকে ৫টি জেলায় বিভক্ত করার প্রস্তাবও করা হয়েছিল। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের পাক-ভারত যুদ্ধের কারণে জেলা স্থাপনের কাজ স্থগিত হওয়ার সুযোগে ১৯৬৬, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ তৎকালীন গভর্ণর মোনায়েম খাঁর ভাই খোরশেদ খান সাহেব এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থন্বেষীদের যোগসাহসে গভর্ণরের আর্শিবাদ পুষ্ট হয়ে জুট মিলে বিনিময়ে জেলার দাবী প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেন। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে প্রচন্ড রাজনৈতি অস্থিরতা ও সামনে সাধারণ নির্বাচন বিধায় কোনো রাজনৈতিক দলই তখন এদিকটায় তেমন উৎসাহ প্রদর্শন না করার কারণে অবশেষে প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ কর্তৃক স্থাপিত টাঙ্গাইল মাহ্‌ফিল (স্থাপিত ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক অরাজনৈতিক ভাবে জেলা প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে সোচ্চার হতে হয় এবং 'টাঙ্গাইল জেলা চাই'নামে আন্দোলন শুরু করা হয়। মাহ্‌ফিলে সভাপতি ড. আলীম আল রাজির নেতৃত্বে। এই আন্দোলনে মাহফিলকে ড. এম.এন হুদা (সাবেক অর্থমন্ত্রী) তাঁর সরকারী সুবিধা ব্যবহার করে এন.ইসি'র অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সরবরাহ করে সর্বাত্মক সহযোগিতা দান করেন। টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ টাঙ্গাইল থেকে সবিশেষ সক্রিয়তা প্রকাশ করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন উপলক্ষে হক-ভাসানী- সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্ট গঠণ করেন। এই সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগ সূচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। যুক্তফ্রন্টের কাছে টাঙ্গাইল বাসী টাঙ্গাইলকে পৃথক জেলা ঘোষণা করার দাবি জানায়। যুক্তফ্রন্ট তা নির্বাচনী ওয়াদা হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করে। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী ওয়াদা হিসেবে টাঙ্গাইলকে পৃথক জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর সক্রিয় সমর্থন ছিল। এইভাবে বিভিন্ন সময়ে দাবির প্রেক্ষিতে টাঙ্গাইল

Matrix BCS Series

মহকুমা প্রতিষ্ঠার একশত বৎসর পর অর্থাৎ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল মহকুমা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ১৯তম জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

মানচিত্রে জেলা

ঢাকা হতে প্রায় একশত কি মি দূরে অবস্থিত এ জেলার পূর্বে রয়েছে ময়মনসিংহ ও গাজীপুর, পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ, উত্তরে জামালপুর, দক্ষিণে ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলা।

আয়তন: ৩৪২৪.৩৮ বর্গ কি.মি.

চতুর্সীমা: পূর্বে ময়মনসিংহ ও গাজীপুর, পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ, উত্তরে জামালপুর, দক্ষিণে ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলা।

ভৌগলিক আয়তন ও অবস্থান

টাঙ্গাইল জেলা ২৩°৫৯"৫০' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪°৪৮"৫১' উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯°৪৮"৫০' পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯০°৫১"২৫'পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত।

জেলার ঐতিহ্য

টাঙ্গাইল একটি ঐতিহ্যবাহী জনপদ। বহু অতীত ঐতিহ্য আর বাংলার চির পরিচিত লোক-সংস্কৃতি ইতিহাসে ক্রমধারার উত্তরাধিকারী। প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যে আর লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যে টাঙ্গাইল জেলার অবস্থান অনেক উঁচুতে। টাঙ্গাইলের লোক-ঐতিহ্য নিয়েও প্রবাদ বচন রচিত হয়েছে। যেমন- 'চমচম, টমটম ও শাড়ি, এই তিনে টাঙ্গাইলের বাড়ি।' প্রবাদ প্রবচনের ছড়াটিতে টাঙ্গাইলের তিনটি লোক ঐতিহ্যের কথা উঠে এসেছে। টাঙ্গাইলের তৈরি চমচম মিষ্টি আর তাঁতের শাড়ি পৃথিবী খ্যাত। টমটম গাড়িও একদা ছিল টাঙ্গাইলের লোক ঐতিহ্যের উল্লেখযোগ্য যানবাহন।

টাঙ্গাইল তথা বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্যের দুইটি প্রধান নিদর্শন হলো- মাটির মৃৎপাত্রের ফলক আর নক্শী কাঁথা। নকশী কাঁথার উপর বাণিজ্যিক ভূত চেপেছে আর মৃৎ ফলক হিন্দুয়ানী বলে বর্জিত। ফলে আমাদের লোক-ঐতিহ্যগুলো কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া টাঙ্গাইলের কাঁসা-পিতল, বাঁশ-বেতের তৈরি তৈজষপত্রগুলোও খ্যাতির দাবীদার। টাঙ্গাইলের লৌকিক খেলাধুলোগুলোও লোক-ঐতিহ্যের উল্লেখযোগ্য উপাদান। তাছাড়া টাঙ্গাইলের ভূখন্ডে কয়েকটি মুসলিম ঐতিহ্য এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের ও উপজাতির ঐতিহ্যও রয়েছে। মুসলিম ঐতিহ্যের মধ্যে আটিয়ার মসজিদ, ধনবাড়ির মসজিদ ও মাজার, কদিম হামজানির মসজিদ, খামার পাড়ার মসজিদ ও মাজার প্রভৃতি। হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে গুপ্ত বৃন্দাবন, পাকুটিয়ার সৎসঙ্গ আশ্রম, বারো তীর্থ, আনন্দ মঠ ইত্যাদি। আর টাঙ্গাইলের গারোদের ওয়ানগালার ঐতিহ্যও কম নয়।

টাঙ্গাইলের জনপদে রাজা-জমিদারদের বাড়িরও একটা ঐতিহ্য আছে। একেক রাজা-জমিদার তাদের মনের মাধুরী দিয়ে তার বাসস্থান নির্মাণ করেছেন। শুধু তাই নয় বাঙালীদেরকে শিক্ষা দান করতে টাঙ্গাইলের জমিদারদের অবদান অপরিসীম।

Matrix BCS Series

পাল, সেন আমলে প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্য টাঙ্গাইল অঞ্চলে লুকায়িত রয়েছে। যেমন কালীদাস গ্রামে কালিদাস পন্ডিতের পুকুর। আর বায়ান্ন খাদা জমি নিয়ে রাধাকৃষ্ণ গোপিনীদের লীলা ভূমি গুপ্ত বৃন্দাবন। এখনো সাদৃশ্য ঐতিহ্যবাহী তমাল গাছ আর কাঠের যুগল রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি। পাশেই প্রাচীন পুকুর। প্রবাহিত ঝর্না ধারার পাশে এখনো বিরাট পাথরের স্তুপ জেগে আছে। কৃষ্ণ বিরহে আজও বিরহী রাধার আকুতি প্রতিধ্বনিত হয় এই গুপ্ত বৃন্দাবনে। তাছাড়া কালিয়া, মহানন্দপুর, কীর্ত্তন খোলা, প্রতিমা বংশী, দাড়িয়াপুর, শহর গোপিনাথপুর, রতনগঞ্জ, বেহুলা, লক্ষিণদর, গড় গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থানগুলো ঐতিহ্যের শিরোনাম।

টাঙ্গাইলের কয়েকটি ঐতিহ্য নিম্নরূপ

তাঁত শিল্পঃ

বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় টাঙ্গাইল জেলা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। এই শিল্পের সাথে জড়িত আছে এদেশের সংস্কৃতি। আর তাঁত শিল্প আমাদের অন্যতম ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। দেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প বা লোকশিল্পও এটি। টাঙ্গাইল জেলার তাঁত শিল্প সেই সর্ব বৃহৎ শিল্পের অন্যতম অংশীদার।

প্রাচীন কাল থেকে টাঙ্গাইলের দক্ষ কারিগররা তাদের বংশ পরম্পরায় তৈরি করছেন নানা জাতের কাপড়। আর কাপড় তৈরিতে লাগে সূতো। সূতো তৈরি হয় তুলো থেকে। টাঙ্গাইল জেলার প্রাচীন অঞ্চল মির্জাপুর উপজেলা বিখ্যাত গবেষক জেম্স টেলর মির্জাপুরের তুলোর কথা লিখেছেন। এখানে বাপ্তা হাম্মাম ও অন্যান্য পাঁচমিশালী বস্ত্রের সূতো কাটা হতো তুলো থেকে। তা ছাড়া বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ও হিউয়েন সাং- এর ভ্রমণ কাহিনীতে টাঙ্গাইলের বস্ত্র শিল্প অর্থাৎ তাঁত শিল্পের উল্লেখ রয়েছে। সে দিক থেকেও বলা যায় টাঙ্গাইলের তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন, এটি আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। বর্তমানে টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির জন্যই টাঙ্গাইলের সুনাম বা পরিচিতি দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী।

তাঁত শিল্পের বৈপ- বিক পরিবর্তন এনেছে টাঙ্গাইলের সফট সিল্ক ও কটন শাড়ি। এই শাড়ি বুনন ও ডিজাইন দৃষ্টি কাড়ে। টাঙ্গাইলের শাড়ির বৈশিষ্ট্য হলো- পাড় বা কিনারের কারু কাজ। রেশমী সূতী মিশ্রনের সূতো শাড়ি ও লুঙ্গি প্রস্তুত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও টাঙ্গাইলের তাঁতিরা তাঁতের শাড়ির, লুঙ্গি, গামছা ও চাদর তৈরি করে থাকে।

টাঙ্গাইলের তাঁতিরা একদা মসলিন শাড়ি বুনতেন বলে শোনা যায়। এক সময় দিল্লির মোগল দরবার থেকে বৃটেনের রাজ প্রাসাদ পর্যন্ত এই মসলিনের অবাধ গতি ছিল। বিদেশী বণিক চক্রের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মসলিন কাপড় কালের প্রবাহে হারিয়ে গেছে। কিন্তু তার সার্থক উতরাধিকারী হয়ে আজও টিকে রয়েছে টাঙ্গাইলের জামদানী, বেনারসী ও তাঁতের শাড়ি।

Matrix BCS Series

মুসলমান তাঁতীদেরকে বলা হতো জোলা। এই জোলা তাঁতীদের সংখ্যাধিক্য ছিল টাঙ্গাইল, কালিহাতী ও গোপালপুর এলাকায়। আবার যুগী বা যুঙ্গীদের নাথপন্থী এবং কৌলিক উপাধি হিসেবে দেবনাথ বলা হয়। ক্ষৌম বস্ত্র বো মোটা কাপড় বোনার কাজে এদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। সূতো কাটার চরকা এদের প্রত্যেক পরিবারেই ছিল এবং পুত্র কন্যাসহ পরিবারের নারী-পুরুষ সবাই সূতো কাটা ও কাপড় বুনতে সারাদিন ব্যস্ত থাকতো। টাঙ্গাইল কালিহাতী ও গোপালপুর এলাকায় যুগী সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। যুগীরা ক্ষৌম, গামছা, মশারী তৈরি করে প্রায় স্বাধীন ভাবেই ব্যবসা চালাত। আরো জানা যায় টাঙ্গাইলের হিন্দু তাঁতীদের মৌলিক উপাধি বসাক। বাজিতপুর ও নলসুন্দা গ্রামেই এদের সংখ্যাধিক্য। কিন্তু বল্লা ও রতনগঞ্জে মুসলিম কারিগর (জোলা) সংখ্যায় হাজার খানেক এবং অনেকেই বেশ ধন সম্পদশালী।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, বসাক সম্প্রদায়ের তাঁতিরাই হচ্ছে টাঙ্গাইলের আদি তাঁতি অর্থাৎ আদিকাল থেকেই এরা তন্তুবায়ী গোত্রের লোক। এদেরকে এক শ্রেণীর যাযাবর বলা চলে- শুরুতে এরা সিন্ধু অববাহিকা থেকে পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদে এসে তাঁতের কাজ শুরু করেন। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া শাড়ির মান ভালো হচ্ছে না দেখে তারা নতুন জায়গার সন্ধানে বের হয়ে পড়েন, চলে আসেন বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে। সেখানেও আবহাওয়া অনেকাংশে প্রতিকূল দেখে বসাকরা দু'দলে ভাগ হয়ে একদল চলে আসে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, অন্যদল ঢাকার ধামরাইয়ে। তবে এদের কিছু অংশ সিল্কের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজশাহীতেই থেকে যায়। ধামরাইয়ে কাজ শুরু করতে না করতেই বসাকরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে ভাগ হয়ে অনেক বসাক চলে যান প্রতিবেশী দেশের চোহাট্টা অঞ্চলে। এর পর থেকে বসাক তাঁতিরা চৌহাট্টা ও ধামরাইয়া' এ দু'গ্রুপে স্থায়ীভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ধামরাই ও চৌহাট্টায় তন্তুর কাজ ভালোই হচ্ছিল। তবে আরো ভালো জায়গায় খোঁজ করতে করতে অনেক বসাক টাঙ্গাইলে এসে বসতি স্থাপন করেন। এখানকার আবহাওয়া তাদের জন্য অনকূল হওয়াতে পুরোদমে তাঁত বোনার কাজে লেগে পড়েন। টাঙ্গাইলে বংশানুক্রমে যুগের পর যুগ তারা তাঁত বুনে আসছেন। এক কালে টাঙ্গাইলে বেশির ভাগ এলাকা জুড়ে বসাক শ্রেণীর বসবাস ছিলো, তারা বসাক সমিতির মাধ্যমে অনভিজ্ঞ তাঁতিদেরকে প্রশিক্ষণ দান ও কাপড়ের মান নিয়ন্ত্রন করতেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগ ও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর অনেক বসাক তাঁতি ভারত চলে যান। এ সময় বসাক ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁত শিল্পের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। তারা বসাক তাঁতিদের মতোই দক্ষ হয়ে উঠেন।

টাঙ্গাইল জেলার ১১টি উপজেলা আর ১টি থানার মধ্যে টাঙ্গাইল সদর, কালিহাতী, নাগরপুর, সখীপুর উপজেলা হচ্ছে তাঁতবহুল এলাকা। তাছাড়া ভূঞাপুর উপজেলায়ও তাঁত শিল্প রয়েছে।

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার তাঁতবহুল গ্রামগুলো হচ্ছে- বাজিতপুর, সুরুজ, বার্থা, বামনকুশিয়া, ঘারিন্দা, গোসাইজোয়াইর, তারটিয়া, চন্ডি, নলুয়া, দেওজান, এনায়েতপুর, বেলতা, গড়াসিন, সন্তোষ, নলসুন্দা, কাগমারী প্রভৃতি।

কালিহাতী উপজেলার বল্লা, রামপুর, বাংরা, সহদেবপুর, ভূক্তা, আকুয়া, ছাতিহাটি, আইসরা, রতনগঞ্জ কোবডোরা প্রভৃতি।

দেলদুয়ার উপজেলা পাথরাইল, নলসোধা, চন্ডি, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি। এছাড়া গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলার কিছু কিছু গ্রামে তাঁত শিল্প আছে। এ সকল গ্রামে দিন রাত শোনা যায় মাকুর মনোমুদ্ধকর খটখট শব্দ। মাকুর খটখটির পাশাপাশি তাঁতিদের ব্যতিব্যস্ত নিরন্তর হাতে নিপুর শাড়ি বোনার দৃশ্য ও সত্যিই মনোমুগ্ধকর। টাঙ্গাইলের তাঁতের সঙ্গে প্রায় পাঁচ লাখ লোকের জীবন জীবিকা জড়িত। আর টাঙ্গাইলে তাঁত রয়েছে লক্ষাধিক। এই লক্ষাধিক তাঁতের সবগুলোতেই আবার টাঙ্গাইলের শাড়ি তৈরী হয় না। টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী শাড়ি তৈরি হয় এ রকম তাঁতের সংখ্যা টাঙ্গাইলে ২০ হাজারেরও কম। আর এই ঐতিহ্যবাহী শাড়ি তৈরি হয় প্রধানত বাজিতপুর, পাথরাইল, নলসুন্দা, চন্ডি, বিষ্ণপুর ও বিন্নাফৈর গ্রামে।

টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি তৈরি করতে হাতের কাজ করা হয় খুব দরদ দিয়ে, গভীর মনোসংযোগের সাথে অত্যন্ত সুক্ষ্ণ ও সুদৃশ্য ভাবে। পুরুষেরা তাঁত বোনে; আর চরকাকাটা, রঙকরা, জরির কাজে সহযোগিতা করে বাড়ির মহিলারা। তাঁতিরা মনের রঙ মিশিয়ে শাড়ির জমিনে শিল্প সম্মতভাবে নানা ডিজাইন করে বা নকশা আঁকে, ফুল তোলে।

টাঙ্গাইলের শাড়ির বৈশিষ্ট্য হলো- পাড় বা কিনারের কারুকাজ। টাঙ্গাইলের শাড়ি বোনার তাঁত দু'ধরনেরঃ (১) চিত্তরঞ্জন (মিহি) তাঁত, (২) পিটলুম (খটখটি) তাঁত। এ দু'ধরনের তাঁতেই তৈরি করা হয় নানা রং ও ডিজাইনের নানা নামের শাড়ি। যেমন- জামদানী বা সফ্‌ট সিল্ক, হাফ সিল্ক, টাঙ্গাইল বি.টি, বালুচরি, জরিপাড়, হাজারবুটি, সূতিপাড়, কটকি, স্বর্ণচুড়, ইককাত, আনারকলি, দেবদাস, কুমকুম, সানন্দা, নীলাম্বরী, ময়ুরকন্ঠী এবং সাধারণ মানের শাড়ি।

শাড়ির বিভিন্ন নাম ও মান, হাতের কাজ, শাড়ির জমিনের রঙভেদে দাম ও ভিন্ন রকম- সর্বনিম্ন দু'শত টাকা থেকে শুরু করে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হয়ে থাকে। এর মধ্যে জামদানি বা সফ্‌ট সিল্কের দাম সবচেয়ে বেশি। জামদানি শাড়ি তৈরি করা হয় আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ভাবে। এ শাড়ি তৈরি করার জন্য তাঁতিরা ১০০ কাউন্টের জাপানি সুতা ব্যবহার করে থাকেন। এ ছাড়া অন্যান্য শাড়ি তৈরি করতেও ১০০ কাউন্টের সূতা ব্যবহার করা হয়। মাঝে মাঝে নারায়নগঞ্জের সংযোগ শিল্পে প্রস্তুতকৃত ৮০, ৮২ ও ৮৪ কাউন্টের সূতাও ব্যবহার করে থাকে।

Matrix BCS Series

দেশ ভাগের পূর্বে টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির বাজার বসতো কলকাতায়। টাঙ্গাইলের বিভিন্ন অঞ্চলের তাঁতিরা চারাবাড়ি ঘাট, পোড়াবাড়ি ঘাট, নলছিয়া ঘাট ও সুবর্ণখালী বন্দর থেকে স্টিমার লঞ্চ ও জাহাজে চড়ে কলকাতায় যেতেন। কলকাতা তথা পুরোপশ্চিম বঙ্গের শাড়ি ব্যবসায়ীরা কিনে নিত এসব সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের তাঁতের শাড়ি।

দেশ ভাগের পর হতে টাঙ্গাইল তাঁতের প্রধান হাট হচ্ছে টাঙ্গাইলের বাজিতপুর। বাজিতপুর হাট টাঙ্গাইল মূল শহর থেকে দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। সপ্তাহের প্রতি সোম ও শুক্রবার হাট বসে। ভোর রাত হতে এখানে হাট শুরু হয়, সকাল ৯-১০টা পর্যন্ত চলে হাটের ব্যতিব্যস্ততা এবং বেচাকেনা। এ হাটের বেশির ভাগ ক্রেতারাই মহাজন শ্রেণীর। মহাজনরা এই হাট থেকে পাইকারি দরে কাপড় কিনে নিয়ে সারা দেশের বিভিন্ন বড় বড় মার্কেটে, শপিং মলে, ফ্যাশন হাউস গুলোতে সাপ- াই দেন। মহাজনদের পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও আমলাদের স্ত্রী-কন্যারাও এ হাট থেকে তাদের পছন্দের শাড়ী কিনে নিয়ে যান। তবে ঢাকা ও বিভিন্ন বিভাগীয় শহর ভিত্তিক ফ্যাশন হাউস গুলোই টাঙ্গাইল শাড়ির বড় ক্রেতা ও সরবরাহকারী।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, যেমন- ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, জাপান, সৌদিআরব, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসহ পশ্চিম বাংলায় টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির ব্যাপক কদর থাকলেও এ শাড়ি আন্তর্জাতিক বাজারে মার খাচ্ছে নানা কারণে- (১) দামের জন্য (কাঁচামালের সরবরাহের সহজলভ্যতা না থাকা, কাঁচামালসহ তাঁত মেশিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে টাঙ্গাইল শাড়ি উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে যায়)। (২) ভারতীয় শাড়ির আগ্রাসন (সেখানে কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও সূতার স্বল্প মূল্যের জন্য টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ির চেয়ে ভারতের শাড়ি দামে সস্তা হয়ে থাকে বিধায় অনেক ক্রেতাই সে দিকে ঝুকে পড়েছে)। (৩) টাঙ্গাইল শাড়ি বিপণন ব্যবস্থাটি মহাজনি চক্রের হাতে বন্দি, ফলে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। এ ছাড়া দেশ ভাগ,
পাকিস্তান-ভারত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের পর টাঙ্গাইল ছেড়ে ভারতে চলে যাওয়া বসাক তাঁতিরা সেখানে টাঙ্গাইল শাড়ির কারিকুলামে যে শাড়ি তৈরি করছে তা টাঙ্গাইল শাড়ির নাম ভাঙিয়ে বিশ্ববাজার দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে এতো প্রতিকূলতার পরেও টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি তার হারানো বাজার পুনরুদ্ধারে সক্ষম হচ্ছে। কারণ টাঙ্গাইল শাড়ি মানেই ভিন্ন সূতায়, আলাদা তাঁতে তৈরি আলাদা বৈশিষ্ট্যের শাড়ি। এর নকশা, বুনন, ও রংয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্রতা। অন্যান্য শাড়ি ১০ হাত থেকে সর্বোচ্চ ১১ হাত মাপে তৈরি হয়ে থাকে, আর টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি তৈরি হয় ১২ হাত মাপে। এ শাড়ি নরম মোলায়েম এবং পরতে আরাম, টেকেই অনেক দিন। এছাড়া সময় ও চাহিদার সাথে তাল রেখে দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে টাঙ্গাইল শাড়ির আকর্ষণ ও নক্‌শার ব্যঞ্জনা।

টাঙ্গাইলের বাজিতপুর, নলসুন্দা, সন্তোষ ও কাগমারী গ্রামে প্রস্তুত হয় ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি। কালিহাতীর বল্লা রতন গঞ্জ ও কোবডোহরা গ্রামে লুঙ্গি, গামছা ও ধুতি। কোকডোহরা, ধুতি মিহি ও মোলায়েম। গায়ের বিছানার চাদর, আলোয়ান তৈরি হয় রতন গঞ্জ। বৈন্নাফৈর গ্রামে

উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হয়। টাঙ্গাইলের রেশমী সূতী ও মিশ্রনের সূতোর শাড়ি, লুঙ্গি প্রস্তুত হয়ে থাকে। তবে গামছা ও মশারী তৈরিতে যুগী বা দেবনাথ সম্প্রদায় আজো একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখতে পেরেছে।

টাঙ্গাইল শাড়ির নতুনত্বের অন্যতম সফল তাঁতিদের মধ্যে বাজিতপুরের আনন্দ মোহন বসাক, সীতানাথ বসাক, চন্ডি গ্রামের নীল কমল বসাক, মনে মন্টু; নলসুন্দা গ্রামের হরেন্দ্র বসাক, পাথরাইল গ্রামের রঘুনাথ বসাক, আনন্দ, গোবিন্দ, সুকুমার বসাক, খুশি মোহন বসাক এর নাম উল্লেখযোগ্য। তারা জানান টাঙ্গাইলের শাড়ি বুনোনের মূল কাজ একেবারেই আলাদা। অনেক পুরোনো একটা ঐতিহ্যের ধারায় চলে একাজ। সেই জ্ঞান ও নিষ্ঠা ছাড়া আসল টাঙ্গাইলের শাড়ি তৈরি করা যায় না। আসল টাঙ্গাইলের শাড়ি তৈরির জন্য এর তাঁতী বা কারিগরদের শিল্পী হয়ে উঠতে হয়। আমাদের টাঙ্গাইলে সেই শিল্পী তাঁতি আছে। তাই টাঙ্গাইলের তাঁত শিল্প ও তাঁতের শাড়ির এতো সুখ্যাতি।

কাঁসা ও পিতল শিল্পঃ

টাঙ্গাইলকে প্রসিদ্ধ করেছে কাসা ও পিতল শিল্প। এক সময় টাঙ্গাইলের সমৃদ্ধশালী ব্যবসা ছিলো এটি। শুধু টাঙ্গাইল নয় বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্পের সুনাম ছিল। টাঙ্গাইলের কাঁসা ও পিতলের তৈরি তৈজস পত্রের ব্যাপক চাহিদা ছিলো সারা দেশে। দেশের চাহিদা মিটিয়েও কাঁসা ও পিতলের তৈজসপত্র বিদেশেও রফতানি হতো। বিশেষ করে এগুলো ছিলো ভারত বিখ্যাত। অবিভক্ত বাংলায় একদিন প্রসিদ্ধ ছিলো টাঙ্গাইলের তামা, কাঁসা ও পিতল শিল্প। এটি বিগলন ঢালাই প্রযুক্তির অন্তর্গত। আর সুদৃশ্য কারুকার্য ও অনুপম গুণগত মানের জন্যই টাঙ্গাইলের কাঁসা ও পিতলের তৈরি তৈজসপত্র এতটা প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিলো।

কাঁসা ও পিতলের অপূর্ব শিল্প কর্মের জন্য ব্রিটিশ সরকার কাঁসা শিল্পীদের মধ্যে নাম করা অনেককেই প্রশংসা ও পদকে ভূষিত করেছেন। এদের মধ্যে প্রয়াত মধুসূদন কর্মকার, গণেশ কর্মকার, বসন্ত কর্মকার, যোগেশ কর্মকার, হারান কর্মকার উল্লেখযোগ্য।

টাঙ্গাইলের প্রধান কাগমারীর কাঁসা, পিতল ও তামার ধাতুশিল্প আজো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এখনো টাঙ্গাইলের কাগমারীসহ জেলার নানা গ্রামাঞ্চলে এই কাঁসা ও পিতল শিল্পীরা তৈরি করছে নানা দ্রব্যাদি। ব্যাপক প্রসিদ্ধ ও চাহিদার ভিত্তিতে টাঙ্গাইলের বিভিন্ন স্থানে কাঁসা ও পিতলের শিল্প গড়ে উঠলেও কাগমারী, মগড়া ও সাকরাইল গ্রাম ছিলো বেশি প্রসিদ্ধ। এক সময় এ সকল গ্রামে শতশত পরিবার কাঁসা ও পিতল শিল্পী ছিলো। দিন রাতে তাদের কাঁসা পেটানোর শব্দে গ্রামগুলো মুখর থাকতো। হিন্দুদের মধ্যে কর্মকার সম্প্রদায়েরাই এ শিল্পের সঙ্গে বংশানুক্রমে জড়িত। টাঙ্গাইলের কর্মকারগণ অত্যন্ত সুনিপূণ কৌশলে নিরলস শ্রম দিয়ে আজো তৈরি করছে তামা, কাঁসা ও পিতলের থালা, বাটি, কলসী, গ- াস, জগ, ঝারি, বদনা, ঘটি, লোটা, পঞ্চ প্রদীপদান, মোমবাতিদান আগর বাতিদান, কুপি, চামচ,

Matrix BCS Series

কাজলদানী, ডেকচি, ডেগ, বোল, খুন্তি, সড়তা, বাটি, পুতুল, ঝুনঝুনি, করতাল, মেডেলসহ প্রভৃতি জিনিস পত্র।

এক কালে টাঙ্গাইল অঞ্চলের জমিদার ও ভূ-স্বামীগণের বড় তৈজসপত্র ছিলো এ গুলো। এদেরই সহায়তায় এসব কারিগর সমাজ নিত্য নতুন জিনিস তৈরি করেছে। প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য। জমিদার গণ ও ছিলেন বৈচিত্র প্রয়াসী তারাও চাইতেন নানা কারুকার্য খচিত কাঁসার বাসনপত্র উপযুক্ত সহায়তা এবং সমাদরের অভাবে এই শিল্প অন্ধকারে ধূকছে। আজ বিয়ে-শাদী, অন্নপ্রাশন ও সুন্নতে খতনা কিংবা সে ধরনের কোন অনুষ্ঠানে কেউ পিতলের কলসী, কাঁসার জগ, গ- াসও চামচ উপহার দেয় না। এক সময় কাঁসা ও পিতলের তৈরি জিনিসপত্র বিয়ে, মুসলমানিসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে সেরা উপহার হিসেবে বিবেচিত হতো।

হাজার বছরের পুরনো এ শিল্প ইতিহাসে প্রমাণ আছে। গ্রাম সমবায়ে কাংস্যকার, কাংস্যবণিক ইত্যাদি বৃত্তিধারী শ্রেণী ছিল। পাঠান, মোগল ও বৃটিশ শাসনামলে কাংস্যকার যখন যে রূপ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল, সেরূপ বিকাশ লাভ করতে পেরেছিলো। কাগমারীতে যারা তামা, পিতল, কাঁসা শিল্পের সাথে জড়িত তাদের বংশগত উপাধি কর্মকার। কাংস্যকার বা কাংস্যবণিক বলে কাউকে কাঁসা শিল্পের সাথে জড়িত দেখা যায় না। তবে কাগমারী কাংস্য শিল্পের সুনাম ছিল এবং এখনো আছে। টাঙ্গাইলের বরাইল ও কাগমারীতে পিতলের কাজের প্রধান্য রয়েছে। টাংগইলের কাগমারী ও মগরা দুটি গ্রামে উপরোল্লোখিত জিনিস ছাড়া আরো তৈরি হয় কাঁসার ঘণ্টা, জয়ঢাক, তামার কুশা-কুশি, টাট পুষ্পাধার ইত্যাদি।

দিন বদলেছে। আধুনিক প- াস্টিক, এলোমেনিয়ামের ও মেলামাইনের তৈজসপত্রের আমদানীতে টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী কাঁসা ও পিতল শিল্পের উন্নয়নে প্রচুর কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা আধুনিক মেশিনারির ব্যবস্থা এবং বাজারের চাহিদানুযায়ী আধুনিক রুচিসম্মত জিনিস তৈরির ব্যবস্থা না থাকার কারণে এ শিল্পের চরম সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী এই লোক শিল্পটি আজ বিলুপ্তির পথে। কাঁসার তৈরি জিনিস পত্রের দাম বর্তমানে এতো বেশি যে, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। দামে সস্তা হওয়ায় বিকল্প হিসেবে স্টিল, মেলামাইন, চিনামাটি, কাচ ও প- াস্টিকের সামগ্রী কাঁসা শিল্পের বাজার দখল করে নিয়েছে। ফলে আধুনিক প্রযুক্তির লোক শিল্পের দাপটে প্রাচীন লোক শিল্পটি ক্রমশই বিলুপ্ত হতে চলেছে।

এছাড়া দেশের স্বাধীনতার পর চোরাই পথে ব্যাপকভাবে এখানকার কাঁসা ও পিতলের তৈরির জিনিস পত্র ভারতে পাচার হতে থাকা এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক দক্ষ কারিগর দেশ ত্যাগ করাতে এই শিল্পের উপর বিপর্যয় নেমে আসে। এখন এই শিল্পের সাথে জড়িত কর্মকার সম্প্রদায়ের শতশত পরিবার মানবেতর জীবন যাপন করছে। টাঙ্গাইলের কাগমারী ও মগরা দু'টি গ্রামে বাস করে অনাধিক ৫০টি পরিবার। তারা কেউ কেউ বেছে নিয়েছে অন্য পেশা। ফলে কমে যাচ্ছে কাঁসা ও পিতল শিল্পীর সংখ্যা। টাঙ্গাইল

Matrix BCS Series

জেলা সদরে এই শিল্পের দোকান থাকলেও বেচাকিনি নাই বললেই চলে। তাই এই শিল্পের মন্দাভাব দিন দিন বাড়ছে। এধারা অব্যাহত থাকলে এবং সরকারি ভাবে উদ্যোগ না নিলে টাঙ্গাইলের প্রাচীন ও ঐতিহ্যাবাহী এ লোক শিল্পটি কালের করাল গ্রাসে হারিয়ে যাবে এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।

বাঙালী রমনীর কণ্ঠে ধ্বনিত হবে না নানা রকমের মিষ্টি সুরের প্রেমের লোক গান। কতই না গান রচিত হয়েছিল কাঁসা ও পিতল শিল্প নিয়ে।

পরিশেষে বলা যায়, মহাজনী পুঁজি প্রবেশ লাভ করেছে এ লোক শিল্পে। এতে কারিগর শ্রেণী দ্রুত মজুরে পরিণত হবে অথচ গড়ে উঠতে পারবে না এ লোক শিল্প শক্ত ভিতের উপর। উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাব হেতু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে রূপান্তরিত হওয়ায় সুযোগও আজ অনুপস্থিত।

মিষ্টি শিল্পঃ

টাঙ্গাইল জেলায় অনেক মিষ্টি তৈরি হয়। যেমন- চমচম, দানাদার, রসগোল্লা, আমৃত্তি, জিলাপী, সন্দেশ, বিভিন্ন প্রকার দই, খির, নই, টানা, খাজা, কদমা বাতাসা ইত্যাদি। কিন্তু টাঙ্গাইলের মিষ্টি শিল্পের কথা বলতে গেলে প্রথমেই পোড়াবাড়ির চমচমের কথা বলতে হয়। মিষ্টির রাজা বলে খ্যাত টাঙ্গাইল জেলার পোড়াবাড়ি নামক স্থানের এই চমচম স্বমহিমায় মহমান্বিত। স্বাদ আর স্বাতন্ত্রের ও এর জুড়ি মেলে না। যার নাম শুনলেই অতুলনীয় স্বাদ ও অর্পূব গন্ধের কথা মনে করে জিহবায় পানি এসে যায়। এই সুস্বাদু ও লোভনীয় চমচম মিষ্টি ও টাঙ্গাইলের একটি অন্যতম ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য প্রায় ২শ বছরের প্রাচীন। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমল থেকে অবিভক্ত ভারতবর্ষসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পোড়াবাড়ির চমচম টাঙ্গাইলকে ব্যাপক পরিচিত করেছে। বাংলা, বিহার, ছাড়িয়ে ভারতবর্ষ তথা গোটা পৃথিবী জুড়ে এর সুনাম রয়েছে। মিষ্টির জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন আকারের চমচমের বৈশিষ্ট অতি চমৎকার এর বাইরেরটা দেখতে পোড়া ইটের মতো। লালচে রংয়ের এই সুস্বাদু চমচমের উপরিভাগে চিনির গুড়ো থাকে এর ভিতরের অংশ রসাল নরম। লালচে গোলাপী আভাযুক্ত ভেতরের নরম অংশের প্রতিটি কোষ থাকে কড়া মিষ্টিতে কনায় কনায় ভরা। এই সুস্বাদু চমচম তৈরির মূল উপাদান খাঁটি দুধ, চিনি, পানি, সামান্য ময়দা ও এলাচ দানা হলেও টাঙ্গাইলের চমচমের স্বাদ মূলত টাঙ্গাইলের পানি উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ টাঙ্গাইলের চমচম তৈরির মূল রহস্য এখানকার পানির মধ্যে নিহিত। দেশের অনেক জায়গা থেকেই টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির কারিগর নিয়ে অনেকেই টাঙ্গাইলের চমচম তৈরির চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সফল হতে পারেনি। এই ঐতিহাসিক চমচমের গুণেই মূলত টাঙ্গাইল এটি জেলা হিসেবে জন্ম লাভের পূর্বেই বিশ্ববাজারে পরিচিত লাভ করে।

গবেষকদের মতে দশরথ গৌড় নামে এক ব্যক্তি বৃটিশ আমলে টাঙ্গাইলের যমুনা নদীর তীরবর্তী পোড়াবাড়িতে আসেন। আসাম থেকে আগত এই দশরথ গৌড় যমুনার সুস্বাদু মৃদুপানি ও এখানকার খাঁটি গরুর দুধ দিয়ে প্রথম চমচম তেরি করেন। অতঃপর এখানে ব্যবসা শুরু করেন। তখন পোড়াবাড়ি টাঙ্গাইলের অন্যতম নদী বন্দর ছিলো। ১৬০৮

খ্রিস্টাব্দে মোঘল সুবেদার ইসলাম খাঁ হযরত শাহ জামানকে আতিয়া পরগনার শাসক নিযুক্ত করলে তিনিই পোড়াবাড়ি গ্রামকে নদী বন্দর হিসেবে গড়ে তোলেন। সেই সময়কালে ধলেশ্বরীর পশ্চিম তীরে গড়ে উঠে ছিলো জমজমাট ব্যবসা কেন্দ্র পোড়াবাড়ি বাজার। তখন পোড়া বাড়ি ঘাটে ভিড়তো বড় বড় সওদাগরী নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার। ক্রমে ক্রমে পোড়াবাড়ি যখন জনসমাগমে প্রাণ চঞ্চলতায় ভরপুর- তখনই এখানে সুস্বাদু চমচম অর্থাৎ মিষ্টি শিল্প গড়ে ওঠে। রসগোল্লা আবিষ্কারে মিষ্টান্ন শিল্পের আসে নবজাগরণ, সমসাময়িককালে পোড়াবাড়ির চমচম ও মুক্তা গাছার মন্ডার সুখ্যাতির শুরু। মন্ডার সাথে পাল্লা দিয়ে শুরু হয় চমচমের ঐতিহ্যের যুগ।

টাঙ্গাইল জেলা সদর থেকে মাত্র ৩ মাইল পশ্চিমে একদা ঘাট ছিল, এর নাম তালান ঘাট। সেখানেও ভিড়তো সওদাগরী নৌকা, জাহাজ ও লঞ্চ। সে সময় দেশী বিদেশী ব্যবসায়ীদের পদচারনায় পোড়াবাড়ি ছিল ব্যস্ত এক ব্যবসাকেন্দ্র। তখন চমচমের ব্যবসাও ছিল জমজমাট। প্রতি সপ্তাহে ১৫০ থেকে ২০০ মন চমচম তৈরি হতো পোড়াবাড়িতে। আবার কারো মতে সে সময় প্রতিদিন প্রায় এক দেড়শমন চমচম তৈরি হতো পোড়াবাড়িতে। উত্তরোত্তর সাফল্য ও চাহিদার কারণে তখন পোড়াবাড়িতে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ টি চমচম তৈরির কারখানা গড়ে উঠে যার সাথে প্রায় তিন শতাধিক পরিবারের জীবন ধারা আবর্তিত হয়। সে সময় চমচম মিষ্টি তৈরির সাথে জড়িত ছিল দশরথ গৌড়ের পর পরই রাজারাম গৌড়, কুশাইদেব, নারায়ন, কাকন হালুই, শিবশংকর গৌড়, প্রকাশ চন্দ্র, মদন গৌড় ও মোহন লাল প্রমূখ। তার পরবর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ চলমান সময়ে খোকা ঘোষ এবং গোপাল চন্দ্র দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা চমচম মিষ্টির ব্যবসায় সাফল্য লাভ করেন। বর্তমানে টাঙ্গাইল শহরের পাঁচ আনি বাজার এই মিষ্টি শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

চমচম এখন একটি উপাদেয় মিষ্টান্ন যা যে কোন বয়সের লোকের কাছে লোভনীয়। বিয়ের অনুষ্ঠান, পূজায়, জন্ম দিনে, পরীক্ষায় ফলাফল হলে, চাকরির প্রমোশন হলে, নির্বাচনে জয়ী হলে, নতুন চাকরি হলে, শ্বশুড় বাড়ি বা আত্মীয় বাড়ি যাওয়ার সময় এই চমচম দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় এখনো সর্বমহলে প্রচলিত।

কালের আবর্তে যমুনার শাখা নদী ধলেশ্বরীর বুকে অসংখ্য চরজেগে উঠে। এতে বন্ধ হয়ে যায় পোড়াবাড়ির নৌপথের ব্যবসা বাণিজ্য। ক্রমে ক্রমে জনবহুল পোড়াবাড়ী হতে থাকে জনশূন্য। এ ঐতিহ্যবাহী চমচম শিল্পকে কেন্দ্র করে এতো লোক জীবিকা নির্বাহ করতো, তারা বেকার হয়ে পড়ে। বেঁচে থাকার তাগিদে তারা অন্য পেশায় চলে যায়। পোড়াবাড়ি বাজারের অবস্থা খুবই করুন। এই বাজারের ৪ থেকে ৫টি ভাঙ্গা চোড়া চমচমের দোকান রয়েছে। যা কেবল মাত্র ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করে চলেছে। বাজার এবং আশে পাশে কয়েকটি বাড়িতে এখনো মিষ্টি তৈরি হয়। তারা ঐ মিষ্টি রাজধানী ঢাকা তাছাড়া দেশের বিভিন্ন শহরে তা সরবরাহ করে থাকে। জয়কালী মিষ্টান্ন ভান্ডার, গোপাল মিষ্টান্ন ভান্ডার ও টাঙ্গাইল পোড়াবাড়ি মিষ্টি ঘরে এখনো নির্ভেজাল পোড়াবাড়ির চমচম পাওয়া যায়।

Matrix BCS Series

বর্তমানে টাঙ্গাইলের পাঁচ আনী বাজার ছাড়াও টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি তৈরিও বিক্রি হচ্ছে। যেমন আমির্তি, রসমালাই, রসগোল্লা, সন্দেশ, কালোজাম জিলাপী খাজা বাতাসা, কদমা, নই, টানাবাদাম ইত্যাদি। মির্জাপুর উপজেলা জামুর্কীর সন্দেশ বিখ্যাত। নলিন বাজারের রসগোল্লার খ্যাতি রয়েছে। বাসাইল উপজেলার ফাইলা পাগলার মেলায় কদমার সুনাম আছে। এ ছাড়া টাঙ্গাইলের ঘোষেরা ওপাল সম্প্রদায়ের লোকেরা দানাদার, দই ও ঘি তৈরি করেন। এ দইয়ের খ্যাতিও কম নয়। বগুড়ার দইয়ের চেয়ে স্বাদে ও গন্ধে কোন অংশে কম নয়। বরং কোন কোন ঘোষের দই বগুড়ার দইয়ের চেয়েও ভালো। যেমন- আলমনগরের নীল কমলের দই, ফলদার খোকা ঘোষের দই ও ভূঞাপুরের রমজানের দইয়ের খ্যাতি রয়েছে।

ঐতিহ্যের পোড়াবাড়ির চমচম আজ নানা প্রতিকূলতায় সম্মুখীন। এই মিষ্টি নির্মাতারা ও ব্যবসায়ীরা আর্থিক লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে এ পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। এমনি করে চলে গেলে আমাদের ঐতিহ্যবাহী পোড়াবাড়ির চমচম একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

মিষ্টি শিল্পে টাঙ্গাইলের ঘোষ ও পাল সম্প্রদায় বংশানু ক্রমিকভাবে নিয়োজিত আছে। তবে দে, নাগ ইত্যাদি উপাধিধারীদের কোথাও কোথাও মিষ্টান্ন তৈরিতে নিয়োজিত দেখা যায়। টাঙ্গাইলের মোদক উপাধি প্রাপ্তরাও মিষ্টি শিল্পের সাথে জড়িত ছিল, এখনো আছে। মোদক উপাধিধারী হিন্দুরা বংশগতভাবে গুড়, তেল, ময়দা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করে জিলাপি, কদমা, বাতাসা, গজা, খাজা, নই, টানা এবং চিনি সহযোগে খোরমা, মিস্ত্রী, চিনি বা গুড়ে সাজ, মুড়ির মোয়া, ঢেপের মোয়া, ঝুরি, জোয়ারের খইসহ বিভিন্ন উপদানের তৈরি নাড়ু ইত্যাদি।

দুগ্ধজাত দই, ক্ষীর, ঘি, মাখন ইত্যাদি মিষ্টি দ্রব্য তৈরিতে টাঙ্গাইলের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে। যে কথা আগেও বলা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতির নরদই, দেউপুর, নিচনপুর ও এলেঙ্গা। ভূঞাপুরের ফলদা ও ভূঞাপুর সদরে এবং গোপালপুরের মিষ্টি পট্টি আলমনগর ও নলিন বাজরের সুস্বাদু এবং উত্তম দই, ক্ষীর, ঘি, মাখন তৈরি উল্লেখযোগ্য স্থান।

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা

১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক জান্তা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার তারিখ বাতিলের ঘোষনা দেন। এই ঘোষনার সাথে সাথে সমগ্র বাংলাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে; টাঙ্গাইলেও শুরু হয় জঙ্গী মিছিল। মিছিলের স্লোগান ছিল "ইয়াহিয়ার ঘোষনা বাঙ্গালীরা মানবে না", "বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, আমরা গড়ব নতুন দেশ নাম হবে তার বাংলাদেশ"। ছাত্র যুবক জনতা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন থানা ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রামগঞ্জে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এই সকল সামরিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন প্রধানতঃ সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ। এই ধারাবাহিকতায় মওলানা মোহাম্মদ আলী

Matrix BCS Series

কলেজে সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ক্যাডেট কোরে ড্যামি রাইফেল দিয়ে মূলতঃ এই প্রশিক্ষণ চলতে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের যুগান্তকারী ভাষণের পর পরই টাঙ্গাইল শহরে বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে তৎকালীন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আবু মোহাম্মদ এনায়েত করিম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে জয় বাংলা বাহিনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে, জনাব এনায়েত করিম ও কাদের সিদ্দিকী দুজনেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে একসময় কর্মরত ছিলেন। উক্ত কুচকাওয়াজে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দপ্তর সম্পাদক জনাব আব্দুর রশীদ সালাম গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইটের নামে ঢাকায় নীরিহ- নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের উপর ভয়াবহ গণহত্যা শুরু করে। রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা, ইপিআর সদর দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ করে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর বঙ্গবন্ধু ওয়ারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষনা তৎকালীন জেলা আওয়ামী লীগের নেতা এবং বয়কনিষ্ঠ এমপিএ ফজলুর রহমান ফারুক মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে সংগ্রহ করে আনেন। এবং এই ঘোষনা টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সলিমুল্লাহ মুসলীম হলের জি.এস আনোয়ারুল আলম শহীদ ও টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের নেতা ফারুক আহমদ মাইকযোগে সমগ্র টাঙ্গাইল শহরে প্রচার করেন। ২৬ মার্চ টাঙ্গাইল থানায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি। তৎকালীন এমপিএ জেলা আওয়ামীলীগ নেতা বদিউজ্জামান খানকে চেয়ারম্যান করে গঠিত হয় হাই কমান্ড। হাই কমান্ডের সদস্য ছিলেন টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত সকল এম.এন.এ ও এম.পি.এ এবং এডভোকেট নূরুল ইসলাম। শ্রমিক নেতা হাবিবুর রহমান খান প্রমূখ। উক্ত হাই কমান্ডের কমান্ডার ইন চীফ এর দায়িত্বে ছিলেন আওয়ামীলীগ নেতা এমপিএ আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী। এডভোকেট নূরুল ইসলামের পূর্ব আদালতপাড়াস্থ বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই হাই কমান্ড গঠিত হয়। ২৭ মার্চ বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভার মাধ্যমে হাই কমান্ডের উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং হাই কমান্ড টাঙ্গাইলের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তৎকালীন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা খন্দকার আসাদুজ্জামান সিএসপি টাঙ্গাইল এসে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সমর্থন ঘোষনা করেন এবং তাকে হাই কমান্ডের উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। টাঙ্গাইলের তৎকালীন জেলা পরিষদ কার্যালয় (পুরাতন ফৌজদারী ভবন) হাই কমান্ডের কার্যালয় করা হয়। হাই কমান্ডের অফিস সেক্রেটারীর দায়িত্বে ছিলেন নৈয়ম উদ্দিন আহমেদ মুক্তার। হাই কমান্ডের সর্বাধিনায়ক জনাব আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে অস্ত্র সংগ্রহ শুরু হয়। এবং বিভিন্ন স্কুল কলেজের ল্যাবরেটরী থেকে এসিড সংগ্রহ করে হাত বোমা ও মলোটভ ককটেল তৈরী করা শুরু হয়। এই কাজে আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দসহ বামপন্থী ছাত্রনেতা বুলবুল খান মাহবুব, শ্রমিক নেতা সৈয়দ আব্দুল মতিন প্রমূখ সক্রীয় ভূমিকা রাখেন। ঐ সময় টাঙ্গাইল সার্কিট হাউসে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি

Matrix BCS Series

অবস্থান করছিল। ২৭ মার্চ ভোরে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ছাত্র যুবসমাজ তাদেরকে ঘিরে ফেলে। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী সৈন্যরা জয় বাংলা স্লে- াগান দিয়ে বেরিয়ে আসে। কোম্পানি কমান্ডার মেজর কাজেম কামালসহ পাকিস্তানী ২ জন অফিসারকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে মেজর শফি উল্লাহ এসে তাদের হত্যা করেন। এক পর্যায়ে মার্চ মাসের শেষেরদিকে মেজর শফি উল্লাহর নেতৃত্বে জয়দেবপুর থেকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী সৈন্যরা অস্ত্র গোলাবারুদ ও সামরিক যানসহ টাঙ্গাইলে আসেন। হাই কমান্ডের পক্ষ থেকে তাদেরকে টাঙ্গাইলে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। পরে তারা ময়মনসিংহ এর দিকে চলে যান।

জোর গুজব ছিল যে কোন সময় পাকবাহিনী ঢাকা হতে টাঙ্গাইলে প্রবেশ করবে। এজন্য মির্জাপুর থানার গুড়ান সাটিয়াচড়া নামক স্থানে ছাত্রজনতা ও ইপিআর সদস্যদের সমন্বয়ে প্রতিরোধ বুহ্য তৈরী করা হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন এমপিএ ফজলুর রহমান ফারুক। ৩ এপ্রিল পাকবাহিনী টাঙ্গাইলে প্রবেশ পথে গুড়ান সাটিয়াচড়া নামক স্থানে এসে পৌঁছলে তুমুল প্ররোধের সম্মুখীন হয়। কয়েক ঘন্টা যুদ্ধের পর ছাত্র যুবক ও ইপিআরের প্রতিরোধ বুহ্য ভেঙ্গে পড়ে। ৬ জন ইপিআর ও ছাত্রলীগ নেতা জুমরাতসহ ৩৩৭ জনকে পাকবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে এবং গুড়ান সাটিয়াচড়া গ্রাম ২টি আগুনে ভস্মীভূত করে। পরে তারা ঐদিনই বিকেলের দিকে টাঙ্গাইলে প্রবেশ করে। পাকবাহিনী টাঙ্গাইলে প্রবেশের সময় যে মর্টারসেল নিক্ষেপ করেছিল সেই মর্টারসেলের আঘাতে শহরের পাড়দিঘুলীয়া গ্রামের শাহাবুদ্দীন মাস্টার, তার পুত্র ছাত্রলীগ নেতা ছানোয়ার হোসেন অনু এবং যুবক আব্দুল কদ্দুস শাহাদত বরণ করেন। পাকবাহিনী টাঙ্গাইলে আসার ঘোষনা বামপন্থী শ্রমিক নেতা সৈয়দ আব্দুল মতিন সকল ভয়ভীতি উপক্ষো করে শহরে প্রচার করেন। পাকবাহিনী শহরে প্রবেশ করে খন্দকার আসাদুজ্জামানের বাড়ী, বদিউজ্জামান খানের বাড়ী, এডভোকেট নূরুল ইসলামের বাড়ী ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয় এবং জনাব আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর বাড়ী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পাক বাহিনী টাঙ্গাইলে প্রবেশের পূর্ব মূহুর্তে খন্দকার আসাদুজ্জামানের সহায়তায় কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ফারুক আহমদ, মোঃ সরওয়ার্দী, এনএ খান আজাদ, মিন্টু খান, সুখন, কালা ফারুক প্রমুখ টাঙ্গাইল ট্রেজারি থেকে পুলিশের সকল রাইফেল,গোলাবারুদ ২টি ট্রাকে করে নিয়ে প্রথমে ঘারিন্দা ও পরে বিভিন্নভাবে টাঙ্গাইলের পাহাড়ী এলাকা বর্তমান সখিপুর উপজেলাধীন মরিচা নামক স্থানে নিয়ে যান। পরবর্তীতে কাদেরীয়া বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে এই অস্ত্রগুলো একটি সহায়ক শক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়।

টাঙ্গাইল হাই কমান্ডের সর্বাধিনায়ক আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী ইপিআরের একটি বাহিনী নিয়ে ঘাটাইল কালিহাতীর হামিদপুর বেতডুবা নামক স্থানে প্রতিরোধ বুহ্য রচনা করেন। কাদের সিদ্দিকীসহ ছাত্র যুবকেরাও এই প্রতিরোধে অংশ নিয়েছিল। ঐ স্থানে পাক বাহিনীর সাথে তুমুল যুদ্ধ সংগঠিত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী ভারতে চলে যান। পরবর্তীতে আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে টাঙ্গাইলে মুক্তিবাহিনী সংগঠিত হতে থাকে। শওকত মোমেন শাজাহান, হামিদুল হক, ইদ্রিস আলী প্রমুখের নেতৃত্বে পাহাড়ী এলাকায়, আনোয়ারুল আলম শহীদ, মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী, নূরুন্নবী, আজীজ বাঙ্গাল,

Matrix BCS Series

সৈয়দ জিয়া আব্দুল আলীম, আবুল কালাম আজাদ, আঃ কদ্দুস, এনায়েত করিম, সোহরাব আলী খান আরজু, খোদা বক্স, আমানউল্লাহ বুলা, সৈয়দ শাজাহান প্রমুখের নেতৃত্বে ভূঞাপুর এলাকায়, সৈয়দ নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে গোলড়া এলাকায় এবং খন্দকার আব্দুল বাতেনের নেতৃত্বে নাগরপুর এলাকায় মুক্তিবাহিনী সংগঠিত হতে থাকে। পরবর্তীতে আব্দুল কাদের সিদ্দিকীকে সর্বাধিনায়ক স্বীকার করে খন্দকার আব্দুল বাতেন ছাড়া সকলেই তার নেতৃত্ব মেনে নেয়। এইভাবে গড়ে উঠে টাঙ্গাইলের বিশাল কাদেরীয়া বাহিনী। কাদেরীয়া বাহিনী গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে ফারুক আহমদ সার্বক্ষনিকভাবে তার সাথে থেকে এই বাহিনী গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে মে মাসের দিকে নাট্যকার মামুনুর রশিদ, মোয়াজ্জেম হোসেন খান, কবি রফিক আজাদ, কবি মাহবুব সাদিক প্রমুখ কাদেরীয়া বাহিনীতে যোগ দেন।

মে মাসে সখিপুরের মহানন্দপুর গ্রামে মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। আনোয়ারুল আলম শহীদকে বেসামরিক প্রধান ও হামিদুল হককে উপ-প্রধান নিয়োগ করা হয়। মুক্তিবাহিনীর একটি সাপ্তাহিক মুখপাত্র "রণাঙ্গন" প্রকাশিত হতে থাকে। এর সম্পাদক ছিলেন রনদূত (আনোয়ারুল আলম শহীদ), সহ-সম্পাদক ফারুক আহমদ ও সৈয়দ নূরুল ইসলাম। বেসামরিক প্রধানকে সহায়তা করার জন্য সৈয়দ নূরুল ইসলাম, ফারুক আহমদ ও আব্দুল্লাহ কে বেসামরিক প্রধানে বিশেষ সহকারী নিয়োগ করা হয়। আব্দুল আওয়াল সিদ্দিকী ও সরু আলী আজগরকে গণ সংযোগের দায়িত্ব দেয়া হয়। মোয়াজ্জেম হোসেন খান, এনায়েত করিম, আব্দুল আলীম, সৈয়দ জিয়া, আব্দুল হামিদ ভোলা ও খন্দকার নূরুল ইসলামকে আঞ্চলিক বেসামরিক প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। বিশাল কাদেরীয়া বাহিনীকে প্রায় ৯৭টি কোম্পানিতে ভাগ করা হয়।

মুক্তিবাহিনীর প্রাথমিক ট্রেনিং সেন্টার ছিল সখিপুরের বহেড়াতলীতে। মুক্তিবাহিনীর হেড কোয়ার্টার থেকে রণাঙ্গন পত্রিকা ছাড়াও বিভিন্ন দলিল স্ট্যাম্প, বিয়ের কাবিন নামা ও বিভিন্ন ফরম ছাপানো হতো। কাদেরীয়া বাহিনী প্রধান লিঁয়াজো অফিসার ছিলেন মোহাম্মদ নূরুন্নবী (বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী) এবং লিয়াজো অফিসার ছিলেন নূরুল ইসলাম, মোয়াজ্জেম হোসেন খান ও এ এম এনায়েত করিম। পরবর্তীতে এ এম এনায়েত করিমকে কাদেরীয়া বাহিনীর প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। কাদেরীয়া বাহিনী ছোট বড় অসংখ্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রতিটি যুদ্ধে অসাধারণ নৈপূণ্য প্রদর্শন করে হানাদার বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পর্যস্ত করেছে। কাদের সিদ্দিকী এবং কাদেরীয়া বাহিনীর নাম মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসই ছিল পাকহানাদার বাহিনীর জন্য চরম আতংকের। কাদেরীয়া বাহিনী একই সঙ্গে হিট এন্ড রান গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি এবং মুক্তাঞ্চল তৈরি করে সম্মুখ যুদ্ধের রণনীতি ও রণ কৌশল ব্যবহার করেছে। টাঙ্গাইলের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধগুলোর মধ্যে গোড়ান-সাটিয়াবাড়ীর যুদ্ধ, কালিহাতী ও বল্লার যুদ্ধ, কামুটিয়ার যুদ্ধ, যমুনা নদীর সারিয়াকান্দী মাটিকাটার বিখ্যাত জাহাজ মারার যুদ্ধ, ধলাপাড়ার (মাকরাই) যুদ্ধ, নখিরপুরের যুদ্ধ সহ অসংখ্য ছোট বড় যুদ্ধ। কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে কাদেরীয়া বাহিনীর দামাল যোদ্ধারাই ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সাথে প্রথম ঢাকা শহর দখল করে পল্টনে প্রথম জনসভা করে।

Matrix BCS Series

কাদেরীয়া বাহিনীতে পাঁচটি সেক্টরের অধীনে ৯৭টি কোম্পানী ছিল। কোম্পানী প্রধানদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মধ্যে ছিলঃ

১) কাদেরীয়া বাহিনীর অর্ন্তভূক্ত সমস্ত এলাকা দ্রুততার সাথে পরিভ্রমণ করা;

২) স্বাধীনতার পক্ষে জনগণকে উৎসাহ দান;

৩) প্রয়োজনবোধে রাস্তা-ঘাট ভেঙ্গে দেয়া (হানাদারদের চলাফেরায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্য);

৪) চুরি-ডাকাতি নিবারণ। কুখ্যাত চোর ডাকাতদের স্থানীয় জনসাধারণের পরমর্শ নিয়ে শাস্তি বিধান করা।

এছাড়া ২৩ নং ইঞ্জিনিয়ারি ও সিগনাল প- াটুনের উপর দায়িত্ব ছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত সদস্যদের খবরা-খবর সম্ভলিত একটি নিখুঁত তালিক প্রণয়ন করে ১৫ দিনের মধ্যে অধিনায়কের নিকট পেশ করা বিভিন্ন জায়গা থেকে টেলিফোনের তার এনে এলাকার দূর্গোম স্থান সমূহের সাথে প্রধান কার্যালয়ের সংযোগ স্থাপন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কাদেরীয়া বাহিনীর কমান্ডারদেরকে কঠোরভাবে যেসব নীতিমালা মেনে চলার জন্য নির্দেশ দেন, তা হলোঃ

১) কোন কোম্পানী কমান্ডার কোন লোককে কোনও অপরাধের জন্য একক ক্ষমতাবলে মৃত্যুদন্ড দিতে পারবে না;

২) কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে সম্ভব হলে তাকে বাহিনীর প্রধান কাদের সিদ্দিকীর নিকট প্রেরণ করতে হবে;

৩) সাধারণ ছোট খাটো ব্যপারে স্থানীয় অবস্থার উপর দৃষ্টি রেখে মীমাংসা করতে হবে;

৪) খুন ও নারী ধর্ষণের অপরাধে অভিযুক্তকে কোন কোম্পানী কমান্ডার নিজ ক্ষমতাবলে মুক্তি দিতে পারবে না;

৫) খুন ও ধর্ষণের চেয়ে কম অপরাধমূলক যেকোন ঘটনার বিচার কমান্ডাররা করতে পারবে। প্রতিটি বিচার সালিশের রেকর্ড সদর দপ্তরে পাঠাতে হবে;

৬) কোন বিচার এককভাবে করা যাবে না। কমপক্ষে দু'জন সহযোদ্ধা ও একজন স্থানীয় ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে সম্পন্ন করতে হবে;

৭) বিশেষ অপরাধের (যেমন- খুন, নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ) বিচারের জন্য অভিযুক্ত কেউ সদর দপ্তরে পাঠানো অনেক সম্ভব নাও হতে পারে। এমতাবস্থায়, কমান্ডার, সহকারী কমান্ডার, একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও ৩জন সহযোদ্ধাকে নিয়ে গঠিত একটি 'বিচার সভা' অপরাধীকে চরমদন্ড প্রদান করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪ জনকে একমত হতে হবে;

৮) যুদ্ধে ধৃত কোন ব্যক্তির সাথে অসদাচরণ করতে পারবে না। খবর সংগ্রহের জন্য যদি কিছু করার প্রয়োজন হয়ে পরে সেটা ব্যতিক্রম। কোন সশস্ত্র সৈন্যও যদি অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পন করতে চায় বা করে তাহলে তার প্রতি ন্যায় বিচার করতে হবে;

৯) কোন অপরাধের সন্দেহে ধরে আনা কোন লোক সত্যিকারভাবে অপরাধী প্রমাণীত হলেও তার আত্মীয় স্বজন, পিতা-মাতা বা পুত্র কন্যার সাথে অসম্মানজনক ব্যবহার করা চলবে না;

Matrix BCS Series

১০) কোন ব্যাপারে সকলে একমত হতে না পারলেও সংখ্যা গুরুর রায়কে সঠিক বলে মেনে নিতে হবে।

এসব নীতিমালা প্রণয়নের পর মুক্তিযোদ্ধাদের উপর প্রধানত দু'টি দায়িত্ব অর্পন করা হয়। এলাকার শান্তি শৃংখলা রক্ষা ও শত্রুর মোকাবেলা করা। কোম্পানী কমান্ডারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শওকত মোমেন, ফজলুর রহমান, নবী নেওয়াজ, লোকমান হোসেন, আবদুল হাকিম, আলী হোসেন লাল্টু, সরোয়ার হোসেন, মনিরুল ইসলাম, আফসার উদ্দিন আহমেদ, হাবিবুর রহমান (শহীদ), হাবিবুর রহমান, মোকাদ্দেস আলী খান, আবদুল গফুর, খোরশেদ আলম তালুকদার, খোরদেশ আলম, রেজাউল করিম, আশরাফ হুমায়ুন, আমানুল্লাহ, মতিউর রহমান, গোলাম মোস্তফা, আব্দুর রাজ্জাক, লুৎফর রহমান, আনিছ, আনসারী আলী, আব্দুল কদ্দুছ (ইদ্রিস আলী), ফেরদৌস আলম, আরজু, হাবিবুল হক বেনু, আজাদ কামাল, মইন উদ্দিন আহমেদ, আঙ্গুর তালুকদার, রিয়াজ উদ্দিন তালুকদার প্রমুখ। মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী গঠন করা হয়। এরপর শুরু হয় সুপরিকল্পিত উপায়ে মুক্তিযুদ্ধ। উল্লেখ্য ৩ মে ১৯৭১ সখিপুরের বাঘেরবাড়ীর পাশে মরিচাতে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে স্বাধীনতাযুদ্ধের টাঙ্গাইলের মুক্তিবাহিনীদের প্রথম শিবির স্থাপিত হয়। এখান থেকে কয়েকটি দলে ভাগ করে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের এলাকার সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

মুজিবনগর সরকার কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধকে সুসংগঠিত ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যে ১১ টি সেক্টর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তাছাড়াও অতিরিক্ত একটি সেক্টর বেসামরিক প্রক্রিয়ায় কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গড়ে উঠে। টাঙ্গাইল জেলা (আরিচা নগরবাড়ী থেকে ফুলছড়ি বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত নদীর সর্বত্র), জামালপুর, নেত্রকোণার অংশ বিশেষ, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ জেলার ব্যাপক অংশ এবং গাজীপুর ও ঢাকা জেলার উত্তরাঞ্চল এই বাহিনীর যুদ্ধাঞ্চল ছিল। ইতোমধ্যে হানাদার বাহিনী জেলার সর্বত্র নিরীহ জনগণের উপর অমানুষিক নির্যাতন, অত্যাচার শুরু করে। মুক্তিবাহিনী ও একের পর এক হানাদারদের উপর আঘাত হানতে থাকে। পাকসেনারা ঘাটি থেকে বের²লেই তাদের আঘাত করা হতো। জনগণের বিশেষকরে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর চলাফেরার খবর সংগ্রহ করতো। মুক্তিবাহিনী জেলা সর্বত্র হানাদারদের উপর চাপ অব্যাহত রেখে টাঙ্গাইল শহের গ্রেনেড হামলা চালায়। এই গ্রেনেড বাহিনীর বিশেষকরে বাকু (শহীদ), সালাউদ্দিন (শহীদ) ও কালাম এদের বীরত্বগাথা অতুলনীয়। নদী, চর, খাল-বিল আর গজারি বন ঘেরা টাঙ্গাইল জেলার পাহাড়ী এলাকা মহান্দপুর ও সখিপুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে মুক্তিবাহিনীর দুর্জয় ঘাটি। আনোয়ার-উল-আলম শহীদকে দেয়া হয় পরিচালনায় সরকারের বেসামরিক প্রশাসন এর দায়িত্ব। আন্দিগ্রামে গড়ে উঠে মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আর অস্ত্রাগার। ডাঃ শাহজাদা চৌধুরী, ডাঃ নিশি কান্ত সাহা ও আমজাদ হোসেনের তত্ত্ববধানে প্রতিষ্ঠিত হয় আহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য হাসপাতাল।

Matrix BCS Series

এপ্রিল মাসে মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে টাঙ্গাইলের আবদুল হামিদ খান ভাসানী সেই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বহির্বিশ্বে সরকারের প্রধান দূত নিযুক্ত হন। সরকারের প্রচার অভিযানের দায়িত্ব পান তথ্য ও বেতার মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত এম. এন. এ(মন্ত্রীর মর্যাদা) টাঙ্গাইলের সাংসদ আবদুল মান্নান। শামসুর রহমান খান শাহজাহান আঞ্চলিক প্রশাসনিক কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। মুজিব বাহিনীর নেতৃত্ব পদে শাহাজাহান সিরাজ বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ২ মার্চের পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ নেতা হিসাবে তিনি স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেছিলেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হাবিবুর রহমানের (জাহাজমারা হাবিব) একটি অপারেশন মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও মনোবল অনেক বাড়িয়ে দেয়। কাদের সিদ্দিকীর নির্দেশে মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ ও স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে কমান্ডার হাবিবুর রহমান জানতে পারে এস.ইউ. ইঞ্জিনিয়ারর্স এল সি- ৩ এবং এস টি রজার নামে পাকিস্তান নৌবাহিনীর দু'টি জাহাজ অস্ত্র গোলাবারুদ বোঝাই করে উত্তরবঙ্গের দিকে যাচ্ছে। তিনি তার কোম্পানী নিয়ে মাটিকাটা গ্রামে নদরি বাঁকে যুৎসই পজিশন নেন এবং সুযোগ বুঝে (১২ আগস্ট ১৯৭১) তিন ইঞ্চি মর্টার চালিয়ে জাহাজের ইঞ্জিনভাগ ধ্বংস করেন। পাকিস্তানি নাবিকরা নদীতে ঝাপ দিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর হাজার খানেক স্বেচ্ছাসেবক, শতাধিক নৌকা দিয়ে জাহাজের অস্ত্রশস্ত্র নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে, জাহাজ মারার নেপথ্যের কৃতিত্বের দাবিদার জাহাজের সারেং ও সুখানীরা। তারাই দেশ প্রেমে উদ্ধুদ্ধ হয়ে জাহাজ গুলোকে নদীর চড়ায় আটকিয়ে দিয়ে মুক্তি বাহিনীকে খবর দেয়। তাদের নাম সংরক্ষিত করা হয়নি বলে আজ তা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। আমরা তাদেরকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। যতদুর জানা যায় তারা সকলেই নোয়াখালি অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। তারপর লাগিয়ে দেন আগুন। জাহাজের সেই আগুন এতাটা প্রকান্ড আকার ধারণ করে যে বহুদূর থেকে লাখ লাখ মানুষ মুক্তিবাহিনীর সাফল্যে উল্লাসে ফেটে পড়ে। ঢাকা থেকে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্লেন এসে মুক্তিবাহিনীর উপর গোলাবর্ষণ করে। এতে মুক্তিবাহিনীর কিছু ক্ষতি হয়। কিন্তু জাহাজ ধ্বংসে এতোটাবড় ক্ষতি পুরো পাঁচ মাসের যুদ্ধে পাকবাহিনীর কখনো হয়নি। কারণ অস্ত্র বোঝাই জাহাজটি ধ্বংসের ফলে পুরো উত্তরবঙ্গে পাকবাহিনীর অপারেশন ক্ষমতা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। জাহাজের লগবুক ও মুভমেন্ট কভারের হিসেবে জাহাজে একলক্ষ বিশ হাজার বাক্সে ২১ কোটি টাকার অস্ত্র-শস্ত্র ছিল। জাহাজ ধ্বংসের জন্য পাকসেনারা প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে ভূঞাপুর সদর থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ছাবিবশা গ্রামে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর পাক-হানাদাররা গ্রামটিতে গণহত্যা চালায়। একই দিনে ৩২ জন নারী-পুরষ ও শিশুকে হত্যা করে পাক হানাদাররা ছাবিবশা গ্রামে প্রায় ৩৫০ টি ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়।

এদিকে জুলাই মাস থেকে টাঙ্গাইলের কিছু কিছু এলাকা আংশিক হানাদারমুক্ত হয়। আগস্টের দিকে টাঙ্গাইলের মুক্ত একালার উপর পাকবাহিনী সামরিক চাপ ও অত্যাচার বৃদ্ধি করে। মুক্ত এলাকা রক্ষা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই সময় ধলাপাড়ার যুদ্ধে আহত হয়ে চিকিৎসার জন্য আবদুল কাদের সিদ্দিকী ভারতে চলে যান। অক্টোবর মাসে আবদুল কাদের সিদ্দিকী ভারত থেকে ফিরে টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে আসেন। ভারতে অবস্থানকালে কাদের

Matrix BCS Series

সিদ্দিকী মুজিবনগর সরকারের সাথে যোগাযোগ করেন। তাই নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আনোয়ার-উল-আলম শহীদের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর একটি প্রতিনিধিদল মুজিবনগর গমন করেন। মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের অতি আগ্রহ নিয়ে যুদ্ধের খবর নেন। থিয়েটার রোডে বিশেষ মন্ত্রিপরিষদের সভায় তাদের স্বাগত জানানো হলে আনোয়ার-উল-আলম শহীদ টাঙ্গাইলের যুদ্ধ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এবং জানান কিভাবে টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনী কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে দেশের এতো অভ্যন্তরে থেকে সুপরিকল্পিত উপায়ে যুদ্ধ পরিচালনা করছে।বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর সংবাদ বেতারে প্রচার করতে নির্দেশ দেন। মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত টাঙ্গাইলের কৃতি সন্তান আব্দুল মান্নান এমএনএ ও চরমপত্রখ্যাত এম আর আখতার মুকুল এর তত্তাবধানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে দেশে-বিদেশে টাঙ্গাইলের মুক্তিযুদ্ধের সফল কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। ষোল নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধপরিকল্পনা নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় তাঁর কামরায় টাঙ্গানো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা সম্বলিত মানচিত্র দেখিয়ে তাকে (শহীদকে) বলেন, আমার মনে হয়, কাদের সিদ্দিকী উইল বি দ্যা ফাস্ট ম্যান টু রীচ ঢাকা। উল্লেখ্য যে, এমএজি ওসমানীর এই ভবিষ্যৎবাণী এক মাস পর ঠিক ঐ একই তারিখে (১৬ ডিসেম্বর) অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো।

এদিকে একই সময়ে মিত্রবাহিনীর লেঃ জেনারেল আরোরা ও মেজর জেনারেল গিলের সঙ্গে কাদেরীয়া বাহিনীর লিয়াজো প্রধান নুরুন্নবী যুদ্ধের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ো পরামর্শ করেন। তাদের এই দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় আরোরা জানান যে, ভারত সরকারীভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হলে টাঙ্গাইলে ছত্রিসেনা নামাতে পারেন-যদি তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা টাঙ্গাইলের মুক্তিবাহিনী করতে পারে। এ ব্যাপারে নুরুন্নবী টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে তাদের পূর্ণ আশ্বাস দেন। অতঃপর উভয় পক্ষের আলোচনায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, মিত্রবাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথে

১. মধুপুর এলাকাকে শত্রুমুক্ত করে কাদেরীয়া বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

২. জামালপুরের শত্রুর প্রতিরোধশক্তি যদি দৃঢ় থাকে, তবে কাদেরীয়া বাহিনী দক্ষিণ দিক থেকে জামালপুর অতিক্রম করে ওদের শক্তি দুর্বল করে দেবে এবং

৩. কাদের সিদ্দিকীর বিশ্বাসযোগ্য নির্দেশ পাওয়ার পরই তাঁর নির্দেশিত অবস্থানে ছত্রী সৈন্য নামানো হবে। মিত্রবাহিনীর সন্দেহ ছিলো যে, ঢাকায় পাকবাহিনীর কাছে হয়তো স্যাবর জেট ছাড়াও মিগ-১৯ সি চায়না বিমান আছে। এ বিষয়টি নিশ্চিত হবার জন্য নুরুন্নবীর কাছে মিগ বিমানের একটি ফটো দেওয়া হয়।

টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগ সাত দিনের মধ্যে তাঁদেরকে জানাতে সক্ষম হন যে, পাকবাহিনীর কাছে স্যাবর জেট ছাড়া আর কোন যুদ্ধবিমান নেই। অতঃপর মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধি দল টাঙ্গাইল ফিরে আসেন। ১১ ডিসেম্বর পাকবাহিনী জামালপুর ও ময়মনসিংহ ত্যাগ করে ঢাকা যাবার পথে বিভিন্নস্থানে কাদেরীয়া বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত

ও ধ্বংস হয়ে যায়। অসংখ্য হানাদার সেনা নিহত ও বন্দী হয়। ১১ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল হানাদার মুক্ত হয়।

ময়মনসিংহ বা জামালপুর মুক্ত না হওয়ায় ঢাকার পথে মিত্রবাহিনীর কয়েকটি কোম্পানি সাভার জয়দেবপুরের দিকে পাঠানো হয়। বাংলাদেশ ভারত যৌথবাহিনীর পরিকল্পনা ছিল সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়া পাকবাহিনীকে পরাস্ত করা ও ঢাকা মুক্ত করা। টাঙ্গাইল-ঢাকা যাত্রাপথ তাড়াতাড়ি মুক্ত করতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হওয়ার কথা কিন্তু হানাদার বাহিনীর যুদ্ধক্ষমতা তখন নিস্তেজ হয়ে গেছে। তাই তারা সহজেই আত্মসমর্পন করে। আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর প্রধান আবদুল কাদের সিদ্দিকী ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর বেসামরিক দপ্তর যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন চালু করতে সহায়তা করে। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পন-এর পর ঢাকা শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা ও জনসেবা, জানমালের সকল প্রকার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে কাদেরিয়া বাহিনী। কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী ১৬ ডিসেম্বর রাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন জনসভা করে ঢাকাবাসীকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে এবং স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৮ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে স্বাধীন রাজধানীতে টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনী প্রথম জনসভা করেন। সেই জনসভায় আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বেসামরিক প্রধান আনোয়ার-উল-আলম (শহীদ), আবদুল লতিফ সিদ্দিকী সহ কয়েকজন সাংসদ বক্তৃতা করেন এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহবান জানান। ২৪ ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ ঢাকায় আসলে সারাদেশে তাদের কতৃত্ব স্থাপিত হয়। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে প্রত্যাবর্তন করলে টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর পক্ষে আব্দুল কাদের সিদ্দিকী ও আনোয়ার-উল-আলম (শহীদ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং অস্ত্র জমা দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এরপর ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে কাদেরিয়া বাহিনী সামরিক কায়দায় এবং সুশৃঙ্খলভাবে বিন্দুবাসিনী বালক বিদ্যালয় মাঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে অস্ত্র সমর্পণ করে।

এতদব্যতীত খন্দকার বাতেন (৭১-এ সরকারি সাদত কলেজের ছাত্রসংসদের সহসভাপতি)-এর নেতৃত্বে বাহিনী দক্ষিণ টাঙ্গাইলে ঢাকা জেলার কিছু অংশ, গাজীপুর, পাবনা, মানিকগঞ্জ জেলার কিছু অংশ ও সিরাজগঞ্জ জেলার ব্যাপক অংশে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। বাতেন বাহিনীতে সাড়ে তিন হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা ছিলো। একুশটি কোম্পানির সমন্বয়ে বাতেন বাহিনী গঠিত ছিলো। এই বাহিনীতে তেষট্টিটি প- টুন এবং একশতটি সেকশন ও তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিলো। ১৯৭১ সালের মে মাসের ৪ তারিখে খন্দকার আব্দুল বাতেন তার বাহিনী নিয়ে মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর থানা আক্রমণ করে যুদ্ধ শুরু করেন। এছাড়া মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর থানা আক্রমণ, সিরাজগঞ্জের চৌহালী থানা আক্রমণ, মানিকগঞ্জ জেলার ঘিউর থানা দখল, বাতেন বাহিনীর সাটুরিয়া আক্রমণ ও দখল বীরত্বপূর্ণ।

Matrix BCS Series

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে বাতেন বাহিনীর একটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার কোনড়া গ্রামে। হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা টাঙ্গাইল থেকে পালিয়ে যাবার পথে টাঙ্গাইল জেলা সদরের প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণে কোনড়া গ্রামে পৌঁছালে সেখানে বাতেন বাহিনীর বীর যোদ্ধারা আক্রমণ করে। হানাদারদের সঙ্গে এখানে বাতেন বাহিনীর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বাতেন বাহিনীর বীর যোদ্ধা আব্দুর রব হানাদারদের গুলিতে শহীদ হন এবং সুবেদার মেজর তাহের হানাদার সৈন্যদের গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হন। কোনড়ার যুদ্ধে হানাদারদের প্রচুর জীবনহানি ঘটে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে গভীর রাতে বহু লাশ ও অস্ত্রশস্ত্র ফেলে হানাদার সৈন্যরা ঢাকার দিকে পালিয়ে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে টাঙ্গাইল পর্বে বাতেন বাহিনীর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। নাগরপুরে বাতেন বাহিনীর প্রতিরোধ পাক হানাদারদের টটস্থ করে রাখতো। ফলে হানাদাররা নানা ধ্বংসযজ্ঞ চালায় বিভিন্ন গ্রামে। ১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর নাগরপুরের বনগ্রাম গ্রামে পাকবাহিনী ব্যাপক লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং সারেংপুর গ্রামে একই পরিবারের ৭ জনকে হত্যা করে। তাদের গণকবর দেয়া হয়। এই ঘটনার ভয়াবহ স্মৃতি নাগরপুরবাসীকে আজও শোকহত করে।

১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে টাঙ্গাইল জেলায় আওয়ামী লীগ দলীয় বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন:

গণপরিষদ সদস্য:

আব্দুল মান্নান (টাঙ্গাইল-১), ব্যারিস্টার শওকত আলী খান (টাঙ্গাইল-২), অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদ (টাঙ্গাইল-৩), হাতেম আলী তালুকদার (টাঙ্গাইল-৪), শামসুর রহমান খান শাহাজাহান (টাঙ্গাইল-৫), সংরক্ষিত মহিলা আসনে রাফিয়া আকতার ডলি।

প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য:

ডাঃ শেখ নিজামুল ইসলাম (টাঙ্গাইল-১), বদিউজ্জামান খান (টাঙ্গাইল-২), আব্দুল বাসেত সিদ্দিকী (টাঙ্গাইল-৩), আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী (টাঙ্গাইল-৪), ইনছান আলী মোক্তার (টাঙ্গাইল-৫), মির্জা তোফাজ্জল হোসেন মুকুল (টাঙ্গাইল-৬) সেতাব আলী খান (টাঙ্গাইল-৭), ফজলুর রহমান খান ফারুক (টাঙ্গাইল-৮), শামসুদ্দিন আহমদ বালু মিয়া (টাঙ্গাইল-৯)।

প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব:

আলী শাহান শাহ্ বাবা আদম কাশ্মিরী:

জন্ম পনেরো শতক, মৃত্যু ১৬১৩ সাল। ধর্মপ্রচারক ও পীর ছিলেন। বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হুসায়েন শাহ কর্তৃক আতিয়ার জায়গিরদার নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। ১৫৯৮ সালে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে আলী শাহান শাহ্ বাবা আদম কাশ্মিরীকে আতিয়া পরগণা দান করা হয়। আতিয়া শব্দের অর্থও দান। তিনি দীর্ঘ ১৫০ বছর পরমায়ু লাভ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। তিনি নিজের ব্যয়ের জন্য রাজকোষ থেকে সামান্য কিছু অর্থ গ্রহণ করে অবশিষ্ট অর্থ জনকল্যাণে যেমন : মক্তব, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট তৈরিতে ব্যয়

Matrix BCS Series

করতেন। তাঁর আমলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ তৈরি হতো আতিয়াতে। শাহন শাহ্ বাবা কাশ্মিরী ১৬১৩ সালে মৃত্যুবরণ করলে আতিয়াতেই তাকে সমাহিত করা হয়। আজও আতিয়াতে তাঁর মাজার আছে। মৃত্যুর পূর্বে বাবা কাশ্মিরী প্রিয়ভক্ত সাঈদ খাঁকে আতিয়া পরগণার শাসনভার অর্পণ করেন এবং তাঁর পরামর্শক্রমে সুবেদার ইসলাম খাঁর সুপারিশে দিল্লির মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীর ১৬০৮ সালে সাঈদ খাঁকে আতিয়া পরগণা ও বাবা কাশ্মিরীর ভাগিনা শাহজামানকে কাগমারী পরগণার শাসনর্কতা নিয়োগ করেন। এই সাঈদ খাঁ করটিয়া জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা।

শাহজামান:

জন্ম আনুমানিক ষোলোশতক। মৃত্যু ১৬৬৩ সালে। তিনি ঐতিহাসিক কাগমারী পরগণার সুশাসক ও আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা বিশিষ্ট আলেম হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় টাঙ্গাইল পিতল, কাঁসা, তাঁতবস্ত্র, দই, মিষ্টি ইত্যাদিতে সুখ্যাতি অর্জন করে। তিনি কাগমারীতে একটি মক্তব স্থাপন করেন। পরবর্তীতে মওলানা ভাসানী এখানে এম.এম আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। শাহজামান ছিলেন আতিয়া পরগণার শাসনকর্তা বাবা আদম শাহ্ কাশ্মিরীর স্নেহে পালিত ভাগ্নে। বাবা কাশ্মিরীর অনুরোধেই বাংলার মোগল সুবেদার ইসলাম খাঁ ১৬০৮ সালে কাগমারী পরগণার শাসনকর্তা হিসেবে শাহজামানকে নিযুক্ত করেন। ১৬০৮ সালে কাগমারী পরগণায় শাসনর্কতা নিয়োগের সময় শাহজামানের বয়স ছিলো ৩০ বছর। তিনি একটানা ৫০ বছর নিযুক্ত ছিলেন কাগমারী পরগণার শাসকরূপে। তিনি সুবেদার ইসলাম খাঁর আদেশে প্রথম কাগমারীতে ভূমি জরিপ করেছিলেন। প্রজাদের চিকিৎসার জন্য তিনি পরগণার কয়েকটি জায়গায় চিকিৎসক নিয়োগ করে দাওয়াখানা স্থাপন করেন।

মৌলভী মোহাম্মদ নঈমউদ্দিন:

মৌলভী মোহাম্মদ নঈমউদ্দীন ১৮৩২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইল সদর উপজেলার সুরুজ গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মৌলভী মোহাম্মদ রুকন উদ্দিন। নইমউদ্দিন উপমহাদেশের মুর্শিদাবাদ, এলাহাবাদ, জৈনপুর, বিহার, আগ্রা, দিল্লি প্রভৃতি স্থানের দেশবরেণ্য বিখ্যাত আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদদের নিকট থেকে ইলমে শরীয়ত (জাহেরী) ও ইলমে মারেফাত (বাতেনী বিদ্যা) আয়ত্ত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম কোরান ও বোখারী শরীফ অনুবাদ করে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় গিরিশ চন্দ্র সেন পবিত্র কোরানের প্রথম সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন; এই অনুবাদ কর্মের প্রথম পথিকৃত মৌলভী নঈমউদ্দিনই। মৌলভী নঈমউদ্দিন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত কোরান শরীফের প্রথম খন্ড ১৮৯১ সালে করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর আনুগত্যানুসারে মৌলভী গোলাম সারোয়ার সাহেবের সহযোগিতায় করটিয়া মাহমুদিয়া প্রেসে মুদ্রিত ও মীর আতাহার আলী কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪০৬ (৬+৪০০) হাদিয়া ২ টাকা ৪ আনা। টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা 'আখবারে এছলামিয়া'করটিয়া জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনিই সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন ১৮৮৩ সালে। পত্রিকাটি সুদীর্ঘ দশ বছর প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ছোটো বড় মিলিয়ে অর্ধশত গ্রন্থ রচনা করেন। তার উল্লেখযোগ্য বই হলো জোব্দাতুল মাসায়েল (১৮৯২), এনসাফ (১৮৯২),

এজবাতে আখেরেজ্জোহর (১৮৮৭), ফতোয়ায়ে আলমগীরী (১৮৯২), কলেমাতুল কোফর (১৮৯৭) ইত্যাদি। ১৯০৮ সালে ২৩ নভেম্বর এই জ্ঞানতাপস মত্যুবরণ করেন।

হেমচন্দ্রঃ

ইতিহাসের পাতায় গোপালপুর উপজেলার হেমনগর রাজবাড়ি উল্লেখযোগ্য। হেমনগর রাজবাড়ির রাজা ছিলেন রাজা হেমচন্দ্র। বিখ্যাত আম্বাবীয়ার জমিদার বংশের কালীচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র হেমচন্দ্র চৌধুরী। জন্ম ১৮৩৩ সালে। তার নামেই এলাকাটির নাম হয়েছে হেমনগর। তিনি পুখুরিয়া পরগণার একআনি অংশের জমিদার ছিলেন।

হেমবাবু প্রজাকল্যাণে রাস্তাঘাট, পুকুর ইত্যাদি নির্মাণ করেন। পারিবারিক মন্ডলে হেমনগর হিতৈষী নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর বাড়িতেই বর্তমানে হেমনগর কলেজ স্থাপিত। তিনি শিক্ষা প্রসারের জন্য হেমনগরে তাঁর মায়ের নামে শাশীমুখী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে গৃহ নির্মাণ কল্পে জমিদানসহ পিংনা ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল, গোপালপুর বালিকা বিদ্যালয় এবং বরিশাল মুক ও বধির বিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ দান করেছিলেন। প্রজাদের স্বাস্থ্যসেবার কথা বিবেচনা করে হেমনগরে স্থাপন করেন হরদূর্গা দাতব্য চিকিৎসালয়। ম্যালেরিয়ার স্বর্গরাজ্য বলে কথিত এ অঞ্চলে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে হেমবাবু ডাকঘর মারফত মাসিক ১৫ পাউন্ড কুননিল ঔষধ বিতরণ করতো। এছাড়া পিংনা দাতব্য চিকিৎসালয়, ময়মনসিংহ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল নির্মাণে, ময়মনসিংহ পুরাতন হাসপাতালের সৌধ নির্মাণে অনেক অর্থ দান করেছেন। তৎকালে দুর্গম চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে তীর্থযাত্রীদের জন্য লোহার সেতু স্থাপনের জন্য সিংহভাগ অর্থ তিনিই প্রদান করেছেন। কবি ও গীতিকার হিসেবে হেমবাবুর তৎকালে সুনাম ছিলো। তাঁর কয়েকটি কবিতার বইও প্রকাশিত হয়েছিলো। হেমচন্দ্র চৌধুরীর বাড়িতে নাট্যশালাও ছিলো। তবে হেমবাবুর প্রজানিপীড়নের চিত্র পাওয়া যায়। ১৯১৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

নবাব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীঃ

টাঙ্গাইলের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের অন্যতম হলেন ধনবাড়ির নবাব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। ১৮৬৩ সালে ২৯ ডিসেম্বর ধনবাড়ি জমিদার পরিবারে তার জন্ম। পিতার নাম জনাব আলী চৌধুরী ও মাতার নাম সাইয়েদা রাবেয়া খাতুন। নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯০৬ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ১৯১২ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত বাংলা প্রেসিডেন্সী ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় আইনসভার সদস্য, ১৯২১ সালে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য এবং ১৯২৩ ও ১৯২৫ সালে দুই দুই বার কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৯০৬ সালে খান বাহাদুর, ১৯১১ সালে নবাব বাহাদুর এবং ১৯১৮ সালে সি আই ই খেতাব লাভ করেন। তিনি নওয়াব ইনস্টিটিউশন, নওয়াব প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন।

Matrix BCS Series

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নওয়াব আলী চৌধুরী অপরিমেয় অবদান রেখেছিলেন, একথা সর্বজনবিদিত। বঙ্গভঙ্গ রদের পর ১৯১২ সালের ৩ ও ৪ মার্চ কলিকাতায় নওয়াব সলিমুল্লার সভাপতিত্বে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'-এর পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নওয়াব আলী চৌধুরীর তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়: উচ্চশিক্ষায় পূর্ববাংলা ও আসামের অধিবাসীদের আপেক্ষিক পশ্চাৎপদতার নিরিখে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ ঢাকায় একটি শিক্ষাদায়ক ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়। মূলত এ থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি ভারত সরকার কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণার পর থেকে ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ, অর্থাৎ যে দিন ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভায় '১৯২০ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট নম্বর ১৮'পাস হয়। সেদিন পর্যন্ত নওয়াব আলী চৌধুরীর চেষ্টার কোনো বিরাম ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির অন্যতম সদস্যরূপে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯১২-১৯২০ সালে পর্যন্ত নওয়াব আলী চৌধুরী ব্রিটিশ-রাজের সাথে নানাভাবে দেন-দরবার ও আইনসভায় বিল উত্থাপন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ক্রমাগত ব্রিটিশ সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অর্থাভাব দেখা দিলে নিজের জমিদারির একাংশ বন্ধক রেখে ৩৫ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে দান করেন। ছাত্রদের বৃত্তির জন্য দান করেন ১৬ হাজার টাকা। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনের নামকরণ করেন এই মহৎ ব্যক্তির নামে। বাংলাভাষার প্রতি এই মানবদরদির ভালোবাসাও ছিলো অকৃত্রিম। যার বহিঃপ্রকাশ করেছিলেন বাংলাভাষাকে অবিভক্ত বাংলার রাষ্টভাষা হিসেবে স্বীকৃতির জন্য ব্রিটিশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক পত্র লিখে। এই বরেণ্য ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে ঈদুল আজহা (১৯০০), মৌলুদ শরীফ (১৯০৩), ভারনাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৯০০) এবং প্রাইমারি এডুকেশন ইন রুরাল এরিয়াস (১৯০৬)। ১৯২৯ সালে ১৭ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

নওশের আলী খান ইউস্ফজী:

জন্ম ১৮৬৪ সালে কালিহাতির চারান গ্রামে। পিতা শওহার আলী। ত্রিরত্ন আব্দুল হামিদ খান ইউস্ফজী (১৮৪৫-১৯১০), রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯) ও নওশের আলী খান ইউস্ফজী (১৮৬৪-১৯২৪) কেবল সমসাময়িক ও পারস্পরিক আত্মীয় ছিলেন না, তাঁরা একই পথের পথিক ছিলেন।

টাঙ্গাইল মহকুমায় মুসলিম সমাজে তিনিই প্রথম এফএ পাস করেন ১৮৮৭ সালে। উল্লেখ্য, টাঙ্গাইল জেলায় তিনিই প্রথম মুসলমানদের মধ্যে এফএ পাস ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৮৮৯ সালে পাকুল্লায় সাব-রেজিস্টার পদে চাকুরি গ্রহণ করেন। বিভিন্ন ধরনের লেখালেখি করলেও গদ্যে ছিল তাঁর ভালো দখল। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলির মধ্যে 'বঙ্গীয় মুসলমান (১৮৯১)', 'শৈশব-কুসুম (১৮৯৫ কবিতার বই, আহম্মদী প্রেস টাঙ্গাইল, ১৩০২ বাং)', 'দলিল রেজেস্টরি শিক্ষা (১৮৯৭)', 'মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত (১৯০৯)', 'সাহিত্য প্রভা (১৯১৪)'ইত্যাদি। তিনি ৯ মে ১৯২৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

Matrix BCS Series

ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চাঁদ মিয়া):
১৮৭১ সালে ১৪ নভেম্বর সদর উপজেলার অন্তর্গত করটিয়ার বিখ্যাত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর পিতার নাম হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী। মাতার নাম খোদেজা খানম। তিনি ছিলেন করটিয়ার জমিদারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রজাহিতৈষী। তিনি জমিদার তথা ময়মনসিংহ জেলা কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির সভাপতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেসের নির্বাহী পরিষদ সদস্য হওয়া সত্ত্বে ব্রিটিশ বিরোধী আযাদী আন্দোলন করে কারাবরণ করেন ১৯২১ সালে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অনমনীয় মনোভাব ও দৃঢ়তার জন্য ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত তাঁর তৈলচিত্রের নিচে লেখা রয়েছে- "One who dified the British."

চাঁদ মিয়া পিতার প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ ইংরেজি শিক্ষার বিদ্যালয়ে উন্নীত করে 'হাফেজ মাহমুদ আলী ইনস্টিটিউশন'নামকরণ করেন ১৯০১ সালে। ইংরেজ মি. স্মিথকে নিযুক্ত করেন প্রধান শিক্ষক হিসেবে। ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর উদ্যোগে করটিয়ায় ১৯০৬ সালে সারা বাংলার মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্। এই ধারাক্রমে ১৯১০ সালে করটিয়ায় ইতিহাস খ্যাত মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। চাঁদ মিয়া প্রতিষ্ঠিত পিতামহের নামে করটিয়ার স্থাপিত 'সা'দত কলেজ'(১৯২৬ সালে) টাঙ্গাইল তথা বৃহত্তর ময়মনসিংহে শিক্ষা বিস্তারে গর্বোন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে। এটি বাংলাদেশে মুসলমান প্রতিষ্ঠিত প্রথম বেসরকারি কলেজ। একই বছর অর্থাৎ ১৯২৬ সালে স্ত্রীর নামে রোকেয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা, বই পুস্তক প্রকাশনায় অর্থ দান করেছেন। চাঁদ মিয়া ১৯২১ সালে আলীপুর (কলিকাতা) জেলে থাকাকালীন ব্যারিস্টার আবদুস রসুল প্রতিষ্ঠিত ও মুজিবুর রহমান সম্পাদিত 'দি মুসলমান'পত্রিকার জন্য আর্থিক সাহায্যদান। জনহিতকর কাজের ব্রতে তাঁর বার্ষিক লক্ষ টাকা আয়ের জমিদার ওয়াকফ্ করেছেন। এই ওয়াকফ্ থেকে বৃত্তি পেয়ে ফজিলাতুননেছা জোহা ও এ জববার (চীফ ইঞ্জিনিয়ার) বিদেশে গমন করেন। ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে করটিয়ায় ন্যাশনাল স্কুল স্থাপন করে শত শত চরকা বসান। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অনেক ব্যারিস্টার, হাকিম, চাকুরিজীবী যোগ দিয়েছেন কিন্তু চাঁদ মিয়ার মতো চারলক্ষ টাকা আয়ের ভূম্যাধিকারী নিজেরও সম্পদের মায়া বিসর্জন দিয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন কিনা তা আমাদের জানা নেই।

জমিদারদের স্বার্থ রক্ষায় বৃহত্তর ময়মনসিংহের জমিদাররা একটি সংগঠনের জন্য পাঁচশত টাকা চাঁদা চাঁদ মিয়ার কাছে চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ এই সংগঠন প্রজাদের কল্যাণে প্রবর্তিত প্রজা স্বত্ত্ব আইনের বিরোধিতা করতো। মজলুম নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খাঁন ভাসানী বলতেন এ দেশের জমিদাররা সবাই চাঁদ মিয়ার মতো হলে আমি জমিদারি উচ্ছেদ আইন সমর্থন করতাম না। উল্লেখ্য, দানের ক্ষেত্রে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী অদ্বিতীয় ছিলেন। এজন্যই তাকে 'দানবীর', 'দ্বিতীয় মহসিন'উপাধিতে ডাকা হতো। ১৯৩৬ সালে ২৫ এপ্রিল শনিবার তিনি ৬৭ বছর বয়সে করটিয়ায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্যার আবদুল করিম গজনবী:

দেলদুয়ারের বিখ্যাত জমিদার পরিবারে ১৮৭২ সালে ২৫ আগস্ট আবদুল করিম গজনবীর জন্ম। জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে আবদুল করিম গজনবী রাজনীতিতে সক্রিয় হন। তিনি বঙ্গ বিভক্তির সমর্থক ছিলেন। করিম গজনবী ব্রিটিশপন্থী ছিলেন তাই সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে স্যার আবদুল করিম গজনবী বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯০৯ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মুসলমান এলাকা থেকে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এবং ১৯১৩ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত বঙ্গ প্রেসিডেন্সির মুসলমান এলাকা থেকে ভাইসরয়েস কাউন্সিলে সরকার মনোনীত সদস্য ছিলেন। আবদুল করিম গজনবী ১৯২৩ ও ১৯২৬ সালে পরপর দু'বার ময়মনসিংহ দক্ষিণ-পূর্ব (মুসলমান) এলাকা থেকে বঙ্গীয় আইনসভায় সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালে 'নাইট'এবং ১৯৩৩ সালে 'নওয়াব বাহাদুর'খেতাবে ভূষিত হন তিনি। স্যার আবদুল করিম গজনবী ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। স্যার আবদুল করিম গজনবী রচিত গ্রন্থ : (১) মুসলিম এডুকেশন ইন বেঙ্গল (২) পিলগ্রিম ট্রাফিক টু হেজাজ এন্ড প্যালেস্টাইন (৩) দি ওয়ার্কিং অব দি ওয়ার্কিকাল সিসটেম ইন বেঙ্গল। ব্রিটিশ রাজ্যের কূটনীতিক হিসেবে অনেকবার সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশে গমন করেন। স্যার আবদুল করিম গজনবী ১৯৩৯ সালের ২৪ জুলাই কলিকাতায় বালিগঞ্জে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

রজনীকান্ত গুহ :

১৮৬৭ সালে ১৯ অক্টোবর ঘাটাইল উপজেলার জামুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাধাপ্রসাদ গুহ, মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী। শিক্ষাবিদ, সুপন্ডিত, ব্রাহ্মনেতা ও লেখক। এসব পরিচয়ের পাশে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিলো তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের একজন বড় স্বদেশী আন্দোলন কর্মী। এ জন্য তাঁকে কয়েকবার চাকরিচ্যুত করা হয়। তিনি ১৮৯৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে এমএ পাস করে, ১৮৯৪ সালে ভবানীপুর এলএমএস কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। কলকাতা সিটি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন ১৮৯৪-৯৬ সাল পর্যন্ত। ২১ জুন ১৯০১-৩০ জুন ১৯১১ সাল পর্যন্ত বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ পদে কাজ করেন। সে সময় স্বদেশী দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় পদচ্যুত হন। এরপর ১৯১১-৩০ জুন ময়মনসিংহ আনন্দমহন কলেজে, ১৯১৩-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। সরকারি নির্দেশে পুনরায় পদচ্যুতি ঘটে। এরপর কলিকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হয়ে পরে ১৯৩৬ সালে এর অধ্যক্ষ হন। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, গ্রীক, ফরাসি, ল্যাটিন ভাষা জানতেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ : ১. সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস (মূল গ্রীক থেকে অনুবাদ) ২. আন্টোনিয়াসের আত্মচিন্তা (গ্রীক থেকে অনুবাদ) ৩. মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ (অনুবাদ) ৪. সক্রেটিস। ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

Matrix BCS Series

আবদুল হালিম গজনবী :

টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৬ সালের ১১ নভেম্বর। তাঁর পিতার নাম আবদুল হাকীম খান গজনবী এবং মাতা ছিলেন রংপুরের পায়রাবন্দর জমিদার যহীর মুহাম্মদ আবু আলীর কন্যা করীমুননেসা খানম। আবদুল হালীম গজনবী লেখাপড়া করেন কলিকাতার সিটি কলেজ-স্কুল ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। ১৯০০ সালে কর্মজীবনের শুরুতে তিনি তদানীন্তন ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হন। লোকাল বোর্ডের সদস্য ও অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের শেরিফ ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত। তিনি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত হন। এক্ষেত্রে হিন্দু-বাংলার 'মুকুটহীন রাজা'কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এজন্যই সম্ভবত অন্যান্য কংগ্রেসী নেতার মতো তিনিও বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। পক্ষান্তরে তাঁর অগ্রজ সহোদর স্যার আবদুল করীম গজনবী '১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগ কার্যকর হলে শুধু সমর্থনই করেন নি, বরং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বঙ্গবিভাগ বিরোধী আন্দোলন প্রতিহত করারও চেষ্টা করেন।'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার আব্দুল করীম গজনবীকে 'রাইট গজনবী'(ন্যায়পন্থী গজনবী) এবং আবদুল হালীম গজনবীকে 'রং গজনবী;'(পথভ্রষ্ট গজনবী) বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি ১৯২৭, ১৯৩১, ১৯৩৫ সালে বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চল থেকে ভারতীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন কমিটি যেমন : বার্মা সেপারেশন কমিটি (১৯৩০), ফেডারেল ফাইন্যান্স কমিটি (১৯৩২-, কনসালটেটিভ কমিটি (১৯৩৩), রেলওয়ে এ্যাডভাইজারী কমিটি (১৯২৭-৩২), পাবলিক একাউন্টস কমিটি (১৯৩৩), জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি (১৯৩৩) ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'-এর সভাপতি এবং 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি দেলদুয়ারে মৃত্যুবরণ করেন।

মন্মথনাথ রায় চৌধুরী :

জন্ম ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ সালের সন্তোষ জমিদার পরিবারে। তাঁর পিতা দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী ও মাতা বিন্দুবাসিনী রায় চৌধুরানী।

তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএল। সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত হন ছাত্রাবস্থায়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন। মন্মথনাথ রায় চৌধুরী তৎকালীন বাংলা সরকারের মন্ত্রী ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ও একজন ভালো ক্রীড়াবিদ ছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় হিসেবে পরপর ছয়বার তৎকালীন ইন্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। তিনি কলকাতার সন্তোষ ট্রফি খেলার উদ্যোক্তা। এছাড়া তিনি বেঙ্গলী পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। এছাড়াও তিনি সন্তোষ, টাঙ্গাইলে একাধিক স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। টাঙ্গাইল শহরে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার প্রথম কলেজটি স্থাপন করেন ১৯০০ সালে। 'প্রমথ-মন্মথ কলেজ'নামে এটি প্রায় দশ বছর চালু ছিলো। পরবর্তী সময়ে এটি ঢাকার

Matrix BCS Series

জগান্নাথ কলেজের সাথে একীভূত হয়। বর্তমানে কলেজটি না থাকলেও এলাকাটি 'কলেজপাড়া'নামে পরিচিত।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী :

ভারতীয় উপমহাদেশের বুভুক্ষু মানুষের মজলুম নেতা। যেখানে অন্যায়-অবিচার সেখানেই একটি প্রতিবাদী কণ্ঠ, একটি ভূকম্পিত হুঙ্কারের নাম মওলানা ভাসানী। ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর পূর্ববঙ্গের প্রবেশপথ খ্যাত সিরাজগঞ্জ জেলার সয়াধানগড়া গ্রামে এক বনেদি মুসলিম পরিবারে মওলানা ভাসানী জন্মগ্রহণ করেন। মওলানা ভাসানীর পিতার নাম হাজী শরাফত আলী খান। সিরাজগঞ্জ জন্মগ্রহণ করলেও টাঙ্গাইলে বিবাহ করে জীবনের অধিকাংশ সময় স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন বলে ভাসানী টাঙ্গাইলের অধিবাসী হিসেবে বেশি পরিচিত। জীবনের প্রথমার্ধে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ১৯২৬-এ আসামে প্রথম কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। ১৯২৯-এ আসামের ধুবড়ী জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের ভাসান চরে প্রথম কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠান। এখান থেকে নামের শেষে ভাসানী শব্দ যুক্ত। ১৯৩১-এ সন্তোষের কাগমারীতে, ১৯৩২-এ সিরাজগঞ্জের কাওরাখোলায় ও ১৯৩৩-এ গাইবান্ধায় বিশাল কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠান। ১৯৩৭-এ কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান। একই বছর আসামে বাঙালি নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে 'লাইনপ্রথা'চালু হলে এই প্রথা-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪০-এ শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের সঙ্গে মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত ও পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ। তিনি ১৯44 আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। এ সময় দল ও দলের বাইরে বাঙালি কৃষকদের অধিকার আদায়ে দুর্বার আন্দলন গড়ে তোলেন। ভাসানী ১৯৪৯ সালে পাকিস্ড়ানে প্রথম বিরোধীদল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'গঠন করে এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তার সাহসী ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে আছে। ১৯৫২-র ৩০ জানুয়ারি ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরি হলে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত এবং এর অন্যতম প্রধান সদস্য নিযুক্ত। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন (ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)-এ সহযোগিতার জন্য গ্রেফতার। ১৬ মাস কারানির্যাতন ভোগ। পূর্ববঙ্গ পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে ১৯৫৩-সালের ৩ ডিসেম্বর কৃষক-শ্রমিক পার্টির সভাপতি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও তাঁর দল নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের আহবায়ক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন। নির্বাচন (৮-১১ মার্চ ১৯৫৪)- যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় অর্জন। যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা এ.কে. ফজলুল হক কর্তৃক পূর্ববঙ্গে সরকার গঠন (4 এপ্রিল ১৯৫৪)। ভাসানী পূর্ব বাংলার খাদ্যজনিত দুর্ভিক্ষ রোধকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে ৫০ কোটি টাকা আদায়ের দাবিতে ১৯৫৬-র ৭ মে ঢাকায় অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। সরকার দাবি মেনে নিলে ২৪ মে ১৯৫৬ অনশন ভঙ্গ করেন। এই বছর ১২ সেপ্টেম্বর হোসন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে মওলানা ভাসানী কর্তৃক সরকারের মার্কিন ঘেঁষা পররাষ্ট্র নীতির বিরোধিতা। নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ ও পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য

Matrix BCS Series

তৎকর্তৃক সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ। মূলত এ থেকেই সোহরাওয়ার্দী-পন্থীদের সঙ্গে ভাসানীর মতবিভেদ তৈরি হয়।

পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্মেলন তিনিই ডাকেন ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে। যা কাগমারী সম্মেলন নামে ইতিহাসখ্যাত। এই সম্মেলনে তিনি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীকে 'আস্সালামু আলাইকুম'বলে বিদায় জানিয়েছিলোন। কাগমারী সম্মেলনের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব-এর সাথে তার বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়েছিল। ভাসানী পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলের দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করলে ১৮ মার্চ ১৯৫৭ আওয়ামী লীগ থেকে ভাসানী পদত্যাগ করেন। একই বছর ২৫ জুলাই ১৯৫৭ তাঁর নেতৃত্বে ঢাকার রূপমহলো সিনেমা হলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হয়। তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৬-তে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত ৬-দফা কর্মসূচির বিরোধিতা করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন ভাসানী। ১৯৬৭ নভেম্বরে ন্যাপ দ্বি-খণ্ডিত হলে চীনপন্থী ন্যাপের নেতৃত্ব গ্রহণ। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফা কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। আইয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের ঘোষণা দিলে ভাসানী দাবি তোলেন 'ভোটের আগে ভাত চাই', দেশে 'ইসলামিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব'সংঘটন, 'ইসলামিক সমাজতন্ত্র' কায়েম ইত্যাদি দাবি উপস্থাপন। নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে ১২ নভেম্বর ১৯৭০ পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল অঞ্চলে এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় হলে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে এবং পশ্চিমা সরকার ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্য কোনো ব্যবস্থা না-নিলে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। ৪ ডিসেম্বর ১৯৭০ ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় সভাপতির ভাষণ দানকালে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান'দাবি উত্থাপন। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্ততি পর্বে ভাসানী শেখ মুজিবুর রহমানের পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন (৩-২৫ মার্চ ১৯৭১)-এর প্রতি সমর্থন প্রদান করেন।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২-এর ২ জানুয়ারি ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন। একই বছর ২৫ ফেব্রুয়ারি 'হক কথা' প্রকাশ। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধির মধ্যে যে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ভাসানী তার বিরোধিতা করেন। তবে তিনি ১৯৭২-এর সংবিধান ও ব্যাংকবীমা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান সরকারের জাতীয়করণ নীতির প্রতি সমর্থন দেন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পদ্মা নদীর পানি প্রবাহ বন্ধ করে গঙ্গা নদীতে নির্মিত মরণ বাঁধ ফারাক্কা তুলে দেওয়ার দাবিতে ১৯৭৬ সালে ১৬ মে ইন্দিরা গান্ধি সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য ফারাক্কা মিছিল নিয়ে কানসার্ট সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৯৭৬ সালের ১ অক্টোবর তার নেতৃত্বে 'খোদাই খিদমতগার'সংগঠন গঠিত।

সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের তিনি ছিলেন লড়াকু নেতা। দেশের সমাজতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম ও বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে তিনি ছিলেন কিংবদন্তি তুল্য। তাকে বলা হয়ে থাকে 'অ্যাফ্রো-এশিয়ার নির্যাতিত মানুষের মুকুটহীন

Matrix BCS Series

সম্রাট। ভাসানীর প্রকাশিত গ্রন্থ, দেশের সমস্যা সমাধান (১৯৬২), মাও সেতুং-এর দেশে (১৯৭৬)।

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর মৃত্যুরবণ করেন।

আবদুল করিম খান:

জন্ম বাংলা ১২৯৯ সালে ২২ মাঘ ঘাটাইল উপজেলার দীঘলকান্দি গ্রামে। পিতা আতা এলাহী খান, মাতা লালেমন নেছা। করিম খান ১৯১০ সালে অনুষ্ঠিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও ১৯১৪ সালে ঘাটাইল থানার মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২০ সালে টাঙ্গাইল মহকুমায় প্রথম মুসলিম আইনব্যাকসায়ী হিসাবে যোগদান করেন। তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত দীঘলকান্দি সমবায় সোসাইটির প্রসার ঘটান। টাঙ্গাইল শহরের কেন্দ্রীয় গোরস্তানটি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান স্মরণীয়। তিনি গোরস্তানের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রায় চারদশক সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। নারী শিক্ষা ও মুসলিম তরুণদের শরীর ও মন গঠনের জন্য তৎসময়ে তার অবদান অগ্রগণ্য। টাঙ্গাইল মুসলিম ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকালীন সেক্রেটারী হিসেবে ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছেন। তাঁর রচিত তরফ গৌরাঙ্গীর ইতিহাসে (১৯৪২) তৎসময়ে ঘাটাইলে বনেদি পরিবার বা গোষ্ঠী কিভাবে অন্যান্য দিকে বিস্তৃতি লাভ কর তার বর্ণনা তুলে ধরেছেন যা ঘাটাইল তথা টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস অনুসন্ধানের একটি ক্ষেত্র হিসেবে আজও কাজ করছে। তিনি ১৯৮৮ সালের ৮ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ :

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর জন্ম ১৮৯৪ সালে, ভুঁঞাপুর উপজেলার বিরামদী (বর্তমানে শাবাজনগর) গ্রামে। পিতার নাম শাবাজ খাঁ, মা রতন খানম। ১৯১৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাস করেন। ১৯২৩ সালে আইনে বিএল ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। আইন পাস করলেও ওকালতি পেশায় না-গিয়ে তিনি করটিয়া হাফেজ মাহ্মুদ ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগদান করেন।

করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করলে প্রিন্সিপাল সাহেব সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে এলেন। ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো করটিয়া সা'দত কলেজ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পেলেন ইবরাহীম খাঁ। তিনি এক টানা ২২ বছর অতি সুনামের সঙ্গে এ গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

অবিভক্ত বাংলা ও আসামে সা'দত কলেজই মুসলমান প্রতিষ্ঠিত প্রথম কলেজ এবং ইবরাহীম খাঁ-ই প্রথম মুসলমান প্রিন্সিপাল। করটিয়ায় একটি সাহিত্য পরিমন্ডল গড়ে ওঠে করটিয়া সা'দত কলেজকে কেন্দ্র করে। এর মধ্যমণি ছিলেন ইবরাহীম খাঁ। এখানে পড়াতে এবং পড়তে এসে যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলা-সাহিত্যে পরিচিত। এঁদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন, অধ্যাপক গোলাম মকুসদ হিলালী, অধ্যাপক আজিমুদ্দিন, মওলানা আহ্সানুল্লাহ, আবুল হাশেম, আবদুল কাদের, নূরুন্নাহার,

Matrix BCS Series

তালিম হোসেন, অধ্যাপক মুফাখ্খারুল ইসলাম, আশরাফ সিদ্দিকী, খোন্দকার আবুবকর, পিসি সরকার, ইদরিস আলী, রবিঘোষ ঠাকুরতা, খুরশীদ আহমদ, আলীম-আল রাজী, শামসুজ্জামান, মোকসেদ আলী, এএসএম আবদুল জলিল প্রমুখ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাতে সাহিত্য-পিপাসা সৃষ্টি করা যায়, তার জন্য ইবরাহীম খাঁ 'কাকলি কুঞ্জ'(১৯৪৩) এবং বড়দের সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রস্বরূপ মহুয়া মজলিশ'(১৯৪২) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ ১৯৪৮ সালে ঢাকায় টাঙ্গাইল মাহফিল (বর্তমান টাঙ্গাইল জেলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সরকারি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ১৯৪৮ সালে ভূঞাপুর কলেজ(অধুনা ইবরাহীম খাঁ কলেজ) স্থাপন করেন। ঢাকার মীরপুরস্থ সরকারি বাংলা কলেজটি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম এবং তাঁর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং একই সালে বাংলার প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৭ তে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য (ময়মনসিংহ-২) নির্বাচিত হন। অতঃপর ক্ষমতাসীন কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বরের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের (কাইয়ুমপন্থি) মনোনয়নে টাঙ্গাইল জেলা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিতহন। ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটর, পাকিস্তান কৃষি ব্যাংক ও বাংলা একাডেমীরও কার্যকরী সদস্য ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ আমলে খান সাহেব ও খান বাহাদুর এবং পাকিস্তান আমলে সিতারা-ই-ইমতিয়াজ উপাধি লাভ করেন। ১৯৬৩-তে নাটকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার এবং ১৯৭৬-এ একুশের পদক লাভ করেন।

গ্রাম বাংলার সরলপ্রাণ মানুষের ভাষায় লেখা তাঁর ছোটগল্প, নাটক, রসরচনা স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। তিনি অনেক পাঠ্যগ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে নাটক : কাফেলা, কামালপাশা, আনোয়ার পাশা, রস রচনা : আলু বোখারা, উস্তাদ, মানুষ, শিশুসাহিত্য : ব্যাঘ্র মামা, সোহরাব রোস্তম, শাহনামা। ভ্রমণকাহিনী : ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র, নয়াচীনে এক চক্কর। অনুবাদ : আরব জাতি, নুরমহল, চেঙ্গিস খাঁ, বাবুর নামা উল্লেখযোগ্য। ইবরাহীম খাঁ ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান। ১৯৭৮ সালের ২৯ মার্চ তিনি পরলোকগমন করেন।

রণদা প্রসাদ সাহা :

১৮৯৬ সালের ১৫ নভেম্বর উত্থান একাদশীতে সাভার এলাকার শিমুলিয়ার কাছোর গ্রামে মামা বাড়িতে রণদা প্রসাদ সাহার জন্ম। পিতার নাম দেবেন্দ্র নাথ সাহা পোদ্দার, মাতা কুমুদিনী দেবী। অতি সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতৃভিটা মির্জাপুরে। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত মির্জাপুর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। তাঁর পিতার আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। রণদা প্রসাদের বয়স যখন সাত বছর, তখন তাঁর মা সন্তান প্রসবকালে ধনুষ্টংকারে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। পিতা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করলে গৃহত্যাগ করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে কলিকাতায় গমন এবং বিপ- বী দলে যোগদান। কয়েকবার গ্রেফতারবরণ। কলিকাতায় মুটের কাজ থেকে শুরু

Matrix BCS Series

করে নানারকম কাজ সম্পাদন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) রণদা প্রসাদ সাহার ছন্নছাড়া জীবনের দিন বদল ঘটিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি সাহসিকতার সাথে অংশগ্রহণ করে কমিশনপ্রাপ্ত হন। পরে সেনাবাহিনী ত্যাগ এবং রেলওয়েতে নিম্নমানের চাকরিতে বহাল। চাকরিতে ইস্তফা দান এবং সঞ্চিত অর্থ দিয়ে শেয়ার ইন্ডাস্ট্রিজের মাধ্যমে গৃহে গৃহে কয়লা সরবরাহের ব্যবসা শুরু। পরবর্তী চার বছরে কলকাতায় একজন বিশিষ্ট কয়লা ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ। এসময় এ্যব ইবহমধষ জরাবৎ ঝবথরপব ঈড়সঢ়ধহু নামে নৌ-পরিবহন সংস্থা ও নৌ-পরিবহন বীমা কোম্পানি স্থাপন করেন। পাশাপাশি পাটের ব্যবসা, গুদাম, বেইল প্রসেসিংসহ নানা ব্যবসা পরিচালনা করেন। তার মায়ের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর স্মৃতি তাঁকে আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসার প্রেরণা যোগায়। তিনি মায়ের নামে মির্জাপুরে 'কুমুদিনী হাসপাতাল'(১৯৩৩) প্রতিষ্ঠা করেন। মেয়েদের শিক্ষার জন্য মির্জাপুরে 'ভারতেশ্বরী হোমস্'(১৯৬২) এবং টাঙ্গাইল শহরে 'কুমুদিনী কলেজ', পিতার নামে মানিকগঞ্জে 'দেবেন্দ্র কলেজ'প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজ, মির্জাপুর সদয়কৃষ্ণ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, করটিয়া সা'দত মহাবিদ্যালয়, ভূঞাপুর ইবরাহীম খাঁ কলেজ, মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজসহ টাঙ্গাইলের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর দান অপরিসীম। তিনি তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কল্যাণধর্মী ও জনহিতকর কাজের স্বার্থে একটি ট্রাস্টভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে গঠন করেন 'কুমুদিনী ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল।'ট্রাস্টের লভ্যাংশ থেকে শুধু নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ ব্যয় ছাড়া সবটুকুই মানুষের কল্যাণে, শিক্ষা বিস্তারে ও সেবামূলক কাজে ব্যয় করেছেন। বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় (১৩৫০ বাং) রেডক্রস সোসাইটিকে এককালীন তিনলক্ষ টাকা দান এবং ক্ষুধার্তদের জন্য চার মাসব্যাপী সারাদেশে দুইশো পঞ্চাশটি ফ্রি-কিচেন খোলা রাখেন।

১৯৭১ সালের ৭ মে রাত ১১টায় তাঁর নারায়ণগঞ্জের বাসা থেকে দেশীয় সহচরের সহযোগিতায় পাকবাহিনী দানবীর রণদা প্রসাদ সাহাকে পুত্র ভবানী প্রসাদ সাহাসহ ধরে নিয়ে যায়। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল চুয়াত্তরউর্ধ্ব, পুত্রের সাতাশ। তারপর তাঁদের আর কোনো খোঁজ মেলে নি।

বেগম ফজিলাতুন্নেছা :

জন্ম ১৮৯৯ সালে টাঙ্গাইল সদর থানার নামদার কুমুল্লী গ্রামে। পিতার নাম ওয়াজেদ আলী খাঁ, মাতা হালিমা খাতুন। তিনি ১৯২১ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক ও ১৯২৩ সালে প্রথম বিভাগে ইডেন কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। ফজিলাতুন্নেছা ১৯২৫ সালে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বিএ পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৭ সালে গণিত শাস্ত্রে এমএ-তে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট (গোল্ড মেডালিস্ট) হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি ১৯২৮ সালে বিলেতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য গমন করেন। নিখিল বঙ্গে তিনিই প্রথম মুসলিম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। উপমহাদেশে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিলাত থেকে ডিগ্রি এনেছিলেন। তাঁর পড়াশোনার ব্যাপারে করটিয়ার জমিদার মরহুম ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চাঁদ মিয়া) বিশেষ উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য করেন। বিলেতে তাঁর অবস্থান কালীন সময়ে ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে প্রথম ডিপিআই খুলনা নিবাসী আহসান উল্ল্যাহর পুত্র এ এ

জোহাও লন্ডনে ব্যারিস্টারী পড়তে যান। লন্ডনে জোহা সাহেবের সাথে ফজিলাতুন্নেছার পরিচয় হয়। পরে উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। লন্ডন থেকে ফিরে ১৯৩০ সালে তিনি কলকাতায় প্রথমে স্কুল ইন্সপেক্টরের চাকুরিতে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালের আগস্টে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ-সেবক-সংঘে'র বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে তাঁর বক্তব্যটি নারী জাগরণের মাইল ফলক হয়ে আছে। এই অধিবেশনে তিনি বলেন 'নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন ও বলেন। নারী সমাজের অর্ধাঙ্গ, সমাজের পূর্ণতালাভ কোনোদিনই নারীকে বাদ দিয়ে সম্ভব হতে পারে না। সেই জন্যেই আজ এ সমাজ এতোটা পঙ্গু হয়ে পড়েছে। তিনি আরো বলেন, The highest form of society is one in which every man and woman is free to develop his or her individuality and to enrich the society what is more characteristic of himself or herself.

কাজেই এ সমাজের অবনতির প্রধান কারণ নারীকে ঘরে বন্দি করে রেখে তার Individuality বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রাখা। নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে এতোটা কথা আজ বলছি তার কারণ সমাজের গোড়ায় যে-গলদ রয়েছে সেটাকে দূরীভূত করতে না-পারলে সমাজকে কখনই সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারা যাবে না।'

তিনি ১৯৩৫ সালে বেথুন কলেজে গণিতের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। বেথুন কলেজে চাকুরিরত অবস্থায় দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে এসে ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন ১৯৪৮ সালে।

বেগম ফজিলাতুন্নেছা ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা ইডেন কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন। বেগম ফজিলাতুন্নেছার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় বিজ্ঞান ও বাণিজ্যিক বিভাগসহ ইডেন কলেজ ডিগ্রি পর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৯৫২ সালে ইডেন কলেজের মেয়েরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কলেজের অভ্যন্তর থেকে মিছিল বের করার প্রস্তুতি নিলে উর্দুভাষী এক দারোগা হোস্টেলে ঢুকে মেয়েদের ভয়ভীতি দেখাতে শুরু করার এক পর্যায়ে খবর পেয়ে বেগম ফজিলাতুন্নেছা কলেজে এসে তার বিনানুমতিতে কলেজ প্রাঙ্গণে ঢোকার জন্য দারোগাকে ভৎসনা করে হোস্টেল থেকে বের করে দেন নিজের দৃঢ়তা ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বলে। নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি সম্পর্কে সওগাতসহ অনেক পত্রিকায় তার বিভিন্ন প্রবন্ধ, গল্প প্রকাশিত হয়।

এই বিদুষী নারী ১৯৭৭ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। এই মহীয়সী নারীর স্মৃতি রক্ষার্থে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৭ সালে ফজিলাতুন্নেছার নামে হল নির্মাণ করেন।

Matrix BCS Series

ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন :

আরবি ভাষার এই সুমহান পন্ডিত ১৯০১ সালে ১ আগস্ট টাঙ্গাইল জেলাধীন মির্জাপুর থানার বানিয়ারা গ্রামে সুখ্যাত সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন সৈয়দ কেরামত আলী এবং মাতা সৈয়দা সাবেরুন নেছা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম নিয়ে ১৯২৪ সালে আরবিতে এমএ পাশ করেন। অতঃপর তিনি ক্লাসিকেল এরাবিক পোয়েট্রির উপর থিসিস লিখে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবিতে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৩০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিভাগে রিডার হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে (১৯৪৮-৫৩) সুখ্যাতি ও সুনামের সাথে কর্মরত থেকে একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে দেশ ও জাতির প্রতি ক্রান্তিকালীন গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

ডঃ সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর পূর্ব পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন (১৯৫৩-৫৬) সাল পর্যন্ত। করাচি ইনকোয়ারী কমিটি সদস্য (পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬-১৯৫৭) চেয়ারম্যান ইসলামিক (এরাবিক) ইউনিভার্সিটি কমিশন (১৯৬৪-১৯৬৫)।

ডঃ সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন দেশ ও বিদেশের বহু পত্রপত্রিকায় ও সাময়িকীতে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও বহু বই প্রকাশ করেন, তার প্রকাশিত ইসলামিক পুস্তকসমূহের মধ্যে Early Arabic Odes, Dhaka, Kitab-al-Rumuz, Damascus, The Poems of Suragalb-Mirdan al-Driqi, Kitab-ul-maÕrifat-i-ulumi Hadith ইত্যাদি। তিনি ১৯৯১ সালে মৃত্যবরণ করেন।

হাতেম আলী খান :

জন্ম ২৪ নভেম্বর ১৯০৪ সালে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানার বেলুয়া গ্রামে। পিতা নায়েব আলী খান, মাতা সালমা খানম। জমিদার পরিবারে জন্ম নিলেও তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার বড় কৃষকনেতা। কৃষককুলের মধ্যে চেতনা, অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নই ছিল হাতেম আলী খানের জীবনের ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা। ১৯২০ সালে হেমনগর হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশের পর তিনি ১৯২১ সালে কলিকাতায় রিপন কলেজে ভর্তি হন। এ সময় তিনি দেশবরেণ্য সংগ্রামী নেতা সূর্যসেন, সত্যেনসেন, কবি নজরুল, জিতেন ঘোষ প্রমুখের সংস্পর্শে এসে বিপ- বী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ১৯২৪ সালে রিপন কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন। কৃষকদের সাম্যবাদী নীতি ও জোতদারদের দাদন নীতির বির ুদ্ধে তিনি নিজ পিতা ও হেমনগরের জমিদারের বির ুদ্ধে ১৯২৫ সালে আন্দোলন করে সফল হন। ১৯২৬ সালে কলিকাতায় কমরেড মুজাফফর আহমেদের সান্নিধ্যে তিনি কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্ত্রীর অজান্তে ৭০ ভরি স্বর্ণের গহনা বিক্রি করে 'সর্বহারা'পত্রিকা প্রকাশ করেন কলিকাতা থেকে। প্রায় ছয়মাস 'সর্বহারা'পত্রিকাটি চালু ছিলো। এরপর তিনি চাষি, মজুর, দিন-মজুর নামে দুইটি পত্রিকা

Matrix BCS Series

প্রকাশ করেন কুলির কাজ করে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে। সক্রিয় বিপ্লবী কর্মকান্ডে জড়িত থেকেও তিনি ১৯২৬ সালে বিএ ও ১৯২৮ সালে কলিকাতা থেকে এমএ পাশ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কলিকাতা থেকে নিজ গ্রাম বেলুয়াতে চলে আসেন স্থায়ীভাবে। ১৯৪২ সালে তিনি নিজ এলাকার বলরামপুর, নলিন ও ধূবলিয়া গ্রামে একই সঙ্গে তিনটি হাইস্কুলের হেডমাস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলন তিনি প্রথমে টাঙ্গাইলে গড়ে তোলেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে তিনি বিপুল সংখ্যক প্রজা নিয়ে হেমনগরের জমিদার বাড়ি আক্রমণ করেন। এতে জমিদারের বহুলোক আহত হয়। নামে জমিদার ৩৯টি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু একদিকে সাক্ষীর অভাব, অন্যদিকে টাঙ্গাইল মহকুমা বারের কোনো আইনজীবী জমিদারের স্বপক্ষে কথা বলতে অস্বীকার করায় এসব মামলা খারিজ হয়ে যায়। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিম বঙ্গ থেকে প্রায় ২০ হাজার উদ্বাস্তু হেমনগর এসে উপস্থিত হলে তাদের একমাস খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন হাতেম আলী খান। ১৯৫৪ সালে তিনি যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে গোপালপুর থেকে বিজয়ী হন। ১৯৫৮ সালে ফুলছড়ি ঘাটে এক বিশাল কৃষক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী সভাপতি ও তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অতঃপর ১৯৬৩, ১৯৬৬, ১৯৭২ সালের কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৭৬ সালে সভাপতি ছিলেন। তিনি যখন যে প্ল্যাটফরমেই কাজ করেন না কেন, তার মূল কাজ ছিল কৃষকদের সংগঠিত করা। তিনি নিজ জেলা টাঙ্গাইল ছাড়াও রংপুর, দিনাজপুর, রায়পুর ও মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলের তেভাগা সংগঠনে কাজ করেন নিষ্ঠার সাথে। কৃষক নেতা হাতেম আলী খান ১৯৭৭ সালের ২৪ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সংগ্রামী জীবনে তিনি ১৩ বার কারানির্যাতন ভোগ করেছেন।

যাদুসম্রাট পিসি সরকার :

১৯১৩ সালে টাঙ্গাইল শহরতলীর আশেকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম ভগবান সরকার মাতার নাম কুসুম কুমারী সরকার। পিসি সরকার ১৯৩৪ সালে বার্মা, জাপান, সিঙ্গাপুর ও চীনে যাদু প্রদর্শন করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫৭ সালে যাদুকর পিসি সরকার লন্ডনে বিবিসি টেলিভিশনে বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে তরুণী দ্বিখন্ডিত করার খেলাটি প্রদর্শন করেন। খেলাটি টেলিভিশনে দেখেই অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁর উল্লেখযোগ্য খেলার মধ্যে শূন্যে ঝুলন্ত কঙ্কাল, এক্স-রে চক্ষুর খেলা, জ্যান্ত হাতি অদৃশ্য করা, মোটরগাড়ি অদৃশ্য করা ইত্যাদি উল্ল্যেখযোগ্য।

তিনি ছেলেদের ম্যাজিক, ম্যাজিকের কৌশল, ম্যাজিকের খেলা, সহজ ম্যাজিক, মেসমেরিজম, সম্মোহন বিদ্যা ইত্যাদি সহ ১৮-১৯টি বই লিখেছেন। ১৯৬৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেন। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের নির্দেশে তিনি জাপানে যাদু প্রদর্শন করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য গঠিত আজাদ হিন্দু ফৌজকে অর্থ সাহায্য করেন। বিশ্বখ্যাত এই যাদুকর ১৯৭১ খ্রিঃ জাপানের তাবেৎসু (সাপোরো) শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

ডঃ এম এন হুদাঃ

এই পন্ডিত ব্যক্তি (১৯১৯) সালে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে টাঙ্গাইল থানার অন্তর্গত (বর্তমানে দেলদুয়ার থানা) জাঙ্গালিয়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মৌলভী মির্জা আব্দুল করিম। টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী হাই স্কুল থেকে ক্লাসের ফার্স্টবয় হিসাবে চারটা লেটার ও স্টার পেয়ে দশ টাকা করে মাসিক বৃত্তি পেয়ে ১৯৩৫ সালে মেট্রিক পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪০ সালে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে অনার্স পাশ করেন। তিনি ঐ বছর অনুষ্ঠিত সর্ববিষয়ে অনার্স গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে প্রথম হওয়াতে তৎকালীন দুর্লভ বৃত্তি রাজা কালিনারায়ন স্কলারশীপে ভূষিত হন। তিনি প্রথম মুসলিম ছাত্র, যিনি এই দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী হন। অতঃপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হন। মরহুম তমিজ উদ্দিন খান কলিকাতাতে প্রাদেশিক মন্ত্রী ছিলেন। তমিজ উদ্দিন খানের দ্বিতীয় কন্যা কুলসুমের সঙ্গে তিনি ঐ সময় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ২৬.০১.১৯৪৫ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকুরি শুরু করেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরিকালীন অবস্থাতেই যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতীয়দের জন্য বেশ কিছু ওভারসীজ বৃত্তির ঘোষণা পত্রিকা মাধ্যমে প্রচার করেন। ডঃ এমএন হুদার বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করেন এবং নির্বাচিতও হন। ওভারসীজ স্কলারশীপ নিয়ে ডঃ এমএন হুদা ১৯৪৭ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকোনোমিকসের রিডার হিসাবে যোগদান করেন। ডঃ হুদা ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন এবং তিনি এই পদে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর ১৯৬৯ সালের ৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়ে শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু ২৫ মার্চ দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থানে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ডঃ হুদার গভর্নরের কার্যকাল শেষ হয়ে যায়। ডঃ হুদা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক পদে চলে যান। ১৯৭৫-এর ২৬ নভেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার সাথে যুক্ত থাকেন, অতঃপর প্রেসিডেন্ট সায়েম তাকে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করে পরিকল্পনা বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছাড়াও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কিছু দায়িত্বও অর্পণ করেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে তিনি মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও প্রেসিডেন্ট সাত্তারের আমলে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২২ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীঃ

আবু সাঈদ চৌধুরীর জন্ম ৩১ জানুয়ারি ১৯২১ মানিকগঞ্জ জেলার এরাচিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে। তার পিতার বাড়ি কালিহাতির নাগবাড়িতে। পিতা স্পিকার আব্দুল হামিদ চৌধুরী, মাতা শামসুন নেছা চৌধুরী। শিক্ষা জীবনে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ (১৯৪০) পাশ করেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ও ল পাশ। লন্ডনের লিঙ্কস ইন থেকে ১৯৪৭ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে আসে। তিনি খ্যাতনামা ছাত্রনেতা ছিলেন। আবু সাঈদ চৌধুরী প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (১৯৪০), নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক (১৯৪০), নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের ব্রিটিশ শাখার সভাপতি (১৯৪৬) ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ১৯৬০ সালে পূর্ব

Matrix BCS Series

পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৬১ সালে তিনি ঢাকা হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক পদে এবং স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান ১৯৬২ সালে। তিনি পাকিস্তান শাসনতন্ত্র কমিশনের সদস্য (১৯৬০-৬১) ও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি (১৯৬৩-৬৮) ছিলেন। তিনি ১৯৬৯ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। ১৫ মার্চ ১৯৬৯ সালে তিনি জেনেভায় অবস্থানকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের গুলিতে হত্যঅর প্রতিবাদে জেনেভা থেকে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে তিনি পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘে অবস্থা করছিলেন। ২৫ মার্চের কালরাত্রির বিবরণ বিবিসিতে জেনে পাকিস্তান সরকারের পক্ষত্যাগ করে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বিশ্বব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলেন। আবু সাঈদ চৌধুরী ২৩ এপ্রিল ১৯৭১ প্রবাসে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ পান। লন্ডনে আবু সাঈদ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানেই স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। স্বাধীনতার পর তিনি ১৯৭২ সালে ১২ জানুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। ১৯৭৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ এবং একজন কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদায় সরকারের আন্তর্জাতিক বিষয়াদির বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত। ১৯৭৫ এর ৮ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাকশাল দলীয় সরকারের বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিহত হবার পর খোন্দকার মোশতাক আহমদের মন্ত্রীসভায় তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী (২০ আগস্ট-৬ নভেম্বর ১৯৭৫) ছিলেন। ১৯৭৮ এ জাতিসংঘের সংখ্যালঘু বৈষম্য প্রতিরোধ ও অধিকার সংরক্ষণ কমিশনের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৮৫-১৯৮৬-তে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান। উদার গণতন্ত্রী, মানবতাবাদী ও বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের প্রতি আস্থাশীল এ বুদ্ধিজীবী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেশীকোত্তম উপাধি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর-অব-ল ডিগ্রি লাল করেন।

মুফাখখারুল ইসলামঃ

জন্ম ৩০ এপ্রিল, ১৯২১, ঘাটাইল থানার অন্তর্গত বেনীমাধব গ্রামে। তাঁর পিতৃভূমি পার্শ্ববর্তী নূরপাড়া গ্রাম। পিতার নাম মৌলভী ময়েজুদ্দীন উয়ায়সী, মাতা নাজিরুন্নিসা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৯ সালে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে ২য় শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, ঢাকা কলেজ এবং সর্বশেষ খুলনা সরকারি মহিলা কলেজে অধ্যাপনার পর অবসর গ্রহণ করেন। বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী এই জ্ঞানতাপস একাধারে করি, প্রাবন্ধিক, ইতিহাসবিদ ও নাট্যকার। এসবের বাইরেও তিনি উয়ায়সী তরিকার একজন আধ্যাত্মিক সাধক। টাঙ্গাইলের ইতিহাস ঐতিহ্য চর্চায় মুফাখখারুল ইসলামকে প্রাণপুরুষ বলা যায়। টাঙ্গাইলের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের নানা অজানা তথ্য তিনি উন্মোচন করেছেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ যেমনঃ 'টাঙ্গাইলে ইসলাম'টাঙ্গাইল জেলা সাধারণ ইতিহাস প্রসঙ্গে'ইত্যাদি প্রবন্ধের অনুসন্ধানী ব্যাখ্যায় আমরা খুঁজে পেয়েছি কালিহাতি থানার বন্দ-ই-শহর বা ভন্ডেশ্বর, ভূঞাপুরের রাজা রায়ের ভিটা, হাট সুলতান নগর, ঘাটাইলের সাগরদীঘি, ঝরোকো, গুপ্তবৃন্দাবন, দেলদুয়ার থানার আল-ই-ইয়াসীন বা এলাসিন সম্পর্কে নব-নতুন তথ্য। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য

Matrix BCS Series

সাহিত্যকর্মের মধ্যে, প্রবন্ধঃ ভাষা ও রচনারীতি, আল্লাহকে দেখা যায়, ইসলাম পথের বাধা, ইতিহাসের ফাঁক ও ফাঁকি, ইতিহাসগত বিভ্রান্তির রহস্য। নাটকঃ মুরশিদ (১৯৭০), আর্তনাদ (১৯৫৮), আশ্রিত (১৯৫০), ঈদের খুশি (১৯৭০), বয়াতি (১৯৭০), হকীম বুআলী সীনা সলেমান আবসাল, হেনা, আদহাম-আশিক, আল্লাহর মর্জি। একাঙ্কিকাঃ তোবাতুন নসুহা, মারাঠা মর্দিন, ইন্টারভিউ, এলাচিপুরের মুন্সেফ। কিশোর নাটকঃ ইমানপরখ, বড় ঈদ, প্রহরী পুত্র ও মজনু ফকির। মুফাখখারুল ইসলাম ২০০৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

অধ্যাপক ডঃ মফিজ উদ্দিন আহমেদঃ

১৯২১ সালে ২ মে ঘাটাইল উপজেলার গাংগাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আহাদউল্যা সরকার। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে ১৯৪২ সালে এবং ১৯৪৪ সালে যথাক্রমে বিএসসি (সম্মান) ও এমএসসি ডিগ্রি লাল করেন প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। অতঃপর ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পেনসেলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিইচডি ডিগ্রি লাভ করেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসায়ন বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালীন তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এই কৃতী শিক্ষাবিদ জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হয়ে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে বিভাগীয় চেয়ারম্যান, সিনেট, সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। ডঃ মফিজ বহু পেশাগত ও সামাজিক সংগঠনের সাথেও নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের 'ফি লামডো আফসিলন'(১৯৪৭) ও সিগমাসিকস (১৯৪৮) সদস্য, ১৯৬৯ সালে সেন্ট্রাল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য, স্বাধীনতার পর বিসিএসআই, আর এর প্রথম চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্যামিকেল সোসাইটির সভাপতি (১৯৭৩-৮০) ও জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান (১৯৮৭) ছিলেন। তাঁর রচিত অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও জার্নালে প্রকাশিত হয়ে প্রশংসিত হয়। তিনি ১৯৬৬ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের তমঘা-ই-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারের মহান স্বাধীনতা দিবস সম্মানে ভূষিত হন ১৯৮৬ সালে। এই পন্ডিত ব্যক্তি ১৯৯৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। আবু সাঈদ চৌধুরীর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছেঃ প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, হিউম্যান রাটস ইন টুয়েনটিয়োথ সেঞ্চুরী'এবং মুসলিম ফ্যামিলি ল ইন ইংলিশ কোর্স ইত্যাদি। তিনি ১৯৮৭ সালে আগস্ট মাসের ২ তারিখে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনের একটি আন্ডারগ্রাউড স্টেশনে নিঃসঙ্গ অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

শামছুল হক:

১লা ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ সালে বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার এলাসিন ইউনিয়নের শাকইজোড়া গ্রামের মাতুলালয়ে শামসুল হকের জন্ম। তার পিতার নাম দবির উদ্দিন সরকার মাতা-শরিফুন্নেছা। পিতা দবির উদ্দিন ছিলেন দেওলি ইউনিয়নের মাইঠান-টেউরিয়া গ্রামের একজন আদর্শ কৃষক। চারভাই দুই বোনের মধ্যে শামসুল হক ছোট বেলা থেকেই পড়ালেখায় ভাল। নিজ গ্রামের মসজিদ মাদ্রাসায় বাল্যশিক্ষা গ্রহন করে টেউরিয়া নিমণ প্রাথমিক স্কুল থেকে তৃতীয় শ্রেণী পাশ করেন। এলাসিন স্বর্ণময়ী মাধ্যমিক স্কুলে চতুর্থ ও

পঞ্চম শ্রেণী পর্যমত্ম পাঠ শেষ করে পোড়াবাড়ী মাধ্যমিক স্কুলে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর ১৯৩৫ সালে সমেত্মাষ জাহ্নবী হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখান থেকেই শামসুল হকের জীবনে রাজনৈতিক সচেতনতা, কর্মপন্থা ও কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৩৬ সালে তিনি প্রথম মুসলিম লীগের সদস্য হন। ১৯৩৮ সালে এই স্কুল থেকে তিনি কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা (মেট্রিকুলেশন) পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে করটিয়া সা'দত কলেজে ভর্তি হন। তখন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ইব্রাহিম খাঁ। শামসুল হকের রাজনৈতিক পরিমন্ডল বাড়তে থাকে। ছাত্রদের প্রয়োজনে কলেজের ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং ১৯৩৯ সালে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি (ভি.পি) নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে এই কলেজ থেকে তিনি প্রথম বিভাগে আই.এ পাস করেন। এরপর রাজনীতির বৃহত্তর অঙ্গনে পা রাখতে জীবনের কঠিন ব্রত নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে প্রথম বর্ষে (সম্মান শ্রেনিতে) ভর্তি হন। অল্প দিনের মধ্যে রাজনীতির ময়দানে ছাত্র নেতাদের মধ্যে সেরা হয়ে উঠেন শামসুল হক। পড়ালেখায় কিছুটা ঘাটতি দেখা দিলেও ১৯৪৩ সালের চূড়ান্ত পরিক্ষায় স্বল্প সময়ের প্রস্ত্ততিতে বি.এ (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর আর এম.এ ডিগ্রি অর্জন করা হয়নি। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের লাহোর প্রসত্মাব উত্থাপনের সময় (২২ মার্চ) শামসুল হকের রাজনৈতিক মঞ্চে অভ্যুদয় ঘটে। এ সময় ছাত্র নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধি হিসেবে তার সাথে পরিচয় ঘটে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের। লাহোর প্রসত্মাবের মূল বিষয়" ভারতের উত্তর পূর্ব ও উত্তর পশ্চিমাংশে স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে- এর ভিত্তিতে নিজের মন প্রান উজার করে বড় বড় রাজনীতিবিদদের সাথে জনমত গঠনে সারা বাংলা চষে বেড়ান। বাংলার মুসলমান সমাজ মুসলিম লীগের পতাকাতলে সংগঠিত ও সমবেত হতে থাকে। ১৯৪৫-১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক ও সাধারন নির্বাচনে মুসলিম লীগ এই বাংলার বিজয় লাভ করেন। বাংলার জনগন চিনে নেয় শামসুল হককে। দেশ বিভাগের সময় হয়। ১৪ ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পায়। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান- মাঝখানে ব্যবধান পায় ১২০০ মাইল। শাসন পরিচালনায় পশ্চিম পাকিস্তানি গোষ্ঠি আর পূর্ব বাংলার তাবেদারি মুসলমান নাম ধারী জমিদার বেনিয়া গোষ্ঠি । শরম্নতেই সাধারন মানুষের জন্য ত্যাগী,সংগ্রামী মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম প্রমুখকে মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় শামসুল হককে ও মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করা হয়। তাই এই অবসরে তিনি 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ' নামে সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটান। তরম্নন ও যুব নেতৃবৃন্দ তার সাথে যোগ দেয়। ১৯৫০ সাল মোগলটুলি, ঢাকা অফিসে অনেকেরই যাতায়াত বাড়তে থাকে। বিভিন্ন প্রশ্নে যেমন ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি গন দাবি খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে মানুষের কাছাকাছি যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু বেশিদিন টিকতে পারে না। এরপর শামসুল হক আবুল হাসিমের সহযোগিতায় মোগলটুলি অফিসে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও হাসিম পন্থি লোকদের নিয়ে "ওয়ার্কার্স ক্যাম্প" চালু করেন। যেখানে কামরম্নদ্দিন আহাম্মদ, অলি আহাম্মদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, তসদ্দুক আহম্মদ , তাজউদ্দিন আহম্মদ প্রমুখ এবং কলকাতা কেন্দ্রিক রাজনীতি থেকে আগত খন্দকার মোসতাক আহম্মদ ,শেখ মুজিবর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সংগঠিত হতে শুরম্ন করেন। এদিকে

পূর্ব পাকিস্তানে বাংলার পরিবর্তে উর্দু কে রাষ্ট্রভাষা করার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে মানুষ সোচ্চার হতে থাকে। গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। শামসুল হক এখানে সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেন। ১৯৪৮ সালের মার্চে ভাষার প্রশ্নে চারদিনও কারাবরন করেন তিনি। ২১ মার্চ ১৯৪৮ রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের গর্ভনর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার ভাষনের এক পর্যায়ে 'উর্দু এন্ড অনলি উর্দু শ্যাল বি দ্যা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্ড়ন' বলে ঘোষনা দেন। জিন্নাহর মুখেরকথা শেষ হবার সাথে সাথে শামসুল হক 'নো', 'নো'বলে চিৎকার করে দাঁড়িয়ে পড়লেতার সাথে সাথে আরো অনেকে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেন। ঐ-দিন সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে জিন্নাহ'র সাথে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকালে শামসুল হকবলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। শামসুল হকের বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষেযুক্তি তর্কে জিন্নাহ রাগান্বিত স্বরে শামসুল হককে উদ্দেশ্য করে বলেন, You are the man who always create trouble. I remember that you created trouble convention also along with Moulana Hasrat Moulana Abdul Hamid Khan Bhashasni and Abul Hashim? তাছাড়া সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির সাথে মি. জিন্নাহর যে বৈঠক হয় সেখানেও শামসুল হক ভাষার প্রশ্নে তার সাথে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৯ সালে প্রথম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিসত্মানে ৩৫ আসনের মধ্যে একটি টাঙ্গাইল মহকুমার দক্ষিনের মুসলিম আসনের উপনির্বাচনে মওলানা ভাসানি বিজয়ী হলে তা বাতিল করা হয়। ২৬ শে এপ্রিল পুনরায় উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষনা হলে প্রার্থী হন শামসুল হক। তার নিজের এলাকা কিন্তু তিনি সহায় সম্বল হীন। ওয়ার্কার্স ক্যাম্প নেতৃবৃন্দের বিপুল উৎসাহ , উদ্দিপনা ও সহযোগিতা পেলেন। বিপরীতে মুসলিম লীগের প্রার্থী করটিয়ার বিখ্যাত জমিদার পুত্র খুররম খান পন্নী। তার পিছনে মন্ত্রিবর্গ সহ নুরম্নল আমিনের সরকার। এরপরও শামসুল হক বিজয় ছিনিয়ে আনেন। কিন্তু বিধি বাম এবারও চক্রামত্ম করে নির্বাচনের ফল বাতিল করা হয়। এর ফলে রাষ্ট্র পরিচালনায় নানা ব্যর্থতা ও অযোগ্যতা তুলে ধরতে শামসুল হক নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। একে একে যোগাযোগ করেন শেরে বাংলা , হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী প্রমুখের সঙ্গে। তাদের কোন সাড়া না পেয়ে আসামের কারাগারে বন্দি মওলানা ভাসানীর সাথে যোগাযোগ করেন। এক পর্যায়ে মওলানা ভাসানী কারামুক্ত হয়ে ঢাকায় ফিরলে ২৩ ও ২৪ জুন (১৯৪৯) এক সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। মওলানা ভাসানী হলেন সভাপতি, শামসুল হক সাধারন সম্পাদক, আর যুগ্ম সাধারন সম্পাদক করা হয় খন্দকার মোশতাক ও শেখ মুজিবকে। শামসুল হকের নেতৃত্বে অতি দ্রম্নত আওয়ামী মুসলিম লীগ বিরোধী দল হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। ১১ অক্টোবর (১৯৪৯) পাকিসত্মানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান , পূর্ব পাকিসত্মান সফরে আসলে দেশের দূরবস্থা ও খাদ্য সংকটের প্রতিবাদে আওয়ামী মুসলিম লীগ একটি জনসভা ও বিক্ষাভের আয়োজন করে। বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের সাথে গোলযোগ দেখা দিলে মওলানা ভাসানী , শামসুল হক সহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে নুরম্নল আমিনের সরকার । তাদের কারাগারে প্রেরণ করে। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে শামসুল হক মুক্তি পান। দীর্ঘ সময় কারাভোগের পর তিনি ধর্মকর্ম ও পরিবারের প্রতি মনোযোগী হন। একই সাথে দলের কার্যক্রম সুচারম্ন ভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু সুবিধাবাদী অনেকে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে সংগোপনে

দলের নেতৃত্ব থেকে অপসারনের প্রস্ততি নিতে শুরু করে। এক সময় ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়া ভাষা আন্দোলনের জোয়ার জেগে উঠে। ১৯৫১ সালের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র ভাষা কমিটি কমিটি গঠিত হয়। আর ১৯৫২ সালে ৩১ শে জানুয়ারি গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। ২১ শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সাধারন ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকেই নুরুল আমিন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। ভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষ বিপক্ষ মতানৈক্য দেখা দিলে (বিপক্ষ সদস্যদের মতামত উপেক্ষিত হওয়ায়) শামসুল হকের প্রস্তাব অনুসারে তা ভোটে দিলে বিপক্ষের মতামত ১১:৪ ভোটে পাস হয়। তা সত্ত্বেও অলি আহাদ, আব্দুল মতিন, শামসুল আলম ও গোলাম মওলা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষ দৃঢ় অবস্থান নেয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে কয়েকজন শহীদ হন। শামসুল হক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার যুক্তি ছিল-" ভাষা আন্দোলন যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্দোলন চালানো বাঞ্চনীয়, যেহেতু সরকার বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলায় কারোরই কোন সাংগঠনিক শক্তি বা প্রস্ততি নেই। তাছাড়া পরবর্তি বছরই সাধারন নির্বাচন হওয়ার কথা, এ কারনে এ আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে জয় লাভের মাধ্যমে বাংলাকে দেশের রাষ্ট্রভাষা করা আমাদের জন্য সহজ হবে।" এতদ্বসত্ত্বেও শামসুল হক ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন সলাপরামর্শ ও বক্তৃতা করা ছাড়াও এক পর্যায়ে তাদের অবস্থানের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে সহমত পোষন করেন। পুলিশের গুলিবর্ষনেও তিনি পিছপা হননি। বিকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে আহত ছাত্রদের সেবা শুশ্রুষায় এগিয়ে আসেন। এরপর থেকেই বোঝা যায় রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শামসুল হকের অবদান অতুলনীয়, অপরিসীম এবং অবিস্মরনীয়। ১৯৪৯ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর শামসুল হক আফিয়া খাতুনের সঙ্গে (ইডেন কলেজের ইংরেজি শিক্ষিকা,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব পরিচিতা) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ৯ই এপ্রিল ১৯৫১ সালে তাদের প্রথম কন্যা উম্মে বতুল তাজমা তাহেরা (শাহীন)এবং ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় কন্যা উম্মে বতুল ফাতেমা জহুরা (সায়কা) জন্মগ্রহন করেন। বর্তমানে তার কন্যাদ্বয় পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে আমেরিকায় প্রবাস জীবন যাপন করছেন। আবার ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৯-০৩-১৯৫২ সালে কারাবরন করলেন শামসুল হক। ১৯৫৩ এর ১৩ ফেব্রুয়ারি কারাবরন হতে মুক্তি পেলেন তিনি। জেল গেটের বাইরে হাজার হাজার মানুষ তার অপেক্ষায় ছিলেন। তাকে দেখে জনগন আনন্দে করতালি ও শ্লোগান করলেন। তিনি স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে স্মিত হাস্যে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানালেন। পরবর্তিতে সেখান থেকে সে সরাসরি ঢাকার শ্বশুরালয়ে যান । সেখানে গিয়ে দেখতে পান তার স্ত্রী ও সন্তানরা দেশ ত্যাগ করে নিউজিল্যান্ড চলে গেছেন। এ বিষয় নিয়ে তার শ্বশুর বাড়ীর লোকজনদের সাথে তার তর্ক বিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে শামসুল হক হালকা রকমের আহত হন। এরপর ধীরে ধীরে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ভাবে নিঃসঙ্গ ও একাকী হয়ে পড়েন আর রাজনৈতিক ভাবে হন অবহেলার শিকার। এ সময় প্রবল মানসিক যন্ত্রনা ও বিরহ ব্যাথায় পৃথিবীর বস্ত জগতের ও স্বাভাবিক জীবন প্রবাহ থেকে ছিটকে পড়েন তিনি। শুরু হয় তার উদ্ভট ও ভাবলেশহীন জীবন যাপন। জীবনের শেষবেলা কাটে হাটে-ঘাটে-মাঠে, নদীতে ও নৌকায়। দূর্ভাগ্যবশত ১৯৬৫ সালে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানে একদিকে আয়ুব খানের সামরিক শাসন, পাক

ভারত যুদ্ধ, অন্যদিকে রাজনীতি বন্ধ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ঐ সময় শামসুল হক সব কিছু হারিয়ে মনে মনে নানা প্রকার বিচ্ছেদ, যন্ত্রনা, অসহায়ত্ব, ভগ্ন রোগাক্রামত্ম স্বাস্থ্য নিয়ে অসুস্থ অবস্থায় তৎকালিন টাঙ্গাইল মহকুমার কালিহাতি থানার দূর্গাপুর ইউনিয়নের জোগারচড় এলাকার কদিমহামজানি গ্রামের শামসুল হকের সুপরিচিত স্বদেশী আন্দোলনের কংগ্রেস নেতা মৌলভি মহির উদ্দিন আনসারি সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নেন। তাকে কংগ্রেস নেতার ছেলেরা স্থানীয় ডাক্তার দ্বারা বেশ কিছু দিন চিকিৎসা করান। চিকিৎসা চলাকালিন অবস্থায় শামসুল হক সাহেব ১৯৬৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। ঐ সময়ের তাগিদে কংগ্রেস নেতার ছেলেরা সমাজের কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে কদিমহামজানি গ্রামের স্থানীয় কবরস্থানে শামসুল হক সাহেবকে দাফন করেন। শামসুল হকের মৃত্যুর আগ মুহূর্ত হইতে প্রায় এক যুগ কেটেছিল দেশের মানুষের সামনে অচেনা, অজানা, অকাতর ,অবহেলা ও অসহায় অবস্থায়। অবশেষে তাহার মৃত্যু হয় পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের অগোচরে এবং দেশবাসীর অজামেত্ম। এরপর ২০০৭ সালে ঐ গ্রামের ডাঃ আনছার আলী তালুকদার সহ যারা দাফন করার সময় উপস্থিত ছিলেন। তারা শামসুল হকের অনুসারি ডাঃ সাইফুল ইসলাম স্বপন, তৃনমূল নেতা কৃষক আব্দুল গফুর বেপারী এবং স্যাটেলাইট চ্যানেল এনটিভি ও দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার টাঙ্গাইল প্রতিনিধি সাংবাদিক মহববত হোসেন সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের নিকট শামসুল হকের মৃত্যুর বিস্ড়ারিত কাহিনী খুলে বলেন এবং তার কবরটি চিহ্নিত করে দেখান। সেই অনুসারে শামসুল হকের জন্মভূমি দেওলি ইউনিয়ন সেই ইউনিয়নের তার অনুসারি ও ভক্ত তৃনমূল নেতা কৃষক আব্দুল গফুর বেপারী, ডাঃ সাইফুল ইসলাম স্বপন সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ শামসুল হকের কবরটি ইট দ্বারা বাধিয়া রেখেছেন। শামসুল হকের 'বৈপ- বিক দৃষ্টিতে ইসলাম' মুসলমানদের জন্য সুসমন্বিত জীবন ব্যবস্থাকল্পে অনুপম ভাষায় রচিত একটি অনবদ্য বই। মোট কথা তার লেখা একমাত্র 'বৈপ- বিক দৃষ্টিতে ইসলাম' বইখানি ছাড়া দ্বিতীয় কোন বই-ই আজ আর বর্তমানে নেই। এ বইটি ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৯৮৭ সালে তৃতীয় সংস্করন প্রকাশ করেছে। (শামসুল হকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত, ইতিহাস ও তথ্য সংগ্রহকারী তৃনমূল নেতা কৃষক আব্দুল গফুর বেপারী, গ্রামঃ বাবুপুর, উপজেলাঃ দেলদুয়ার, জেলাঃ টাঙ্গাইল।)

ড. আলীম আল রাজীঃ

১৯২৫ সালে দেলদুয়ার থানার বরটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মুন্সি নইমুদ্দিনের ঘরে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ (ইতিহাস) ও বিএল পাস। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস ও আইনে দু'বার পিএইচডি ডিগ্রি লাভ। এখান থেকে বার-এট-ল ডিগ্রি অর্জন। লন্ডনে অবস্থানকালে ড. রাজী লন্ডনের মুসলিম ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি এর চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আলীম আল রাজী তদানীন্তন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে। তিনি একজন দক্ষ পাল্যামেন্টারিয়ান ছিলেন। পাকিস্তান গণপরিষদে তিনি সব জোরালো বক্তব্য রাখতেন এবং তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে মন্ত্রীদের ব্যতিব্যস্ত রাখতেন। সর্বজনীন ভোটাধিকার, পাল্যামেন্টারি গণতন্ত্র, পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন, বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধানতার দাবিতে জাতীয় পরিষদে সোচ্চার ও

Matrix BCS Series

আপোসহীন ভূমিকা পালন করেন। আই ব্যবসার পাশাপাশি একজন সুলেখক হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। তিনি ১৯৭৪-৭৫ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ছিলেন। ড. রাজীর সম্পাদনায় টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দূরবীন'ও লন্ডন থেকে প্রকাশিত হতো 'দি ওরিয়েন্টাল টাইমস'। তিনি ঢাকা সিটি কলেজ (১৯৫৭), নাগরপুর ডিগ্রি কলেজ (১৯৬৬) ও লাউহাটী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। স্বল্পকাল তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তার রচিত বইয়ের মধ্যে (১) বিশ্বনবী ও হযরত আয়েশা (রা) (২) আরাকানের পথে (৩) মোসলমানদের জেনে রাখা ভালো। ড. রাজী ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত টাঙ্গাইল জেলা সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. রাজী ভাসানী ন্যাপের সহ-সভাপতি পরবর্তীতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৫ সালের ১৫ মার্চ টাঙ্গাইলের এই কৃতী সন্তান মৃত্যুবরণ করেন।

শামসুল আলমঃ

জন্ম ১৯২৬ সালে টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার গৌরাঙ্গী গ্রামে। পিতা রেজার করিম আহমেদ। ১৯৫২ ভাষাআন্দোলন সূচনা পর্বে শামসুল আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক এবং একই সঙ্গে তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। শামসুল আলম এই কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত হন। এই পরিষদের নেতৃত্বেই ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ প্রথমবারের মতো ঐতিহাসিক হরতাল ও ছাত্র ধর্মঘট প্রতিপালিত হয় এবং এই পরিষদের নেতৃত্বে ১৫ মার্চ ১৯৪৮ সালে প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে ভাষার স্বপক্ষে ৮ দফার এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে জনাব শাসুল আলম সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন এবং সরকারের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চের চুক্তির মাধ্যমেই ভাষার দলীয় নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যার কৃতিত্বে ছিলেন শামসুল আলম। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে সংগ্রাম পরিষদের একুশ সদস্য শামসুল আলমের নেতৃত্বেই সাক্ষাৎ করেন। সেদিনের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি বলেই ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির অবতারণা। এই ভাষাসৈনিক ১৯৯৪ সালের ১২ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

আবদুস সাত্তারঃ

কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, ভাষাবিদ, অনুবাদক, স্মৃতিকথক, সম্পাদক, শিশুতোষ সাহিত্য রচয়িতা আবদুস সাত্তার ১৯২৭ সালে ২০ জানুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার গোলরা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মৌলভী আবদুস সোবহান, মাতা সবির উন-নেসা। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা শতস্পর্শী। ১৯৪৩ সালে 'দৈনিক আজাদ'পত্রিকার 'মুকুলেরর মহফিলে'-র পাতায় প্রথম ছড়া প্রকাশিত হয়। ১৯৪৫-এ 'মাসিক মোহাম্মদী'-তে প্রথম কবিতা। এরপর থেকে লেখায় বিরাম পড়েনি। নিজের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, ... আমাকে কিছু না কিছু লিখতেই হবে। .... লেখা আমার অস্থিমজ্জার সঙ্গে জড়িত। আমার লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। তারপর আরও অনেকগুলো। ১৯৬৬ সালে

Matrix BCS Series

প্রকাশিত হয় আদিবাসীদের নিয়ে গবেষণাগ্রন্থ 'অরণ্য জনপদে'। বাংলাদেশের উপজাতিদের নিয়ে লেখা এটিই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। বইটি জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পুরস্কার অর্জন করেছে। আবদুস সাত্তার ২০০০ সালের মার্চ মাসে বার্ধক্যজনিত রোগে মৃত্যুবরণ করেন।

আব্দুল মান্নানঃ

আব্দুল মান্নানের জন্ম ১৯২৯ সালে ৭ অক্টোবর টাঙ্গাইল সদর উপজেলার গলাটিয়া গ্রামে। বাবা তাজ উদ্দিন জোয়ারদার, মা খাতুন জোয়ারদার। গত ৫৯ বছর ধরে দেশের রাজনীতির উত্থান-পতনের ঘটনাবহুল সময়ের সাক্ষী তিনি। আব্দুল মান্নান ১৯৪৮ সালে তৎকালীন টাঙ্গাইল মাহফিল (বর্তমান টাঙ্গাইল জেলা সমিতি)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৫ সালে টাঙ্গাইল মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং পরবর্তী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ও ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে তার ভূমিকা উজ্জ্বল। ১৯৭০ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে বিপুল ভোটে এমএনএ নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল মুজিব নগর সরকারের মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় আব্দুল মান্নানকে স্বাধীন বাংলা বেতর কেন্দ্রের প্রচার বিভাগের দায়িত্ব দেন। ১৯৭১ এ স্বাধীনতা যুদ্ধে মাটি থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালনা করে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। সে সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আহম্মদ রফিক ছদ্মনামে তিনি 'বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন নামক নিয়মিত কথিকা পাঠ করতেন। যা পাক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর বিচারের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গঠনে সহায়তা করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মুজিব নগর থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক জয়বাংলা নামে একটি পত্রিকা প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর সম্পাদনায় বের হতো। ১৯৭৪ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তৃতীয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক দেশের নন্দিত এই রাজনীতিবিদ ২০০৫ সালের ৪ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

সাইয়িদ আতীকুল্লাহঃ

জন্ম ১৯৩৩, আঠারদানা, ঘাটাইল। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে জনতা ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। তবে তার বড় পরিচয় ছিলো সমসায়কি সময়ের একজন বড় মাপের কবি ও গল্পকার। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৪), কবিতায় সুফী মোতাহার হোসেন পুরস্কার, কবিতায় হাসান হাফিজুর রহমান স্বর্ণপদক অর্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে : কাব্য, আমাকে ছাড়া অনেক কিছু, আঁধির যতো শত্রু-মিত্র, অদম্য পথিকের গান, এই যে তুমুল বৃষ্টি। গল্পগ্রন্থ : বুধবার রাতে, অনুবাদ : সেগডেন হ্রদ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৪ নভেম্বর ১৯৯৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

Matrix BCS Series

অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদঃ

জন্ম ১ আগস্ট ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ। পিতা শমসের আলী। গ্রাম- সুবর্ণতলী, উপজেলা- দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল। তিনি শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিকবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবী, মুক্তিযোদ্ধা ও সুলেখক। ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ এবং ১৯৬৭ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষাজীবনে করটিয়া সা'দত কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি(১৯৫৩-৫৪) এবং তৎকালীন নূর"ল আমিন সরকারের বির"দ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন। আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ১৯৭০ সালে তৎকালীন জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তাঁর অংশগ্রহণ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতের তুরাতে ৮ মাস এফজে সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর মোটিভেশনের দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় ১৬ হাজার মুক্তিবাহিনীর সদস্য তাঁর হাতে শপথ নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে। তিনি নিজেও ৪ মাস গেরিলা ট্রেনিং নেন। প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তমকে তিনি ভারত থেকে উন্নতমানের অস্ত্র যোগানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সহায়তা করেন। ভারতে ট্রেনিং দিয়ে টাঙ্গাইল ময়মনসিংহের ভালো ভালো মিলিটান্ট ছেলেদেরকে বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বিরোত্তমের কাছে সরাসরি পাঠিয়ে দিতেন। জনাব খালিদ স্বাধীনতার পর দেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৩ সালে নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর বিরাজমান রাজনৈতিক শূন্যতার দর"ন রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে পবিত্র হজব্রত পালন করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেছেন। ১৯৯২ সালে নাগরপুর কলেজ থেকে অধ্যাপনা জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে শরীয়তপুর হাজী শরীয়তুল্লাহ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি টাঙ্গাইল জেলার শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক হিসেবে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তাঁর কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থের নাম নিম্নে সন্নিবেশিত হলো : (১) চরমোনাই পীর সাহেব কেবলা, (২) ভারতে কয়েকদিন, (৩) মওয়াজে কারিনয়া (মোট চার খন্ড), (৪) আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষা। ২৯ ডিসেম্বর ২০০২ সালে হুমায়ুন খালিদ মৃত্যুবরণ করেন।

অতুল চন্দ্র গুপ্তঃ

জন্ম ১০.০৫.১৯৮৪ সালে সাকরাইলে। লেখক, আইনজীবী এবং রাজনীতিক। ১৯০৬ সালে দর্শন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে এমএ পাশ করেন। আইনজীবী হিসেবে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন ১৯১৪ সালে। ১৯১৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ছাত্র জীবন থেকেই প্রগতিশীল রাজনীতি করতেন। রসতত্ত্বে ও অলংকার শাস্ত্রের ওপর ব্যুপত্তি তাঁর অসাধারণ। তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা'গ্রন্থটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে পাঠ্য। অন্যান্য গ্রন্থ : ১. শিক্ষা ও সততা ২. জমির মালিক ৩. সমাজ ও বিবাহ ৪. নদী পথে ৫. ইতিহাসের মুক্তি ইত্যাদি। তাঁর উপার্জিত অর্থের বৃহৎ অংশ জনসেবামূলক কাজে ব্যয় করেছেন। মৃত্যু ১৭.০২.১৯৬১ সালে।

আব্দুল হামিদ খান ইউস্ফজীঃ

Matrix BCS Series

জন্ম ১৮৪৫ চারান, কালিহাতি। তিনি একাধারে কবি, সাংবাদিক, লেখক ও রাজনীতিক ছিলেন। আব্দুল হামিদ খান 'উদাসী'(১৯০০ সালে) কাব্যে আত্ম-পরিচয়সূচক এরূপ একটি ছত্র রচনা করেন :

আটীয়া, চারাণ গ্রাম, বঙ্গে সুবিদিত ধাম,
তাহাতে জন্মিলা কবি আব্দুল হামিদ নাম।
মাতা হামিদুননেছা, পিতা বশারত আলী,
পিতামহ শাহ কামাল ইউসফজায়ী পাঠানবলী।

১৮৮৬ সালে টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত 'আহম্মদী'পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। 'আহম্মেদী'পরবর্তীতে তিনি 'নবরত্ন'নামে পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। স্বদেশী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সহকর্মী হিসেবে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকেন। আব্দুল হামিদ খান ইউস্ফজী বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে ১. উদাসী ২. অরুণ ভাতি কিরুণ প্রভা ৩. হৃদয় উদ্যান ৪. আরব কান্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দেলদুয়ারের 'গজনবী'জমিদারদের স্ববংশীয় শরিক ছিলেন হামিদ খান। তিনি দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার হিসেবেও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রসৈনিক। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতার অপরাধে তিনি ফৌজদারি দন্ডবিধিতে অভিযুক্ত হন। তিনি ১৯১০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

জাহ্নবী চৌধুরানীঃ

জাহ্নবী চৌধুরানী মাত্র ১৩ বছর বয়সে স্বামী গোলকনাথ রায় চৌধুরীর মৃত্যুতে বিধবা হয়ে সন্তোষ ছয় আনী জমিদারির মালিকানা লাভ করেন। তিনি মজিদারি পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জনহিতকর কাজেও যথেষ্ট অবদান রাখেন। তিনি ৩ জুন ১৮৭০ সালে তৎকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার দ্বিতীয় ইংরেজি (এমই) বিদ্যালয় হিসেবে সন্তোষ জাহ্নবী হাইস্কুল স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় থেকে ১৮৯৬ সালে মহিম চন্দ্র ঘোষ এন্ট্রাস পরীক্ষায় প্রথম স্থান, ১৯২৬ সালে দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান, ১৯৬৫ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে নিতাই দাস পাল এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং ১৯৬৯ সালে আশীষ কুমার পাল এসএসসি মানবিক বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। জাহ্নবী চৌধুরানী জনস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ রেখে সন্তোষে নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় স্বামীর নামে গোলকনাথ দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

রানী দিনমনি চৌধুরানীঃ

সন্তোষ ছয়আনী জমিদারির কর্তা জাহ্নবী দেবী চৌধুরানীর পোষ্যপুত্র বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর স্ত্রী ছিলেন দিনমনি চৌধুরানী। তাঁর উল্লেখযোগ্য জনহিতকর কাজ হচ্ছে ১) দার্জিলিং শৈলবাসে স্বামীর নামে বৈকুণ্ঠনাথ থাইসিস ওয়ার্ড স্থান (২) ঢাকায় বৈকুণ্ঠনাথ আশ্রম নির্মাণ (৩) ঢাকা মিটফোর্ড কলেজে মহিলাদের জন্য ওয়ার্ড নির্মাণ (৪) কাগমারীতে মৃতদেহ সৎকারের জন্য

দাতব্য কাষ্ঠ ভান্ডার স্থাপন। এছাড়াও তিনি ঢাকার জগান্নাথ কলেজকে পাঁচ হাজার ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সহায়তা দেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে তিনি রানী উপাধি পান।

আব্দুল হামিদ চৌধুরীঃ

জন্ম ১৮৮৮ সালে কালিহাতীর নাগরবাড়ি। পিতা এবাদত চৌধুরী। আব্দুল হামিদ চৌধুরী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আদে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য, ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আইসভার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের স্পিকার প্রথম ১৯৬২-তে ও ১৯৬৫-তে দ্বিতীয় বার নির্বাচিত হন। ১৯৩৬- এ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগ পুনর্গঠন করলে এবং ময়মনসিংহে চার সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিল অব অ্যাকশন গঠিত হলে তার সদস্য এবং মুসলিম লীগের আজীবন সদস্য হন। তিনি বিভিন্ন সময়ে টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহে ১ম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, জেলা স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান, তৎকালীন ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্ড়ানের ডাইরেক্টর এবং কলিকাতায় পাক-হাই কমিশনার (১৯৫১)। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে খান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তিনি নাগবাড়ি গ্রামে প্রিয়তমা স্ত্রীর নামে হাসিনা চৌধুরী হাই স্কুল ও পিতার স্মৃতিতে এবাদত চৌধুরী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আবু কায়সারঃ

জন্ম ১২.০২.১৯৪৫ সালে পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিবাদের জিয়াগঞ্জে। বাবা শফিউদ্দিন আহমেদ, মা শামসুন নাহার। পৈত্রিক নিবাস মীরের বেতকা গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক। কর্মজীবনে বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। গদ্যে পদ্যে সিদ্ধহস্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ১. আমি খুব লাল একটি গাড়িকে (কবিতা) ২. লজ্জার দেরাজ (কবিতা) ৩. সব পাখি আসে (উপন্যাস) ৪. পলি মাটির পুতুল (শিশুসাহিত্য) ৫. রায়হানের রাজহাঁস (শিশুসাহিত্য) ৬. যাদু সম্রাট পি.সি. সরকার (জীবনী) ৭. বুলগেরিয়ার গল্প (অনুবাদ)। ২০০৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

কামাক্ষা নাথ সেনঃ

জন্ম ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ সালে টাঙ্গাইল শহরে। পিতা প্রিয়নাথ সেন, মাতা প্রভাবতী সেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমকম (হিসাববিজ্ঞান) ১৯৭৪, এমকম (ফিন্যান্স) ১৯৭৫, এলএলবি ১৯৭৬। তিনি একাধারে আইনবিদ, লেখক, সম্পাদক, সংগঠক ও অধ্যাপক ছিলেন। তিনি টাঙ্গাইল আইন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়, ইন্সটিটিউট অব্ ব্যাংকার্স ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিলর পরীক্ষক ছিলেন। কামাক্ষা নাথ সেন বাংলাভাষায় প্রথম আইন বিষয়ক পত্রিকা ত্রৈমাসিক 'আদালত'- এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাঁর বিশেষ কিছু গ্রন্থ হলো : ১. অগ্রক্রয় আইন ২. শত্রু সম্পত্তি আইন ৩. তামাদি আইন ৪. মুসলিম আইন ৫. নিষেধাজ্ঞা আইন ৬. হিন্দু আইন ৭. জামিন আইন ৮. ছানী মামলার আইন ৯. বাটোয়ারা আইন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ হলো, ষাটের দশকের কবিতা (মাহমুদ কামালের সঙ্গে যৌথ) ও

Matrix BCS Series

সত্তর দশকের কবিতা (মাহমুদ কামালের সঙ্গে যৌথ)। কামাক্ষা নাথ সেন ৩০ মার্চ ২০০৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

গোপিনাথ কবিরাজ, মহামহোপাধ্যায়ঃ

জন্ম ১৮৮৭ সালে সদর থানার দাইন্যা গ্রামে। কাশীর কুইন্স কলেজ থেকে সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং ঐ কলেজেই সংস্কৃতের অধ্যাপক ও গ্রন্থগারিক হন। ১৯১৮ সালে বিখ্যাত তান্ত্রিক ও দার্শনিকযোগী বিশুদ্ধানন্দের কাছে দীক্ষা নেন। তাঁর অসাধারণ বুৎপত্তি ছিলো দর্শনের সমস্ত শাখায়, বিশেষত ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র ও বৌদ্ধ দর্শনে। ১৯৬৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে মহামহোপাধ্যায়, ১৯৪৭ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট. ১৯৬৪ সালে পদ্মভূষণ, ১৯৬৫ সালে উত্তর প্রদেশ সরকার সাহিত্য বাচস্পতি এবং ১৯৭৬ সালে বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশীকোত্তম'উপাধি দেন। বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় তাঁর রচিত প্রধান প্রধান গ্রন্থাবলী ১. শ্রী শ্রী বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (৫খন্ড) ২. ভারতীয় সাধনার ধারা ৩. শ্রী কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ৪. তান্ত্রিক সাধনা ৫. মৃত্যু বিজ্ঞান ও কর্ম রহস্য ৬. SARASWATI BHAWAN STUDIES ৭. ASPECTS OF INDIUN THOAGHT এবং সংস্কৃতে ৮. ত্রিপুরা রহস্য ৯. গোরখ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ প্রভৃতি। ১৯৭৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

নরেশ গুহঃ

জন্ম ১৯২৪ সালে টাঙ্গাইল সদর। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : ১. দুরন্ত দুপুর (কাব্য) ২. তাতার সমুদ্র ঘেরা (কাব্য) ৩. 'W.B. Yeats : An Indian'(সমালোচনা) বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা'(১৯৩৫) পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন।

নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তঃ

৩ মে ১৮৮২ সালে বগুড়ায় মাতুলালয়ে জন্ম। তাঁর পৈত্রিক নিবাস টাঙ্গাইলে। তিনি একাধারে আইনবিদ, গবেষক ও লেখক ছিলেন। ১৯০৫ সালে দর্শন সাস্ত্রে এমএ পাশ করেন। ১৯০৬ সালে ওকালতি পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং সে সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ও কংগ্রেসের রাজনীতিতে অংশ নেন। প্রাচীন ভারতের ব্যবহার ও সমাজনীতি বিষয়ে গবেষণা করে ১৯২০-২৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপনা করেন। ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে ১৯৫১ সালে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে যোগ দেন। ১৯৫৬ সালে ভারতীয় আইন কমিশনের সদস্য ছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁর বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। তাঁর একাধিক উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। ১৯৩৪ সালে লেবার পার্টি অব ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ৬০টি গ্রন্থের রচয়িতা। আইন ও সাহিত্য উভয় দিকের রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গ্রন্থ : গল্প উপন্যাস : ১. শুভা, ২. পাপের ছাপ, ৩. অগ্নি সংস্কার, ৪. শাস্তি, ৫. দত্ত গিন্নী, ৬. কাঁটার ফুল ইত্যাদি। নাটক : ১. আনন্দ মন্দির, ২. ঠকের মেলা, ৩. ঋষির মেয়ে ইত্যাদি। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

Matrix BCS Series

প্রমথনাথ রায় চৌধুরীঃ

জন্ম ১৮৭২ সালে সন্তোষের জমিদার পরিবারে। তিনি কবি, নাট্যকার হিসেবে বিখ্যাত। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর ভালো দখল ছিলো। স্বদেশী আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান রাখেন এবং নাটোরের মহারাজার সঙ্গে একত্রে 'সাহিত্য সঙ্গীত'নামক সাহিত্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। প্রবাসী, মানসী, ভারতবর্ষ, প্রদীপ, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামে কণিকা কাব্য এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের নামে 'পদ্ম'কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেন। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী জলধর সেনের সম্পাদনায় 'প্রমথ নাথের গ্রন্থাবলী'নামে কয়েক খন্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর গ্রন্থগুলো হলোঃ ১. পদ্ম, ২. দিপালী, ৩. গীতিকা, ৪. আরতি, ৫. গৌরাঙ্গ ইত্যাদি। নাটকঃ ১. ভাগ্যচক্র, ২. চিতোরোদ্ধার বা হাম্বির, ৩. জয় পরাজয় ইত্যাদি নাটক। প্রহসালঃ আক্কেল সেলামী। তিনি ১৯৪৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

বঙ্কিম চন্দ্র সেনঃ

জন্ম ১৮৯২ সালে সদর উপজেলার ঘারিন্দা গ্রামে। কবি, প্রবন্ধকার ও সাংবাদিক। কলিকাতায় গিয়ে ১৯১৭ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯৩০ সালে আনন্দ বাজার পত্রিকার সম্পাদক গ্রেপ্তার হলে তিনি ৭ মাস পর্যন্ত অস্থায়ী সম্পাদক ছিলেন। 'দেশ'পত্রিকা প্রকাশিত হলে তিনি তার সম্পাদক হন ১৯৩৩ সাল। ১৯৪২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে প্রবন্ধ লেখার জন্য গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৪ সালে থেকে ভগবৎ সাধনায় অনুরাগী হয়ে বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। সে সময় বৈষ্ণব ধর্মের উপর কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন। ১৯৫৮ সালে 'দেশ'পত্রিকা থেকে অবসর নেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : ১. গীত মাধুরী, ২. লোকমাতা রানী রাসমনি, ৩. জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে প্রভৃতি। ১৯৬৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

ভবানী প্রসাদঃ

জন্ম ষোড়শ শতকের কাঠালিয়া (প্রাচীন আতিয়া পরগণা) গ্রামে। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ এবং শৈশবেই পিতা মাতাকে হারিয়েছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : দুর্গামঙ্গল, ২. মনসা মঙ্গল। ব্যোমকেশ মুস্তাফীর সম্পাদনায় ১৩২১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক দুর্গামঙ্গল প্রকাশিত হয়। দুর্গামঙ্গল মার্কন্ডেয় চন্ডীয় অনুবাদ, তবে মুলানুগ অনুবাদ নয়। অন্যান্য পুরাণের প্রভাব আছে। সপ্তদশ শতকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রসিক চন্দ্র বসুঃ

ঊনিশ শতকে নাগরপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করে। আতিয়া পরগণার জমিদার প্রখ্যাত জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত করটিয়ার সাহিত্যিক পরিমন্ডলের ত্রিরত্নের অন্যতম (রসিক চন্দ্র বসু, ছাবেদ আলী খাঁ ও মোসলেমউদ্দিন খাঁ)। তিনি বিশিষ্ট কবি, ইতিহাসবেত্তা ও লেখক ছিলেন। আতিয়া পরগণার ইতিহাসমূলক গ্রন্থ : 'আতিয়ার ইতিহাস'তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। এ গ্রন্থের মাধ্যমে টাঙ্গাইলের সাবেকি অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : ১. সৈয়দ খাঁ, ২. শেরশাহ, ৩. শৈব্যা, ৪. দময়ন্তী, ৫. বেহুলা ইত্যাদি। তিনি বিশ শতকের প্রথম ভাগে মৃত্যুবরণ করেন।

Matrix BCS Series

রিয়াজউদ্দিন আহম্মদ মাশহাদীঃ

জন্ম ১৮৫৯ সালে কালিহাতী উপজেলার বিখ্যাত চারাণ গ্রামে। দেশ বিখ্যাত আলেম, সুপন্ডিত ও লেখক। ছদ্মনাম ফকির আবদুল্লাহ বিন ইসমাইল। তিনি কলিকাতায় আলীয়া মাদ্রাসার বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন পরে দেলদুয়ার জমিদার গজনবী পরিবারের ম্যানেজারের পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ১. সমাজ সংস্কারক, ২. অগ্নিকুক্কুট (পূর্বোক্ত পুস্তকদ্বয় তৎকালীন ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন) ৩. সুরিয়া বিজয় ইত্যাদি। ১৯১৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

লোকমান হোসেন ফকিরঃ

১৯৩৪ সালে ভূঞাপুর উপজেলার নিকরাইল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। গীতিকার, কণ্ঠশিল্পী, সঙ্গীত সংগঠক এবং লেখক। ১৯৬০ সালে বেতার কণ্ঠশিল্পী হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে বেতার ও টেলিভিশনে গীতিকার ও সুরকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। 'চরিত্রহীন'ছায়াছবিতে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালনার জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর গ্রন্থসমূহ : ১. আমি শুনছি (কবিতা পুস্তক), ২. লোকমান ফকিরের গান।

শ্রীনাথ চন্দ্রঃ

জন্ম ১ এপ্রিল ১৮৫১ সালে ফুলবাড়ী। তিনি লেখক, সমাজসেবী, ব্রাহ্মসমাজের নিষ্ঠাবান কর্মী। প্রথমদিকে দারিদ্র ও রোগভোগের জন্য লেখাপড়া করা তেন সম্ভব হয়নি। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় দুটো টাকা বৃত্তি পেয়ে ময়মনসিংহে হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পিতার মৃত্যুর পর আর্থিক অনটনে পড়েন। ব্রাহ্মণধর্মে দীক্ষা নেওয়ার জন্য আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। ১৮৬৬ সালে ৪ টাকা বৃত্তি পেয়ে বাংলা নর্মাল ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর আশ্রয়দাতা রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর চন্দ্রনাথ দারোগার গৃহে থেকে ১৮৬৯ সালে নর্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কিন্তু উপার্জনের খাতিরে পড়া ছেড়ে জেলা স্কুলে হেড পন্ডিতে কাজ নেন। তিনি ১৮৭৬ সালে বামা সুন্দরী নামে এক বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেন। মেয়েদের আবাসিক বিদ্যাময়ী স্কুল প্রতিষ্ঠা ছাড়াও গরীব শ্রমজীবীদের জন্য নাইট স্কুল, শহরে কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তাঁর সক্রিয় অবদান ছিল এছাড়া বিদ্যাময়ী স্কুলের সঙ্গে তিনি বহুদিন দায়িত্বসহ যুক্ত ছিলেন। ১৮৮০ সালে সঞ্জীবনী পত্রিকা, ঘোষ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ সভা স্বারস্বত সমিতি স্থাপন করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশ নেন। গ্রন্থ : ১. ভারত মিলন, ২. ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বছর। ২৩ জুলাই ১৯৩৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সিরাজ উদ্দিন চৌধুরীঃ

জন্ম ১৩২৩ বাংলা ধলাপাড়া, ঘাটাইল। সনেট রচয়িতা। গ্রন্থ : ১. সাঝের বলাকা ২. আদরজান।

শাহ একিনঃ

জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জনা যায়নি। জীবনকাল আনুমানিক ষোড়শ শতক। তিনি কালিহাতী উপজেলার ভন্ডেশ্বর গ্রামে অবস্থান করতেন। কালিহাতী থানায় ভন্ডেশ্বর গ্রামে আবাস স্থাপন করলেও পুরো টাঙ্গাইলের বিভিন্ন স্থানে তাঁর বিচরণ ছিল। ভন্ডেশ্বরে 'শাহ একিন'মাজার এখনো বিদ্যমান। টাঙ্গাইল জেলায় ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর ঔরশ উপলক্ষে এই সাধকের মাজারে অনেক ভক্তের সমাগম হয়।

শাহ করম আলী আরবিঃ

জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায়নি। জীবনকাল আনুমানিক সতেরো শতক। তিনি কালিহাতী উপজেলার কদিমহামজানী অবস্থান করেন। ১০১১ বঙ্গাব্দে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সনদ মোতাবেক তিনি কালিহাতী থানার কাদিমহামজানী গ্রামে খানকা স্থাপন করেন। শাহ করম আল আরবি নিজ খানকায় মসজিদ স্থাপন করেন ১০৯৬ বঙ্গাব্দে। সে মসজিদটি এখনো কালের সাক্ষী হিসেবে বিদ্যমান। তিনি অত্যন্ত বুজুর্গ জ্ঞানী আলেম ও জনসেবক ছিলেন। জনশ্র"তি মতে, শাহ করম আলী আরবি দীর্ঘায়ু সম্পন্ন ছিলেন। কাদিমহামজানী গ্রামে এখনো তাঁর মাজার এবং বংশধরগণ রয়েছে।

অনুথবন্ধু গুহঃ

১২৫৫ বাঃ ময়মনসিংহ শহরে তাঁর জন্ম। পিতা মৃত্যুঞ্জয় গুহ। তাঁর পৈত্রিক নিবাস সদর থানার বেলতা গ্রামে। আইনজীবী, সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী। ময়মনসিংহ থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ওকালতি শুর" করেন। 'ভারত মিহির'সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন ১৮৭৫ সালে। স্থানীয় সৌরভ, চার"বার্তা, বাঙালি ও চার"মিহির পত্রিকা প্রকাশে তার যথেষ্ট অবদান ছিল। শিক্ষা বিস্তার, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতি কাজে অংশ নেন। তিনি ময়মনসিংহে পিতার নামে 'মৃত্যুঞ্জয় হাই স্কুল'এবং কাশীতে মাতার নামে 'জগদম্বী জাতীয় আয়ুর্বেদ মহিলা বিদ্যালয়'স্থাপন করেন। কাশীতে তাঁর ১৩৩৪ বাঃ মৃত্যু হয়।

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষঃ

২ অগ্রহায়ণ ১২৮১ বাঃ, টাঙ্গাইল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সাহচর্যে আইন ব্যবসা ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেন। যুগান্তর ও স্বরাজ্য দলের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। তিনি টাঙ্গাইল পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের স্বরাজ দলের ডেপুটি চীফ হুইপ ছিলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় অবদান রেখেছেন। তাঁর মৃত্যু ১০ পৌষ ১৩৫০ বাঃ।

মহিম চন্দ্র ঘোষঃ

ভূঞাপুর উপজেলার নিকলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (জন্মতারিখ জানা যায়নি)। তিনি টাঙ্গাইলের প্রথম আইসএস অফিসার ছিলেন। শিক্ষাজীবন শুর" হয় সন্তোষ জাহ্নবী স্কুলে। তিনি ১৮৯৬ সালে এ স্কুল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় বাংলা,

Matrix BCS Series

বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং বার্মার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে 'দি দি মহিম ঘোষ'ডাকা হতো। তিনি পরবর্তী জীবনে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অনুপম ঘটকঃ

১১ এপ্রিল ১৯১১ সালে দেলদুয়ারের পাথরাইল গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা অতুল চন্দ্র ঘটক। শিক্ষাজীবন শুরু গ্রামেই, পরে সপরিবারে কলিকাতা চলে যান। পিতার কাছে শৈশবে সঙ্গীতের তালিম নেন। অনেক প্রতিষ্ঠিত গীতিকারের গান এবং অনেক বিখ্যাত চলচ্চিত্রে তিনি সুরারোপ করেছেন। তাঁর সুরারোপিত উল্লেখযোগ্য ছায়াছবি হচ্ছে, কর্ণার্জুন, মায়ের প্রাণ, পাষাণদেবতা, শ্রী তুলসীদাস, কারপাপে, অগ্নিপরীক্ষা ইত্যাদি। বাংলা ছাড়াও কিছু হিন্দী ছবিতেও তিনি সুরারোপ করেছিলেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিখ্যাত 'অনুপম ঘটক সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়।'১২ ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রূপনারায়ণ ঘোষঃ

ষোড়শ শতাব্দীর কবি রূপনারায়ণ ঘোষ ১৫৯৭ সালে আদাজান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত 'দুর্গামঙ্গল'কাব্য সাধারণ্যে 'প্রাকৃত চন্ডী'নামে পরিচিত। কবি ভবানী প্রসাদের চেয়ে এ কাব্য সবদিক থেকেই উন্নত।

মোসলেমউদ্দিন খানঃ

কবি মোসলেমউদ্দিন খান ১৮৬২ সালে গান্দিনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'হিতকরী'পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 'বুলবুলিস্তান'ও 'হিতকাব্য' তাঁর রচনা। ১৯৩৪ সালের ২ অক্টোবর টাঙ্গাইল শহরের থানাপাড়ার বাসগৃহে ৭২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমানঃ

১৯২৫ সালে বানিয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হচ্ছেঃ রেডিও টেলিভিশনের কথা (অনুবাদ ১৯৫৯) আজব বাপ (অনুবাদ ১৯৬৩) চল্লিশজন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব (অনুবাদ ১৯৬৩) নামাজ ও আদর্শ নাগরিক (অনুবাদ ১৯৬৪) রক্তের লেখা ইতিহাস (১৯৬৪), তুমি সুন্দর (১৯৬৭), রাজা মিঞার রাজবাড়ী (১৯৬৯) ইত্যাদি।

কুমুদিনী মিত্রঃ

'সঞ্জীবনী'পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র (পরে বসু উপাধি নামের শেষে ব্যবহার করেন) তিনি সদর থানার বাঘিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এ জেলার প্রথম গ্রাজুয়েট মহিলা। তাঁর গ্রন্থসমূহঃ শিখের বলিদান, জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, মেরী কার্পেন্টার, সমাধি ইত্যাদি।

মীর আবুল খায়েরঃ

Matrix BCS Series

জন্ম ৮ পৌষ ১৩৪২ বঙ্গাব্দ। একজন প্রতিশ্রুতিশীল কবি ছিলেন। তিনি 'সমুদ্রে ঝিনুক'নামে একটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। বাংলা ১৩৬৮ সালের ৫ ফাল্গুন মৃত্যুবরণ করেন।

বিনোদ লাল দেঃ

জন্ম ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে গোপালপুর উপজেলাধীন হেমনগর গ্রামে। পিতা জানকী নাথ দে। ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাল করেন এবং ১৯২৫ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএল ডিগ্রি নেন। তিনি ভূঞাপুর উপজেলাধীন পিগালা দেওয়ানি আদালতে আইন পেশায় জড়িত থাকাকালে তিনি হেমনগর, মুক্তাগাছা, সন্তোষ ও ধনবাড়ীসহ ৮টি জমিদারি আইন উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে তিনি টাঙ্গাইল বারে যোগ দিয়ে আইন ব্যবসা পরিচালনাসহ টাঙ্গাইল বার এসোসিয়েশনের সভাপতি, ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার, ময়মনসিংহ সূর্যকান্ত হাসপাতাল পরিচালনা কমিটির সদস্য, টাঙ্গাইল করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সভাপতির এবং ১৯৩৯ সালে শিক্ষা কমিশনের সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনিও টাঙ্গাইলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। বিনোদ লাল দে ৩০-১১-১৯৪৯ থেকে ৩-৪-১৯৫০ এবং ১৪-৩-১৯৫৫ থেকে ২৩-৫-১৯৬০ সাল পর্যন্ত টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যাল কমিটির (পৌরসভা) চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৭ মে ১৯৬৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

অমরেন্দ্র নাথ ঘোষঃ

দেলদুয়ার উপজেলার জাঙ্গালিয়া গ্রাম তাঁর পৈত্রিক নিবাস। পেশায় ছিলেন আইনজীবী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আদর্শে পেশা ছেড়ে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা আইন অমান্য আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য রাজরোষে পতিত হন। ১৯২৬ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত করটিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ৯-১১-১৯২৪ থেকে ১৩-১২-১৯২৭ পর্যন্ত টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিলো গভীর অনুপ্রেরণা। 'জেলের আবর্জনা'নামক একটি কবিতা গ্রন্থও রচনা করেন।

ভূবনেশ্বর চক্রবর্তীঃ

ভূবনেশ্বর চক্রবর্তী টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার রাধানগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী। তিনি ছাত্র জীবনেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহন করেন এবং গোপন বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। জীবনের বেশিরভাগ সময় তাঁর কারাগারে ও আত্মগোপনে কেটেছে। তিনি বিপ- বী নেতা মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী এবং পূর্ণ দাসের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বিপ্লবী ভূবনেশ্বর চক্রবর্তীর জন্যে তাঁর পরিবারের অনেকেই ইংরেজ শাসকদের বিভিন্ন নিপীড়নের শিকার হয়েছে।

Matrix BCS Series

গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীঃ

জন্ম ১৮৮৫ সালে নাগরপুরের দুয়াজানির জমিদার পরিবারে। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে বিএ এবং ১৯১১ সালে সমাজ বিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এমএ পাশ করেন। 'নারায়ণ'পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহযোগী ছিলেন। রচিত প্রবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙলার ঊনবিংশ শতাব্দী', 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশী যুগ', 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাঙলায় বিপ্লববাদ', শ্রীচৈতন্য'(চরিতগ্রন্থ) উল্লেযোগ্য। তিনি ১০ মার্চ ১৯৬৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

খন্দকার মোহাম্মদ আলীঃ

নাগরপুরের সারেংপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে খন্দকার মোহাম্মদ আলীর জন্ম। তিনি ছিলেন একাধারে সরকারি চাকুরে, পীর ও সমাজসেবক। তাঁর পূর্বপুরুষরা মুর্শিদাবাদ শাহী মসজিদের খতিব ও নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। তিনি টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ও গোরস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তৎকালীন সময়ে সন্তোষ জমিদারি এলকায় গরু জবাই নিষিদ্ধ ছিল। খন্দকার মোহাম্মদ আলী এ নিয়ম ভেঙ্গে গরু জবাইয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় তিনি জয়ী হন। মহৎপ্রাণ ব্যক্তি খন্দকার মোহাম্মদ আলী ১৯৪০ সালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

তারাপদ রায়ঃ

১৯৩৯ সালে পূর্বআদালত পাড়া, টাঙ্গাইল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। বিখ্যাত এই লেখকের উল্লেখযোগ্য বইঃ তোমার প্রতিমা, নীল দিগন্তে এখন ম্যাজিক, কোথায় যাচ্ছেন তারাপদ বাবু, রস ও রমণী ইত্যাদি। তিনি ২০07 সালের ২৫ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

নবাবজাদা সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরীঃ

১৯১০ সালে ধনবাড়ীর জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ধনবাড়ীর জমিদার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী। ঢাকা মাদ্রাসা ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করনে। ময়মনসিংহ জেলার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জেল পরিদর্শক, পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৩৫ সালে কৃষক প্রজা আন্দোলনে যোগ দিয়ে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য এবং দলের চিফ হুইপ নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কলিকাতা থেকে দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকা বের করেন। ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্ড়ান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরে শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৯ সালে তিনি বিএনপি'র টিকেটে টাঙ্গাইল-১ (মধুপুর) আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। নবাবজাদা সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী ১৯৮৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

Matrix BCS Series

ব্যারিস্টার শওকত আলী খান:

জন্ম ০৯-০২-১৯২৬ সালে দেলদুয়ার উপজেলার লাউহাটী গ্রামে। পিতা ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আরফান খাঁন। লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারী পাস করে হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তিনি ১৯৭০ সালে নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক হিসেবে ভূমিকা রাখেন। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ রাতে ব্যারিস্টার শওকত আলী খান বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যান। সেখানে আলোচনার পর বঙ্গবন্ধু তাকে নিজ এলকায় যাওয়ার নির্দেশ দেন। ১৯৭১ এ ২৪ মার্চ ব্যারিস্টার শওকত আলী খান নিজ গ্রাম লাউহাটীতে চলে আসেন। তিনি একজন সংসদ সদস্য হয়েও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। ১৯৭১-এর আগস্ট মাসে ভারতের মহেন্দ্র গঞ্জের মাইনারচর থেকে তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে গেরিলা বাহিনীর একটি কোম্পানিসহ দেশের ভেতরে আসে যুদ্ধের জন্য। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে তিনি সংবিধান রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সহ-সভাপতি ছিলেন। আমৃত্যু তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২৯-০৬-২০০৯ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

রায় বাহাদুর সতীশ চন্দ্র চৌধুরীঃ

জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। জমিদার ও সমাজসেবক। সতীশবাবু ৫৪ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত বাড়ি থেকে জমিদারি পরিচালনা করতেন। বাড়ির একেবারে দক্ষিণে রয়েছে ১১ একর জমির উপর খননকৃত বিশাল আকৃতির এক জলাশয়। বাংলা ১৩৪১ সনে খননকৃত জলাশয়ের নাম উপেন্দ্র সরোবর। উল্লেখ্য উপেন্দ্র সরোবর সতীশ বাবুর পিতার নাম। সতীশবাবু স্থাপন করেন নাগরপুর যদুনাথ হাই স্কুল। তাঁর বাড়িতেই বর্তমানে নাগরপুর মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি প্রজাকল্যাণে বাড়ির অদূরে নির্মাণ করেন বৃহৎ হাসপাতাল। এই হাসপাতালের চিকিৎসক অক্ষয়বাবু, ননীগোপাল দত্তের সেবার কথা আজও মানুষ স্মরণ করে। মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এটি তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার পল্লী অঞ্চলের সর্ববৃহৎ চিকিৎসা কেন্দ্র। জনসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। খেলাধুলার উদার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সতীশবাবুর খ্যাতি আজও ম- ান হয়ে যায়নি। সতীশবাবু ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর মৃত্যুবরণ করেন।

বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য:

জন্ম ১৯১৪ সালে এলেঙ্গার ঐতিহ্যবাহী জমিদার পরিবারে। পিতা নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নওয়াব আলী চৌধুরী অপরিমেয় অবদান রেখেছিলেন, একথা সর্বজনবিদিত। বঙ্গভঙ্গ রদের পর ১৯১২ সালের ৩ ও ৪ মার্চ কলিকাতায় নওয়াব সলিমুল্লার সভাপতিত্বে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'-এর পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নওয়াব আলী চৌধুরীর তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয় : (১) উচ্চশিক্ষায় পূর্ববাংলা ও আসামের অধিবাসীদের আপেক্ষিক পশ্চাৎপদতার নিরিখে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ ঢাকায় একটি শিক্ষাদায়ক ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়। মূলত

এ থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি ভারত সরকার কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণার পর থেকে ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ, অর্থাৎ যে দিন ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভায় '১৯২০ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট নম্বর ১৮'পাস হয়। সেদিন পর্যন্ত নওয়াব আলী চৌধুরীর চেষ্টার কোনো বিরাম ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির অন্যতম সদস্যরূপে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯১২-১৯২০ সালে পর্যন্ত নওয়াব আলী চৌধুরী ব্রিটিশ-রাজের সাথে নানাভাবে দেন-দরবার ও আইনসভায় বিল উত্থাপন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ক্রমাগত ব্রিটিশ সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অর্থাভাব দেখা দিলে নিজের জমিদারির একাংশ বন্ধক রেখে ৩৫ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে দান করেন। ছাত্রদের বৃত্তির জন্য দান করেন ১৬ হাজার টাকা। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনের নামকরণ করেন এই মহৎ ব্যক্তির নামে। বাংলাভাষার প্রতি এই মানবদরদির ভালোবাসাও ছিলো অকৃত্রিম। যার বহিঃপ্রকাশ করেছিলেন বাংলাভাষাকে অবিভক্ত বাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির জন্য ব্রিটিশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক পত্র লিখে। এই বরেণ্য ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে ঈদুল আজহা (১৯০০), মৌলুদ শরীফ (১৯০৩), ভারনাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৯০০) এবং প্রাইমারি এডুকেশন ইন রুরাল এরিয়াস (১৯০৬)। ১৯২৯ সালে ১৭ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদঃ

জন্ম ১ আগস্ট ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ। পিতা শমসের আলী। গ্রাম- সুবর্ণতলী, উপজেলা- দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল। তিনি শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিকবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবী, মুক্তিযোদ্ধা ও সুলেখক। ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ এবং ১৯৬৭ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষাজীবনে করটিয়া সা'দত কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি(১৯৫৩-৫৪) এবং তৎকালীন নূরুল আমিন সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন। আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ১৯৭০ সালে তৎকালীন জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তাঁর অংশগ্রহণ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতের তুরাতে ৮ মাস এফজে সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর ম্যোটিভেশনের দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় ১৬ হাজার মুক্তিবাহিনীর সদস্য তাঁর হাতে শপথ নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে। তিনি নিজেও ৪ মাস গেরিলা ট্রেনিং নেন। প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তমকে তিনি ভারত থেকে উন্নতমানের অস্ত্র যোগানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সহায়তা করেন। ভারতে ট্রেনিং দিয়ে টাঙ্গাইল ময়মনসিংহের ভালো ভালো মিলিটান্ট ছেলেদেরকে বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বিরোত্তমের কাছে সরাসরি পাঠিয়ে দিতেন। জনাব খালিদ স্বাধীনতার পর দেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৩ সালে নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর বিরাজমান রাজনৈতিক শূন্যতার দরুন রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে পবিত্র হজব্রত পালন করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক জীবন

Matrix BCS Series

যাপন করেছেন। ১৯৯২ সালে নাগরপুর কলেজ থেকে অধ্যাপনা জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে শরীয়তপুর হাজী শরীয়তুল্লাহ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি টাঙ্গাইল জেলার শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক হিসেবে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তাঁর কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থের নাম নিম্নে সন্নিবেশিত হলো : (১) চরমোনাই পীর সাহেব কেবলা, (২) ভারতে কয়েকদিন, (৩) মওয়াজে কারিনয়া (মোট চার খন্ড), (৪) আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষা। ২৯ ডিসেম্বর ২০০২ সালে হুমায়ুন খালিদ মৃত্যুবরণ করেন।

প্রমথনাথ রায় চৌধুরীঃ

জন্ম ১৮৭২ সালে সন্তোষের জমিদার পরিবারে। তিনি কবি, নাট্যকার হিসেবে বিখ্যাত। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর ভালো দখল ছিলো। স্বদেশী আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান রাখেন এবং নাটোরের মহারাজার সঙ্গে একত্রে 'সাহিত্য সঙ্গীত'নামক সাহিত্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। প্রবাসী, মানসী, ভারতবর্ষ, প্রদীপ, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামে কণিকা কাব্য এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের নামে 'পদ্ম'কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেন। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী জলধর সেনের সম্পাদনায় 'প্রমথ নাথের গ্রন্থাবলী'নামে কয়েক খন্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর গ্রন্থগুলো হলোঃ ১. পদ্ম, ২. দিপালী, ৩. গীতিকা, ৪. আরতি, ৫. গৌরাঙ্গ ইত্যাদি। নাটকঃ ১. ভাগ্যচক্র, ২. চিতোরোদ্ধার বা হাম্বির, ৩. জয় পরাজয় ইত্যাদি নাটক। প্রহসালঃ আক্কেল সেলামী। তিনি ১৯৪৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

রসিক চন্দ্র বসুঃ

ঊনিশ শতকে নাগরপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করে। আতিয়া পরগণার জমিদার প্রখ্যাত জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত করটিয়ার সাহিত্যিক পরিমন্ডলের ত্রিরত্নের অন্যতম (রসিক চন্দ্র বসু, ছাবেদ আলী খাঁ ও মোসলেমউদ্দিন খাঁ)। তিনি বিশিষ্ট কবি, ইতিহাসবেত্তা ও লেখক ছিলেন। আতিয়া পরগণার ইতিহাসমূলক গ্রন্থ : 'আতিয়ার ইতিহাস'তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। এ গ্রন্থের মাধ্যমে টাঙ্গাইলের সাবেকি অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : ১. সৈয়দ খাঁ, ২. শেরশাহ, ৩. শৈব্যা, ৪. দময়ন্তী, ৫. বেহুলা ইত্যাদি। তিনি বিশ শতকের প্রথম ভাগে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রাকৃতিক সম্পদ

টাঙ্গাইলের ভূ-খন্ডে যে সব খনিজ সম্পদের কথা জানা যায়। তাহলো লোহা, কয়লা ও তৈল। এর মধ্যে কোনটাই উৎপন্ন করা সম্ভব হয়নি। কেদারনাথ মজুমদারের ময়মনসিংহের বিবরণ গ্রন্থ থেকে জানা যায়। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে দীননাথ সেন মধুপুরের শালবনের মাটি পরীক্ষা করে এখানে লৌহ খনি থাকতে পারে বলে মত দেন। সরকার পরে এজন্য একজন রাসায়নিক বিশেষজ্ঞকে মধুপুর বনভূমি পরীক্ষায় নিয়োগ করে। তিনিও লৌহ খনি থাকার সম্ভাবনা বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

Matrix BCS Series

দর্শনীয় স্থান

১. পাকুটিয়া জমিদারবাড়ী
২. আতিয়া মসজিদ
৩. উপেন্দ্র সরোবর
৪. এলেঙ্গা রিসোর্ট
৫. ডিসি লেক, টাঙ্গাইল
৬. ধলাপাড়া চৌধুরীবাড়ী ও কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ
৭. নাগরপুর চৌধুরী বাড়ী (জমিদার বাড়ি)
৮. বনগ্রামের গনকবর
৯. মহেড়া জমিদার বাড়ী

খাল বিল নদী

বাসাইলের বুকে সতত বিচরণশীল বিপুল জনগোষ্ঠির দৈনন্দিনতার জন্য প্রয়োজনীয় জল প্রকৃতি গতভাবে যোগান দিচ্ছে নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-জলাশয়। বছরের একটি নির্দিষ্ট মৌসুমে চলাচলের জন্য প্রয়োজন জলপথের। সকল কিছুর উর্ধে কৃষিজ উৎপাদনের জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাসাইলে মোট জলাশয়ের পরিমাণ-৪৩০ হেক্টর। এখানকার প্রধান নদী বংশী বা বংশাই, লৌহজং ও ঝিনাই। খালের মধ্যে রয়েছে কুচিয়ামারার খাল, নয়ার খাল, মইষাখালীর খাল, ময়থার খাল, বেংড়া খাল, খসরুখালির খাল প্রভৃতি। তবে এসব খাল প্রায় ক্ষেত্রেই নদীর শাখা রূপে সৃষ্টি হয়ে আবার নদীতেই মিশেছে। বিলের মধ্যে বালিয়া বিল, কাউলজানী বিল, ডুবাইল বিল আকারে কিছুটা বড়। এছাড়া আরো ছোট ও মাঝারি আকারের বিল রয়েছে। যেমন- চাপড়া বিল, দেও বিল,পদ্ম বিল, চাটাই বিল, বারকাটি বিল, বার্থা বিল ইত্যাদি।

বংশী নদীঃ

ইহা বাসাইল উপজেলার পূর্ব সীমান্ত নির্ধারণী নদী। "পুরাতন ব্রহ্মপুত্র হতে উৎপন্ন হয়ে জামালপুরের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয়ে টাংগাইল জেলার মধুপুরে গিয়ে পৌঁছে বানার নদীর একটি ও ঝিনাই নদীর একটি শাখার সাথে মিলিত হয়ে দক্ষিণে টাংগাইলের মির্জাপুর হয়ে, ঢাকার কালিয়াকৈরে দুইভাগ হয়ে মূল ধারা তুরাগ নামে দক্ষিণ-পূর্বদিকে গিয়ে ঢাকার মিরপুর হয়ে বুড়ীগঙ্গায় পড়েছে। দ্বিতীয় ক্ষুদ্র ধারাটি কালিয়াকৈর হতে দক্ষিণমুখী সাভার হয়ে ধলেশ্বরীতে পড়েছে (টাংগাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃঃ ৯৫)"। "এ জেলার মাঝারিধরনের নদীসমূহের মধ্যে বংশাই সবচাইতে দীর্ঘ। উৎপত্তিস্থল হতে সঙ্গমস্থল পর্যন্ত এটি দৈর্ঘ্যে ১০০ মাইল (কোম্পানী আমলে ঢাকা, জেমস টেলর, পৃঃ ৭)"।

ঝিনাই নদীঃ

উপজেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত। ঝিনাই জামালপুরের বাউশী থেকে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে একটি শাখা ডানদিকে বেঁকে যমুনার পূর্ব পাশ দিয়ে ভূয়াপুর থানার ৭ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে যোকার চরের কাছে ধলেশ্বরীর উৎসমুখের কাছে মিলিত হয়েছে। অপর শাখা দক্ষিণ-পূর্বমূখী হয়ে বাসাইল ফুলকী হয়ে বংশী নদীতে পতিত হয়েছে। অন্য অংশ দক্ষিণমুখী হয়ে বাসাইলের ফুলকী-আইসড়া, দেউলী, দাপনাজোর নথখোলা হয়ে দক্ষিণমুখী হয়েছে (টাংগাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃঃ ৯৫)। ঝিনাই বাসাইল উপজেলার মধ্য-প্রবাহিনী নদী হওয়ায় এর সবটুকু সুযোগ-সুবিধা এলাকাবাসীগণ ভোগ করেন।

লৌহজং নদীঃ

লৌহজং যমুনার শাখা নদী। ভূয়াপুর থানা সদরের গাবসাড়া হতে উৎপন্ন হয়ে ভূয়াপুর থানা সদরের এক কিঃমিঃ উত্তরে পাঁচটিকরীতে ঝিনাইর সাথে মিশে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী হয়েছে।

এসময় নদীটি টাংগাইল-করটিয়া, বাসাইল সীমান্ত দিয়ে মির্জাপুর-জামুর্কী হয়ে বংশী নদীর সাথে মিলিত হয়। বাসাইল উপজেলায় এটি নাহালী ও মটরা গ্রাম দিয়ে বাসাইল অতিক্রম করে। নদীটি বর্তমানে প্রায় মৃত। যদিও একসময় নদীটি ছিল প্রবল খরস্রোতা। কেদারনাথ মজুমদার লৌহজং নদী সম্পর্কে নিম্নরূপ বিবরণ দিয়েছেনঃ "টাংগাইল মহকুমার অন্তর্গত বৈষ্ণববাড়ী হইতে যমুনার একটি শাখা বাহির হইয়াছে। ইহার নাম লৌহজঙ্গ। লৌহজঙ্গ নদী টাংগাইল, করটিয়া ও জামুর্কী প্রভৃতিস্থানের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঢাকা জেলার বংশাই নদীর সাথে মিলিত হইয়াছে।

Matrix

Facebook Page: Matrix BCS Series

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

১ম ধাপের মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলা পরিচিতি

Facebook Page: Matrix BCS Series

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর নং: ৭

সেক্টর কমান্ডার:

- মেজর নাজমুল হক (এপ্রিল- সেপ্টেম্বর)
- মেজর কাজী নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর)

উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা:

- মোহর আলী বীরউত্তম
- এ. আর. আজম চৌধুরী বীরবিক্রম

কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি:

- গিরিশ চন্দ্র সিংহ (দানশীল ও সমাজসেবী)
- গনিতজ্ঞ প্রফেসর আব্দুর রহিম
- ইলা মিত্র
- কুতুব উদ্দিন: গম্ভীরার জনক।
- রফিকুন্নবী (রনবী)
- ড. মনিরুজ্জামান মিঞা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি।
- মমতাজ উদ্দিন আহমেদ (প্রখ্যাত নাট্যকার)

Matrix B

সংসদীয় আসন: ৩টি

৪৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১	ডাঃ সামিল উদ্দিন আহম্মেদ শিমুল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৪৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২	মোঃ আমিনুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
৪৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩	মোঃ হারুনুর রশীদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

জেলার পুরাতন নাম: গৌড়;

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৫

ইউনিয়ন: ৪৫টি

যে নদীর তীরে অবস্থিত: মহানন্দা

আয়তন : ১৭০২.৫৬ বর্গকিলোমিটার

ভৌগলিক অবস্থা : ২৪°২২' থেকে ২৪°৫৭' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭°২০' থেকে ৮৮°২৩' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

পূর্বে: রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলা ও নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর এবং পোরশা উপজেলা।

পশ্চিমে: ভারতের মালদহ জেলা ও পদ্মা নদী

উত্তরে: ভারতের মালদহ জেলা

দক্ষিণে: পদ্মা নদী ও ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলা

জনসংখ্যা : ১৬,৪৭,৫২১ জন

মোট ভোটার সংখ্যা(পুরুষ ও মহিলা): মোট: ১০,৬৯,১৩৬ জন

পুরুষ: ৫,৩৩,১০১ জন

মহিলা: ৫,৩৬,০৩৫ জন

শিক্ষার হার: ৬৬%

উপজেলা: ০৫ টি (চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, নাচোল ও ভোলাহাট)

পৌরসভা: ০৪ টি (চাঁপাইনবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, রহনপুর ওনাচোল পৌরসভা)

মৌজা: ৭৮৭ টি

গ্রাম: ১,২৯৪ টি

নদী: ০৪ টি (পদ্মা, মহানন্দা, পুনর্ভবা ও পাগলা নদী)

নদী পথের দৈর্ঘ্য : ৪৩.৯১ কিলো মিটার (সারাবছর), ২১২.৩৮ কিলোমিটার (বর্ষাকাল)

বিল: ৪১ টি

মসজিদ: ৪,৬৮০ টি

এনজিও: ৯৮ টি

খাদ্য গুদাম : ০৬ টি

খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা : ১৬,০০০ মেট্রিক টন

ব্যাংক : ২৩ টি (মোট শাখা ৭২ টি)

Matrix BCS Series

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ : ০৬ টি (চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মহারাজপুর, শিবগঞ্জ, রহনপুর, নাচোল, ভোলাহাট)

সিনেমা হল : ০৩ টি

ডাকঘর; ৮৫ টি (বড় ১৩টি এবং ছোট ৭২ টি)

বিশ্ববিদ্যালয়: ০১ টি (এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)

মহাবিদ্যালয়: ৪৯ টি (সরকারি ৩ টি, বেসরকারি ৪৬ টি)

স্কুল এণ্ড কলেজ: ০৯ টি

মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ২২৫ টি (সরকারি ৪ টি, বেসরকারি ২২১ টি)

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ১৬ টি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়: ৩৭০ টি

জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়: ৩৩৫ টি

মাদ্রাসা: ১৩২ টি

স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা: ১৪ টি

মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ী মাদ্রাসা : ১৩২ টি

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট : ০৬ টি

পিটিআই : ০২ টি (নবাবগঞ্জ ও দাদনচক ফজলুল হক, শিবগঞ্জ)

মোট জমির পরিমাণ : ১,৭০,৩৬২৬.৩হেক্টর

আবাদী জমির পরিমাণ: ১,২৯,৭৫১.০০ হেক্টর

সেচযোগ্য জমির পরিমাণ: ১,১৪,৩৫৫.০০ হেক্টর- ৮৮%

গভীর নলকূপ: ১,৫৬৫ টি

অগভীর নলকূপ: ১৪,৪১২ টি

শক্তিচালিত পাম্প: ২,৬৯৭ টি

উপজেলা ভূমি অফিস: ০৫ টি (চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, নাচোল ও ভোলাহাট)

ইউনিয়ন ভূমি অফিস: ৪৫ টি

পৌর ভূমি অফিস: ০২ টি

বন্দোবস্তকৃত খাস জমি (কৃষি): ৯১৪৮.৬৫৯৫ একর

অবশিষ্ট খাস জমি: ১৯৭.৮৯১৫ একর

মোট আদর্শ গ্রাম: ১৪ টি

আশ্রয়ন প্রকল্প: ০৮ টি (০৪টি ফেইজ-২ ও ০৪টি আশ্রয়ন প্রকল্প)

সায়রাত মহল : ৬ টি

জলমহাল : ২০ একরের উর্ধে ২৯টি ত্রিখাত হতে সরকারের রাজস্ব আয় প্রায় ৩.৫ কোটি টাকা

হাট বাজার : ৯৪ টি

খাস পুকুর: ২৮৬৭ টি

পরিত্যক্ত সম্পত্তি : কৃষি ০৯.৯৮০০ একর, অকৃষি ১.৪৭৩১ একর

Matrix BCS Series

অর্পিত সম্পত্তি : ২,৭৮৫.৬০৭৮ একর

মৎস্য খামার: ৫৯৫ টি

মৎস্য পোনা উৎপাদন খামার: ৯২ টি

মৎস্য চাষের আওতাধীন পুকুর: ৯,১৬১ টি

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি: ০১ টি

ডাকবাংলো: ০৯ টি (জেলা পরিষদের মালিকানাধীন)

হেলিপ্যাড: ০৩ টি

মাইক্রো ওয়েভ স্টেশন: ০৫ টি (চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ, রহনপুর, নাচোল ওভোলাহাট)

রেলওয়ে স্টেশন : ০৬ টি (চাঁপাইনবাবগঞ্জ, আমনুরা, নেজামপুর, নাচোল, গোলাবাড়ি ও রহনপুর)

কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি: ১৫ টি

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক: ০১ টি

দৈনিক পত্রিকা: ০৪ টি (দৈনিক গৌড় বাংলা, চাঁপাই দৃষ্টি, চাঁপাই চিত্র ও চাঁপাই দর্পণ)

সাপ্তাহিক পত্রিকা: ০২ টি (সীমান্তের কাগজ ও সোনামসজিদ)

রেডিও স্টেশন: ০২ টি (কম্যুনিটি রেডিও ও মহানন্দা কম্যুনিটি রেডিও)

দর্শনীয় স্থান:

- **ছোট সোনা মসজিদ**
- **দারসবাড়ী মসজিদ**
- **চামচিকা মসজিদ**
- **তিন গম্বুজ মসজিদ**
- **কোতোয়ালী দরওয়াজা**
- **ষাঁড়বুরুজ**
- **বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের সমাধি**
- **খঞ্জনদীঘির মসজিদ**
- **তাহখানা কমপ্লেক্স**
- **শাহ্ নেয়ামতউল্লাহ (রহঃ) ও তাঁর মাজার**
- **বাবু ডাইং**
- **ঐতিহাসিক আলী শাহপুর মসজিদ**

Matrix BCS Series

মানচিত্রে জেলা

মোট ১,৭৪৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অবস্থান বাংলাদেশের মানচিত্রে সর্ব পশ্চিমে। এর পূর্বে রাজশাহী ও নওগাঁ জেলা, উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহ জেলা, পশ্চিমে পদ্মা নদী ও মালদহ জেলা দক্ষিণে পদ্মা নদী ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলা। এটি ভৌগোলিকভাবে ২৪°২২′ হতে ২৪°৫৭′ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৭°৫৫′ হতে ৮৮°২৩′ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।

ভৌগলিক পরিচিতি

অবস্থান

বাংলাদেশের মানচিত্রে চাঁপাইনবাবগঞ্জের অবস্থান সর্ব পশ্চিমে। পূর্বদিকে রাজশাহী ও নওগাঁ জেলা, উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহ জেলা, পশ্চিমে পদ্মা নদী ও মালদহ জেলা এবং দক্ষিণে পদ্মা নদী ও মুর্শিদাবাদ জেলা (পশ্চিমবঙ্গ)। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ২৪'২২ দহতে ২৪'৫৭ দউত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৭'৫৫ দহতে ৮৮'২৩ দপূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

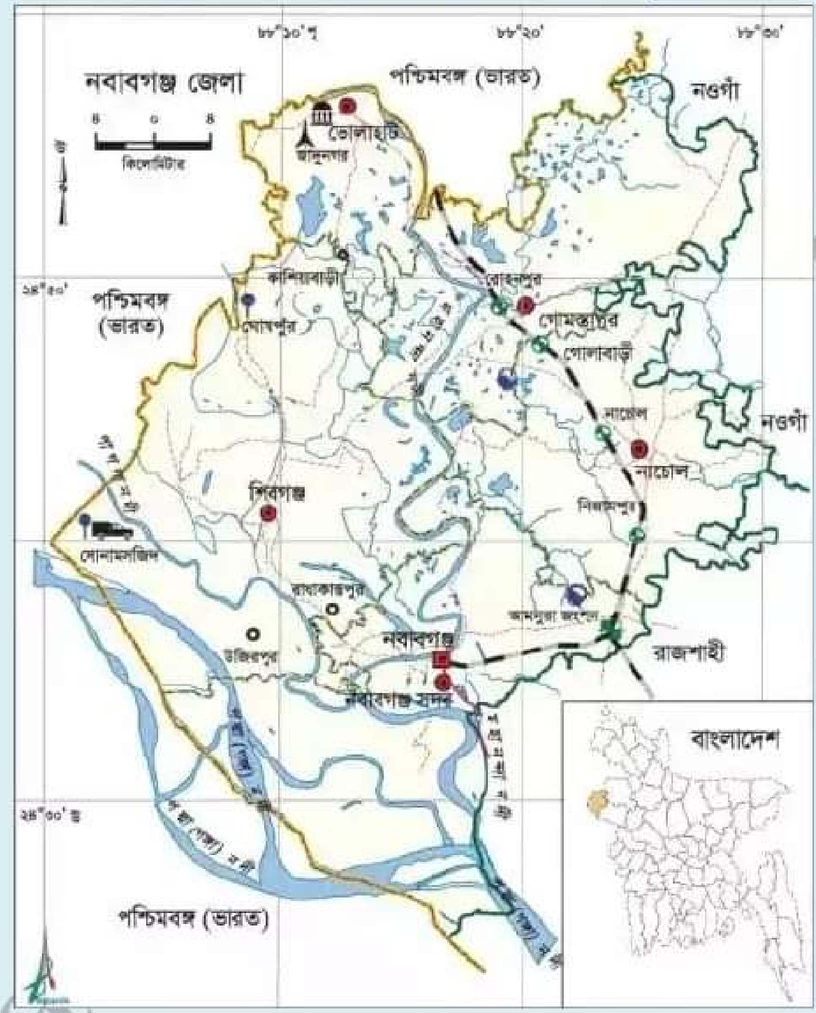

ভূ-প্রকৃতি

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা ১. বরেন্দ্র অঞ্চল ও ২. দিয়াড় অঞ্চল।

১.বরেন্দ্র অঞ্চলঃ মহানন্দা নদীর পূর্ব দিকের এলাকা বরেন্দ্র অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। বরেন্দ্র ভূ-ভাগ বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন এলাকা। বঙ্গীয় বদ্বীপ গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূমি গঠিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, গোমস্তাপুর উপজেলার কিছু অংশ এবং নাচোল উপজেলার সমগ্র অঞ্চল বরেন্দ্র এলাকার অন্তর্ভুক্ত। ধান বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রধান উৎপাদিত ফসল।

২.দিয়াড় অঞ্চলঃ মহানন্দা নদী থেকে পশ্চিম দিকের এলাকা দিয়াড় নামে পরিচিত। গঙ্গা নদীর ক্রমাগত গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এই অঞ্চল গড়ে উঠেছে। নদী গঠিত এই এলাকার

ভূমি খুব উর্বর। এককালে এই এলাকা রেশম ও নীল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে জেলার অধিকাংশ আমবাগান দিয়াড় অঞ্চলে অবস্থিত।

নদনদী ও জলাভূমি

১. পদ্মা-গঙ্গা নদী ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার পাশ দিয়ে পদ্মা নাম ধারণ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। উজানে ফারাক্কা বাঁধ নির্মিত হওয়ার পর থেকে পদ্মায় পানি প্রবাহ কমতে থাকে এবং বিশাল চর জেগে উঠতে থাকে। বর্তমানে পদ্মা তার পূর্বেকার রূপটি হারিয়ে ফেললেও প্রতিবছর বর্ষাকালে সে প্রলয়ঙ্কারী রূপ ধারণ করে।

২. মহানন্দাঃ জেলার ভোলাহাট উপজেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে মহানন্দা নদী রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহরটি মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত।

৩. পাগলাঃ ভারত থেকে আসা পাগলা নদী শিবগঞ্জ উপজেলার তর্ত্তীপুরে মরাগঙ্গার সাথে মিলিত হয়ে কিছুদূর এগিয়ে মহানন্দায় পড়েছে।

৪. পুনর্ভবাঃ দিনাজপুর থেকে নওগাঁ জেলা হয়ে পুনর্ভবা নদী চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

৫. বিল ও জলাভূমিঃ নদ-নদীর পাশাপাশি এ জেলায় রয়েছে বিলভাতিয়া, বিল চুড়ইল, বিল সিংড়া, বিল হোগলা, বিল পুটিমারি, বিল আনইল এবং বিল মরিচাদহ ও বিল কুমিরাদহ এর মত অসংখ্য বিল ও জলাভূমি।

জলবায়ু

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার জলবায়ু রুক্ষ ও চরমভাবাপন্ন। এখানকার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৮৬ সেন্টিমিটার।

জেলার পটভূমি

ক. নামকরণ:

চাঁপাইনবাবগঞ্জ নামটি সাম্প্রতিককালের। ইতোপূর্বে এই এলাকা 'নবাবগঞ্জ' নামে পরিচিত ছিল। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নামকরণ সম্পর্কে জানা যায়, প্রাক-ব্রিটিশ আমলে এ অঞ্চল ছিল মুর্শিদাবাদের নবাবদের বিহারভূমি এবং এর অবস্থান ছিল বর্তমান সদর উপজেলার দাউদপুর মৌজায়। নবাবরা তাঁদের পাত্র-মিত্র ও পারিষদসহ এখানে শিকার করতে আসতেন বলে এ স্থানের নাম হয় নবাবগঞ্জ। বলা হয়ে থাকে যে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯-৪০ খ্রি) একবার শিকারে এসে যে স্থানটিতে ছাউনি ফেলেছিলেন সে জায়গাটিই পরে নবাবগঞ্জ নামে পরিচিত হয়ে উঠে। তবে অধিকাংশ গবেষকের মতে, নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলে (১৭৪০-৫৬ খ্রি) নবাবগঞ্জ নামকরণ হয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ও মধ্যভাগে বর্গীর ভয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকজন ব্যাপকভাবে এ এলাকায় এসে বসতি স্থাপনের ফলে স্থানটি এক কর্মব্যস্ত জনপদে পরিণত হয়। কালক্রমে

Matrix BCS Series

নবাবগঞ্জের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নবাবগঞ্জের ডাকঘর চাঁপাই গ্রামে অবস্থিত হওয়ায় নবাবগঞ্জ তখন 'চাঁপাইনবাবগঞ্জ' নামে পরিচিত হয়।

ইতিহাসসূত্রে এই 'চাঁপাই' নামকরণের কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ ব্যাপারে দুরকম জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছেঃ-

১. বর্তমান নবাবগঞ্জ শহর থেকে ৫/৬ মাইল দুরে মহেশপুর নামে একটি গ্রাম রয়েছে। নবাব আমলে এই গ্রামে চম্পাবতী মতান্তরে 'চম্পারাণী' বা 'চম্পাবাঈ' নামে এক সুন্দরী বাঈজি বাস করতেন। তাঁর নৃত্যের খ্যাতি আশেপাশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি নবাবদের প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠেন। তাঁর নামানুসারে এই জায়গার নাম 'চাঁপাই' হয় বলে অনেকে মনে করেন।

২. 'চাঁপাই' নামকরণের আর একটি প্রচলিত মত হচ্ছে-এ অঞ্চল রাজা লখিন্দরের বাসভূমি ছিল। লখিন্দরের রাজধানীর নাম ছিল চম্পক। কিন্তু এই চম্পক নগরীর প্রকৃত অবস্থান কোথায় ছিল এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। যা হোকনবাবগঞ্জ জেলায় চসাই, চান্দপুর, বেহুলা গ্রাম ও বেহুলা নদীর সন্ধান পাওয়া যায়। বেহুলা নদী বর্তমানে মালদহ জেলায় প্রবাহিত হলেও দেশবিভাগ-পূর্বকালে চাঁপাই, মালদহ জেলার অধীনে ছিল। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০ খ্রি) মনে করেন, বেহুলা তার স্বামীকে ভেলায় নিয়ে মহানন্দার উজান বেয়ে ভেসে গিয়ে ছিলেন। ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (১৮৮৫-১৯৬৯ খ্রি) 'বাঙলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থের প্রথম খন্ডে বর্ণিত লাউসেনের শত্রুরা জামুতিনগর দিয়ে গৌড়ে প্রবেশ করে। বর্তমান ভোলাহাট উপজেলার জামবাড়িয়া পূর্বে জামুতিনগর নামে পরিচিত ছিল। এসবের ওপর ভিত্তি করে কোনো কোনো গবেষক চাঁপাইকে বেহুলার শ্বশুরবাড়ি চম্পকনগর বলে স্থির করেছেন এবং মত দিয়েছেন যে, চম্পক নাম থেকেই চাঁপাই নামের উৎপত্তি।

খ. প্রাচীনকালের চাঁপাইনবাবগঞ্জ (প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ১২০৪ খ্রি):
ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদের কিছু অংশ এবং দার্জিলিং ও কোচবিহারসহ গঠিত সমগ্র অঞ্চলকে বরেন্দ্র এলাকা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই এলাকাকে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন অঞ্চল বলে মনে করার আরেকটি কারণ হচ্ছে বরেন্দ্র অঞ্চলেই সবচেয়ে প্রাচীন পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে। আর বরেন্দ্রভূমির ইতিহাসের সঙ্গে চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলের ইতিহাস জড়িত। একসময় উত্তরবঙ্গের সিংহভাগ এলাকা পুন্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধারণা করা হয়, এই পুন্ড্রবর্ধনই পরবর্তীতে গৌড় নামে পরিচিত হয়ে উঠে। পর্যটক ইবনে বতুতার বিবরণী থেকে জানা যায় যে, এই শহর গঙ্গা ও করতোয়া নদীদ্বয়ের মধ্যে কোনো স্থানে অবস্থিত ছিল। অবশ্য গৌড় রাজ্য সম্পর্কে কিংবদন্তীর অন্ত নেই। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের জৈনদের গ্রন্থে প্রদত্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মালদহ জেলার লক্ষ্মণাবতী গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভবিষ্যপুরাণে বা ত্রিকান্ডশেষ গ্রন্থে গৌড়কে পুন্ড্র বা বরেন্দ্রর অন্তর্গত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চগৌড়ের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়

Matrix BCS Series

'ব্রজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে পরবর্তীতে বহু গ্রন্থে পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের মতে গৌড়, সারস্বত, কনৌজ, মিথিলা ও উৎকল নিয়েই এই পঞ্চগৌড়। কোনো এক সময় মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমানের কিয়দংশ ও মালদহ গৌড়ের অন্তর্গত ছিল । এ নিরিখে পন্ডিতগণ নবাবগঞ্জকে গৌড়ের অংশ হিসেবে মনে করেন।

গৌড়রাজ শশাঙ্কের সময় (আনুমানিক ৬০৬-৬৩৭ খ্রি) গৌড়ের অংশ হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্য সম্রাট হর্ষবর্ধন ও তাঁর মিত্র কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার অধীনে চলে যায়। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর বহিঃশত্রুর ক্রমাগত আক্রমণের ফলে গৌড়ের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে 'মাৎস্যন্যায়' নামের শতবর্ষব্যাপী এক অন্ধকার ও অরাজক যুগের সূচনা হয়। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গৌড় রাজ্যে মাৎস্যন্যায় যুগের অবসান ঘটে প্রথম পাল রাজা গোপালের (আনুঃ ৭৫০-৭৭০ খ্রি) ক্ষমতারোহণের মাধ্যমে। বাংলায় পাল শাসন প্রায় তিন শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়েছিল। এরপর কর্ণাটক থেকে আগত ও রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী সেন বংশ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করে।

গ. মুসলিম শাসনামলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ (১২০৪-১৭৫৭ খ্রি):

ভাগ্যান্বেষী তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া জয় করেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে। মুসলিম আমলে গৌড় নগরী 'লখনৌতি' (লক্ষ্ণাবতী) নামে পরিচিতি লাভ করে। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনামলে বাংলাভাষী সমগ্র ভূখন্ড 'বাঙ্গালা' নামের একক রাষ্ট্রের অধীনে আসে। তবে গৌড় তথা বাংলার ইতিহাসের স্বর্ণযুগ ধরা হয় হোসেন শাহী বংশের শাসনকালকে। আর স্বাভাবিকভাবেই গৌড়ের পাদভূমি হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জনপদ তখন অভাবনীয় বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জন করে। মধ্যযুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ নরপতি সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহর (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি) রাজত্বেই মূলত চাঁপাইনবাবগঞ্জ গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়। আর সেই গৌরবের সাক্ষী হিসেবে আজও টিকে আছে গৌড়ের বিখ্যাত ছোট সোনামসজিদ।

১৫৭৬ খ্রিঃ মুঘল সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের পর থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের বেশিরভাগ এলাকা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার কিছু কিছু এলাকায় তখন বার ভুঁইয়ারা মুঘলবিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। যা হোক, মুঘল সুবাদারদের মধ্যে শাহাজাদা মুহম্মদ সুজার (১৬৩১-৫৯ খ্রি) বেশ কিছু কীর্তি চাঁপাইনবাবগঞ্জে রয়েছে। তাঁর কাছারী বাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে শিবগঞ্জ উপজেলার ফিরোজপুরে। তাঁর সময় গৌড়ের পূর্বাঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য হযরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ (রঃ) এখানে আসেন। সুবাদার সুজা তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানান। পরে শাহ নেয়ামতুল্লাহ গৌড় নগরীর উপকণ্ঠে ফিরোজপুরে স্থায়ীভাবে আস্তানা স্থাপন করেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি) পর থেকে মুঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তখন থেকে বাংলা নবাবদের অধীনে একটি স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তার মর্যাদা ভোগ করতে থাকে। নবাব মুর্শিদকুলি খানের (১৭১৭-১৭২৭ খ্রি) সময় বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে স্থানান্তর করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয় যা ভৌগোলিক দূরত্বের দিক থেকে

Matrix BCS Series

চাঁপাইনবাবগঞ্জের অধিকতর নিকটবর্তী। পূর্বেই বলা হয়েছে, নবাবি আমলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকা নবাবদের মৃগয়াভূমি হিসেবে মুর্শিদাবাদের অভিজাত মহলে বেশ পরিচিত হয়ে ওঠে এবং 'নবাবগঞ্জ' নামটি মূলত ঐ সময়েই জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ঘ. ব্রিটিশ যুগ (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি):

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা-ভারতে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের বীজ রোপিত হয়। বাংলার রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতিতে নেতিবাচক রূপান্তর ঘটে এবং নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদের পশ্চাদভূমি হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ যে গুরুত্ব বহন করত, তাতে ভাটা পড়ে। তবে এ কথাও সত্যি যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বর্তমানে আমরা যে গ্রামীণ ও শহুরে জনপদ কাঠামো দেখতে পাই তার সিংহভাগই ব্রিটিশ যুগে তৈরি। অবশ্য নবাবগঞ্জ অঞ্চলের ইতিহাস খুব প্রাচীন হলেও নবাবগঞ্জ থানা শহর ও মহকুমা শহরের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে পুর্ণিয়া ও দিনাজপুর জেলা ভেঙ্গে মালদহ জেলা গঠিত হয়, কিন্তু ১৮৫৯ খ্রিঃ পর্যন্ত এটিকে কোন কালেক্টরের অধীনে দেয়া হয়নি। গৎ. জধাধহ ঝযড়ঁছিলেন মালদহ জেলার প্রথম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। এ সময় শিবগঞ্জ ও কালিয়াচক থানাদ্বয় অপরাধপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে কুখ্যাত ছিল। নবাবগঞ্জ তখন শিবগঞ্জ থানার অধীনে একটি পুলিশ ফাঁড়ি ছিল মাত্র। ১৮৭৩ খ্রিঃ মুন্সেফ চৌকি শিবগঞ্জ থেকে নবাবগঞ্জে স্থানান্তরিত হয় এবং তারও কিছুদিন পর ১৮৯৯ খ্রিঃ নবাবগঞ্জ থানায় উন্নীত হয়। থানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই নবাবগঞ্জ ও তার পার্শ্ববর্তী থানাগুলো নিয়ে একটি স্বতন্ত্র মহকুমা গঠনের পরিকল্পনা ও প্রয়াস চলতে থাকে। ১৮৭৬ খ্রিঃ পর্যন্ত নবাবগঞ্জ অঞ্চল রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ১৮৭৬-১৯০৫ খ্রিঃ সময়ে বিহারের ভাগলপুরের (বিভাগ) অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতোমধ্যে ১৯০৩ সালে ১২ জন ওয়ার্ড কমিশনারের সমন্বয়ে নবাবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। ১৯০৫ খ্রিঃ বঙ্গভঙ্গের সময় তদানীন্তন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশসহ এ অঞ্চলটি আবার অঞ্চল রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যদিও তা মালদহ জেলার অন্তর্গত থাকে। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে নবাবগঞ্জে সাবরেজিস্ট্রি অফিস স্থাপিত হলে এখানে কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। সরকারি কাজকর্মের সুবিধার জন্য 'চাঁপাই' গ্রামে অবস্থিত ডাকঘরটি ১৯২৫ সালে নবাবগঞ্জ শহরে স্থানান্তর করা হয় এবং তার নাম রাখা হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সে সময় থেকেই নবাবগঞ্জ শহর চাঁপাইনবাবগঞ্জ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠে।

ঙ. পাকিস্তান ও বাংলাদেশ যুগ (১৯৪৭-বর্তমান সময়):

১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের সময় র্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে নবাবগঞ্জ এবং তার পার্শ্ববর্তী শিবগঞ্জ, নাচোল, ভোলাহাট ও গোমস্তাপুর থানাকে মালদহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে ১৯৪৮ খ্রিঃ ১লা নভেম্বর রাজশাহী জেলার একটি থানা ও দিনাজপুরের অন্তর্ভুক্ত পোরশা থানাসহ একটি নতুন মহকুমার সৃষ্টি হয় এবং নবাবগঞ্জ শহরে মহকুমা সদর দপ্তর স্থাপিত হয় । এই নতুন মহকুমার নাম রাখা হয় 'নবাবগঞ্জ'। নবাবগঞ্জ মহকুমা ঘোষিত হওয়ার পর প্রথম মহকুমা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ আহমদ চৌধুরী, ইপিসিএস (১৯৪৮-১৯৪৯ খ্রিঃ)।

Matrix BCS Series

১৯৮২ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রশাসনকে জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ঘোষণা দিয়ে থানাগুলোকে উপজেলা এবং মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করেন। এই পদক্ষেপের কারণে নবাবগঞ্জের ৫টি থানা শিবগঞ্জ, নাচোল, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর ও নবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় উন্নীত হয়। ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ নবাবগঞ্জ মহকুমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক মন্ত্রী মেজর জেনারেল এম. শামসুল হক চাঁপাইনবানগঞ্জ জেলা উদ্বোধন করেন। নবাবগঞ্জ জেলার প্রথম জেলা প্রশাসক নিযুক্ত হন এ. কে. শামছুল হক। তিনি ০১.০৩.১৯৮৪ খ্রিঃ থেকে ০৮.০৮.১৯৮৫ খ্রিঃ পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। জেলাবাসীর দাবির মুখে ২০০১ সালের ১লা আগস্ট সরকারিভাবে নবাবগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাখা হয়।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশেষ ঘটনাঃ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসীর অংশগ্রহণ ছিল সর্বাত্মক ও স্বতঃস্ফূর্ত। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরকে পাকবাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়। ১০ ডিসেম্বর তারিখে মুক্তিযোদ্ধারা মহানন্দা নদীর অপর পাড় থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর দখলের জন্য অগ্রসর হন। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর তৎকালীন সেক্টর কমান্ডার কাজী নুরুজ্জামানের নির্দেশে প্রায় পঞ্চাশজন যোদ্ধার এই দলের নেতৃত্ব দেন। মহানন্দা তীরের বারঘরিয়া গ্রামে এসে উপস্থিত হলেও ১৩ ই ডিসেম্বরের পূর্বে তিনি নদী পার হয়ে শহরে প্রবেশ করতে পারেননি। ঐদিন রাতে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর তাঁর বাহিনীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে শহর আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি নিজে একটি অংশের নেতৃত্বে থাকেন এবং সহযোদ্ধাদেরকে নিয়ে গভীর রাতে মহানন্দা পেরিয়ে শহরের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হন। রেহাইচর নামক স্থানে শত্রুসেনাদের সঙ্গে তাঁর লড়াই হয়। বীরদর্পে যুদ্ধ করে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর যখন পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদেরকে রণাঙ্গন থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করছিলেন, তখনই শত্রুর নির্মম বুলেট এসে তাঁর কপালে বিদ্ধ হয়। শহীদ হন ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। তাঁর বীরত্বপূর্ণ লড়াই ও সাহসী রণপরিকল্পনার কারণে ১৪ ই ডিসেম্বর তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরকে মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হন। শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিনজাহাঙ্গীরকে ঐতিহাসিক ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করা হয়। বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের বীরত্বগাঁথা অমর হয়ে আছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ তথা বাংলাদেশের মুক্তিপাগল জনগণের হৃদয়ে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় উন্নীত

১৯৮২ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রশাসনকে জনগনের দ্বারগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ঘোষণা দিয়ে থানাগুলোকে উপজেলা এবং মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করেন। এই পদক্ষেপের কারণে নবাবগঞ্জের ৫ টি থানা শিবগঞ্জ, নাচোল, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর ও নবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় উন্নীত হয়। ১৯৮৪ সালের ১ লা মার্চ নবাবগঞ্জ মহকুমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন স্বাস্থ্য ও

Matrix BCS Series

জনসংখ্যা বিষয়ক মন্ত্রী মেজর জেনারেল এম. শামসুল হক চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা উদ্বোধন করেন। নবাবগঞ্জ জেলার প্রথম জেলা প্রশাসক নিযুক্ত হন এ. কে শামছুল হক। তিনি ০১.০৩১৯৮৪ খ্রিঃ থেকে ০৮.০৮.১৯৮৫ খ্রিঃ পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। জেলাবাসীর দাবির মুখে ২০০১ সালের ১ লা আগস্ট সরকারীভাবে নবাবগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাখা হয়।

দর্শনীয় স্থানসমূহঃ

তিন গম্বুজ মসজিদ – চাঁপাইনবাবগঞ্জ

শিবগঞ্জ উপজেলা ফিরোজপুরস্থিত শাহ্ নেয়ামত উল্লাহ (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত তদীয় সমাধি সংশ্লিষ্ট তিন গম্বুজ মসজিদটি (Tin Gumbug Mosjid) মোঘল যুগের একটি বিশিষ্ট কীর্তি। এ মসজিটি শাহ নেয়ামত উল্লাহ ওয়ালী মসজি` (Shah Niamatullah Wali Mosque) নামেও বেশ প্রসিদ্ধ।

কথিত আছে বঙ্গ সুলতান শাহ সুজা তাঁর মোরশেদ হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহর উদ্দেশ্যে (রাজত্বকাল ১৬৩৯-৫৮ খ্রিঃ) শীতকালীন বাসের জন্য ফিরোজপুর তাপ নিয়ন্ত্রীত ইমারত হিসেবে এ ভবনটি নির্মাণ করেছিলেন। সময়ে সময়ে শাহ সুজাও এখানে এসে বাস করতেন।

উঁচু ভিটের উপর দন্ডায়মান এ সমাধিটি বর্গাকৃতির এক গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারত। এর প্রত্যেক দিকে ৪৯ ফুট দৈর্ঘ্য প্রস্থ। মধ্য প্রকোষ্ঠটি সারে ২১ ফুট বর্গ। মুল কক্ষের চারদিকে গিরে রয়েছে টানা ভর্টেড বারান্দা। মুল মাজার কক্ষের চর্তুদিকে একটি দরজা বিদ্যমান ।

বর্তমানে দক্ষিনের দরজা ছাড়া বাঁকি ৩ টি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত দরজা গুলি খিলানযুক্ত মূল কক্ষের ওয়াল ভোল্ট গম্মুজ এর ভার বহন করে। মূলত এটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট

সমাধি ভবন। তাহাখানা থেকে ৩০-৩৫ মি. উত্তরে রয়েছে শাহ নিয়ামত উল্লাহ ওয়ালীর সমাধি।

বর্গাকার নকশা পরিকল্পনায় নির্মিত এবং অভ্যন্তরীণ সমাধি কক্ষের চতুর্দিকে প্রশস্ত বারান্দা আছে। পূর্ব-পশ্চিম এবং দক্ষিণে ৩টি করে খিলানযুক্ত মোট ১২টি খিলানপথ রয়েছে । ক্যানিংহাম-এর নামকরণ করেছিলেন বারদুয়ারী। প্রত্যেক দেয়ালে তিনটি করে প্রবেশ পথ সন্নিবেশিত হওয়াতে এ মাজার শরীফকে বারদুয়ারী বলা হয় ।

এতে ৩টি প্রবেশ পথ এবং ভেতরে ৩টি মেহরাব রয়েছে। মসজিদের ভেতর ও বাইরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কারুকার্য নেই। দেয়ালে কয়েকটি তাক আছে। স্থানীয় জনসাধারণ এই মসজিদে নিয়মিতভাবে নামাজ আদায় করে থাকেন। এই মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে সুলতান শাহ সুজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বিতল ইমারত মোঘল যুগের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ইট নির্মিত ইমারতটি তাহখানা নামে প্রসিদ্ধ।

শাহ নিয়ামত উল্লাহর মাজার – চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বার আউলিয়ার দেশ বাংলাদেশ। এই দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছে অনেক সুফী সাধক। তার মধ্যে অন্যতম পীর শাহ নিয়ামত উল্লাহ ওয়ালী (Shah Niamat Ullahr Mazar)।

দিল্লির করনৌল প্রদেশের অধিবাসী শাহ নিয়ামত উল্লাহ ছিলেন একজন সাধক পুরুষ। কথিত আছে তিনি ছিলেন প্রচন্ড ভ্রমণ পাগল মানুষ। ভ্রমণ করতে করতে একসময় তিনি এসে উপস্থিত হন গৌড় এলাকায়। দেখা হয় তার সাথে বাংলার সুবেদার শাহ সুজার সাথে। শাহ সুজা তার গুণে মুগ্ধ হয়ে তার স্থায়ী বসবাসের জন্য গড়ে দেন তাহাখানা।

তাহাখানার উত্তর পাশেই আছে একটি তিন গম্বুজ মসজিদ। আর মসজিদের উত্তর দিকে রয়েছে এই সাধক পুরুষের সমাধি। সাধক পুরুষ হলেও উনি একধারে একজন কবিও ছিলেন। কাব্যের ছলে রেখে গেছেন অনেক ভবিষৎবাণী।

সময় পেলে ঘুরে আসতে পারেন এই সাধক পুরুষের সমাধিস্থল আর আশে পাশের স্থাপনা। ছোট সোনা মসজিদ, দারস বাড়ী মাদ্রাসা ছাড়াও আছে বেশ কয়েকটা প্রাচীন মসজিদ।

রহনপুর নওদা বুরুজ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুরে অবস্থিত বর্তমানে সর্ব প্রাচীন প্রত্নসম্পদ ও লুকায়িত ইতিহাস সমৃদ্ধ স্থান। দেখতে অনেকটা বড়সড় এক ঢিবির মতো। স্থানীয়ভাবে এটি ষাঁড়বুরুজ নামেও পরিচিত।

রাজা লক্ষন সেনের আমলে রহনপুর বাণিজ্য নগরী হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাণিজ্যিক কারণে রহনপুরেই তিনি গড়ে তোলেন সুরম্য অট্টালিকা, যার মধ্যে মসজিদই প্রধান। ষাঁড়বুরুজ নামে খ্যাত এই বিলীন অট্টালিকাটির প্রকৃত নাম শাহ্বুরুজ। শাহ্ শব্দের অর্থ বাদশা আর বুরুজ শব্দের অর্থ অট্টালিকা বা বালাখানা যা পরবর্তীতে লোকমুখে ষাঁড়বুরুজ নামে খ্যাতি লাভ করে।

বাংলা বিজয়ী ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী এ পথে বাংলায় আগমন করেন এবং এ স্থানে কিছু সময় অবস্থান করেন। ইতিহাসে পরিচিত নদীয়া অঞ্চলটি এ স্থাপনাগুলির অঞ্চলের পাশেই অবস্থিত। যা পরবর্তীতে নওদা নামে পরিচিতি লাভ করে। বখতিয়ার খলজীর আগমনের সংবাদে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রাজা লক্ষন সেন এ স্থান থেকে নদী পথে পলায়ন করেন। সেই থেকে এটি নওদা বুরুজ নামেও পরিচিত।

নওদা বুরুজের (Rahanpur Nauda Buruj) চতুষ্পার্শ্বেই শুধু নয়, গোটা রহনপুর এলাকাতেই প্রাচীনত্ব ও নগর সুলভ চিহ্ন বিরাজমান। কোন কোন ইতিহাস অনুসন্ধানী রহনপুরে প্রাক মুসলিম যুগের উন্নত নগরীর অবস্থানের উল্লেখ করেছেন।

বাবুডাইং – চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহর থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরে সদর উপজেলার ঝিলিম ইউনিয়নের বাবুডাইংয়ে ২০০ একর খাস জমিতে গড়ে উঠেছে প্রকৃতির নৈসর্গিক এক মনোরম পরিবেশ। উচুঁ কয়েকটি টিলার জন্যই এক সময়ের বাবুডাঙ্গা এখন বাবুডাইং নামে পরিচিত।

ছোট বড় ২৬ টি টিলার সমন্বয়ে গঠিত বাবুডাইংয়ে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রোপন করে বরেন্দ্র বহুমুখি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) এলাকাটির সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।২৫ বছর আগে এ এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় দেড় লাখ গাছ রোপন করে বিএমডিএ। বর্তমানে মাত্র ২০ থেকে ২৫ হাজার গাছ রয়েছে। গাছ লাগানোর পাশাপাশি এখানে ৫টি পুকুরও খনন করা হয়।

প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠা আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ লেকে একটি ক্রসড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে, যা লেকের পানিকে জমিতে সেচ দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ক্রসড্যামের পানি প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়ায় তা কৃত্রিম ঝর্নার মত দেখায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ ছাড়াও এর আশেপাশের জেলা থেকে দর্শনার্থীরা পরিবার পরিজন নিয়ে বাবুডাইংয়ের সৌন্দর্য দেখতে আসেন। শীত মৌসূমে লোকজনের আনাগোনা বছরের অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়।

Matrix BCS Series

তোহাখানা – চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে প্রায় ৩৫ কি.মি. দূরুত্বে অবস্থিত শিবগঞ্জ উপজেলার শাহাবাজপুর ইউনিয়নে ঐতিহ্যবাহী তোহাখানা কমপ্লেক্স বা তোহাখানা অবস্থিত। তোহাখানা (Tohakhana) একটি তিনতলা বিশিষ্ট রাজ প্রাসাদ। তোহাখানা ফার্সি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ ঠান্ডা ভবন বা প্রাসাদ। গৌড়-লখনৌতির ফিরোজপুর এলাকায় একটি বড় পুকুরের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত ভবন কাঠামোটি ঐতিহ্যগতভাবে তোহাখানা নামে পরিচিত।

সুলতান শাহ সুজা তাঁর মুর্শিদ সৈয়দ নেয়ামতউল্লাহ এর উদ্দেশ্যে শীতকালীন বাসের জন্য ফিরোজপুরে তাপনিয়ন্ত্রণ ইমারত হিসেবে এ ভবনটি নির্মাণ করেছিলেন। সময়ে সময়ে শাহ সুজাও এখানে এসে বাস করতেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ হতে জানা যায়, মুঘল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ্ সূজা বাংলার সুবাদার থাকাকলে ১৬৩৯-১৬৫৮ খ্রিঃ মতান্তে ১৬৩৯-১৬৬০ খ্রিঃ তাঁর মুরশিদ হযরত শাহ সৈয়দ নেয়ামতউল্লাহর প্রতি ভক্তি নিদর্শনের উদ্দেশ্যে তাপনিয়ন্ত্রিত ইমারত হিসেবে তোহাখানা নির্মান করেন।

জনশ্রুতি আছে যে-শাহ সুজা যখন ফিরোজপুরে মোরশেদ শাহ নেয়ামতউল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসতেন তখন উক্ত ইমারতের মধ্যবর্তী সুপ্রশস্ত কামরাটিতে বাস করতেন। তোহাখানা কমপ্লেক্সের ভেতরে আরো নাম না জানা অনেক সমাধি দেখা যায়। যাদের পরিয় এখনো জানা যায় নি। তবে এদেরকে হযরত শাহ সৈয়দ নেয়ামতউল্লাহর খাদেম বা সহচর বলে ধারনা করা হয়।

গৌড়ের প্রাচীন কীর্তির মধ্যে এই শ্রেণীর ইমরাত এই একটিই পরিলক্ষিত হয়। কড়িকাঠের উপর খোয়া ঢালাই করে যার ছাদ ও কোঠা জমাট করা হয়েছিল। উল্লেখিত মসজিদ ও তাহখানার নিকটস্থ সরোবর দাফেউল বালাহর তীরে অবস্থিত। এই দুই ইমারত হতে দুইটি সিড়ি সরোবরের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভবনটির উত্তর-পশ্চিমে আরও দুটি কাঠামো রয়েছে নিকটস্থটি একটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ এবং একটু উত্তরে অবস্থিত অপরটি ভল্টেড বারান্দা ঘেরা একটি গম্বুজ সমাধি।

যেহেতু ভবনগুলো একই সময় একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল, সেহেতু সব ভবনকে একত্রে একটি একক ইউনিট বা একটি কমপ্লেক্স হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ভবনটি মূলত ইট নির্মিত। তবে দরজার চৌকাঠের জন্য কালো পাথর এবং সমতল ছাদের জন্য কাঠের বিম ব্যবহৃত হয়েছে। পশ্চিম দিক থেকে ভবনটিকে দেখলে একতলা মনে হয়, পূর্বদিক থেকে অবশ্য দ্বিতল অবয়বই প্রকাশ পায়, যার নিচতলার কক্ষগুলো পূর্বদিকে বর্ধিত এবং খিলানপথগুলো উত্থিত হয়েছে সরাসরি জলাশয়টি থেকে। ভবনের দক্ষিণ পাশে রয়েছে একটি গোসলখানা যেখানে পানি সরবরাহ হতো একটি অষ্টভুজাকৃতির চৌবাচ্চার মাধ্যমে জলাশয় থেকে। উত্তর পাশে একটি ছোট পারিবারিক মসজিদ অবস্থিত, এর পেছনে রয়েছে একটি উন্মুক্ত কক্ষ যেটি একটি অষ্টভুজাকার টাওয়ার কক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এ টাওয়ার কক্ষটি সম্ভবত ধ্যানের জন্য ব্যবহৃত হতো। অষ্টভুজাকার টাওয়ারটি সব কমপ্লেক্সটিতে ভারসাম্য প্রদান করেছে। প্রাসাদটি প্লাস্টার করা এবং খোদাইকৃত। এসব অলঙ্করণ রীতি মোঘল আমলের।

ছোট সোনা মসজিদ – চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ছোট সোনা মসজিদটিকে (Choto Sona Mosque/Mosjid) বলা হতো 'গৌড়ের রত্ন'। এই মসজিদটির বাইরের দিকে সোনালী রঙ এর আস্তরণ ছিলো, সূর্যের আলো পড়লে নাকি এ রঙ সোনার মত ঝলমল করত। অন্যদিকে প্রাচীন গৌড়ে আরেকটি মসজিদ ছিলো যা সোনা মসজিদ নামে পরিচিত। এটি তৈরি করেছিলেন সুলতান নুসরত শাহ। সেটি ছিলো আরও বড়। তাই স্থানীয় লোকজন এটিকে ছোটো সোনা মসজিদ এবং গৌড় নগরীর মসজিদটিকে বলতো বড় সোনা মসজিদ বলে অবহিত করতো।

ছোট সোনা মসজিদ বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ। এ মসজিদটিকে বলা হয় সুলতানি স্থাপত্যের রত্ন। সুলতান আলাউদ্দিন শাহ-এর রাজত্ব কালে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ) মনসুর ওয়ালি মোহাম্মদ বিন আলি নামে এক ব্যক্তি এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। সে হিসেবে মসজিদটির বর্তমান বয়স ৫০০ বছরের বেশি।

প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড় নগরীর উপকণ্ঠে পিরোজপুর গ্রামে সুলতানি আমলের রত্ন সাদৃশ্য এ স্থাপনাটি নির্মিত হয়। যা বর্তমানে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানা প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের অধীনে সংরক্ষিত।

মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে ৮২ ফুট লম্বা ও পূর্ব-পশ্চিমে ৫২.৫ ফুট চওড়া। উচ্চতা ২০ ফুট। এর দেয়ালগুলো প্রায় ৬ ফুট পুরু। দেয়ালগুলো ইটের কিন্তু মসজিদের ভেতরে ও বাইরে এগুলো পাথর দিয়ে ঢাকা। ভেতরের দেয়ালে পাথরের কাজ শেষ হওয়ার পর খিলানের কাজ শুরু হয়েছে। মসজিদের খিলান ও গম্বুজগুলো ইটের তৈরী।

মসজিদের চারকোণে চারটি বুরুজ আছে। এগুলোর ভূমি নকশা অষ্টকোণাকার। বুরুজগুলোতে ধাপে ধাপে বলয়ের কাজ আছে। বুরুজগুলোর উচ্চতা ছাদের কার্নিশ পর্যন্ত।

মসজিদের পূর্ব পার্শ্বের দেয়ালে পাঁচটি খিলানযুক্ত দরজা আছে। খিলান গুলো বহুভাগে বিভক্ত এবং অলংকরণে সমৃদ্ধ। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে রয়েছে তিনটি করে দরজা। উত্তর দেয়ালের সর্ব-পশ্চিমের দরজাটির জায়গায় রয়েছে সিঁড়ি। এই সিঁড়িটি উঠে গেছে মসজিদের অভ্যন্তরে

উত্তর-পশ্চিম দিকে দোতলায় অবস্থিত একটি বিশেষ কামরায়। কামরাটি পাথরের স্তম্ভের উপর অবস্থিত।

মসজিদের গঠন অনুসারে এটিকে জেনানা-মহল বলেই ধারণা করা হয়। তবে অনেকের মতে এটি জেনানা-মহল ছিল না, এটি ছিলো সুলতান বা শাসনকর্তার নিরাপদে নামাজ আদায়ের জন্য আলাদা একটি কক্ষ।মসজিদের অভ্যন্তরের ৮টি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর তৈরি হয়েছে মসজিদের ১৫টি গম্বুজ। মাঝের মিহরাব ও পূর্ব দেয়ালের মাঝের দরজার মধ্যবর্তী অংশে ছাদের ওপর যে গম্বুজগুলো রয়েছে সেগুলো চৌচালা গম্বুজ।

মসজিদের প্রধান প্রবেশদ্বার বরাবর পূর্বদিকের বাহিরের দেয়ালে স্থাপিত এবং বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে পুননির্মিত ফটকের দৈর্ঘ্য ৭.৬ মিটার ও প্রস্থ ২.৪ মিটার।এদের দুপাশে দুসারিতে তিনটি করে মোট ১২টি গম্বুজ রয়েছে। এরা অর্ধ-বৃত্তাকার গম্বুজ। এ মসজিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, বাইরের যে কোনো পাশ থেকে তাকালে কেবল পাঁচটি গম্বুজ দেখা যায়, পেছনের গম্বুজগুলো দৃষ্টিগোচর হয় না।

পুরো মসজিদের অলংকরণে মূলত পাথর, ইট ও টেরাকোটা ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলোর মাঝে আবার পাথরের ওপর খোদাই করা নকশাই বেশি। মসজিদের সম্মুখভাগ, বুরুজসমূহ, দরজা প্রভৃতি অংশে পাথরের উপর অত্যন্ত মিহি কাজ রয়েছে, যেখানে লতাপাতা, গোলাপ ফুল, ঝুলন্ত শিকল, ঘণ্টা ইত্যাদি খোদাই করা আছে।দরজাগুলো অলংকরণযুক্ত চতুষ্কোণ ফ্রেমে আবদ্ধ। খিলানগুলো পাথর খোদাই এর অলংকরণযুক্ত। দুটি খিলানের মধ্যভাগেও পাথরের অলংকরণ রয়েছে।

নদনদী

নদ-নদী

পানিশূন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জের নদ-নদী. মরণ বাঁধ ফারাক্কার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মরুকরণের দিকে এগোচ্ছে সীমান্তবর্তী জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ। বাঁধের কারণে একদিকে প্রমত্তা পদ্মা যেমন নাব্য হারিয়েছে; তেমনি দেড় যুগ ধরে চাঁপাইনবাবগঞ্জে পদ্মা-তীরবর্তী অঞ্চলে ব্যাপক নদীভাঙন। চাঁপাইনবাবগঞ্জে রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নদী। এখানে প্রধান নদী পদ্মা ,মহানন্দা ,পুনর্ভবা ও পাগলা।

পদ্মা: গঙ্গা নদী ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার পাশ দিয়ে পদ্মা নাম ধারণ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। উজানে ফারাক্কা বাঁধ নির্মিত হওয়ার পর থেকে পদ্মায় পানি প্রবাহ কমতে থাকে এবং বিশাল চর জেগে উঠতে থাকে। বর্তমানে পদ্মা তার পূর্বেকার রূপটি হারিয়ে ফেললেও প্রতিবছর বর্ষাকালে সে প্রলয়ঙ্কারী রূপ

ধারণ করে।পদ্মা বাংলাদেশের একটি প্রধান নদী। এটি হিমালয়ে উৎপন্ন গঙ্গানদীর প্রধান শাখা এবং বাংলাদেশের ২য় দীর্ঘতম নদী। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর রাজশাহী এই পদ্মার উত্তর তীরে অবস্থিত। পদ্মার সর্বোচ্চ গভীরতা ১,৫৭১ ফুট(৪৭৯ মিটার) এবং গড় গভীরতা ৯৬৮ফুট(২৯৫ মিটার)। রাজা রাজবল্লভের কীর্তি পদ্মার ভাঙ্গনের মুখে পড়ে ধ্বংস হয় বলে পদ্মার আরেক নাম কীর্তিনাশা।
পদ্মার প্রধান উপনদী মহানন্দা ও পুনর্ভবা। মহানন্দা উপনদীটি চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় এবং পুনর্ভবা বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পদ্মার বিভিন্ন শাখানদীর মধ্যে গড়াই, আড়িয়াল খাঁ, কুমার, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব ইত্যাদি অন্যতম। আবার পদ্মার বিভিন্ন প্রশাখা নদীসমূহ হলো- মধুমতী, পশুর, কপোতাক্ষ ইত্যাদি। এই নদীগুলো কুষ্টিয়া, যশোর, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুরা, বাগেরহাট,গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, বরিশাল, পটুয়াখালি ইত্যাদি জেলার উপর দিয়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

মহানন্দাঃ জেলার ভোলাহাট উপজেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে মহানন্দা নদী রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহরটি মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। মহানন্দা নদী ভারত ও বাংলাদেশের একটি নদী। এর উৎপত্তিস্থল হিমালয় পর্বতের ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দার্জিলিং জেলার অংশে। এখান থেকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এর পর আবার পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় প্রবেশ করে, ও পরে আবার বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা শহরের কাছে প্রবেশ করে পদ্মা নদীর সাথে মিলিত হয়। বৃষ্টির পানি এই নদীর প্রবাহের প্রধান উৎস। ফলে গরম কাল ও শীতকালে নদীর পানি কমে যায়, আর বর্ষা মৌসুমে নদীর দুই কুল ছাপিয়ে বন্যা হয়ে থাকে।
বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মহানন্দা নদীর অংশটির দৈর্ঘ্য ৩৬ কিমি।
উপনদী: পুনর্ভরা, নাগর, ট্যাংগন,কলিখ।

পুনর্ভবাঃ দিনাজপুর থেকে নওগাঁ জেলা হয়ে পুনর্ভবা নদী চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

পাগলাঃ ভারত থেকে আসা পাগলা নদী শিবগঞ্জ উপজেলার তত্তীপুরে মরাগঙ্গার সাথে মিলিত হয়ে কিছুদূর এগিয়ে মহানন্দায় পড়েছে।

জেলার ঐতিহ্য

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ঐতিহ্যসমূহ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঐতিহাসিক নিদর্শন ও প্রতণসম্পদে সমৃদ্ধ একটি জেলা। প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড়ের রাজধানী হিসেবে শিবগঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক স্থাপনা ও দর্শনীয় নিদর্শন হিন্দু শাসন আমলে বিশেষ করে সেন বংশের শেষ রাজাদের খননকৃত দিঘী ও সুলতানী আমলে মুসলিম সুলতানদের নির্মিত মসজিদই এ উপজেলার প্রধান ঐতিহাসিক স্থাপনা। তাছাড়া বৃটিশ আমলে স্থানীয় জমিদারদেরও কিছু স্থাপনা শিবগঞ্জে দেখা যায়। এই

Matrix BCS Series

জেলার ঐতিহাসিক সহাপনাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল ছোট সোনা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ মধ্যে নির্মিত), শিবগঞ্জ; দারসবাড়ি মসজিদ ও মাদ্রাসা (১৪৭৯ খ্রিঃ), শিবগঞ্জ; ধনাইচকের মসজিদ (১৫ শতকে নির্মিত), শিবগঞ্জ; খঞ্জনদীঘির মসজিদ (১৫ শতকে নির্মিত), শিবগঞ্জ; দাখিল দরওয়াজা (১২২৯ খ্রিঃ), শিবগঞ্জ; শাহ সুজার কাছাড়ি বাড়ি (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রিঃ মধ্যে নির্মিত), শিবগঞ্জ; তোহাখানা মসজিদ (১৬৩৬-১৬৫৮ খ্রিঃ মধ্যে নির্মিত), শিবগঞ্জ; শাহ নেয়ামতুল্লাহ (রহঃ) এর মাজার (১৬৬৯ খ্রিঃ নির্মিত), শিবগঞ্জ; বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর এর মাজার (সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে ১৯৭১ খ্রিঃ নির্মিত), শিবগঞ্জ; কানসাট রাজবাড়ি, শিবগঞ্জ; চাঁপাই জামে মসজিদ (৮৯৩ হিজরিতে নির্মিত), সদর উপজেলা; মহারাজপুরের প্রাচীন মসজিদ (মুঘল আমলে নির্মিত), সদর উপজেলা; মাঝপাড়া প্রাচীন মসজিদ (১৭৭৫ খ্রিঃ নির্মিত), সদর উপজেলা; রামচন্দ্রপুরহাটের নীলকুঠি (১৮৫৯-৬১ খ্রিঃ, নীল বিদ্রোহের সাক্ষী) সদর উপজেলা; বারঘরিয়া কাছাড়ি বাড়ি (বর্তমানে বিলুপ্ত), সদর উপজেলা; বারঘরিয়া ও মহারাজপুর মঞ্চ, সদর উপজেলা; জোড়া মঠ (নির্মাণকাল অজ্ঞাত), সদর উপজেলা; নওদা বুরতজ, গোমসতাপুর; এক গম্বুজ বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, গোমসতাপুর; শাহপুর গড় (বাদশাহি আমলের রাজধানী সুরক্ষা বেষ্টনী), গোমসতাপুর; জাগলবাড়ি ঢিবি (৮ম শতাব্দী), ভোলাহাট; ছোট জামবাড়িয়া দারতস সালাম জামে মসজিদ, ভোলাহাট; বড়গাছী দক্ষিণ টোলা বাজার জামে মসজিদ, ভোলাহাট; রেশম কুটির ও চিমনি, ভোলাহাট; আলী শাহ্পুর মসজিদ, নাচোল; রাজবাড়ি, নাচোল; কেন্দুয়া ঘাসুড়া মসজিদ, নাচোল; কলিহার জমিদারবাড়ি, নাচোল; মল্লিকপুর জমিদারবাড়ি, নাচোল।

ছোট সোনা মসজিদঃ

ছোট সোনামসজিদ 'সুলতানি স্থাপত্যের রত্ন' বলে আখ্যাত। এটি বাংলার রাজধানী গৌড়-লখনৌতির ফিরোজপুর কোয়ার্টার্স এর তাহখানা কমপ্লেক্স থেকে অর্ধ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং কোতোয়ালী দরওয়াজা থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। বিশাল এক দিঘির দক্ষিণপাড়ের পশ্চিম অংশ জুড়ে এর অবস্থান। মসজিদের কিছু দূর পশ্চিমে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিপ্তর কর্তৃক কয়েক বছর পূর্বে নির্মিত একটি আধুনিক দ্বিতল গেষ্ট হাউস রয়েছে। গেষ্ট হাউস ও মসজিদের মধ্য দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে একটি আধুনিক রাস্তা চলে গেছে। মনে হয় রাস্তাটি পুরনো আমলের এবং একসময় এটি কোতোয়ালী দরওয়াজা হয়ে দক্ষিণের শহরতলীর সঙ্গে গৌড়-লখনৌতির মূল শহরের সংযোগ স্থাপন করেছিল।

প্রধান প্রবেশ পথের উপরিভাগে স্থাপিত একটি শিলালিপি অনুযায়ী জনৈক মজলিস-ই-মাজালিস মজলিস মনসুর ওয়ালী মুহম্মদ বিন আলী কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়। শিলালিপিতে নির্মানের সঠিক তারিখ সম্বলিত অক্ষরগুলি মুছে গেছে। তবে এতে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এর নামের উল্লেখ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, মসজিদটি তার রাজত্বকালের (১৪৯৪-১৫১৯) কোন এক সময় নির্মিত।

Matrix BCS Series

ছোট সোনামসজিদের প্রস্তর লিপি:

মসজিদের দরজাগুলোর প্রান্তদেশ বলিষ্ঠ শোভাবর্ধক রেখা দিয়ে ঘেরা। কিন্তু খোদাই কাজটি অগভীর এবং অট্টালিকাটির খুব নিকটে না পৌছলে এ খোদাই কাজ চোখে পড়ে না। দরজাগুলোর মধ্যবর্তী কুলঙ্গীগুলোতেও রয়েছে একই অগভীর খোদাই। মধ্য দ্বারের উপরস্থ লিপিটির অনুবাদঃ 'দয়াময় ও করুণাময় আল্লাহর নামে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন যে, আল্লাহ ও বিচার দিনের উপর আর কাউকে ভয়করোনা।' যারা আল্লাহর মসজিদ তৈরী করেন তারা শীঘ্রই পথ প্রদর্শিতদের অন্তর্ভূক্ত হবে এবং নবী (সাঃ) বলেন যে, আল্লাহর জন্য যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, তার জন্য অনুরূপ একটি গৃহ বেহেস্তে তৈরী করা হবে। এ মসজিদের নির্মাণ কার্য সুলতানগণের সুলতান, সৈয়দগণের সৈয়দ, পবিত্রতার উৎস, যিনি মুসলমান নর-নারীর উপর দয়া করেন, যিনি সত্য কথা ও সৎ কাজের প্রশংসা করেন, যিনি ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষক, সেই আলাউদ্দুনীয়া ওয়াদ্দীন আবুল মুযাফ্ফর হোসেন শাহ্ সুলতান আল হোসাইনী, (আল্লাহ তাঁর রাজ্য ও শাসন চিরস্থায়ী করেন) এর রাজত্বকালে সংঘটিত হয়। খালেছ ও আন্তরিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে ওয়ালী মনসুর, কর্তৃক জামে মসজিদ নির্মিত হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইহকাল ও পরকাল উভয়স্থানে তাকে সাহায্য করেন। এর শুভ তারিখ হচ্ছে আল্লাহর রহমতের মাস রজবের ১৪ তারিখ। এর মূল্য এবং মর্যাদা বর্ধিত হোক।" এই লিপিটির মধ্যম লাইনে তিনটি শোভাবর্ধক বৃত্ত রয়েছে। প্রত্যেকটিরমধ্যে রয়েছে আল্লাহর নাম। মধ্যম বৃত্তটির মধ্যে রয়েছে 'ইয়া আল্লাহ' (ও আল্লাহ) ডানদিকে বৃত্তটির মধ্যে রয়েছে 'ইয়া হাফিয' (ও রক্ষক) এবং বামদিকের বৃত্তটির মধ্যে 'ইয়া রহিম' (ও দয়াময়)। অলংকরণের ক্ষেত্রে যে সোনালি গিল্টির ব্যবহার থেকে এর 'সোনা মসজিদ' নামকরণ হয়েছে তা এখন আর নেই।মসজিদ প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে পূর্বে একটি বহির্দেয়াল ছিল। পূর্ব পশ্চিমে ৪২ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ৪৩ মিটার লম্বা এ বহির্দেয়ালের পূর্বদিকের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ফটক ছিল। শুধু ফটকটি ছাড়া সমগ্র বহির্দেয়াল এখন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে স্থানে স্থানে এখনও এর চিহ্ন সুস্পষ্ট। বর্তমানে মূল চৌহদ্দি দেওয়ালের স্থলে কাঁটাতারের বেড়া বসানো হয়েছে। স্থানীয় ভাবে জানা যায় যে, ফটকের নিকটে এবং দিঘির দক্ষিণপাড়ে এক সময় সোপানবিশিষ্ট একটি পাকা ঘাট ছিল।

মসজিদটি ইট ও পাথরে নির্মিত। এ মসজিদের মূল ইমারত আয়তাকার এবং বাইরের দিকে উত্তর-দক্ষিণে ২৫.১ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৫.৯ মিটার। চারটি দেওয়ালই বাইরের দিকে এবং কিছুটা অভ্যন্তরভাগেও গ্রানাইট পাথরখন্ডের আস্তরন শোভিত। ১৮৯৭ সালে প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে ধ্বংসলীলার পর সংস্কার কাজের সময় পশ্চিম দেয়ালের দক্ষিণ অংশে পাথরের আস্তরন অপসারিত হয়েছে। মসজিদের বাইরের দিকে চার কোণে চারটি বহুভূজাকৃতির বুরুজের সাহায্যে কোণগুলিকে মজবুত করা হয়েছে। এ বহুভুজ বুরুজের নয়টি অংশ বাইরে থেকে দেখা যায়। পেছন দেয়ালের মধ্যবর্তীস্থলে কেন্দ্রীয় মিহরাবের বাইরের দিকে আয়তাকার একটি বর্ধিত অংশ রয়েছে। কার্নিসগুলো ধনুকের মতো বাঁকানো এবং ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি নিস্কাশনের জন্য ছাদের কিনারায় পাথরের নালি বসানো আছে। মসজিদের পূর্বদিকের সম্মুখভাগে পাঁচটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে তিনটি করে প্রবেশদ্বার রয়েছে। পূর্ব দেয়ালের খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার বরাবর পশ্চিম দেয়ালের অভ্যন্তরে রয়েছে পাঁচটি অর্ধবৃত্তাকার মিহরাব।

Matrix BCS Series

অধিকাংশ মিহরাবের পাথর সরিয়ে নেয়ার ফলে এখন সমগ্র পশ্চিম দেওয়াল অনাবৃত হয়ে পড়েছে; অথচ এক সময় এ দেয়ালই ছিল মসজিদের সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্য অংশ।

মসজিদের ২১.২ মি×১২.২ মি পরিমাপের অভ্যন্তরভাগ প্রতি সারিতে চারটি করে দুসারি প্রস্তর স্তম্ভ দ্বারা উত্তর দক্ষিণে লম্বা তিন স্তরে বিভক্ত। একটি বিস্তৃত কেন্দ্রীয় নেভ স্তরগুলোকে সমান দুভাগে বিভক্ত করেছে। প্রতি ভাগে রয়েছে ৩.৫ মিটার বাহুবিশিষ্ট ছয়টি সমান বর্গাকার ইউনিট। মসজিদের অভ্যন্তরভাগে তাই মোট পনেরোটি ইউনিট রয়েছে যার মধ্যে তিনটি আয়তাকার ইউনিট চৌচালা খিলান ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। বাকি বারোটি বর্গাকৃতি ইউনিটের প্রত্যেকটি উল্টানো পানপাত্র আকৃতির গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। এগুলোর সবই স্বতন্ত্র পাথরের স্তম্ভ ও ভবনের সঙ্গে যুক্তস্তম্ভ শীর্ষে বসানো বিচ্ছুরিত খিলানের উপর স্থাপিত। কিন্তু ইউনিটগুলোর খিলানের মধ্যবর্তী উপরের কোণগুলি গম্বুজ বসানোর উপযোগী করার জন্য করবেল পদ্ধতিতে ইটের পেন্ডেন্টিভ দ্বারা বন্ধ করা হয়েছে। মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে উপরিভাগে দোতলার কায়দায় নির্মিত একটি রাজকীয় গ্যালারি রয়েছে। গ্যালিরিটি এখনও ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় বিদ্যমান। মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল গ্যালারির প্রবেশপথ। দরজার সঙ্গে সংযুক্ত একটি সোপানযুক্ত প্লাটফর্ম হয়ে গ্যালারিতে পৌছাত। গ্যালারির সম্মুখভাগে রয়েছে একটি মিহরাব।

মসজিদের অলংকরণের ক্ষেত্রে খোদাইকৃত পাথর, ইটের বিন্যাস, পোড়ামাটির ফলকের গিল্টি ও চকচকে টালি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এগুলোর ভেতর প্রাধান্য পেয়েছে খোদাইকৃত পাথর। ক্রাইটন ও কানিংহাম মসজিদটির ছাদের উপর পনেরোটি গম্বুজ ও খিলান ছাদের সবগুলোই গিল্টি করা দেখতে পান। কিন্তু বর্তমানে গিল্টির কোন চিহ্ন নেই। পাথর খোদাইয়ের নকশার ধরন নির্বাচন করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট পরিসরের উপযোগিতা অনুযায়ী। যেমন, প্যানেলের কিনারগুলিতে করা হয়েছে লতাপাতার নকশা এবং এদের অভ্যন্তরভাগে হিন্দু আমলের শিকল ও ঘন্টার মোটিফ অনুসরনে বিভিন্ন ধরনের ঝুলন্তরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। খিলানের স্প্যান্ড্রিল ও ফ্রেমের উপরের স্থানগুলি আকর্ষনীয় অলংকরণরীতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে খোদাই করা গোলাপ দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। গম্বুজ ও খিলান ছাদের অভ্যন্তর ভাগে পোড়ামাটির ফলক দিয়ে অলংকৃত; তবে খিলান ছাদের অলংকরণ করা হয়েছে স্থানীয় কুঁড়েঘরের বাঁশের ফ্রেমের অনুকরণে। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় অলংকরণ হলো কোণের বুরুজের খোদাইকৃত পাথরের বেষ্টনী এবং দ্বারপথ ও ফ্রেমের উপরে বসানো পাথরের কার্নিস ও অলংকরণ রেখা। উল্লেখ্য, সম্মুখের সবগুলি খিলানপথ ও মিহ্রাবের খিলানগুলি ছিল খাঁজবিশিষ্ট এবং এগুলো অনেকাংশে এ মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল।

মসজিদের প্রবেশদ্বারের মতোই পূর্ব দিকের ফটকে একসময় বিভিন্ন নকশা খোদাইকৃত প্রস্তর ফলকের আস্তরণ ছিল। কিন্তু এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত কিছু গোলাপ নকশা ছাড়া এসব অলংকরণের তেমন কিছুই এখন আর নেই। ফটকের ১৪.৫ মিটার পূর্বদিকে একটি পাথরের প্লাটফর্ম রয়েছে যার আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৪.২ মিটার, পূর্ব-পশ্চিমে ৬.২ মিটার এবং উচ্চতা ১ মিটার। এর চার কোনে রয়েছে একটি করে প্রস্তর স্তম্ভ। প্লাটফর্মের পরে কয়েকটি উর্ধ্বমুখী আয়তাকার ধাপ আছে এবং এ ধাপসমূহের পরিধি উপরের দিকে ক্রমশ হ্রাস হয়ে এসেছে। দুটি সমাধিতে রয়েছে কুরআনের আয়াত ও আল্লাহর কতিপয় নাম সম্বলিত অগ্রভাগ সরু পিপাকৃতির পাথরের সমাধিফলক। এখানে কারা সমাহিত আছেন তা সঠিক জানা যায়নি।

Matrix BCS Series

কানিংহাম সমাধি দুটিকে মসজিদের নির্মাতা ওয়ালী মুহম্মদ ও তার পিতা আলীর বলে মনে করেন। ছোট সোনা মসিজিদের দৃষ্টিনন্দন রূপ অনেকটা হ্রাস পেলেও অদ্যাবধি এটি গৌড়-লখনৌতির সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইমারত এবং এ এলাকায় আগত দর্শনার্থীদের জন্য সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত নিদর্শন।

বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের সমাধিঃ

মসজিদ প্রাঙ্গণের অভ্যন্তরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দুটি আধুনিক কবর রয়েছে। কবর দুটি উত্তর-দক্ষিণে ৪.১ মিটার পূর্ব-পশ্চিমে ৪.৭ মিটার এবং ১.৩ মিটার উঁচু ইটের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। কবর দুটি বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর নাজমুল হক-এর। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর বরিশালের রহিমগঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৭ সালের ৫ অক্টোবর কাকুলপাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে যোগদান করেন। নিষ্ঠার সাথে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর ১৯৬৮ সালের ২ জুন কমিশন প্রাপ্ত হন। ছয় মাস চাকুরী করার পর তিনি রিসালপুরস্থ মিলিটারি কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ যোগদান করেন এবং সুদীর্ঘ ১৩ মাসের বেসিক কোর্সে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এরপর সেখান হতে বোম্ব ডিসপোজাল কোর্স করেন এবং কোর অব ইঞ্জিনিয়ারস এর একজন সুদক্ষ অফিসার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। ১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনী যখন বাংলাদেশএক ধ্বংসযজ্ঞ ও পাশবিক অত্যাচারে লিপ্ত ছিল, তখন ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কারাকোরামের বন্ধুর পার্বত্য সীমান্ত রক্ষীদের দৃষ্টি এড়িয়ে শিয়ালকোট সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করেন। ভারত হতে পরে তিনি বাংলদেশ সীমান্তে পৌছেন। শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর স্বাধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নির্দেশে রাজশাহী জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত এলাকার ৭ নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে কাজ করছিলেন। তার যোগ্য অধিনায়কত্বে মুক্তিবাহিনী এক চরম বিভীষিকারূপে হানাদার বাহিনীর সকল স্তরের সৈনিকদের মধ্যে মহাত্রাসের সঞ্চার করেছিল। সিংহ শক্তিতে বলিয়ান মুক্তিসেনারা ঝাপিয়ে পড়লে শত্রুদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটিগুলো একের পর এক পতন ঘটতে থাকে। তাদের আক্রমণ এত প্রবল ও ত্রাস সৃষ্টিকারী ছিল যে, একবার একটি শত্রু লাইনের উপর হামলা চালাবার পূর্ব মুহূর্তে প্রায় সহস্রাধিক শত্রুসেনা প্রাণের ভয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ ছেড়ে চলে যান। ১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর মহানন্দা নদী অতিক্রম করে শত্রুসৈন্যদের ধ্বংস করার জন্য নবাবগঞ্জের দিকে অগ্রসর হন। ১৪ ডিসেম্বর তিনি শত্রুদের কঠিন ব্যূহ ভেদ করবার জন্য দুর্ভেদ্য অবস্থানগুলো ধ্বংস করছিলেন, যখন আর একটি মাত্র শত্রু অবস্থান বাকী রইল এমন সময় মুখোমুখি সংঘর্ষে বাংকার চার্জে শত্রুর বুলেটের আঘাতে বাংলার এই সূর্য সৈনিক শাহাদাৎ বরণ করলেন। দৃঢ় অথচ বজ্রশপথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে দুটি চোখ স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরীর মত সদা জাগ্রত থেকে ভবিষ্যতের স্বাধীন সোনালী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছিল তা স্তিমিত হয়ে গেল।

১৫ ডিসেম্বর শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের মৃতদেহ ঐতিহাসিক সোনা মসজিদ প্রাঙ্গনে আনা হয়। অসংখ্য স্বাধীনতা প্রেমিক জনগণ, ভক্ত মুক্তিযোদ্ধা, অগণিত মা-বোনের নয়ন জলের আর্শীবাদে সিক্ত করে তাকে এখানে সমাহিত করা হয়।

Matrix BCS Series

দারসবাড়ী মসজিদ ও মাদ্রাসাঃ

ছোট সোনামসজিদ ও কোতোয়ালী দরজার মধ্যবর্তী স্থানে ওমরপুরের সন্নিকটে দারসবাড়ী অবস্থিত। পুরুষানুক্রমে স্থানীয় জনসাধারণ এই স্থানকে 'দারসবাড়ী' বলে থাকেন। বর্তমানে এই স্থান পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। দর্স অর্থ পাঠ। সম্ভবতঃ একসময় মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদ্রাসা ছিল এখানে। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের সময় মুনশী এলাহী বখশ কর্তৃক আবিস্কৃত একটি আরবী শিলালিপি অনুযায়ী (লিপি-দৈর্ঘ্য ১১ ফুট ৩ ইঞ্চি, প্রস্থ ২ফুট ১ ইঞ্চি) ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ৮৮৪) সুলতান শামস উদ্দীন ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে তাঁরই আদেশক্রমে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইট নির্মিত এই মসজিদের অভ্যন্তরের আয়তক্ষেত্র দুই অংশে বিভক্ত।

এর আয়তন ৯৯ ফুট ৫ ইঞ্চি, ৩৪ ফুট ৯ ইঞ্চি। পূর্ব পার্শ্বে একটি বারান্দা, যা ১০ ফুট ৭ ইঞ্চি। বারান্দার খিলানে ৭টি প্রস্তর স্তম্ভের উপরের ৬টি ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজ এবং মধ্যবর্তীটি অপেক্ষাকৃত বড় ছিল। উপরে ৯টি গম্বুজের চিহ্নাবশেষ রয়েছে উত্তর দক্ষিণে ৩টি করে জানালা ছিল। উত্তর পশ্চিম কোণে মহিলাদের নামাজের জন্য প্রস্তরস্তম্ভের উপরে একটি ছাদ ছিল। এর পরিচয় স্বরূপ এখনও একটি মেহরাব রয়েছে। এতদ্ব্যতীত পশ্চিম দেয়ালে পাশাপাশি ৩টি করে ৯টি কারুকার্য খচিত মেহরাব বর্তমান রয়েছে। এই মসজিদের চারপার্শ্বে দেয়াল ও কয়েকটি প্রস্তর স্তম্ভের মূলদেশ ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই । এ মসজিদটিও বাংলার প্রথম যুগের মুসলিম স্থাপত্যের কীর্তির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এখানে প্রাপ্ত তোগরা অক্ষরে উৎকীর্ণ ইউসুফি শাহী লিপিটি এখন কোলকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। জেনারেল ক্যানিংহাম তার নিজের ভাষাতে একে দারসবাড়ী বা কলেজ বলেছেন। এ ঐতিহাসিক কীর্তির মাত্র কয়েকগজ দূরে ভারতীয় সীমান্ত।

দারসবাড়ী মসজিদের প্রস্তর লিপিঃ

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে এ স্থানে একটি জঙ্গাল স্তুপের নিচে মুন্সী এলাহী বখশ ১১ফুট ৩ ইঞ্চি ও ২ ফুট ১ ইঞ্চ উচু একটি তোঘরা লিপি প্রাপ্ত হন। এটা এখন কলকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। নম্বর-৩১ লিপিটির বিপুল দৈর্ঘের কারণে একে দু'ভাগ করতে হয়েছে। লিপির অর্থ হচ্ছে-

"সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন- নিশ্চয়ই সব মসজিদ আল্লাহর, সুতরাং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।' নবীও বলেছেন, আল্লাহর জন্য যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেস্তে অনুরূপ একটি প্রাসাদ তৈরী করবেন। এই জামে মসজিদ ন্যায় পরায়ণ ও মহান সুলতান, জনগণ ও জাতি সমূহের প্রভু, সুলতানের পুত্র সুলতান, তাঁর পুত্র সুলতানের পুত্র শামসুদ্দুনীয়া ওয়াদ্দীন আবুল মুজাফ্ফর ইউসুফ শাহ সুলতান, পিতা বরবক শাহ সুলতান, পিতা মাহমুদ শাহ সুলতান কর্তৃক নির্মিত। আল্লাহ তার শাসন ও সার্বভৌমত্ব চিরস্থায়ী করুন এবং তার উদারতা ও উপচিকীর্ষা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক। তারিখ ৮৮৪ হিঃ"

খঞ্জনদীঘির মসজিদঃ

দারসবাড়ী মসজিদের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বল্লাল সেন খননকৃত বালিয়া দীঘির দক্ষিণ পাড় ঘেঁষে পূর্বদিকেকিছুদূর গিয়ে চোখে পড়ে খঞ্জনদীঘির মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। একটি প্রাচীন জলাশয়ের পাশেই এ ধ্বংসাবশেষটি অবস্থিত। খঞ্চনদীঘির মসজিদটি অনেকের নিকট

খনিয়াদীঘির মসজিদ নামে পরিচিত। আবার অনেকে একে রাজবিবি মসজিদও বলে থাকেন। বহুকাল ধরে মসজিদটি জঙ্গলের ভেতর পড়েছিল। কিছুকাল আগে জঙ্গল কমে গেলে মসজিদটি মানুষের চোখে পড়ে। কিন্তু ইতোমধ্যে মসজিদটি প্রায় শেষ অবস্থায় এসে পৌছেছিল।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখন এটিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। বর্তমানে মসজিদটির একটি মাত্র গম্বুজ ও দেয়ালের কিছু কিছু অংশ কোন রকমে টিকে আছে। এগুলোর অবস্থাও খুব জীর্ণ। পূর্বে এই মসজিদের আয়তন ছিল ৬২৪২ ফুট। গম্বুজটির নিচের ইমারত বর্গের আকারে তৈরী। এই বর্গের প্রত্যেক বাহু ২৮ ফুট লম্বা। এটি মাঝের গম্বুজ। বড় কামরার সামনের দিকে (পূর্ব) একটি বারান্দা ছিল। ইটের তৈরী এ মসজিদের বাইরে সুন্দর কারুকাজ করা ছিল। যার নমুনা খুব সামান্য হলেও রয়েছে। খঞ্জনদীঘির মসজিদ কখন নির্মিত হয়েছিল এবং কে নির্মাণ করেছিলেন সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে মসজিদ তৈরীর নমুনা দেখে পন্ডিতেরা অনুমান করেন যে এটি পনেরো শতকে নির্মিত হয়েছিল।

ধনাইচকের মসজিদঃ

খঞ্জনদীঘি মসজিদের ধ্বংসাবশেষের একটু দুরেই রয়েছে আর একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। এই মসজিদের নাম ধনাইচকের মসজিদ। মসজিদটির পশ্চিম ও উত্তর দেয়ালের কিছু অংশ এবং স্তম্ভের কিছু অংশ, এখনও দাঁড়িয়ে আছে। আর রয়েছে কয়েকটি স্তম্ভের কিছু কিছু, এগুলো পাথরের তৈরী। অনেককাল আগের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে জানা যায় যে, মসজিদটিতে ৩টি গম্বুজ ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালের গবেষণায় দেখা গেছে এতে ৬টি গম্বুজ ছিল। মেহরাবে ছিল অতি সুন্দর লতাপাতা ফুলের কাজ। এ মসজিদটিও ১৫ শতকে নির্মিত বলে পন্ডিতেরা অনুমান করেন। তবে এর নির্মাতা কে এ সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি।

চামচিকা মসজিদঃ

চামচিকা মসজিদের নামকরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না। তবে বর্তমান ভারতে অবস্থিত বড় চামচিকা মসজিদের আদলেই এটি তৈরী। দারসবাড়ী মসজিদের মতই পোড়ামাটি ইট ও কারুকার্য খচিত এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। এর দেয়ালের পরিধি এত মোটা যে চৈত্র মাসের প্রচন্ড গরমে এর ভিতরে শীতল পরিবেশ বিদ্যমান থাকে। এর মূল গম্বুজটি অতি সুন্দর। এই মসজিদের পূর্বে ৬০ বিঘা আয়তনের খঞ্জন দিঘী নামে একটি বড় দিঘী রয়েছে যার পাড়ে সিড়ি বাঁধা ঘাট ছিলমুসল্লীদের ওজু করার জন্য।

তিন গম্বুজ মসজিদ ও তাহখানাঃ

শিবগঞ্জ উপজেলা ফিরোজপুরস্থিত শাহ্ নেয়ামতউল্লাহ (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত তদীয় সমাধি সংশ্লিষ্ট তিন গম্বুজ মসজিদটি মোঘল যুগের একটি বিশিষ্ট কীর্তি। এতে ৩টি প্রবেশ পথ এবং ভেতরে ৩টি মেহরাব রয়েছে। মসজিদের ভেতর ও বাইরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কারুকার্য নেই। দেয়ালে কয়েকটি তাক আছে। স্থানীয় জনসাধারণ এই মসজিদে নিয়মিতভাবে নামাজ আদায় করে থাকেন। এই মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে সুলতান শাহ সুজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বিতল

Matrix BCS Series

ইমারত মোঘল যুগের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ইট নির্মিত ইমারতটি তোহাখানা নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে বঙ্গ সুলতান শাহ সুজা তাঁর মোরশেদ হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহর উদ্দেশ্যে (রাজত্বকাল ১৬৩৯-৫৮ খ্রিঃ) শীতকালীন বাসের জন্য ফিরোজপুর তাপনিয়ন্ত্রণ ইমারত হিসেবে এ ভবনটি নির্মাণ করেছিলেন। সময়ে সময়ে শাহ সুজাও এখানে এসে বাস করতেন। এর দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ১১৬ ফুট ও প্রস্থে ৩৮ ফুট। এতে ছোট বড় অনেক কামরা ও উভয় পার্শ্বে বারান্দা ছিল।

জনশ্রুতি আছে যে-শাহ সুজা যখন ফিরোজপুরে মোরশেদ শাহ নেয়ামতউল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসতেন তখন উক্ত ইমারতের মধ্যবর্তী সুপ্রশস্ত কামরাটিতে বাস করতেন। গৌড়ের প্রাচীন কীর্তির মধ্যে এই শ্রেণীর ইমরাত এই একটিই পরিলক্ষিত হয়। কড়িকাঠের উপর খোয়া ঢালাই করে যার ছাদ ও কোঠা জমাট করা হয়েছিল। উল্লেখিত মসজিদ ও তাহখানার নিকটস্থ সরোবর দাফেউল বালাহর তীরে অবস্থিত। এই দুই ইমারত হতে দুইটি সিড়ি সরোবরের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্বতীর হতে এই ইমারত দুটোর দৃশ্যাবলী খুবই মনোরম।

তাহখানা কমপ্লেক্সঃ

তাহখানা পারসিয়ান শব্দ যার আভিধানিক অর্থ ঠান্ডা ভবন বা প্রাসাদ। গৌড়-লখনৌতির ফিরোজপুর এলাকায় একটি বড় পুকুরের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত ভবন কাঠামোটি ঐতিহ্যগতভাবে তাহখানা নামে পরিচিত। ভবনটির উত্তর-পশ্চিমে আরও দুটি কাঠামো রয়েছে নিকটস্থটি একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ এবং একটু উত্তরে অবস্থিত অপরটি ভল্টেড বারান্দা ঘেরা একটি গম্বুজ সমাধি। যেহেতু ভবনগুলো একই সময় একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল, সেহেতু সবগুলো ভবনকে একত্রে একটি একক ইউনিট বা একটি কমপ্লেক্স হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে বর্তমানে এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত। কে এই কমপ্লেক্সের নির্মাতা তা নির্দিষ্ট করে জানা যায় না। তবে ভবনগুলোর স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য, সুলতানি রীতির সৌধসমূহের মাঝে বিষম বৈশিষ্ট্যের মুঘলরীতির প্রয়োগ এবং সমসাময়িক ও পরবর্তী ঐতিহাসিক বিবরণ ইঙ্গিত করে যে এর নির্মাতা মুগল সুবাহদার শাহ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রিঃ) । তিনি সুফী সাধক শাহ নেয়ামতউল্লাহ ওয়ালীর প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ মাঝে মাঝে গৌড়-লখনৌতি যেতেন এবং তিনি সেখানে অবস্থানও করতেন। রাজমহলেই ছিল শাহ সুজার রাজধানী, যা গৌড় থেকে খুব দূরে নয়। তবে প্রায়ই গৌড়ে তার ভ্রমণ এবং সেখানে অবস্থিত লুকোচুরি দরওয়াজা নামে জাকজমকপূর্ণ মোঘল তোরণ এ যুক্তিটিকে আরও বেশি অকাট্য করে তুলেছে। খুব সম্ভবত শাহ সুজা দরবেশের খানকাহ হিসেবে এই ছোট্ট প্রাসাদটি এবং এর সংলগ্ন মসজিদ ও সমাধিসৌধটি নির্মাণ করেন। সমাধিটি সম্ভবত দরবেশের (মৃত্যু ১৬৬৪ অথবা ১৬৬৯ খ্রিঃ) অন্তিম শয়নের জন্য পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল।

দ্বিতল ভবনটি মূলত ইট নির্মিত। তবে দরজার চৌকাঠের জন্য কালো পাথর এবং সমতল ছাদের জন্য কাঠের বীম ব্যবহৃত হয়েছে। পশ্চিম দিক থেকে ভবনটিকে দেখলে একতলা মনে হয়, পূর্বদিক থেকে অবশ্য দ্বিতল অবয়বই প্রকাশ পায়, যার নিচতলার কক্ষগুলি পূর্বদিকে বর্ধিত এবং খিলানপথগুলি উত্থিত হয়েছে সরাসরি জলাশয়টি থেকে। ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে রয়েছে একটি গোসলখানা যেখানে পানি সরবরাহ হতো একটি অষ্টভুজাকৃতির

Matrix BCS Series

চৌবাচ্চার মাধ্যমে জলাশয় থেকে। উত্তর পার্শ্বে একটি ছোট পারিবারিক মসজিদ অবস্থিত এর পেছনে রয়েছে একটি উন্মুক্ত কক্ষ যেটি একটি অষ্টভুজাকার টাওয়ার কক্ষের সাথে সংযুক্ত ছিল। এ টাওয়ার কক্ষটি সম্ভবত ধ্যানের জন্য ব্যবহৃত হতো। অষ্টভুজাকার টাওয়ারটি সমস্ত কমপ্লেক্সটিতে ভারসাম্য প্রদান করেছে। প্রাসাদটি প্লাস্টার করা এবং তা খোদাইকৃত। এসব অলংকরণ রীতি মোঘল আমলের। তাহখানা কমপ্লেক্সটি সুলতানি যুগের নগরে মুগল রীতির স্থাপত্য নিদর্শনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের স্থাপত্য বাংলায় প্রথম। এ ধরনের কমপ্লেক্সের সূত্রপাত হওয়ার পর ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে এরূপ প্রাসাদ, মসজিদ অথবা সমাধিসৌধ সম্বলিত কমপ্লেক্স একটি প্রচলিত রীতিতে পরিণত হয়।

শাহ্ নেয়ামতউল্লাহ (রহঃ) ও তাঁর মাজারঃ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে (গৌড়ের পূর্বাঞ্চলে) ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব যারা বহন করেছিলেন তাদের মধ্যে স্বনাম খ্যাত সাধক হযরত শাহ সৈয়দ নেয়ামতউল্লাহ (রহঃ) অন্যতম। সুলতান শাহ সুজার রাজত্বকালে (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রিঃ) তিনি দিল্লী প্রদেশের করোনিয়ার নামক স্থান থেকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নানা স্থান ভ্রমন করে রাজমহলে এসে উপস্থিত হন। তার আগমনবার্তা জানতে পেরে শাহ সুজা তাকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানান এবং তার নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। পরে তিনি গৌড়ের উপকণ্ঠে (শিবগঞ্জ উপজেলার) ফিরোজপুরে স্থায়ীভাবে আস্তানা স্থাপন করেন। দীর্ঘদিন এতদঞ্চলে তিনি সুনামের সঙ্গে ইসলাম প্রচার করে ফিরোজপুরেই ১০৭৫ হিজরী (১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে) মতান্তরে ১০৮০ হিজরীতে (১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে) সমাধিস্থ হন। পারস্য দেশীয় একটি বিবরণীতে হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি একজন জবরদস্ত আলেম ও আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ আওলিয়াগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তাহখানা প্রাসাদটি শাহ সুজা, শাহ নেয়ামতউল্লাহর বসবাসের জন্য প্রদান করেন। পরে তিনি সেখানে একটি ৩ গমবুজ মসজিদ নির্মান করেন এখনও তা অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বংশধর ও পুরুষানুক্রমিক ওলী ছিলেন। তিনি হাকিকাত ও মারেফাতের শ্রেষ্ঠ কামেল দরবেশ ছিলেন। তাঁর মত একজন ধর্মনিষ্ঠ আউলিয়া যাতে আজীবন নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম ও মুসলমানের সেবা এবংরাজ্যের উন্নতি করতে পারেন -সেজন্য বাদশাহ আলমগীর মহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব সুবায়ে বাঙলা সরকার জান্নাতাবাদে পরাগণে 'দারাশাকে' ৫,০০০/- টাকা আয়ের সম্পত্তি তার ও তার বংশধরদের ভরণপোষণের জন্য দান করেন। তিনি প্রায় ৩৩ বছর এই সম্পত্তির আয় থেকে এই মসজিদ ও খানকার যাবতীয় খরচাদি নির্বাহ করে গেছেন। তার মৃত্যুর পরও অনেকদিন পর্যন্ত সম্পত্তির আয় হতে খানকা ও মসজিদের জন্য ব্যয় হতো।

শাহ নেয়ামতউল্লাহর সমাধিঃ

হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহর মাজার শরীফ শিবগঞ্জ উপজেলার তোহাখানায় অবস্থিত। বার দরজা বিশিষ্ট চতুস্কোনায়তন তার সমাধিটি। প্রত্যেক পাশে ২/৩ টি করে দরজা আছে। এখানে যে লিপিটি আছে তা হোসেন শাহী যুগের একটি আরবী লিপি। পরবর্তীকালে তা স্থাপন করা হয়েছে। এই সমাধি প্রাঙ্গণে আরো কয়েকজন সাধক, তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গের

সমাধি রয়েছে। হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহর সমাধি প্রাঙ্গন বৃক্ষশোভিত ও ইটের প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত। প্রতিদিনই বহুলোক তার মাজার দর্শন করে কৃতার্থ হন।

পহেলা মহরম হযরত শাহ নোয়ামতউল্লাহর জন্ম ও মৃত্যুর দিন বলে পরিচিত। এই দিনে প্রতিবছরই এখানে 'উরস পালন' করা হয়ে থাকে। এছাড়া ভাদ্র মাসের শেষ শুক্রবার এখানে অন্য একটি উরস পালন করা হয়। এ দিনই অধিকাংশ লোক এখানে জমায়েত হয়ে থাকেন। এ দিনেরই ফজিলত বেশি বলে অনেকের ধারনা। হযরত এদিনে ইসলাম প্রচারের জন্য সর্বপ্রথম গৌড় নগরীতে পদার্পন করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবারের দিন আসরের নামাজের পর সারারাত ব্যাপী 'জেকের' অনুষ্ঠিত হয়। উরস কমিটির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মিলাদ শরীফ পাঠ করান হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসককে পদাধিকার বলে সভাপতি করে একটি 'মাজার পরিচালনা কমিটি' গঠিত রয়েছে। এতে ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী ছাড়াও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সদস্য রয়েছেন। শুক্রবার বাদ জুম্মা হযরতের মাজারে চাদরপশী বা গিলাফ পরানো হয়। এই চাদর প্রদান করেন পীর সাহেবের বংশধর নবাবগঞ্জ নিবাসী আলহাজ্ব শাজাহান আলী । তিনি পীর সাহেবের কন্যা কাদিরণ নেসার বংশধর।

কোতোয়ালীদরওয়াজা:
নগর পুলিশের ফারসি প্রতিশব্দ 'কোতওয়াল' এর অনুকরণে নামকরণ করা হয়েছে। এ নগরপুলিশ (কোতওয়াল) গৌড় নগরীর দক্ষিণ দেয়াল রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে এটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। আবিদ আলীর বর্ণনানুযায়ী (Memoirs of Gaur and Pandua, Calcutta, ১৯৩১), প্রবেশপথের মধ্যবর্তী খিলানের উচ্চতা ৯.১৫ মিটার এবং প্রস্থ ৫.১০ মিটার। তার বিবরণে প্রবেশপথের পূর্ব ও পশ্চিমদিকের সচ্ছিদ্র প্রাচীরের কথা উল্লেখ আছে। এ ছিদ্রগুলি দিয়ে শত্রুর ওপর গুলি বা তীর ছোড়া হতো। আবিদ আলীর মতে, অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ উভয় পার্শ্বের সম্মুখভাগে ক্রমঢাল বিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার বুরুজ ছিল। বর্তমানে সারিবদ্ধ শরছিদ্র সম্বলিত বিশাল উত্তল পরিলেখসহ বহিস্থ বরুজের আংশিক দেখা যায়। বুরুজগুলির পার্শ্বের প্রতিরক্ষা প্রাচীর এখনও বিদ্যমান এবং তা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম প্রাচীরটি নদী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে, আর পূর্ব প্রাচীরটি ভারতীয় সীমান্তের অভ্যন্তরে কিছুদুর গিয়ে পৌছেছে। এরপর এ প্রাচীর বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে উত্তরমুখী হয়ে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করেছে। পুরু মাটির দেয়াল দেখেই বোঝা যায়, নগরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তখন কত মজবুত ছিল। প্রবেশপথের খিলানগুলোর ভেতর ও বাহিরে উভয় পার্শ্বই কারুকার্যমন্ডিত প্যানেলে শোভিত এবং এ প্যানেলের অভ্যন্তরে আছে ঝুলন্ত মোটিফ। এসব প্যানেলের কিছু কিছু এখনও টিকে আছে।
প্রাচীন গৌড়ের রাজধানীতে প্রবেশ করতে হলে দক্ষিণ 'নগর উপকণ্ঠে'র অধিবাসীদের এই তোরণ অতিক্রম করতে হতো। নগরদূর্গের অধিবাসীগণের দক্ষিণমুখী পথও ছিল এটিই। এর উপরের খিলান বহুদিন আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। এই তোরণটির উচ্চতা ৩১২ ফুট বিস্তার ১৬ ফুট। প্রবেশপথের দৈর্ঘ্য ১৭ ফুট ৪ ইঞ্চি। জেনারেল ক্যানিংহাম লিখেছেন "ইহা প্রাচীন মুসলিম স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম নিদর্শন।" সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর সমসাময়িক স্থাপত্য

Matrix BCS Series

নিদর্শন বলে তিনি অনুমান করেছেন। তিনি আরো অনুমান করেছেন যে, সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর মৃত্যুর পর লখনৌতিতে দিল্লীর আধিপত্য কায়েম হলে এই সুদৃশ্য নগর বেষ্টণী প্রাচীর ও তোরণটি নির্মিত হয়।" এ মত মেনে নিলে ১২২৯ (হিজরী ৬২৭) খ্রিস্টাব্দের কিছু পর এটি নির্মিত হয়েছিল বলতে হয়। ডাঃ দানী বলেছেন, "বঙ্গের সুলতান নাসিরউদ্দিন মহম্মদ শাহের আমলে (পান্ডুয়া হতে গৌড় রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর) রাজধানীর নগর দ্বার হিসাবে ইহা নির্মিত হয়।" এই তোরণের উভয় পার্শ্বে ৬ ফুট বিশিষ্ট বৃত্তাকার দুটি শান্ত্রী ঘর ছিল। সেখানে আগ্নেয়াস্ত্রসহ পাহারারত শান্ত্রী থাকতো। এই তোরণ ও শান্ত্রীঘর দুটিতে বিভিন্ন প্রকার লতাপাতার কারুকার্য ছিল।

দাফেউল বালাঃ

তাহখানা সংলগ্ন পুকুরটির নাম 'দাফেউল বালা'। এটি খুব মাহাত্মপূর্ণ জলাশয়। কথিত আছে খাসমনে এর পানি পান করলে যে কোন প্রাচীন পীড়া সেরে যায়। এজন্য এ পুকুরের পানি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার নিকট পবিত্র। রোগ-ব্যাধি মুক্ত হওয়ার জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান এই পানি ব্যবহার করেন। বিশেষত উরশের সময় এ পানি নেয়ার জন্য হাজার হাজার লোকের ভিড় হয়ে থাকে। কথিত আছে শাহ নেয়ামতউল্লাহর সময়ে বিশেষ কারণে এ পুকুরের পানি নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ কিংবা অন্য কোন পশু বা জীব-জন্তু এ পানি পান করলেই মারা যেত। শাহ সাহেব কয়েকজন মুরীদসহ এখানে উপস্থিত হন। এবং সকলে মিলে পুকুরের পানি পান করেন। সঙ্গে সঙ্গে পানি ভাল হয়ে যায়।

বালিয়াদীঘিঃ

রাজা বল্লাল সেন (রাজত্বকাল ১১৫৮-১১৭৯ খ্রিঃ) দীঘিটি খনন করেন। 'বল্লাল দীঘি' কালক্রমে "বালিয়াদীঘি" নামে পরিচিত হয়েছে। এছাড়া অনেকে মনে করেন বালুকাময় জলাশয় বলে এর নাম বালুয়াদীঘি। কোতোয়ালী গেট হতে দক্ষিণে এই প্রাচীন দীঘিটি অবস্থিত। খাস খতিয়ান ভুক্ত এ দীঘির আয়াতন ৩৯.৪৮ একর। এক কালে রাজবাড়ী এবং দূর্গে এই দীঘি হতে পানি সরবরাহ করা হতো। দীঘির তলদেশ বালুকাময় থাকায় পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ।

খঞ্জন দীঘিঃ

খঞ্জন দীঘি গৌড়ের একটি প্রাচীন দীঘি। এই দীঘিকে কেউ কেউ 'খানিয়া দীঘি'ও বলে থাকে। এককালে এর পানি রক্তের মতো লাল ছিল, রক্ত বা খুন থেকে খানিয়া হয়েছে শোনা যায়। বালিয়াদীঘির পূর্বে এর অবস্থান।

কানসাটের জমিদার বাড়ীঃ

শিবগঞ্জ উপজেলা কানসাট একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানকার জমিদারদের আদিপুরুষ প্রথমত বগুড়া জেলার 'কড়ইঝাকৈর' গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। দস্যু সরদারপন্ডিতের অত্যাচারে তারা ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছাতে স্থানান্তরিত হন। পরে তারা নবাবগঞ্জের কানসাটে এসে স্থায়ী হন। সূর্য্যকান্ত, শশীকান্ত ও শীতাংশুকান্ত এই বংশের অধঃস্তন বংশক্রম। প্রজা সাধারণের

Matrix BCS Series

জন্য এরা কিছু রেখে যেতে পারেননি। এরা মুসলিম বিদ্বেষী জমিদার হিসেবে কুখ্যাতি লাভ করেন। জমিদার কার্য ছাড়াও এরা হাতির বেচাকেনা করতেন। আসামে এদের একটি 'খেদা' ছিল। এই জমিদার পরিবারে মুসলিম বিদ্বেষের বহু দৃষ্টান্ত এতদঞ্চলে বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় কাগজী পাড়ায় মুসলিম সম্প্রাদায়কে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রের ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে এক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সুত্রপাত হয়। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় শ্যামপুর চৌধুরী পরিবারের নেতৃত্বে বাজিতপুর গ্রামের আম্রকাননে প্রায় ১২টি ইউনিয়নের মুসলমান সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে উক্ত ঘটনার জোর প্রতিবাদ জানায় এবং একটি মামলা দায়ের করে। এই মামলায় জমিদার শিতাংশু বাবু হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা অনুমান করে স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে ডেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং সাময়িক বিপদ হতে রক্ষা পান।

প্রাচীনকালে এখানে কংসহাট্টা নামক রাজার বাড়ী ছিলবলে জানা যায়। তার নামানুসারেই স্থানটির নামকানসাট হয়। আবার অনেকে এর অন্য প্রকার নামকণের কথাও বলে থাকেন। 'কান+সাট'= কানসাট। সাট অর্থ বন্ধ কর। বঙ্গ অধিকারী রানী স্বর্ণময়ীর রাজধানী ছিল নিকটস্থ পুখুরিয়া গ্রামে। পুখুরিয়া বাগদীপাড়ায় এখনও এর ধ্বংসাবেশেষ দেখা যায়। এই রানীর তোপকামানের শব্দে স্থানীয় লোকের কান বন্ধ করতে হতো। কানসাট নামের উৎপত্তি এভাবেই হয় বলে অনেকের ধারণা।

তরতীপুরঃ

এককালে এই অঞ্চল পাট আমদানি ও রপ্তানির কেন্দ্র ছিল। সহানটি পাগলা নদীর তীরে শিবগঞ্জ হতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। কেউ কেউ একে তকতীপুর নামে অভিহিত করেন। এটা হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। এখানকার গঙ্গাজল হিন্দুদের কাছে সর্বাপেক্ষা পবিত্র। প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে এই তীর্থ ক্ষেত্রে গঙ্গাস্নানের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভারত ও অন্যান্য স্থানের বহু হিন্দু নর-নারী এই তীর্থ ক্ষেত্রে এসে গঙ্গাস্নান করে অশেষ পূণ্য সঞ্চয় করেন। দৈব-দুর্বিপাকে ও অসুখ-বিসুখে এখানকার গঙ্গাজল ব্যবহৃত হয়।
শিবগঞ্জ উপজেলা বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনের জন্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করলেও এখানে পর্যটনের বিকাশের জন্য সুপরিকল্পিত কোন অবকাঠামো গড়ে উঠেনি। পর্যটকদের জন্য উন্নত মানের হোটেল,মোটেল, রেস্টুরেন্ট, বিভিন্ন নিদর্শনের পাশে আধুনিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও রাস্তা-ঘাট নির্মাণ/মেরামত সংস্কার করা জরুরী। এছাড়া শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন দর্শনীয়, ঐতিহাসিক, স্থান ও স্থাপনা বিষয়ে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

চাঁপাই জামে মসজিদঃ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার চাঁপাই গ্রামে প্রাচীন একটি মসজিদ রয়েছে। এটি ৮৯৩ হিজরীতে নির্মিত হয় বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আলী ওয়াজ খিজির খাঁন নামক এক ব্যক্তি মসজিদের নির্মাতা বলে মসজিদ গাত্রে প্রাপ্ত লিপি থেকে জানা যায়।

মহারাজপুর জামে মসজিদঃ

মোগল আমলের সহাপত্যকলার নিদর্শন সমৃদ্ধ সুন্দর লতা-পাতার কারতকার্য খোদিত একটি প্রাচীন মসজিদ বর্তমান মহারাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এখনো বিদ্যমান।

মাঝপাড়া জামে মসজিদঃ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের পার্শ্বে মাঝপাড়া গ্রামে গম্বুজ বিশিষ্ট একটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। এটি মাঝপাড়া বালিগ্রাম মসজিদ নামে পরিচিত। আনুমানিক ১৭৭৫ খ্রিঃ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

হযরত বুলন শাহ (রাঃ) মাজারঃ

পীরশাহ আব্দুল মসহুদ নবাবগঞ্জ সদরের আমনুরায় ইসলাম প্রচার করেন। পীরের অপর নাম হযরত বুলন শাহ। আমনুরার পূর্বনাম ছিল ঝিলিম। আমনুরায় দীঘির পার্শের্ব এই কামেল পীরের সমাধি রয়েছে।

সর্ববৃহৎ দুর্গাপুজা (বাইশ পুতুল):

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় ঠাকুরবাড়ী, জোড়া মঠ, রামসীতা মন্দির প্রভৃতি সহাপত্যকলার নিদর্শন আজও টিকে আছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে অত্র অঞ্চলের সর্ববৃহৎ কালিপুজা হয়ে থাকে যা "বুড়াকালি" নামে পরিচিত। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দূর্গাপুজা হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বারঘরিয়া গ্রামে। এখানে সাহেবদের কার্তিক, গনেশ, মীবসহ ২১টি মুর্তি পরিবেষ্টেত দেবী দূর্গা সম্বলিত এ সর্ববৃহৎ দূর্গাপুজা সবার কাছে বাইশপুতুল নামে পরিচিত। উক্ত অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলিম সকল ধর্মের লোকের সমাগম হয়। যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি বিরল দৃষ্টামত।

মহারাজপুর মঞ্চঃ

একসময় অত্র এলাকায় বিভিন্ন গোষ্ঠি তাদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সহায়ী মঞ্চে পরিবেশনার মাধ্যমে উপসহাপন করত। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার মরহুম সদর আহম্মদ মিয়ার বাড়ীর আঙিংনায় মহারাজপুর মঞ্চটি আজও বিদ্যমান।

বারঘরিয়া মঞ্চঃ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বর্ধিষ জনপদ বারঘরিয়া বাজারের নিকটে জমিদারবাড়ীর সামনে পাকা সুসজ্জিত মঞ্চটি এখনো চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর আসনের প্রাক্তন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ হারুনুর রশীদ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মঞ্চ ২টি সংস্কারের কাজ হাতে নেয়া হয়। এ মঞ্চ ২টিসহ চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় ভাবে গম্ভীরা, আলকাব, মেয়েলীগীতি, খ্যামটা গান পরিবেশিত হয়। লোকজ সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ উপাদনের ধারক এই চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Matrix BCS Series

জোড়া মঠ:

বিস্তৃত বরেন্দ্র ভূমি অধ্যুষিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে স্বতমএধর্মী। এখানকার মানুষ আবহমানকাল থেকে প্রকৃতির সংগে সংগ্রাম করে টিকে আছে। পদ্মা-মহানন্দা-পাগলা নদীর করাল গ্রাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি হারিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের হুজরাপুরে দুটো মঠ বা মন্দির পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তাই এলাকাবাসীর কাছে এটি "জোড়ামঠ" নামে পরিচিত। নবাবগঞ্জ পূর্বে হিন্দুপ্রধান এলাকা ছিল, তখন প্রায় প্রত্যেক পাড়ায় বা গ্রামে বিভিন্ন আকারের মঠ গড়ে উঠেছিল। মঠ দুটি মহানন্দা নদীর তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব

দিয়ানতুল্লাহ চৌধুরী ওরফে লুকা চৌধুরী (১৮০১-১৯০৬): দিয়ানতুল্লাহ চৌধুরী চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বর্ধিষ্ণু গ্রাম মহারাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নীল বিদ্রোহের নায়ক।

গিরিশ চন্দ্র সিংহঃগিরিশ চন্দ্রসিংহ বিশাল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দানশীল ও সমাজসেবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

রফিক মন্ডলঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার নারায়নপুরের রফিক মন্ডল ওহাবি আন্দোলনের নেতা ছিলেন।

গনিতজ্ঞ প্রফেসর আব্দুর রহিম (১৮৯৫-১৯৫৮): জন্ম পৌর এলাকার খামার (বর্তমানে উপর রাজারামপুর) গ্রামে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। গণিত বিষয়ক তাঁর অসংখ্য গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

ড. জহুরুল হক (১৯২৩-১৯৯৮): রাজারামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

বাবু অভয় প্রদ মুখার্জী (১৯২২-৯৯): চাঁপাইনবাবগঞ্জের সবশ্রেণীর মানুষের শ্রদ্ধারপাত্র বাবু অভয়পদ মুখার্জী পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকতা করে তিনি যে অর্থ পেতেন তা অন্য গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের দান করতেন।

ইলা মিত্রঃ যশোরের বাগুটিয়া গ্রামে আদি নিবাস হলেও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ইতিহাসে জড়িয়ে আছে তাঁর নাম কলকাতা থেকে লেখাপড়া শেষ করে তিনি ১৯৪৫ খ্রিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে আসেন রমেন মিত্রের বধু হিসেবে। ১৯৪৭-৫০ খ্রিঃ নাচোলে অনুষ্ঠিত তেভাগা আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য আজও তাঁর কথা মনে রেখেছে এখানকার আবাল-বৃদ্ধ বনিতা।

Matrix BCS Series

রমেন মিত্র (হাবু বাবু): নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্রের স্বামী এবং নিজেও আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা ।

ভাষা ও সংস্কৃতি

ভাষা ও সংস্কৃতি

সংস্কৃতি:

ক. নাট্যচর্চা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে নাট্যচর্চা সংস্কৃতির অপরাপর ধারাগুলোর মত উৎকর্ষ লাভ করেনি। যতদূর জানা যায়, নবাবগঞ্জে সর্বপ্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মহারাজপুর গ্রামে। তারপর থেকে এখানে নাটক মঞ্চায়ন জনপ্রিয়তাও ব্যাপকতা লাভ করে। ১৮৯১ সালে নবাবগঞ্জে এক্সপ্রেস থিয়েটার নামে প্রথমবারের মত একটি নাট্যশালা গড়েওঠে। এটির উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় জমিদার ললিত মোহন মিত্র, গোপীমোহন সাহা, উমেশচন্দ্র চ্যাটার্জি, শরৎ চ্যাটার্জিও পঞ্চানন সিংহ। ঐ সময়ের জনপ্রিয় নাট্যাভিনেতা সৌরেশচন্দ্র মৌলিকের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় সৌরেশ নাট্যশালা। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় বহু হিন্দু ভারতে পাড়ি জমালে এখানকার নাট্যচর্চায় কিছুটা ভাটা পড়ে। অবশ্য কয়েক বছর পরেই জনৈক এহসান আলী খানের উদ্যোগে উদয়ন নাট্য সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংসদের কর্মকান্ডের ফলে নবাবগঞ্জের নাট্যচর্চায় গতি সঞ্চারিত হয়। ১৯৫২ সালে তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক আল মামুন সানাউল হকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি স্থায়ী নাট্যমঞ্চ হিসেবে 'টাউন হল' স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে আরো কিছু নাট্য সংগঠন গড়েওঠে। তন্মধ্যে 'প্রগতি'ও 'আর্ট কাউন্সিলে'র নাম উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠিত 'সুপ্রভা'ও 'থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠী' অদ্যাবধি নাট্যচর্চায় ভূমিকা পালন করে আসছে। সাম্প্রতিককালে জনতা নাট্যগোষ্ঠী, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী এবং সরকারিভাবে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে অনিয়মিতভাবে নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে।

খ. সংগীত

বিশ শতকের প্রথমার্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জে সংগীতচর্চার কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। কিন্তু ঘরে ঘরে সংগীতের চর্চা ঠিকই হত। সন্ধ্যার পর পথ বেয়ে চললে হারমোনিয়ামও বাঁয়া-তবলার শব্দ শোনা যেত বিভিন্ন ঘর থেকে। নববর্ষের 'হালখাতা' অনুষ্ঠানে দোকানে দোকানে জমে উঠত গানের আসর। ১৯৬০ সালের পরচাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রাতিষ্ঠানিক সংগীতচর্চা শুরু হয়। তখন দুটি প্রতিষ্ঠান সংগীতচর্চার মাধ্যম হিসেবে গড়েওঠে। প্রতিষ্ঠান দুটো হচ্ছে 'বাণী বিতান'ও 'সংগীত বিদ্যালয়'। শেখ লাল মোহাম্মদ বাণী বিতানও বাবু ক্ষীরোদ লাল রায় সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং শিক্ষক হিসেবে নবাবগঞ্জে সংগীতচর্চার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭১-এ স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যে নবতর স্পন্দন শুরু হয় সে সময় নবাবগঞ্জের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তার প্রভাব পড়ে। ১৯৭২ সালে 'সংগীতা সংগীত নিকেতন' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে নবাবগঞ্জে স্বাধীনতা-উত্তর প্রাতিষ্ঠানিক সংগীতচর্চা শুরু হয়।

Matrix BCS Series

বর্তমানেও এ প্রতিষ্ঠানটি তার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। সংগীতা সংগীত নিকেতনের পরবর্তী সময়ে নবাবগঞ্জে অসংখ্য সংগীত বিদ্যালয় গড়েওঠে এবং জেলার সংগীতচর্চায় ভূমিকা পালন করে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'উত্তরায়ন সাংস্কৃতিক পরিষদ' (১৯৭৬), 'সুরতরঙ্গ বিদ্যালয়' (১৯৮৩), 'মুক্তমহাদল' (১৯৭৫), 'সংলাপ' (১৯৯০), 'মহানন্দা সংগীত নিকেতন' (১৯৮৮), 'উদীচী' (১৯৮৪), 'থিয়েটার' (১৯৭৮), 'সুরছন্দ', 'স্বরলিপি শিল্পী গোষ্ঠী'ও 'সারগাম' উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বর্তমানে জেলা শিল্পকলা একাডেমীও শিশু একাডেমী শিশু-কিশোরদের সংগীতও নৃত্য প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

গ. চিত্রকলা

চিত্রশিল্পে নবাবগঞ্জ পিছিয়ে থাকলেও এ জেলার কৃতী সন্তান রফিকুন্নবী (রনবী নামে পরিচিত) শুধু বাংলাদেশেই নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও খ্যাতিও সম্মান লাভ করেছেন। শিবগঞ্জ উপজেলার ছত্রাজিতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণকারী 'টোকাই'র স্রষ্টা রনবী বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর 'টোকাই' আজ দেশের নির্যাতিত, নিপীড়িতও অবহেলিত মানুষের পক্ষ থেকে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া নবাবগঞ্জের চিত্রশিল্পী খাইরুল আলম, শফিকুল আলম, হাবিবুর রহমান, তসিকুল ইসলাম বকুল, রাজা খান, এস. কে সাহা পিয়াস প্রমুখ শিল্পী হিসেবে বেশ খ্যাতি লাভ করেছেন।

ঘ. লোকসংগীত

গম্ভীরাঃ গম্ভীরাচাঁপাইনবাবগঞ্জের জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। নানা-নাতির কথোপকথন এবং সংগীতের মাধ্যমে সমাজের বিবিধ অসঙ্গতির সমালোচনা করা এ গানের বৈশিষ্ট্য। নানা-নাতি ছাড়াও বেশ কয়েকজন দোহার থাকেন। তারা হারমোনিয়াম, তবলা, জুড়ি ইত্যাদি বাজিয়ে থাকেন।

আলকাপঃ আলকাপ এক ধরনের হাস্যরসাত্মক লোকসঙ্গীত। বোনাকানা নামে জনৈক ব্যক্তি এ গানের উদ্ভাবন করেন। আলকাপ ছয়টি পর্বে বিভক্ত হয়ে পরিবেশিত হয়ে থাকে। পর্বগুলো হচ্ছে- জয়ধ্বনি, আসর বন্দনা, খ্যামটা, ফার্স, বন্দনা ছড়াও পালা। আলকাপে নারী চরিত্রে সাধারণত ছেলেরা রূপদান করে থাকে। তাদের ছোকরা বলা হয়ে থাকে। সারা রাত ধরে আলকাপ অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে আলকাপের চর্চা অনেকটা কমে গেছে।

মেয়েলি গীতঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের মেয়েলি গীতগুলো স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বিয়ে বাড়িতে গীত পরিবেশন এ এলাকায় একটি অপরিহার্য বিষয়। পানচিনি, আইলপোন, মেহেন্দিপাত, গায়ে হলুদ, থুবড়া খাওয়া, স্নান, বরানুগমন, বৌ-বিদায় প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মেয়েলি গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিয়ের আনন্দের পাশাপাশি নারী জীবনের দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ-বেদনার কথা উপস্থাপিত হয়ে থাকে মেয়েলি গীতে।

Matrix BCS Series

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

১ম ধাপের মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলা পরিচিতি

Facebook Page: Matrix BCS Series

কুমিল্লা জেলা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর নং: ২

সেক্টর কমান্ডার:

- মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল- সেপ্টেম্বর);
- মেজর এ. টি. এম. হায়দার (সেপ্টেম্বর- ডিসেম্বর)

উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা:

- মীর শওকত আলী বীরউত্তম
- আব্দুল মান্নান বীরউত্তম

জেলার পুরাতন নাম: ত্রিপুরা

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৭৯০

উপজেলা: ১৭টি

ইউনিয়ন: ১৯৩টি

যে নদীর তীরে অবস্থিত: গোমতী

Matrix B

কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি:

নাম	জীবনকাল
মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুর	১৮৩৭-১৮৯৬
নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী	১৮৩৪-১৯০৩
হর দয়াল নাগ	১৮৫৩-১৯৪২
মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য	১৮৫৮-১৯৪৩
নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা	১৮৬২-১৯২২
রায়বাহাদুর আনন্দ চন্দ্র রায়	১৮৬৩-১৯২০
সৈয়দ আবদুল জব্বার	১৮৬৭-১৯৫১
নওয়াব সৈয়দ হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরী	১৮৬৮-১৯২১
অখিল চন্দ্র দও	১৮৬৯-১৯৫০
খান বাহাদুর আবিদুর রেজা চৌধুরী	১৮৮০-১৯৬১
আবদুর রসুল	১৮৭০-১৯১৭
খান বাহাদুর আবদুল করিম	১৮৭৩-১৯৪৫
নওয়াব মোশাররফ হোসেন	১৮৭৬-১৯৬৬
বসন্ত কুমার মজুমদার	১৮৭৬-১৯৪৪
নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত	১৮৭৮-১৯৬২
কামিনী কুমার দত্ত	১৮৭৯-১৯৫৯
শচীন দেববর্মন	১৯০৬-১৯৭৫
ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত	১৮৮৬-১৯৭১
ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৮৮৪-১৯৪৯
হেম প্রভা মজুমদার	১৮৮৮-১৯৬২
নওয়াব স্যার কে.জি.এম. ফারুকী	১৮৯০-১৯৮৪
আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরী	১৮৯৩-১৯৭৬
অতীন্দ্র মোহন রায়	১৮৯৪-১৯৭৯
শহীদুল হক	১৮৯৪-১৯৬৮
খান বাহাদুর মফিজউদ্দিন আহমদ	১৮৯৮-১৯৭৯
আবদুল মালেক	১৮৯৮-১৯৬৫
হাবিবুর রহমান চৌধুরী	১৮৯৯-১৯৭২
ড. আখতার হামিদ খান	১৯১৪-১৯৯৯
মেজর আবদুল গণি	১৯১৫-১৯৫৭
ডঃ মুজিবর রহমান খান	১৯২৫-১৯৮২

Matrix BCS Series

সংসদীয় আসন: ১১ টি

২৪৯	কুমিল্লা-১	মোহাম্মদ সুবিদ আলী ভূঁইয়া	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৫০	কুমিল্লা-২	সেলিমা আহমাদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৫১	কুমিল্লা-৩	ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৫২	কুমিল্লা-৪	রাজী মোহাম্মদ ফখরুল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৫৩	কুমিল্লা-৫	আবুল হাসেম খান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৫৪	কুমিল্লা-৬	আ ক ম বাহাউদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৫৫	কুমিল্লা-৭	প্রান গোপাল দত্ত	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৫৬	কুমিল্লা-৮	নাছিমুল আলম চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৫৭	কুমিল্লা-৯	মোঃ তাজুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৫৮	কুমিল্লা-১০	আ হ ম মুস্তফা কামাল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৫৯	কুমিল্লা-১১	মোঃ মুজিবুল হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

দর্শনীয় স্থান:

- শালবন বৌদ্ধ বিহার
- ময়নামতি ওয়ার সিমেট্রি
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বোর্ড)
- শাহ সুজা মসজিদ
- বীরচন্দ্র গণপাঠাগার ও নগর মিলনায়তন
- উটখাড়া মাজার
- বায়তুল আজগর জামে মসজিদ
- নূর মানিকচর জামে মসজিদ
- কবি তীর্থ দৌলতপুর (জাতীয় কবি কাজী নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত স্থান)
- গোমতী নদী
- নওয়াব ফয়জুন্নেছার স্বামী গাজী চৌধুরীর বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ

জেলার ঐতিহ্য: খাদি, রসমালাই, মৃৎশিল্প

Matrix BCS Series

এক নজরে কুমিল্লা

কুমিল্লা জেলার তথ্যাবলী: কুমিল্লা জেলা ২৩°০১' থেকে ২৩°৪৭' ৩৬" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯০°৩৯' থেকে ৯১°২২' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে বিস্তৃত। কর্কটক্রান্তি রেখা কুমিল্লা জেলা অতিক্রম করেছে।
সীমানাঃ উত্তরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা, দক্ষিণে ফেনী ও নোয়াখালী জেলা, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা, পশ্চিমে চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলা।
আয়তনঃ ৩০৮৭.৩৩ বর্গ কিলোমিটার।
আন্তর্জাতিক সীমান্ত দৈর্ঘ্যঃ ১০৬ কিলোমিটার

ভৌগলিক পরিচিতি

কুমিল্লা জেলা ২৩°০১' থেকে ২৩°৪৭' ৩৬" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯০°৩৯' থেকে ৯১°২২' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে বিস্তৃত। কর্কটক্রান্তি রেখা কুমিল্লা জেলা অতিক্রম করেছে। এই জেলার কিছু অংশ গঠিত হয়েছে প্লাবন ভূমি দ্বারা এবং কিছু অংশ পাহাড়ি বৈশিষ্ট্যময়। বাকি অংশ সমতলভূমি।

এ জেলার প্রাচীনতম শিলাভূমি লালমাই পাহাড়ের গভীরে মায়োসীন যুগের শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে যার সময় তিনকোটি, সাড়ে তিনকোটি বছরের অধিক নয়। এ জেলার অধিকাংশ এলাকার ভূ-তাত্ত্বিক গঠন হয়েছে প্লাইস্টোসীন ও হলোসীন বা বর্তমান যুগেই।

কুমিল্লা জেলার ভৌগলিক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় পার্গিটার রচিত পূর্ব-ভারতীয় দেশসমূহের প্রাচীনকালের মানচিত্রে। এই মানচিত্রে আজকের বাংলাদেশের এই অঞ্চলের দক্ষিণে সাগরনূপের, উত্তরে প্রাগজ্যোতিষ ও কিরাতসের অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে। মোটামুটি ভাবে লোহিত্য নদীর অববাহিকায় প্রাগজ্যোতিষ ও পূর্বভাগের পাহাড়ের পাদদেশের অঞ্চল কিরাতস নামে অবিহিত ছিল। লোহিত্য নদীই বর্তমানের ব্রহ্মপুত্র। জেলার মধ্যভাগের সমতল- চান্দিনা প্লাবন সমভূমিই তখনকার দিনে গঠিত হয়েছিল ব্রহ্মপুত্র বাহিত পলিদ্বারা। পরে অবশ্য নদীটি পশ্চিম দিকে সরে যায়। এই কিরাতসের মধ্য দিয়েই তিতাস নদীর গতিপথ চিহ্নিত। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রাগজ্যোতিষের পূর্বের অঞ্চল কিরাতসের অধিকাংশ স্থান নিয়েই আজকের কুমিল্লা জেলা গঠিত হয়েছে।

Matrix BCS Series

আকৃতিঃ

জেলাটি মোটামুটি ভাবে ত্রিভূজাকৃতির। দক্ষিণ দিক প্রশস্ত, উত্তর দিক সরু এবং এর মাথা পূর্ব দিকে খানিকটা ঝুকেঁ পড়েছে। মেঘনা সমভূমি হতে ত্রিপুরা পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। সমুদ্রতীর থেকে ত্রিপুরা পাহাড়ের পাদদেশের গড় উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট, আর মেঘনা সমভূমির পশ্চিম ভাগের গড় উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট। সুতরাং জেলার এই সমভূমির ঢাল মৃদু এবং পশ্চিম দিকে কুমিল্লা শহরের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত, উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত লালমাই পাহাড় এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার নিম্ন জলাভূমি ব্যতীত সমগ্র সমভূমিটিকে সাধারণ ভাবে পশ্চিম-ঢাল সম্বলিত একটি সমতল ভূমি বলা যেতে পারে। ভূ-তত্ত্ব ও ভূ-গঠন শাস্ত্রে এটি ত্রিপুরা সমতল (Tippera proper) বলে অভিহিত হত। আর এ সমভূমির অধিকাংশ এলাকাই বর্ষাকালে ৫ থেকে ১০ ফুট পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে। বর্ষায় পানির নিচে থাকলে ও এ সমভূমিতে ততটা পলি জমেনা। কারন মেঘনার পানি ততটা পলি বহন করে আনেনা। কিন্তু এ নিমজ্জিত মৃত্তিকা বেশকিছু কাল সিক্ত থাকার দরুন ভালভাবে চাষের উপযোগী হয়।

জলবায়ু, বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রাঃ

কর্কট ক্রান্তি রেখা কুমিল্লা জেলার উপর দিয়ে অতিক্রম করার জন্য এ জেলা ক্রান্তীয় অঞ্চলের অর্ন্তভূক্ত। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এখানে ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। এ জেলা বর্ষাকালে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় ও এখানকার শীতকালকে মোটামুটি ভাবে শুস্ক বলা যেতে পারে। এখানে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৮০ ইঞ্চি হতে ১২০ ইঞ্চি। শীতকালে বৃষ্টিপাত খুবই কম, এক রকম হয়না বললেও চলে। জেলার গড়তাপ ৭৮ ডিগ্রী ফাঃ। মে মাসে তাপমাত্রার গড় ৮৬ ডিগ্রী ফাঃ নামে। শীতকালে জানুয়ারী মাসের গড় ৬৬ ডিগ্রী ফাঃ নামে। তবে এপ্রিল-মে মাসে কখনও তাপমাত্রা ১০৭ ডিগ্রী ফাঃ হয় আর ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত কখনও তা ৪৫ ডিগ্রী থেকে ৪২ডিগ্রী ফাঃ এ নামে।

বনজ সম্পদঃ

কুমিল্লা জেলার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বনাঞ্চল নেই। এক কালে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী অঞ্চলে প্রচুর বনজ সম্পদ ছিল। এখন নেই বললেও চলে। কুমিল্লার কোটবাড়ী এলাকা এবং চৌদ্দগ্রাম থানার কিছু অংশে কিছু কিছু বনজ সম্পদ দেখা যায়। তবে জলবায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা, পলি গঠিত মৃত্তিকার উর্বরতা এবং অন্যান্য কারনে এ জেলার উদ্ভিদের যথেষ্ট প্রাচুর্য দেখা যায়। গাছপালার মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, তেঁতুল, বেল, বট বা অশ্বত্থ, খেজুর, নারিকেল, তাল, নিম, রয়না বা পিতরাজ, শিমুলতুলা, মান্দার, সুপারি, কদম্ব, কড়ই, শেওড়া, হিজল, গাব, জাম্বুরা, কুল,বন্য জামরুল, জারুল, জলপাই, আমড়া, গামার বা মেভডা, শাল, শিশু, ঝাউ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জেলার পটভূমি

বর্তমান কুমিল্লা চট্টগ্রাম বিভাগের অধীন একটি জেলা। প্রাচীনকালে এটি সমতট জনপদের অন্তর্গত ছিল এবং পরবর্তীতে এটি ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ হয়েছিল। এ অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শনাদি থেকে যতদূর জানা যায় খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে ত্রিপুরা গুপ্ত সম্রাটদের অধিকারভুক্ত ছিল।
ঐতিহাসিকদের মতে সপ্তম থেকে অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ অঞ্চলে বৌদ্ধ দেববংশ রাজত্ব করে। নবম শতাব্দীতে কুমিল্লা হরিকেলের রাজাগণের শাসনাধীনে আসে। প্রতপ্রমাণ হতে পাওয়া যায় যে, দশম হতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় দেড়শ বছর এ অঞ্চল চন্দ্র রাজবংশ দ্বারা শাসিত হয়েছে।

Matrix BCS Series

মধ্যবর্তী সময়ে মোঘলদের দ্বারা শাসিত হওয়ার পরে ১৭৬৫ সালে এটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে আসে। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে কোম্পানী ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ প্রদেশে একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করে। তখন কুমিল্লা ঢাকা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লাকে কালেক্টরের অধীন করা হয়। ১৭৯০ সালে ত্রিপুরা জেলা গঠনের মাধ্যমে ত্রিপুরা কালেক্টরেটের যাত্রা শুরু হয়। ১৭৯৩ সালে তৃতীয় রেগুলেশন অনুযায়ী ত্রিপুরা জেলার জন্য একজন দেওয়ানি জজ নিযুক্ত করা হয় এবং সে বছরই তাকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮৩৭ সালে ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদগুলিকে পৃথক করা হয়। ১৮৫৯ সালে আবার এই দুটি পদকে একত্রিত করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে ১৯৬০ সালে ত্রিপুরা জেলার নামকরণ করা হয় কুমিল্লা এবং তখন থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর পদটির নামকরণ হয় ডেপুটি কমিশনার। ১৯৮৪ সালে কুমিল্লার দু'টি মহকুমা চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে পৃথক জেলা হিসেবে পুনর্গঠন করা হয়।

জেলার ঐতিহ্য

কুমিল্লার খাদি

প্রাচীনকাল থেকে এই উপ-মহাদেশে হস্তচালিত তাঁত শিল্প ছিল জগদ্বিখ্যাত। দেশের চাহিদা মিটিয়ে সব সময় এই তাঁতের কাপড় বিদেশেও রপ্তানি হতো। একটি পেশাজীবী সম্প্রদায় তাঁত শিল্পের সাথে তখন জড়িত ছিলেন। তাদেরকে স্থানীয় ভাষায় বলা হতো 'যুগী' বা 'দেবনাথ'। বৃটিশ ভারতে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়কালে ঐতিহাসিক কারণে এ অঞ্চলে খাদি শিল্প দ্রুত বিস্তার লাভ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তখন খাদি কাপড় তৈরি হতো রাঙ্গামাটির তূলা থেকে। জেলার চান্দিনা, দেবিদ্বার, বুড়িচং ও সদর থানায় সে সময় বাস করতো প্রচুর যুগী বা দেবনাথ পরিবার। বিদেশি বস্ত্র বর্জনে গান্ধীজীর আহবানে সে সময় কুমিল্লায় ব্যাপক সাড়া জাগে এবং খাদি বস্ত্র উৎপাদনও বেড়ে যায়। দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে কুমিল্লার খাদি বস্ত্র। এই বস্ত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করে কুমিল্লার খাদি হিসাবে।

গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লার অভয় আশ্রম খাদি শিল্প প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুশীলন চক্রের আশ্রয় স্থল হিসেবে ছদ্ম বরণে প্রতিষ্ঠিত সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশি কাপড় বর্জনের ডাকে যখন ব্যাপক হারে চরকায় সূতা কাটা শুরু হয়। অভয় আশ্রম তখন সুলভে আশ্রমে তৈরি চরকা বাজারে বিক্রির পাশাপাশি নিজেরাও তৈরি করতে থাকে খাদি বস্ত্র। বিভিন্ন গ্রামে তৈরি খাদি বস্ত্রও এ সময় অভয় আশ্রমের মাধ্যমে বাজারজাত করতে শুরু করে।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ১৯২৬-২৭ সালে একটি ৮ হাত লম্বা ধুতি বিক্রি হতো মাত্র পাঁচশিকে দামে। সে সময় কুমিল্লা অভয় আশ্রম প্রায় ৯ লাখ টাকা মূল্যের খাদি কাপড় বিক্রি করেছিল। প্রয়াত রবীন্দ্র সংগীত বিশারদ, অভয় আশ্রমের একজন কর্মী পরিমল দত্তের লেখা থেকে জানা যায়, বিপুল চাহিদা থাকলেও অভয় আশ্রম থেকে সে চাহিদা সম্পূর্ণভাবে পূরণ হতো না।

খাদির দ্রুত চাহিদার কারণে দ্রুত তাঁত চালানোর জন্য পায়ে চালিত প্যাডেলের নীচে মাটিতে গর্ত করা হতো। এই গর্ত বা খাদ থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হতো সেই কাপড় খাদি। এভাবে খাদি নামের উৎপত্তি। ক্রমান্বয়ে এই কাপড় খাদি বা খদ্দর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

Matrix BCS Series

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় খাদি শিল্পের ছিল স্বর্ণযুগ। এর পরপরই আসে সংকটকাল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বস্ত্রকলগুলো তখন বন্ধ। বস্ত্র চাহিদা মেটাতে আমদানি নির্ভর দেশে হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ের উপর প্রচুর চাপ পড়ে। দেশের বা মানুষের চাহিদার তুলনায় খাদির উৎপাদন ব্যাপক না হলেও চান্দিনা বাজারকে কেন্দ্র করে আশ-পাশের গ্রামগুলোতে তাঁতীরা চাদর, পর্দার কাপড়, পরার কাপড় তৈরি করতে শুরু করে। স্বাধীনতার পূর্বে খাদির চাহিদা শীত বস্ত্র হিসেবে ব্যাপক ছিল। খাদি বস্ত্রের চাহিদের সুযোগে এ অঞ্চলের কতিপয় অতীত সরকারের দেয়া সুতা, রং এর লাইসেন্স গ্রহণের সুবাধে মুনাফা লুটে মধ্যস্বত্ব ভোগী হিসেবে। সুলভ মূল্যে সুতা ও রংয়ের অভাবে প্রকৃত তাঁতীরা সে সময় তাদের মূল পেশা বদল করতে বাধ্য হন। আশির দশকের মাঝামাঝি দেশে ব্যাপক হারে পাওয়ার লুম ভিত্তিক বস্ত্র শিল্প গড়ে উঠে। ফলে অতুলা জাত বস্ত্রের প্রসার ব্যাপক হারে ঘটে। বেড়ে যায় পলিয়েস্টার, রেয়ন, ভিসকম এ্যাক্রেলিক সুতার ব্যবহার। রপ্তানি মুখী তৈরি পোশাকের জন্য আমদানি হতে থাকে শুল্ক মুক্ত বিদেশি বস্ত্র। এভাবে খাদ থেকে খাদি নামের যে বস্ত্রের প্রসার ঘটেছিল তা হারিয়ে যায় বিলুপ্তির খাদে।

কুমিল্লার খাদি শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও এই শিল্প মূলত কুটির শিল্প। গ্রাম্য বধূরা গৃহস্থালি কাজের ফাঁকে ফাঁকে চরকায় সুতা কেটে তাঁতীদের কাছে বিক্রি করে বাড়তি আয়ের সুযোগ পেত। যে বৃদ্ধ লোকটি খেতে খামারে পরিশ্রম করতে পারত না, যে কিশোর- কিশোরী বাইরে শ্রম বিক্রির সুযোগ পেত না তারাও চরকায় সুতা কেটে সংসারে বাড়তি আয়ের সুযোগ পেত।

কুমিল্লার রসমালাই

উনিশ শতকে ত্রিপুরার ঘোষ সম্প্রদায়ের হাত ধরে রস মালাইএর প্রচলন হয়। সে সময় বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মিষ্টি সরবরাহের কাজটা মূলত তাদের হাতেই হত। মালাইকারির প্রলেপ দেয়া রসগোল্লা তৈরি হত সে সময়। পরে দুধ জ্বাল দিয়ে তৈরি ক্ষীরের মধ্যে ডোবানো রসগোল্লার প্রচলন হয়। ধীরে ধীরে সেই ক্ষীর রসগোল্লা ছোট হয়ে আজকের রসমালাই এ পরিণত হয়েছে।

কুমিল্লার মৃৎ-শিল্প

বাংলার লোকশিল্পের আবহমান সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অন্যতম কুমিল্লার মৃৎশিল্পের বিভিন্ন পণ্য। প্রাচীনকাল থেকেই কুমিল্লায় তৈরীকৃত গৃহস্থালি তৈজসের মধ্যে কলসি, হাঁড়ি, জালা, সরাই বা ঢাকনা, শানকি, থালা, কাপ, বদনা, ধূপদানি, মাটি নির্মিত নানা খেলনা এবং ফল, পশু-পাখি ইত্যাদি বিখ্যাত ছিল। তবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় তা ক্রমশ ম্রিয়মাণ হতে থাকলে ১৯৬১ সালে ডঃ আখতার হামিদ খান বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী এটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭৫ হাজার টাকা অনুদান দিলে সমিতিটি আবার ঘুরে দাড়ায়। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে সমবায় মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় এখানে গড়ে তোলা হয়েছে - মৃৎ-শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে বছরের বিভিন্ন সময়ে ২০জন করে বেশ কয়েকটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এক পক্ষ কালব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে একেকজন কুমার হয়ে উঠেন একেকজন দক্ষ শিল্পী।
বর্তমানে কুমোরেরা বিভিন্ন শোপিস এর পাশাপাশি ফুলের টব, বিভিন্ন ধরনের মুর্তি, সিরামিকস কালার, দীর্ঘস্থায়ী সেনেটারী লেট্রিনের চাক, পানির ট্যাংকি ,টাইলস ইত্যাদি তৈরী করছেন।

Matrix BCS Series

দর্শনীয় স্থান

- উটখাড়া মাজার.
- নূর মানিকচর জামে মসজিদ
- বায়তুল আজগার জামে মসজিদ
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)
- বীরচন্দ্র গণপাঠাগার ও নগর মিলনায়তন
- ময়নামতি ওয়ার সিমেট্রি
- শালবন বৌদ্ধ বিহার
- শাহ সুজা মসজিদ

পুরাকীর্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

শালবন বিহার

গ্রাম-শালমানপুর, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, জেলা- কুমিল্লা

কুমিল্লা শহর থেকে ৯ কিমি. পশ্চিমে লালমাই ময়নামতি নামক অনুচ্চ গিরি শ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত। বর্গাকার এই বৌদ্ধ বিহারের প্রতি বাহুর পরিমাপ ১৬৭.৬৪ মিঃ। বিহারের ৪টি বাহুতে সর্বমোট ১১৫ টি ভিক্ষু কক্ষ ছাড়াও বিহারাঙ্গনে রয়েছে ক্রুশাকার কেন্দ্রিয় মন্দির। এটিকে শেষ নির্মাণ যুগে আয়তাকার মন্দিরে রুপান্তর করা হয়। মন্দিরের দেয়াল পোড়ামাটির ফলক চিত্র দ্বারা অলংকৃত ছিল। প্রত্মতাত্ত্বিক খননে এ প্রত্মকেন্দ্রে ৬টি নির্মাণ যুগের সন্ধান পাওয়া যায় এবং ১ম নির্মাণ যুগ ৬ষ্ঠ শতক এবং শেষ নির্মাণ যুগ ১২শ শতক বলে প্রত্মতাত্ত্বিকগন মনে করেন। বিহারের উত্তর বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে বিহারের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য ১টি মাত্র প্রবেশ পথ এবং প্রবেশ পথের বাইরে উত্তর পশ্চিম পাশে আরও ১ টি ছোট আকারের মন্দির পরিলক্ষিত হয় যা বিহারের সমসাময়িক কালে নির্মিত বলে ধারণা করা হয়

রুপবান মুড়াঃ লালমাই পাহাড়, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, জেলা-কুমিল্লা

কুমিল্লা শহর হতে ৮ কিমি. পশ্চিমে লালমাই-ময়নামতি পাহাড় শ্রেণীর মধ্যবর্তী এবং কুমিল্লা কালির বাজার সড়কের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঢিবিটি সম্প্রতিকালে প্রত্মতাত্ত্বিক খনন

BCS Series

পরিচালনা করে ৩৪.১৪ মি. X ২৫ মি. পরিমাপের ১ টি বৌদ্ধ বিহার ও ২৮.৯৬ মি. X ২৮.৯৬ মি. পরিমাপের ক্রুশাকার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচন করা হয়েছে। মন্দিরের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্রকৌষ্ঠ থেকে বেলে পাথরের অভয় মুদ্রায় দন্ডায়মান বৃহদাকার ১ টি বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়। খননে প্রাপ্ত স্থাপত্য নিদর্শন ও প্রত্ন সম্পদ বিশ্লেষণে এই প্রত্নকেন্দ্রের সময়কাল পন্ডিতগণ খ্রী. ৭ম থেকে ১২শ শতাব্দী বলে অনুমান করেন।

ইটাখোলা মুড়াঃ লালমাই পাহাড় সেনানিবাস এলাকা, কুমিল্লা সদর, জেলা-কুমিল্লা

রুপবান মুড়া প্রত্নকেন্দ্রের উত্তর পাশে অবস্থিত আরও ১ টি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ প্রত্নকেন্দ্র স্থানীয়ভাবে ইটাখোলা মুড়া নামে পরিচিত। এই স্থানে সম্প্রতি খনন পরিচালনা করে ৩৯.৬২ মি. X ৩৯.৬২ মি. পরিমাপের ১টি বৌদ্ধ বিহার, ৬০.৬৬ মি. X ২৫ মি. পরিমাপের ১টি আয়তাকার মন্দির এবং বেশ কয়েকটি স্তুপের সন্ধান পাওয়া গেছে। উন্মোচিত মন্দিরটিতে মোট ৫টি নির্মাণ যুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়।

ভোজ রাজার বাড়ীঃ ময়নামতি পাহাড় সেনানিবাস এলাকা, কুমিল্লা সদর, জেলা-কুমিল্লা

এই প্রত্নকেন্দ্রটি কুমিল্লা শহর হতে ৮ কিমি. পশ্চিমে কোটবাড়ী-টিপরা বাজার ক্যান্টনমেন্ট সড়কের পশ্চিম পাশে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এটি ভোজ রাজার বাড়ী নামে পরিচিত। সম্প্রতি খননের ফলে ১টি বৌদ্ধ বিহারের আংশিক কাঠামো আবিষ্কৃত হয়েছে। বিহারটি বাহ্যিক পরিমাপ ১৭৩.৪৩ মি. X ১৭৩.৪৩ মি. এর দক্ষিণ বাহু সম্পুর্ণ খননের ফলে দু'প্রান্তে দুটি কক্ষ ছাড়াও ৩১ টি কক্ষ উন্মোচিত হয়েছে। ফলে সিড়ি কক্ষ ছাড়া বিহারে ১২৪ টি কক্ষ আছে বলে অনুমিত হয়। বিহারের উত্তর বাহুর মধ্যভাগে মুল ফটকটির আংশিক নিদর্শন উন্মোচিত হয়েছে এবং এর কেন্দ্রস্থলে প্রদক্ষিণ পথ সহ ১টি ক্রশাকার চর্তুমুখী মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্রুশাকার মন্দিরটির পরিমাপ ৪৬.৩৩ X ৪৬.৩৩ মি.। এই প্রত্নস্থানে খননের ফলে কেন্দ্রীয় মন্দির হতে ১টি ব্রোঞ্জের বৃহদাকার বুদ্ধ মুর্তি, ২টি স্থানীয় নরম পাথরে তৈরী বুদ্ধ মূর্তি এবং ১টি রৌপ্য মুদ্রা উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া অনেকগুলো পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত খননের ফলে মোট ৪টি নির্মাণ যুগের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। আবিষ্কৃত স্থাপত্য কাঠামো এবং প্রত্নসম্পদের বিবেচনায় এ নিদর্শনটির সময়কাল ৮ম হতে ১২শ শতাব্দী নিরুপন করা যেতে পারে।

Matrix BCS Series

আনন্দ বিহার: কুমিল্লা শহর থেকে ৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম এবং লালমাই ময়নামতি পাহাড়ের পূর্ব প্রান্ত ঘেঁষে অপেক্ষাকৃত নিচু ও সমতল ভূমিতে আনন্দ বিহার প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। ১৯৭৫ খ্রি: থেকে এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ শুরু করা হয়। আয়তনে এ বিহার শালবন বিহার থেকে অনেক বড়। বর্গাকারে নির্মিত এ বিহারের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ৬২৫ ফুট। প্রতি বাহুতে বৌদ্ধ ভিক্ষু কক্ষ উম্মোচিত হয়েছে। বিহারের মধ্যবর্তী স্থানে ক্রুশাকার কেন্দ্রীয় মন্দির উম্মোচিত হয়েছে। খননের ফলে এখানে বৃহদাকার একটি ব্রোঞ্জের মূর্তিসহ বিভিন্ন ধরণের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে।

কোটিলা মুড়া: কুমিল্লা সদর থেকে ৮ কিমি. এবং আনন্দ বিহার থেকে ১ কিমি. উত্তরে ময়নামতি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে এ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। খননের ফলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা ৩টি স্তুপের নির্দশন উন্মোচিত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের ত্রি-রত্ন (বৌদ্ধ,ধর্ম ও সংঘ) ৩টি স্তুপ বাংলাদেশে আর কোথায়ও পাওয়া যায়নি। প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন। ত্রি-রত্ন স্তুপের সাথে লাগোয়া পশ্চিম পাশে আরও ৯টি স্তুপ এবং পূর্ব পাশে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি ৩টি হল ঘরের নির্দশন পাওয়া যায়। এগুলোর সময়কালকে খ্রিষ্টিয় সাত-তের শতক বলে অনুমান করা হয়।

Matrix BCS

চারপত্র মুড়া: কোটিলা মুড়া থেকে প্রায় ২ কিমি. উত্তর-পশ্চিমে সেনানিবাস এলাকায় একটি উঁচু সমতল পাহাড়ের চূড়ায় এই নির্দশনটি অবস্থিত। এখানে খনন করে ছোট আকৃতির মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে এবং তিনটি নির্মাণ যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এ স্থাপত্য নিদর্শনটি নামকরণের যথার্থতা রয়েছে। খননের ফলে এখানে ৪টি তম্রলিপি পাওয়া গিয়েছে বিধায় ঢিবিটি চারপত্র মুড়া নামে অভিহিত করা হয়েছে। স্থাপত্য শৈলী অনুযায়ী এর সময়কালকে খ্রিঃ এগার-বার শতকে ন্যস্ত করা যায়।

রাণী ময়নামতি প্রাসাদ ও মন্দির: এই প্রত্নকেন্দ্রটি লালমাই ময়নামতি পাহাড় শ্রেণীর সর্ব উত্তর প্রান্তে বিচ্ছিন্ন একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। সমতল ভূমি হতে এর উচ্চতা ১৫.২৪মি.। স্থাণীয়ভাবে এটি রাণী ময়নামতি প্রাসাদ নামে পরিচিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে বৌদ্ধ ধর্মীয় ক্রুশাকার মন্দির সহ ৪টি নির্মাণ যুগের স্থাপত্য নিদর্শন উন্মোচিত হয়েছে এবং এখান থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নসম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। স্থাপত্য বৈশিষ্ট ও প্রত্নসম্পদের বিশ্লেষণে এটিকে ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর প্রাচীন কীর্তি বলে অনুমিত হয়।

রাণীর কুঠি: রাণীর কুঠি কুমিল্লা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঐতিহ্যবাহী ধর্মসাগরের উত্তর পারে ছোটরা মৌজায় অবস্থিত। এটি তদানিন্তন মহারাজা মানিক্য কিশোর বাহাদুরের স্ত্রী বাসভবন হিসেবে ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। শতাধিক বছরের পুরাতন এই বাড়িটির নাম "রাণীর কুঠি" হিসেবে তদানিন্তন ত্রিপুরা রাজ্য সহ বাংলাদেশের সকল জেলায় সর্ব সাধারনের নিকট পরিচিত। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল প্রত্নসম্পদ আইন ১৯৬৮ এর ১০ ধারার (১) উপধারার ক্ষমতা বলে রাণীর কুঠিকে সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

সতর রত্ন মন্দির: কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পূর্ব দিকে জগন্নাথপুর গ্রামে এ মন্দিরটি অবস্থিত। ত্রিপুরার মহারাজা দ্বিতীয় রত্ন মানিক্য ১৭ শতকে মন্দিরটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং ১৮ শতকে মহারাজা কৃষ্ণ মানিক্য সমাপ্ত করেন। তিন তলা এবং ১৭টি রত্ন বিশিষ্ট এ মন্দিরটি অষ্টকোণাকার ভিত্তি ভূমির উপর স্থাপিত। এর প্রতি বাহুর পরিমাপ ৭.০১ মি.। এর ভিতর গাত্রে আস্তর করা এবং দেয়ালে চিত্র দ্বারা সজ্জিত আছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর কুমিল্লা জেলা। এ জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকটবর্তী মুরাদনগর থানার বাখরাবাদে আবিষ্কৃত হয়েছে ২টি প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র। এখানে বর্তমানে ০৮ টি কূপ হতে গ্যাস উত্তোলন হচ্ছে। প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয় ১৯৮৪ সালে। আনুমানিক গ্যাস মজুদ ৩০/৩৫ মিলিয়ন কিউবিক ফিট।

এছাড়া চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় আবিষ্কৃত হয়েছে সিলিকা বালি এবং এ জেলায় ছড়িয়ে আছে বিশেষ ধরণের আঠালো কাদামাটি, যা দিয়ে তৈরি হয় নিত্য ব্যবহায্য মাটির জিনিসপত্র। আরো রয়েছে ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদ যা সেচের কাজে সহায়তা করে।

নদ-নদীঃ

কুমিল্লায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নদী রয়েছে। এখানে প্রধান নদী গোমতী। ডাকাতিয়া, কাঁকরী নামে আরো দুটি নদী ও রয়েছে। এর মধ্যে ডাকাতিয়া নতুন ও কাঁকরী প্রাচীন নদী। গোমতীর উৎপত্তি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী এলাকায়। গোমতীর দৈর্ঘ্য ১৩০.১২২ কিলোমিটার। এটি কুমিল্লার সদর, বুড়িচং, ব্রাহ্মণপাড়া, দেবিদ্বার, মুরাদনগর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দাউদকান্দি হয়ে মেঘনায় মিলেছে। গোমতীর ডান তীরে ৪১ কিলোমিটার ও বাম তীরে ৩৪.৭৫ কিলোমিটার বন্যা ব্যবস্থাপনা বাঁধ রয়েছে।

Matrix BCS

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

১ম ধাপের মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলা পরিচিতি

Facebook Page: Matrix BCS Series

চট্টগ্রাম জেলা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর নং: ১

সেক্টর কমান্ডার:

- মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন);
- মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন- ডিসেম্বর)

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধার তালিকা

- বেলায়েত হোসেন
- সিরাজুল হক (বীর প্রতীক)
- মোহাম্মেদ দিদারুল আলম (বীর প্রতীক)
- মোজাম্মেল হক (বীর প্রতীক)
- নূরুল হক (বীর প্রতীক)
- তাজুল ইসলাম (বীর প্রতীক)
- কবির আহম্মদ (বীর মুক্তিযোদ্ধা)
- আহমেদ হোসেন
- আবু তাহের মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন (বীর মুক্তিযোদ্ধা)
- আবদুল হক (বীর বিক্রম)
- আবদুল করিম

Matrix BCS

প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব

আবদুল করিম
সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ
আহমদ ছফা
আবদুল হক চৌধুরী
বেলায়েত হোসেন
শুভ রায়
আবুল ফজল
আহমদ শরীফ
আবুল ফজল (সাহিত্যিক)
সূর্য সেন
মোহাম্মদ আবুল কাসেম (ভাষা সৈনিক)

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

মাস্টারদা সূর্য সেন
কল্পনা দত্ত (যোশী)
যাত্রামোহন সেন
জহুর আহমদ চৌধুরী
এম এ হান্নান
কাজেম আলী মাস্টার
মহিমচন্দ্র দাশ
যতীন্দ্রমোহন সেন
অম্বিকা চক্রবর্তী
অনন্ত সিং
তারকেশ্বর দস্তিদার
আবদুল হক দোভাষ
ব্রজেন সেন
দীনেশ দাশগুপ্ত
অধ্যাপক পুলিন দে
কমরেড আবদুচ সত্তার
বজলুস সত্তার
আরতি দত্ত
কমরেড দেবেন সিকদার
শরদিন্দু দস্তিদার
এ কে খান
শেখ মোজাফ্ফর আহমদ
সিরাজুল হক মিয়া
মোহাম্মদ আবদুল ওহাব
আবদুল্লা আল হারুন
এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী
আহসানউল্লাহ চৌধুরী
এম এস হক
এটি এম নিজামুদ্দিন
শহীদ স্বপন চৌধুরী
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
পূর্ণেন্দু দস্তিদার
বিনোদ বিহারী চৌধুরী
এম এ আজিজ
মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী
শরৎ দাশ
কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ
শহীদ নির্মল সেন
লোকনাথ বল
গণেশ ঘোষ
নেলী সেনগুপ্তা
রফিউদ্দিন সিদ্দিকী
শরৎ কানুনগো
কালিপদ চক্রবর্তী
অমর সেন
অনঙ্গ সেন
শুধাংশু বিমল দত্ত
অধ্যাপক আসহাব উদ্দিন
অধ্যাপক ননীগোপাল দত্ত
পূর্নেন্দু কানুনগো
চৌধুরী হারুনুর রশিদ
ক্যাপ্টেন আবুল কাসেম
অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ
ফজলুল হক বি,এস,সি
আতাউর রহমান খান কায়সার
আহমেদুর রহমান আজমী
আবুল বশার
এডভোকেট চিত্ত দাশগুপ্ত
লুৎফুল হক মজুমদার
সুবেদার রজব আলী (সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক)

Matrix BCS Series

ব্রিটিশ শাসনামল থেকে চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন

মীর হামজা	মীর এয়াহিয়া
এবাদ উল্যা পন্ডিত	বঙ্কিম চন্দ্র সেন
ডাক্তর অন্নদা চরণ খাস্তগীর	ডাক্তার চন্দ্রকান্ত খাস্তগীর
ড. বেনী মাধব বড়ুয়া	প্রিয়দা রঞ্জন
সুবিমল দত্ত	বিনোদ দত্ত
রেবতী রমন দত্ত	ড.এনামুল হক
নেপাল দস্তিদার	এ আর মল্লিক
সৈয়দ আলী আহসান	আয়ুব খাঁ
চন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	বিভূতি ভট্টাচার্য
যোগেশ চন্দ্র সিংহ	ভাষা সৈনিক প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম
ভাষা সৈনিক মাহফুজুল হক	প্রিন্সিপ্যাল রেজাউল করিম
মোজাফ্ফর আহমদ	সাহিত্যিক মোবাশ্বের আলী
শরদিন্দু দত্ত	আর আই চৌধুরী
মোহাম্মদ শাহ কোরাইশী	রশিদ আল ফারুকী
সেকান্দর খান	হায়াত মাহমুদ
জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম	প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস
রনজিৎ চক্রবর্তী	প্রফেসর আনিসুজ্জমান
ড. অনুপম সেন	ড. জামাল নজরুল ইসলাম
মমতাজ উদ্দিন আহমদ	হৃদয় সেন
প্রফেসর মোহাম্মদ আলী	আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন
অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হোসেন খাঁন	প্রণতি সেন
ড. আবু ইউছুফ আলম	আবুল হায়াত চৌধুরী

এ কে এম এমদাদুল ইসলামসফিউল আলম।

ক্রীড়াবিদ হিসেবে যাঁরা বহুল আলোচিত-

কালু সিং	রেফারী ইসলাম মিয়া
ইউছুফ গণি চৌধুরী	মেকওয়া
মারী	শঙ্কর
পি আর বড়ুয়া	আবুতাহের ফুত
জয়নাল আবেদিন	শাহেদ আজগর
সুনিল দে	ইকবাল খান
আশীষ ভদ্র	শুভাস বড়ুয়া
মিনহাজুল আবেদীন নান্নু	আকরাম খান
তামিম ইকবাল	আফতাব আহমেদ

সমাজকর্মে যাঁদের রয়েছে বিশেষ অবদান

খানবাহাদুর আবদুচ ছাত্তার	খানবাহাদুর ফজলুল কাদের
রিয়াজ উদ্দিন	ক্যাপ্টেন বখতেয়ার উদ্দিন
রফিউদ্দন সিদ্দিকী	খানবাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী

Matrix BCS Series

ও আর নিজাম
নুর আহমদ চেয়ারম্যান
বাদশা মিয়া
ফজল করিম
অনিল গুহ
এডভোকেট চিত্ত দাশ
পি এইচ আমিন
প্রাণহরি চৌধুরী
যতীন্দ্র দস্তিদার
নতুনচন্দ্র সিংহ

সাংবাদিকতায় যাঁদের অশেষ অবদান রয়েছে

আবদুচ ছালাম
নুরুল ইসলাম
হাবিবুর রহমান
সাধন ধর
মঈনুল আলম
শহীদ সাবের
বি আজাদ ইসলামাবাদী
নুর সাইদ চৌধুরী
অরুণ দাশগুপ্ত
নজির আহমদ
ওবায়দুল হক
আখতার উন নবী
বিপিন চন্দ্র বড়ুয়া (সম্পাদক-বৌদ্ধ পত্রিকা ১৮৮০ সালে প্রকাশিত)
মহিম চন্দ্র দাশ (সম্পাদক-দৈনিক জ্যোতি পত্রিকা ১৯০৩ সালে প্রকাশিত)
ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক (সম্পাদক দৈনিক আজাদী ১৯৬০ সালে প্রকাশিত)

চিকিৎসা সেবায় যাঁদের রয়েছে খ্যাতি-

ডাক্তার কেশব সেন
ডাক্তার হরিহর দত্ত
ডাক্তার রবিউল হোসেন
ডাক্তার আহমদ শরীফ
ডাক্তারএম এ হাশেম
ডাক্তর এ কে এম আবু জাফর

বর্তমানে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংগঠক হিসেবে যাঁরা বিশেষ অবদান রেখে আসছেন

প্রবাল চৌধুরী
সুজত রায়
আয়ুব বাচ্চু
তপন চৌধুরী
দেওয়ান মাকসুদ আহমেদ
রনজিৎ রক্ষিত
আহমদ ইকবাল হায়দার
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর
নকিব খান
রবি চৌধুরী
পার্থ বড়ুয়া
ফকির সাহাবুদ্দিন
নাসিম আলী খান
কল্যানী ঘোষ
সনজিৎ আর্চায্য
কান্তা নন্দি
উমা খান
সৈয়দ মহিউদ্দিন

সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যাঁদের রয়েছে অসমান্য অবদান-

জ্যোতির্ময়ী চৌধুরী
কবিয়াল রমেশ শীল
চিদানন্দ দাশগুপ্ত
শিল্পী নাসির উদ্দিন
গৌরাঙ্গ রুদ্র
আশুতোষ চৌধুরী
সত্য সাহা
তেজেন সেন
প্রিয়দারঞ্জন সেনগুপ্ত
মলয়ঘোষ দস্তিদার
ডাক্তার কামাল এ খান
কবিয়াল ফনী বড়ুয়া

Matrix BCS Series

ফযেজ চৌধুরী	বুলবুল চৌধুরী
নির্মল মিত্র	অভিনেতা হাসান ইমাম
অভিনেতা মনি ইমাম	শিল্পী সাদেক নবী
শিল্পী বেলা নবী	নভেরা আহমেদ
অপর্ণা সেন	শিল্পী আহমদ হোসেন
রশিদ চৌধুরী	মর্তুজা বশির
জিয়া হায়দার	রশিদ আল ফারুকী
চিত্র শিল্পী সফিউল আলম	চিত্র শিল্পী মনসুরুল করিম
সুরেন্দ্র লাল দাশ	অভিনেত্রী সারাহ কবরী
অভিনেত্রী শাবানা	ওয়াহিদুল হক
হরি প্রসন্ন পাল	বেগম মুশতারী সফি
দেবদাশ চক্রবর্তী	আবুল কাসেম সন্দ্বীপ
সফিকুল মওলা	অচিন্ত সেন
বিনয় বাশি জলদাস	মাহবুব আলম চৌধুরী
সৈয়দ মোহাম্মদ সফি	মাহবুব হাসান
বেলাল মোহাম্মদ	ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলাম
সি এম রোজারিও	শংকর দাশ গুপ্ত
রুনু বিশ্বাস	অচিন্ত সেনগুপ্ত
কবিয়াল এয়াকুব আলী	শিব শঙ্কর মিত্র
শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব	শেফালী ঘোষ
মিহির লালা	মিহির নন্দী
আবুয়াল কাউয়াল	ফাহমিদা আমীন
অমিতাব বড়ুয়া	জগদানন্দ বড়ুয়া
কানন বড়ুয়া	নিরোদ বড়ুয়া
ভোলা সেন	প্রনব দাশ
আবদুচ ছালাম	রবিউল আলম
স্বপন চৌধুরী	আবদুল গফুর হালি
ক্যাপ্টেন আজিজুল ইসলাম	সুলতান আহমদ
মৃনাল সরকার	এম এন আখতার।

অষ্টম শতক থেকে পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য কবি ও সাহিত্যিক

কবি আবদুল হাকিম	রামজীবন বিদ্যাভূষণ
ভবানী শঙ্কর দাস	আলী রজা
নিধিরাম আচার্য	মুক্তারাম সেন
কবি চুহর	হামিদুল্লা খান
আসকর আলী পন্ডিত	রঞ্জিত রাম দাস
রামতনু আচার্য	ভৈরব আইচ
নবীন চন্দ্রদাস	নবীনচন্দ্র সেন
শশাঙ্ক মোহন সেনগুপ্ত	আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	হেমেন্দ্র বালা দত্ত

Matrix BCS Series

পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী
আশুতোষ চৌধুরী
সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
মাহাবুব আলম
আবুল ফজল
সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহ
ওহিদুল আলম
ডক্টর আবদুল করিম
আহমদ শরীফ
আইনুন নাহার
নুরুন নাহার
সুচরিত চৌধুরী
আবদুল হক চৌধুরী
আহমদ ছফা
কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া
কবি নবীন দাশ
ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া
চৌধুরী জহুরুল হক

আরাকানের রাজসভায় চট্টগ্রামের কবি

দৌলত কাজি
মহাকবি আলাওল
কোরেশী মাগন ঠাকুর

চট্টগ্রামের মধ্যযুগের কবি-সাহিত্যিক

কবি শাহ মোহাম্মদ ছগির
কবি মুজাম্মিল
কবি আফজাল আলী
সারিবিদ খান
কবীন্দ্র পরমেশ্বর
শ্রীকর নন্দি
দৌলত উজির বাহরাম খান
হাজী মোহাম্মদ
মুহাম্মদ কবির
কবি শ্রীধর
সৈয়দ সুলতান
শেখ পরান
মোহাম্মদ নসরুল্লা খাঁ
মুহাম্মদ খা
নওয়াজিশ খাঁ
করম আলী

সংসদীয় আসন: ১৬টি

২৭৮	চট্টগ্রাম-১	ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৭৯	চট্টগ্রাম-২	সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন
২৮০	চট্টগ্রাম-৩	মাহফুজুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৮১	চট্টগ্রাম-৪	দিদারুল আলম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৮২	চট্টগ্রাম-৫	আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	জাতীয় পার্টি
২৮৩	চট্টগ্রাম-৬	এ. বি. এম ফজলে করিম চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৮৪	চট্টগ্রাম-৭	মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৮৫	চট্টগ্রাম-৮	মোছলেম উদ্দিন আহমদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৮৬	চট্টগ্রাম-৯	মহিবুল হাসান চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৮৭	চট্টগ্রাম-১০	মোঃ আফছারুল আমীন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৮৮	চট্টগ্রাম-১১	এম. আবদুল লতিফ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৮৯	চট্টগ্রাম-১২	সামশুল হক চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৯০	চট্টগ্রাম-১৩	সাইফুজ্জামান চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

Matrix BCS Series

২৯১	চট্টগ্রাম-১৪	নজরুল ইসলাম চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৯২	চট্টগ্রাম-১৫	আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামউদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৯৩	চট্টগ্রাম-১৬	মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

জেলার পুরাতন নাম: **ইসলামাবাদ, চাটগাঁও**
প্রতিষ্ঠাকাল: ১৬৬৬
উপজেলা: ১৫ টি
ইউনিয়ন: ১৯১ টি
যে নদীর তীরে অবস্থিত: কর্ণফুলী

চট্টগ্রাম জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। পাহাড়, সমুদ্র, উপত্যকা, বন-বনানীর কারণে চট্টগ্রামের মতো ভৌগোলিক বৈচিত্র বাংলাদেশের আর কোন জেলার নেই।

ভৌগোলিক অবস্থান: বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্বে ২০°৩৫' থেকে ২২°৫৯' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°২৭' থেকে ৯২°২২' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ বরাবর এর অবস্থান।

ভৌগোলিক সীমানা: চট্টগ্রাম জেলার উত্তরে ফেনী জেলা এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে কক্সবাজার জেলা, পূর্ব দিকে বান্দরবান, রাঙামাটি, ও খাগড়াছড়ি জেলা, এবং পশ্চিমে নোয়াখালী জেলা এবং বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। এছাড়া দ্বীপাঞ্চল সন্দ্বীপ চট্টগ্রামের অংশ।
এক নজরে চট্টগ্রাম জেলা
আয়তন: ৫,২৮৩ বর্গ কিঃ মিঃ

উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান / স্থাপনা:

- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
- বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী (বিএমএ)
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী
- বিটিভি (চট্টগ্রাম কেন্দ্র)
- এম এ আজিজ স্টেডিয়াম
- জহুর আহম্মদ চৌধুরী স্টেডিয়াম
- চট্টগ্রাম এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন

Matrix BCS Series

ভৌগোলিক পরিচিতি

ভৌগোলিক অবস্থান:

বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্বে ২০°৩৫' থেকে ২২°৫৯' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°২৭' থেকে ৯২°২২' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ বরাবর এর অবস্থান।

ভৌগোলিক সীমানা:

উত্তরে ফেনী জেলা ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে কক্সবাজার জেলা, পূর্বে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা এবং পশ্চিমে নোয়াখালী জেলা ও বঙ্গোপসাগর। পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, উপত্যকা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে এ জেলা অন্যান্য জেলা থেকে স্বতন্ত্র।

- চট্টগ্রাম জেলার আয়তন ৫,২৮২.৯৮ বর্গ কিমি।
- বার্ষিক গড় তাপমাত্রা: সর্বোচ্চ ৩৩.৮০ সে. এবং সর্বনিম্ন ১৪.৫০ সে. ।
- বার্ষিক বৃষ্টিপাত: ৩,১৯৪ মিমি।
- প্রধান নদী: কর্ণফুলী ,হালদা ও সাঙ্গু।

জেলার ইতিহাস

সীতাকুণ্ড এলাকায় পাওয়া প্রস্তরীভূত অস্ত্র এবং বিভিন্ন মানবসৃষ্ট প্রস্তর খন্ড থেকে ধারণা করা হয় যে, এ অঞ্চলে নব্যপ্রস্তর যুগে অস্ট্রো-এশিয়াটিক জনগোষ্ঠীরবসবাস ছিল। তবে, অচিরে মঙ্গোলদের দ্বারা তারা বিতাড়িত হয় (হাজার বছরের চট্টগ্রাম, পৃ. ২৩)। লিখিত ইতিহাসে সম্ভবত প্রথম উল্লেখ গ্রিক ভৌগোলিক প্লিনির লিখিত পেরিপ্লাস। সেখানে ক্রিস নামে যে স্থানের বর্ণনা রয়েছে ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে সেটি বর্তমানের সন্দীপ। ঐতিহাসিক ল্যাসেনের ধারণা সেখানে উল্লিখিত পেন্টাপোলিশ আসলে চট্টগ্রামেরই আদিনাম। মৌর্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি নিশ্চিত নয় তবে পূর্ব নোয়াখালির শিলুয়াতে মৌর্য যুগেরব্রাহ্মী লিপিতে একটি মূর্তির পাদলিপি পাওয়া গেছে। তিব্বতের বৌদ্ধ ঐতিহাসিক লামা তারানাথের একটি গ্রন্থে' চন্দ্রবংশের শাসনামলের কথা দেখা যায় যার রাজধানী ছিল চট্টগ্রাম। এর উল্লেখ আরাকানের সিথাং মন্দিরের শিলালিপিতেও আছে।

Matrix BCS Series

তারানাথের গ্রন্থে' দশম শতকে গোপীনাথ চন্দ্র নামের রাজার কথা রয়েছে (বাংলাপিডিয়া, খন্ড ৩, পৃ২৭৬)। সে সময় আরবীয় বনিকদের চট্টগ্রামে আগমন ঘটে। আরব ভৌগলিকদের বর্ণনার 'সমুন্দর' নামের বন্দরটি যে আসলে চট্টগ্রাম বন্দর তা নিয়ে এখন ঐতিহাসিকরা মোটামুটি নিশ্চিত (হাজার বছরের চট্টগ্রাম, পৃ২৩)। সে সময় পালবংশের রাজা ছিলেন ধর্মপাল। পাল বংশের পর এ অঞ্চলে একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

৯৫৩ সালে আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজা সু-লা-তাইং-সন্দয়া চট্টগ্রাম অভিযানে আসলেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি বেশি দূর অগ্রসর না হয়ে একটি স্তম্ভ তৈরি করেন। এটির গায়ে লেখা হয় 'চেৎ-ত-গৌঙ্গ' যার অর্থ 'যুদ্ধ করা অনুচিৎ'। সে থেকে এ এলাকাটি চৈত্তগৌং হয় যায় বলে লেখা হয়েছে আরাকানীয় পুথি 'রাজাওয়াং'-এ। এ চৈত্তগৌং থেকে কালক্রমে চাটিগ্রাম, চাটগাঁ, চট্টগ্রাম, চিটাগাং ইত্যাদি বানানের চল হয়েছে (হাজার বছরের চট্টগ্রাম, পৃ২৩)। চন্দ্রবংশের পর লালবংশ এবং এরপর কয়েকজন রাজার কথা কিছু ঐতিহাসিক উল্লেখ করলেও ঐতিহাসিক শিহাবুদ্দিন তালিশের মতে ১৩৩৮ সালে সুলতান ফকর"দ্দিন মোবারক শাহ-এর চট্টগ্রাম বিজয়ের আগ পর্যন্ত ইতিহাস অস্পষ্ট। এ বিজয়ের ফলে চট্টগ্রাম স্বাধীন সোনারগাঁও রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সে সময়ে প্রায় ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম আসেন বিখ্যাত মুর পরিব্রাজক ইবনে বতুতা। তিনি লিখেছেন -"বাংলাদেশের যে শহরে আমরা প্রবেশ করলাম তা হল সোদকাওয়াঙ (চট্টগ্রাম)। এটি মহাসমূদ্রের তীরে অবস্থি'ত একটি বিরাট শহর, এরই কাছে গঙ্গা নদী- যেখানে হিন্দুরা তীর্থ করেন এবং যমুনা নদী একসঙ্গে মিলেছে এবং সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে তারা সমুদ্রে পড়েছে। গঙ্গা নদীর তীরে অসংখ্য জাহাজ ছিল, সেইগুলি দিয়ে তারা লখনৌতির লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ...আমি সোদওয়াঙ ত্যাগ করে কামর" (কামরূপ) পর্বতমালার দিকে রওনা হলাম।" ১৩৫২-৫৩ সালে ফকর"দ্দীন মোবারক শাহ এর পুত্র ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহকে হত্যা করে বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শাহ বাংলার মসনদ দখল করলে চট্টগ্রামও তার করতলগত হয়। তার সময়ে চট্টগ্রাম বাংলার প্রধান বন্দর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর হিন্দুরাজা গণেশ ও তার বংশধররা চট্টগ্রাম শাসন করে। এরপরে বাংলায় হাবসি বংশ প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ১৪৯২ সালে সুলতান হোসেন শাহ বাংলার সুলতান হোন। কিন্তু চট্টগ্রামের দখল নিয়ে তাকে ১৪১৩-১৪১৭ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজা ধনমানিক্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত রাজা ধনমানিক্যের মৃত্যুর পর হোসেন শাহ-এর রাজত্ব উত্তর আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তার সময়ে উত্তর চট্টগ্রামের নায়েব পরবগল খানের পুত্র ছুটি খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দীমহাভারতের একটি পর্বের বঙ্গানুবাদ করেন।

পর্তুগিজদের আগমন ও বন্দরের কতৃত্ব লাভঃ

১৫১৭ সাল থেকে পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে আসতে শুরু করে। বাণিজ্যের চেয়ে তাদের মধ্যে জলদস্যুতার বিষয়টি প্রবল ছিল। সুলতান প্রবলভাবে তাদের দমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু এ সময় আফগান শাসক শের শাহ বাংলা আক্রমণ করবে শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হোসেন শাহ পর্তুগিজদের সহায়তা কামনা করেন। তখন সামরিক সহায়তার বিনিময়ে ১৫৩৭ সালে পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে বাণিজ্য কুঠি নির্মান করে। একই সঙ্গে তাদেরকে বন্দর এলাকার শুল্ক আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ১৫৩৮ সালে শের শাহ-র সেনাপতি চট্টগ্রাম দখল করে। তবে, ১৫৮০ পর্যন্ত আফগান শাসনামলে সবসময় ত্রিপুরা আর আরাকানীদের সঙ্গে যুদ্ধ চলেছে।

আরাকানী শাসনঃ

১৫৮১ সাল থেকে ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম সম্পূর্ণভাবে আরাকান রাজাদের অধীনে শাসিত হয়। তবে, পর্তুগিজ জলদস্যুদের দৌরাত্ম এ সময় খুবই বৃদ্ধি পায়। বাধ্য হয়ে আরাকান রাজা ১৬০৩ ও

Matrix BCS Series

১৬০৭ সালে শক্ত হাতে পর্তুগিজদের দমন করেন। ১৬০৭ সালেই ফরাসি পরিব্রাজক ডি লাভাল চট্টগ্রাম সফর করেন। তবে সে সময় পর্তুগিজ জলদস্যু গঞ্জালেস সন্দীপ দখল করে রাখে। পর্তুগিজ মিশনারি পাদ্রি ম্যানরিক ১৬৩০-১৬৩৪ সময়কালে চট্টগ্রামে উপস্থিতকালে চট্টগ্রাম শাসক আলামেনের প্রশংসা করে যান। ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রাম মোগলদের হস্তগত হয়।

চট্টগ্রামে আরাকানী শাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রাম আরাকানীদের কাছ থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করে। জমির পরিমাণে মঘী কানির ব্যবহার এখনো চট্টগ্রামে রয়েছে। মঘী সনের ব্যবহারও দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল। সে সময়ে আরাকানে মুসলিম জনবসতি বাড়ে। আরকান রাজসভায় মহাকবি আলাওল, দৌলত কাজী, এবং কোরেশী মাগন ঠাকুর এর মতো বাংলা কবিদের সাধনা আর পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয়। পদ্মাবতী আলাওলের অন্যতম কাব্য।

মোঘল শাসনামলঃ

১৬৬৬ সালে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানকে চট্টগ্রাম দখলের নির্দেশ দেন। সুবেদারের পুত্র উমেদ খাঁর নেতৃত্বে কর্ণফুলী নদীর মোহনায় আরাকানীদের পরাজিত করে এবং আরাকানী দূর্গ দখল করে। যথারীতি পর্তুগিজরা আরাকানীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মোঘলদের পক্ষ নেয়। মোগল সেনাপতি উমেদ খাঁ চট্টগ্রামের প্রথম ফৌজদারের দায়িত্ব পান। শুরু হয় চট্টগ্রামে মোঘল শাসন। তবে মোঘলদের শাসনামলের পুরোটা সময় আরাকানীরা চট্টগ্রাম অধিকারের চেষ্টা চালায়। টমাস প্রাট নামে এক ইংরেজ আরাকানীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মোঘলদের পরাজিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কোলকাতার গোড়াপত্তনকারী ইংরেজ জব চার্নকও ১৬৮৬ সালে চট্টগ্রাম বন্দর দখলের ব্যর্থ অভিযান চালায়। ১৬৮৮ সালে কাপ্তেন হিথেরও অনুরূপ অভিযান সফল হয় নি। ১৬৭০ ও ১৭১০ সালে আরাকানীরা চট্টগ্রামের সীমান্তে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ১৭২৫ সালে প্রায় ৩০ হাজার মগ সৈন্য চট্টগ্রামে ঢুকে পড়ে চট্টগ্রামবাসীকে বিপদাপন্ন করে ফেলে। তবে শেষপর্যন্ত মোঘলরা তাদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। এই সময় মোঘলদের কারণে ইংরেজরা চট্টগ্রাম বন্দর কোনভাবেই দখল করতে পারেনি। মোঘলরা পার্বত্য এলাকার অদিবাসীদের সঙ্গে, বিশেষ করে চাকমা সম্প্রদায়ের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে সদ্ভাব বজায় রাখে।

পলাশীর যুদ্ধ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনঃ

পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর ইংরেজরা চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য নবাব মীর জাফরের ওপর চাপ সৃস্টি করে। তবে, মীরজাফর কোনভাবেই ইংরেজদের চট্টগ্রাম বন্দরের কর্তৃত্ব দিতে রাজী হোননি। ফলে, ইংরেজরা তাঁকে সরিয়ে মীর কাশিমকে বাংলার নবাব বানানোর ষড়যন্ত্র করে। ১৭৬১ সালে মীর জাফরকে অপসারণ করে মীর কাশিম বাংলার নবাব হয়ে ইংরেজদের বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম হস্তান্তরিত করেন। চট্টগ্রামের শেষ ফৌজদার রেজা খাঁ সরকারিভাবে চট্টগ্রামের শাসন প্রথম ইংরেজ চিফ ভেরেলস্ট-এর হাতে সমর্পন করেন। শুরু হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন। কোম্পানির শাসনামলে চট্টগ্রামবাসীর ওপর করারোপ দিনে দিনে বাড়তে থাকে। তবে, ১৮৫৭ সালের আগে চাকমাদের বিদ্রোহ আর সন্দীপের জমিদার আবু তোরাপের বিদ্রোহ ছাড়া ইংরেজ কোম্পানিকে তেমন একটা কঠিন সময় পার করতে হয়নি। সন্দীপের জমিদার আবু তোরাপ কৃষকদের সংগঠিত করে ইংরেজদের প্রতিরোধ করেন। কিন্তু ১৭৭৬ সনে হরিষপুরের যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হলে সন্দীপের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। অন্যদিকে ১৭৭২ থেকে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত চাকমারা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সম্মুখ সমরে চাকমাদের কাবু করতে না পেরে ইংরেজরা তাদের বিরুদ্ধে কঠিন অর্থনৈতিক অবরোধ দিয়ে শেষ পর্যন্ত চাকমাদের কাবু করে। ইংরেজরা আন্দরকিল্লা জামে মসজিদকে গোলাবারুদের গুদামে পরিণত করলে চট্টগ্রামবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

Matrix BCS Series

মসজিদের জন্য নবাবী আমলে প্রদত্ত লাখেরাজ জমি ১৮৩৮ সালের জরিপের সময় বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ খান কলিকাতায় গিয়ে গভর্নরের কাছ থেকে এটি উদ্ধার করেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের সময় ৩৪তম বেঙ্গল পদাতিক রেজিমেন্টের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোম্পানীগুলি চট্টগ্রামে মোতায়েন ছিল। ১৮ নভেম্বর রাতে উল্লিখিত তিনটি কোম্পানী বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং জেল থেকে সকল বন্দী মুক্ত করে। হাবিলদার রজব আলী ও সিপাহী জামাল খান এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। সিপাহিরা ৩টি সরকারি হাতি, গোলাবারুদ ও ধনসম্পদ নিয়ে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে। তারা পার্বত্য ত্রিপুরার সীমান্ত পথ ধরে এগিয়ে সিলেট ও কাছাড়ে পৌঁছে। ইংরেজ কোম্পানির অনুরোধে ত্রিপুরা রাজ তাদের বাঁধা দেন। এভাবে বিভিন্ন স্থানে লড়াই সংগ্রাম এবং রসদের অভাবে বিদ্রোহীরা অনেকখানি কাবু হয়ে পড়ে। শেষে ১৮৫৮ সালের ৯ জানুয়ারি সিলেটের মনিপুরে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে এক লড়াই-এ চট্টগ্রাম সেনা বিদ্রোহের অবসান হয়।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনঃ

১৮৯২, ১৮৯৬ ও ১৯০১ সালে চট্টগ্রামকে বাংলা থেকে পৃথক করে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেয় ইংরেজ সরকার। এই প্রচেষ্টার প্রতিরোধে চট্টগ্রামে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। একটি ১৮৯৫-৯৬ সালে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন জোরদার ও ১৯০২ সালে চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মিলন নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা। ১৯০২ সালের ২৯ ও ৩০ মার্চ প্যারেড ময়দান-এ সংস্থার প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন যাত্রা মোহন সেন।

১৯৩০ সালে মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে কয়েকজন স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী ব্রিটিশ পুলিশ ও সহায়ক বাহিনীর চট্টগ্রামে অবস্থিত অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের চেষ্টা চালায়।১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল অভিযান শুরু হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী পুলিশ অস্ত্রাগারের এবং লোকনাথ বাউলের নেতৃত্বে দশজনের একটি দল সাহায্যকারী বাহিনীর অস্ত্রাগারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা গোলাবার"দের অবস্থান শনাক্ত করতে ব্যর্থ হন। বিপ্লবীরা সফলভাবে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হন এবং রেল চলাচল বন্ধ করে দেন। সফল বিপ্লবের পর বিপ্লবী দলটি পুলিশ অস্ত্রাগারে সমবেত হন এবং সেখানে মাস্টারদা সূর্য সেনকে মিলিটারী স্যালুট প্রদান করা হয়। সূর্য সেন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করেন। ভোর হবার পূর্বেই বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম শহর ত্যাগ করেন এবং নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে যাত্রা করেন এবং পাহাড়ের গায়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কয়েক দিন পরে পুলিশ বিপ্লবীদের অবস্থান চিহ্নিত করে। ২২ এপ্রিল ১৯৩০ সালে কয়েক হাজার সৈন্য চট্টগ্রাম সেনানিবাস সংলগ্ন জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেয়া বিপ্লবীদের ঘিরে ফেলে। প্রচন্ড যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর ৭০ থেকে ১০০ জন এবং বিপ্লবী বাহিনীর ১২ জন শহীদ হন। সূর্য সেন ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে তার লোকজনকে পার্শ্ববর্তী গ্রামে লুকিয়ে রাখে এবং বিপ্লবীরা পালাতে সক্ষম হয়। কলকাতা পালিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন গ্রেফতার হয়। কয়েকজন বিপ্লবী পুনরায় সংগঠিত হয়।

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সালে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করে এবং এক মহিলা মারা যায়। কিন্তু তাদের পরিকল্পনায় বিপর্যয় ঘটে এবং বেশ কিছু বিপ্লবী নিহত হন ও আহতাবস্থায় ধরা পড়েন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সায়ানাইড গলাধঃকরন করে আত্মহত্যা করেন। ব্রিটিশরা সূর্য সেনকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখে। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি রাতে পটিয়া থেকে ৫ মাইল দূরে গৈরালা নামক স্থানে আত্মগোপনে থাকাকালীন এক বৈঠক থেকে অস্ত্রসহ সূর্য সেন ধরা পড়েন। সূর্য সেনকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের

মামলায় প্রধান আসামি বলিয়া অভিহিত করা হয়। সূর্য সেনের বিচারের জন্য ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১/১২১এ ধারা অনুযায়ী স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৪ আগষ্ট ১৯৩৩ সালে ট্রাইব্যুনাল সূর্য সেনকে ১২১ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদন্ডে দন্ডিত করেন। কলকাতা হাইকোর্টে আপীল করা হলে ১৪ নভেম্বর ১৯৩৩ সালে প্রদত্ত রায়ে হাইকোর্ট স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের দেয়া দন্ড বহাল রাখে। ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি মধ্যরাতে সূর্য সেনের ফাঁসী কার্যকর করা হয়।

পাকিস্তান শাসনামল ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে চট্টগ্রাম:

১৯৫১ সালের ১৬-১৯ মার্চ চট্টগ্রামের হরিখোলার মাঠে ৪ দিনব্যাপী সংস্কৃতি সম্মেলনে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সভাপতির যে ভাষণটি প্রদান করেন সেটি পূর্ব বাংলার স্বাধিকার চিন্তা ও জাতির সাংস্কৃতিক ধারাকে বেগবান করে তোলে। ঐ ভাষণে তিনি বলেন, 'মানুষে মানুষে বিভেদ আছে সত্য। এই বিভেদকে জয় করাই শক্তি। সংস্কৃতি ঐক্যের বাহন, বিভেদের চামুণ্ডা নয়।' ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ড় আন্দোলন-সংগ্রামের তুঙ্গপর্বে চট্টগ্রামের এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন দেশব্যাপী লেখক-বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীদের ব্যাপক অনুপ্রেরণা দেয়। এই সম্মেলনের প্রভাবে চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক ও শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনও জোরদার হয় এবং পাকিস্তানের শাসক শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রবল হয়ে ওঠে।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পর ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দিন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'-এ ঘোষণা দিলে সারা পূর্ব বাংলায় বিক্ষোভ শুরু হয়। চট্টগ্রামে ৪ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়। আন্দরকিল্লায় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। তরুণ সাহিত্যিক মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীকে আহ্বায়ক, আওয়ামী মুসলিম লিগ চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক এম এ আজিজ ও রেল শ্রমিক নেতা চৌধুরী হার"নর রশিদকে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়। কমিটিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ক্লাব, যুব সম্প্রদায়, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও শ্রমজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত হন। চট্টগ্রামে ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকাও ছিলো উল্লেখযোগ্য, ৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। আবদুল্লাহ আল হার"নকে আহ্বায়ক, মোহাম্মদ আলী ও ফরিদ উদ্দিন আহমদকে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়। চট্টগ্রামের ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। ভাষা আন্দোলনের ডাক চট্টগ্রামের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতৃত্বের পাশাপাশি রাজনীতিসচেতন শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী ও তর"ণ লেখকরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। তারা চট্টগ্রাম শহর ও গ্রামাঞ্চলে গণসংগীত, কবিগান ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের মর্মবাণী ও পূর্ব বাংলার মানুষের জাতীয়তাবাদী ও স্বাধিকার চেতনা ছড়িয়ে দেন।

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রাক্কালে ২৩ ও ২৪ মার্চ সোয□াত জাহাজ থেকে পাকিস্ড়নিরা অস্ত্র নামানোর বির"দ্ধে শ্রমিক জনতার রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র লুট করে চট্টগ্রামের খালাসিরা বিরাট অবদান রাখেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা প্রচারে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

Matrix BCS Series

চট্টগ্রাম জেলার ১৫টি উপজেলার নামঃ

০১ । আনোয়ারা	০২ । বাঁশখালী	০৩ । বোয়ালখালী
০৪ । চন্দনাইশ	০৫ । ফটিকছড়ি	০৬ । হাটহাজারী
০৭ । লোহাগড়া	০৮ । মীরসরাই	০৯ । পটিয়া
১০ । রাঙ্গুনিয়া	১১ । রাউজান	১২ । সন্দ্বীপ
১৩ । সাতকানিয়া	১৪ । সীতাকুন্ড	১৫ । কর্ণফুলী

চট্টগ্রাম জেলা ৪১ ওয়ার্ড বিশিষ্ট ১টি সিটি কর্পোরেশন, ১৪টি উপজেলা, ২৭টি থানা, ১৩টি পৌরসভা, ১৯৪টি ইউনিয়ন, ১২৬৭টি গ্রাম, ৮৯০টি মৌজা, ১৬টি সংসদীয় আসন নিয়ে গঠিত।

চট্টগ্রাম শহর এলাকা ১৬টি থানার অধীনঃ চান্দগাঁও, বায়জীদবোস্তামী, বন্দর, ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, কোতোয়ালী, পাহাড়তলী, পাঁচলাইশ, বাকলিয়া, কর্ণফুলী, হালিশহর, খুলশী থানা এবং নবগঠিত চকবাজার,আকবরশাহ, সদরঘাট ও ইপিজেড।

পৌরসভা সমূহ: মীরসরাই পৌরসভা, বারৈয়ারহাট পৌরসভা, সীতাকুন্ড পৌরসভা, ফটিকছড়ি পৌরসভা, হাটহাজারী পৌরসভা, সন্দ্বীপ পৌরসভা, রাউজান পৌরসভা, রাঙ্গুনিয়া পৌরসভা, পটিয়া পৌরসভা, বাঁশখালী পৌরসভা, সাতকানিয়া পৌরসভা, চন্দনাইশ পৌরসভা, বোয়ালখালী পৌরসভা

Matrix BCS

জেলার ঐতিহ্য:

দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে স্বীকৃত চট্টগ্রামের হাজার বছরের পুরাতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী। বারো আউলিয়ার পুণ্যভূমি, প্রাচ্যের রাণী বীর প্রসবিনী, আধ্যাত্মিক রাজধানী, বন্দরনগরী, আন্তর্জাতিক পর্যটন নগরী, কল্যাণময় নগরী এমন অসংখ্য নামে পরিচিত এই চট্টগ্রাম।

জেলার নামকরণের ইতিহাসঃ

কথিত আছে, আজ থেকে বহু বছর পূর্বে চট্টগ্রাম ছিল বনজঙ্গল দিয়ে ঘেরা, বিভিন্ন হিংস্র প্রাণীর অভয়ারণ্য এবং জিন-ভূতের আখড়া। হযরত বদর আউলিয়া আরব রাজ্য থেকে পাথরে ভেসে এখানে এসে একটি চাটির প্রজ্জ্বলন করেন। তার আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায় এই অঞ্চল জিন-ভূতমুক্ত হয়। একটি চাটি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে পুরো অঞ্চল সব প্রতিকূলতা থেকে মুক্তি লাভ করায় এই জায়গার নাম হয়েছে চাটিগাঁ থেকে চাটগাঁ, পরে চট্টগ্রাম। এখনো জামালখান এলাকার বদর আউলিয়ার সেই স্মৃতিবিজড়িত জায়গার স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান। যা চেরাগী পাহাড় নামে পরিচিত। চাটি মানে চেরাগ। তাই এই পাহাড়ের নাম চেরাগী পাহাড়।

চট্টগ্রাম নামকরণের আরো একটি ইতিহাস রয়েছে। ইতিহাসবিদদের মতে, চট্টগ্রাম নামের উৎস অনুসন্ধানে দ্রাবিড় যোগসূত্র রয়েছে। চট্ট' চাটি বা চাডি দ্রাবিড়জাত ভাষার প্রকাশ। চোট্টি' চেট্টি ইত্যাদি শব্দও সাদৃশ্য। এই শব্দ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার আগে চট্টগ্রামের নামকরণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পর্যটক, পরিব্রাজক ও পন্ডিতগণ লিখিত বিবরণ এবং অঙ্কিত মানচিত্রে চট্টগ্রামকে বিভিন্ন নামে খ্যাত করেছিলেন। যেমনঃ চিৎ-তৌং-গং, শ্যাংগাঙ্গ, চৈত্যগ্রাম, চট্টল, চাটিগ্রাম, চাটিগাঁও, চতুর্গ্রাম, চাটিগাঁ, সোদকাওয়ান, চাটিকিয়াং, শাতজাম, জেটিগা, দেবগাঁ, দেবগাঁও ইত্যাদি। এতদঞ্চলে জনবসতি গড়ে ওঠার শুরু থেকেই একের পর এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। বাংলায় এ অঞ্চল থেকেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল।

প্রাচীন মসজিদের ইতিহাসঃ

চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লার সাথে মোঘলদের চট্টগ্রাম বিজয়ের কাহিনী সম্পর্কিত। এই কেল্লায় আরাকানি মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের আস্তানা ছিল। মোঘলরা মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপর বিজয় অর্জন করে। ১৬৬৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে শায়েস্তা খাঁয়ের পুত্র উমেদ খাঁ আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদ নির্মাণের পর থেকেই চট্টগ্রামের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান হয়ে উঠে। এই মসজিদের ইমাম-খতিব নিযুক্ত হতেন পবিত্র মদিনার আওলাদে রাসুল (রা.) গণ। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই এই মসজিদ জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য যে, এই মসজিদে প্রতি জুম্মায় চট্টগ্রাম ও এর আশপাশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও মুসল্লিরা এসে নামাজ আদায় করতেন এবং পবিত্র মাহে রমজানের শেষ জুমায় কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকেও মানুষের সমাগমের নজির আছে। রোজা, ফিতরা এবং ঈদের চাঁদ দেখা প্রশ্নে এই মসজিদের ফয়সালা চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনগণ মেনে চলত অবধারিতভাবে। আন্দরকিল্লা জামে মসজিদের স্থাপত্য ও গঠন মুঘল রীতি অনুযায়ী তৈরি। মসজিদটি নির্মাণ কৌশলগত দিক থেকে দিল্লির ঐতিহাসিক জামে মসজিদের প্রায় প্রতিচ্ছবি হওয়ায় এটি চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলিম স্থাপত্য বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রার জন্ম দেয়। শুধু স্থাপত্য নিদর্শনেই নয়, শৈল্পিক দিক থেকেও এই মসজিদ উল্লেখ্য। কারণ চট্টগ্রামে মুসলিম বিজয়ের স্মারকস্বরূপ হিসেবে শিলালিপিভিত্তিক যেসব স্থাপনা আছে, সেগুলোর মাঝে আন্দরকিল্লা জামে

Matrix BCS Series

মসজিদের গায়ের শিলালিপি অন্যতম। এই শিলালিপি থেকে এর প্রতিষ্ঠাতার নামও পাওয়া যায়। এই মসজিদে পাওয়া সব শিলালিপির সঙ্গে সিরিয়ার রাক্কা নগরের স্থাপত্যকলার মিল পাওয়া যায়।

হাশেমি বংশের পদচারণাঃ

রাসুল (সা.)-এর জামানায় আরবের সেরা বংশ ছিল কুরাইশ। এই কুরাইশ বংশ দুটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। ১. হাশেমি গোত্র, ২. উমাইয়া গোত্র। হাশেমি গোত্র ছিল ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ। বিশ্বনবী রাসুল (সা.) এই হাশেমি গোত্রেই জন্ম লাভ করেন। আউলিয়া কেরামের স্মৃতিধন্য চট্টগ্রাম জেলার তৎকালীন পাঁচলাইশ বর্তমানে বায়েজিদ বোস্তামী থানার অন্তর্গত জালালাবাদের এক ধর্মভীরু সম্ভ্রান্ত মুসলিম কাজী পরিবারে হাশেমি বংশে আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমি জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষ ইমাম হোসাইন (রা.)-এর বংশধর। তার পিতার পূর্বপুরুষ মদিনা শরিফ হতে হিজরত করে বাগদাদে আসেন। ওখান থেকে দিল্লির বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব আলমগীরের আমলে প্রধান বিচারপতি হয়ে দিল্লিতে আসেন। দিল্লি থেকে নবাবি আমলে ইসলাম খাঁর অনুরোধে কাজীর দায়িত্ব গ্রহণ করে বিশেষত ইসলাম প্রচারের নিমিত্তে চট্টগ্রামে তসরিফ আনেন।

ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপনাসমূহঃ

চট্টগ্রামের সুদৃশ্য দালানকোঠা, মসজিদ ও পবিত্র সৌধসমূহ অতীতকাল হতে বর্তমান পর্যন্ত এর ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। নগরীর পুরানো ও নতুন অধিকাংশ ইমারত নিচু পাহাড় ও টিলার উপরে এবং উপত্যকা ও সমভূমিতে নির্মিত। দেওয়ানি আদালত, ফৌজদারি আদালত এবং বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, জেলা ও দায়রা জজের কার্যালয় সম্বলিত বিশাল কোর্ট বিল্ডিং পরীর পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। এ পাহাড়ের শীর্ষদেশ হতে নিচে শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করা যায়। যে কেউ মোহনা পর্যন্ত কর্ণফুলি নদী এবং এর তীর ধরে বন্দর এলাকা, দক্ষিণ দিকে দিয়াঙ ও বাঁশখালী পর্বতশ্রেণী এবং পূর্ব দিকে পার্বত্য অঞ্চল দেখতে পারে। পাহাড়ের পাদদেশ ধরে জেনারেল পোষ্টঅফিস, মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল, নিউমার্কেট এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভবন অবস্থিত। রংমহল পাহাড় শীর্ষে জেনারেল হাসপাতাল অবস্থিত। টেমপেস্ট হিলস নামে পরিচিত এক পর্বতশ্রেণীর শীর্ষে টেলিগ্রাফ অফিস, বিভাগীয় বন কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারের বাসভবন অবস্থিত।

বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের সদর দফতর চট্টগ্রামে অবস্থিত। ১৮৯১ সালে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এ রেলপথ পরবর্তী সময়ে পূর্ববাংলা রেলওয়ে এবং ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় রেলওয়ে নামে পরিচিত হয়। চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন থেকে পাহাড়তলি পর্যন্ত এলাকা এবং পাহাড়ের পাদদেশ ধরে রেলপথ উত্তর দিকে চলে গেছে; রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এ পুরো এলাকার উন্নয়ন সাধন করেছে। এ এলাকা রেলওয়ে কলোনি নামে পরিচিত এবং নগরীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় এলাকার অন্যতম। পাহাড়ের উপরে সুবিধাজনক স্থানে সুদৃশ্য বাংলোগুলি নির্মিত হয়েছে। রেলওয়ে ক্লাব, কর্মচারীদের আবাসিক ভবনসমূহ, রেলওয়ের প্রধান অফিস, রেলওয়ে হাসপাতাল, পাহাড়তলি ওয়ার্কশপ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি এ এলাকাতে অবস্থিত।

নগরীর এক মনোরম স্থানে ১৯১৩ সালে ইংরেজরা চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস নির্মাণ করে। পরবর্তী সময়ে এটিকে এক প্রাসাদোপম অট্টালিকার রূপ দিয়ে ভ্রমণরত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের অস্থায়ী নিবাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বাদশা মিয়া সড়কে অবস্থিত চট্টগ্রাম ওয়ার সিমেট্রি অপর একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইন্দো-বার্মা রণাঙ্গনে আত্মদানকারী মিত্রবাহিনীর ৭৫৫ জন সৈনিকের সমাধি রয়েছে। এখানে সমাধিস্থ সৈনিকদের অধিকাংশই ছিলেন অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, কানাডা, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা,

Matrix BCS Series

ব্রিটিশ ভারত ও নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী। মোট ছয় একর জায়গার উপর বিস্তৃত সমাধিস্থলটির রক্ষণাবেক্ষণ করে কমনওয়েলথ গ্রেভস কমিশন।

চট্টগ্রামে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসার জন্য অপর একটি প্রসিদ্ধ স্থান হচ্ছে চাকতাই। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে কর্নফুলী নদীর তলদেশ থেকে জেগে ওঠা একটি পুরাতন ও পরিত্যক্ত স্থলভাগ। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা চাকতাই খাল নামে পরিচিতি একটি খালপথে নৌকা ও সাম্পান যোগে তাদের মালামাল এখানে নিয়ে আসে। ধনী ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ অফিস, ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অফিসগুলি এখানে অবস্থিত।

'৭১-এর আন্দোলনে চট্টগ্রামঃ

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রাক্কালে সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র লুট করে চট্টগ্রামের খালাসিরা বিরাট অবদান রাখেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা প্রচারে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

চট্টগ্রামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিঃ

চট্টগ্রাম হাজার বছরের পুরনো নিজস্ব এক অনন্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক। নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে চট্টগ্রাম উপমহাদেশে অনন্য এক ঐতিহাসিক স্থান। উল্লেখ্য, কলকাতায় তাদের সাহিত্য সংস্কৃতি রক্ষায় গড়ে ওঠার দেড় বছর আগে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী শিক্ষার বিস্তার, দেশীয় শিল্প রক্ষা, প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন, সংবাদপত্র প্রকাশের মতো গঠনমূলক কর্মকান্ড তখন থেকেই আরম্ভ হয়। দেশীয় শিল্পের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নলিনী কান্ত সেনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় শিল্প রক্ষিণী সমিতি। তার প্রচেষ্টায় সেসময় অধ্যয়নী সম্মিলনী নামে একটি পাঠাগার স্থাপিত হয়েছিল। এটাই চট্টগ্রামের প্রথম পাবলিক লাইব্রেরি।

১৯২৬ সালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রথমবারের মতো হেমন্ত কুমার সরকারের সঙ্গে চট্টগ্রামে এসেছিলেন। হেমন্ত কুমার দেশবধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ পার্টির চীফ হুইপ এবং নেতাজি সুভাষ বসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ১৯২৯ সালে তিনি দ্বিতীয়বার চট্টগ্রাম আসেন এবং মুসলিম শিক্ষা সোসাইটির ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ভিক্টোরিয়া ইসলামী হোস্টেলে উপস্থিত ছিলেন।

কাট্টলি ইউনিয়ন ক্লাব নজরুলকে এক বিশাল সংবর্ধনা দেয় যেখানে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ১৯৩৩ সালে কবি নজরুল তৃতীয়বারের মতো চট্টগ্রাম আসেন প্রধান অতিথি হিসাবে রওজানে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম জেলা সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে। চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণে কবির আগমন ছিল অনুপ্রেরণাদায়ক।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হয়েছে অসংখ্য গান; যা শুধু এ অঞ্চল নয় সমাদৃত হয়েছে বিশ্বপরিমন্ডলে। সংগীত, নৃত্য, নাটক, যাত্রাপালা, কবিগান, লোক-সংগীতের চর্চা এতদঞ্চলে বরাবরই হয়ে আসছে। শিল্পে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক অঙ্গনেও চট্টগ্রাম অঞ্চল শুধু বাংলাদেশে নয় উপমহাদেশে বিখ্যাত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও এ অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাহাড়-পর্বত, নদী, প্রাকৃতিক ঝরনাসহ অসংখ্য ছোট-বড় সবুজ বনানী চট্টগ্রামকে করেছে অনন্য। সুলতানি এবং মোগল আমলের বেশ কয়েকটি বড় বড় দিঘি রয়েছে চট্টগ্রামে। এর মধ্যে পরাগল খাঁর দিঘি, ছুটি খাঁর দিঘি, নসরত বাদশার দিঘি, আলাওলের দিঘি, মজলিশ বিবির দিঘি, আসকার খাঁর দিঘি, হম্মাদ্যার দিঘি উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক এ বিরল সম্পদগুলো চট্টগ্রামের সৌন্দর্য শতগুণ বৃদ্ধি করেছে।

Matrix BCS Series

পুরাকীর্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ,
বাংলাদেশের চট্টগ্রামে অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য।

ইতিহাস:

চট্টগ্রামের চাটগছার আন্দরকিল্লার সাথে মোঘলদের চট্টগ্রাম বিজয়ের কাহিনী সম্পর্কিত। এই কিল্লা বা কেল্লায় মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের আস্তানা ছিলো। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি শায়েস্তা খাঁ'র ছেলে উমেদ খাঁ এই আন্দরকিল্লার অন্দরে বা ভিতরে প্রবেশ করলে এর নাম হয়ে যায় "আন্দরকিল্লা"। চট্টগ্রাম বিজয়ের স্মৃতি ধরে রাখতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে শায়েস্তা খাঁ ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে নির্মাণ করেন "আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ"।

১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের আরেক শাসনকর্তা নবাব ইয়াসিন খাঁ, এই জামে মসজিদটির কাছাকাছি, পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের একটি টিলার উপর আরেকটি পাকা মসজিদ নির্মাণ করে তাতে "কদম-রসূল" রাখলে সাধারণ্যের কাছে ঐ মসজিদটি গুরুত্ব পেয়ে যায় এবং আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ লোকশূণ্য হয়ে পড়ে। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, এই মসজিদটিকে গোলাবারুদ রাখার গুদাম হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক হামিদুল্লাহ খাঁ'র আবেদনের প্রেক্ষিতে মসজিদটি মুসলমানদের জন্য আবারও উন্মুক্ত হয়।

বিবরণ:

১৬৬৭ সালে এই মসজিদ নির্মাণের পর থেকেই চট্টগ্রামের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান হয়ে উঠে আন্দরকিল্লার এই মসজিদ। এই মসজিদের ইমাম/খতিব নিযুক্ত হতেন পবিত্র মদিনার আওলাদে রাসুল (রাঃ) গন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই এই মসজিদ জনপ্রিয় হয়ে পরে। বলা বাহুল্য যে, এই জুমা মসজিদে প্রতি জুম্মায় চট্টগ্রাম ও এর আশেপাশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও মুসল্লিরা এসে নামায আদায় করতেন এবং পবিত্র মাহে রমজানের শেষ জুমায় কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকেও মানুষের সমাগমের নজির আছে। রোজা, ফিতরা এবং ঈদের চাঁদ দেখা প্রশ্নে এই মসজিদের ফয়সালা চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনগণ মেনে চলত অবধারিতভাবে। আন্দরকিল্লা জামে মসজিদের স্থাপত্য ও গঠন মোঘল রীতি অনুযায়ী তৈরি। সমতল ভুমি থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট উপরে ছোট্ট পাহারের উপর এর অবস্থান। মূল মসজিদের নকশা অনুযায়ী এটি ১৮ গজ (১৬ মিটার) দীর্ঘ, ৭.৫ গজ (৬.৯ মিটার) প্রস্থ এবং প্রতিটি দেয়াল প্রায় ২.৫ গজ (২.২ মিটার) পুরু। পশ্চিমের দেয়াল পোড়া মাটির তৈরি এবং বাকি তিনটি দেয়াল পাথরের তৈরি। মধ্যস্থলে একটি বড় গম্বুজ এবং দুটি ছোট গম্বুজ দ্বারা ছাদ আবৃত। ১৬৬৬ সালে নির্মিত এর চারটি অষ্টভূজাকৃতির বুরুজগুলির মধ্যে এর পেছনদিকের দুটি এখন বিদ্যমান। মসজিদটির পূর্বে তিনটি ও উত্তর এবং দক্ষিণে একটি করে মোট ৫টি প্রবেশদ্বার রয়েছে। মসজিদটিতে তিনটি মেহরাব থাকলেও সাধারণত মাঝের ও সর্ববৃহৎ মেহরাবটিই ব্যবহরিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, মসজিদটি নির্মাণ কৌশলগত দিক থেকে দিল্লির ঐতিহাসিক জামে মসজিদের প্রায় প্রতিচ্ছবি হওয়ায় এটি চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলিম স্থাপত্য বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রার জন্ম দেয়। এই মসজিদটি দিল্লি জামে মসজিদের আদলে বড় বড় পাথর ব্যবহার করে নির্মিত বলে এই মসজিদকে পাথরের মসজিদ-"জামে সঙ্গীন"ও বলা হয়ে থাকে। শুধু স্থাপত্য নিদর্শনেই নয়...... শৈল্পিকদিক থেকেও এই মসজিদ উল্লেখ্য। কারন চট্টগ্রামে মুসলিম বিজয়ের স্মারকস্বরূপ হিশাবে শিলালিপি ভিত্তিক জেসব স্থাপনা আছে, সেইগুলোর মাঝে আন্দরকিল্লা জামে মসজিদের গায়ের শিলালিপি অন্যতম। মসজিদের মূল ইমারতের প্রবেশপথে কালো পাথরের গায়ে খোদাইকৃত সাদা অক্ষরে লেখা ফার্সি লিপির বঙ্গানুবাদ জা দাড়ায় তা হলঃ "হে জ্ঞানী, তুমি জগতবাসীকে বলে দাও, আজ এ দুনিয়ায় ২য় কাবা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার প্রতিষ্ঠাকাল ১০৭৮ হিজরি (১৭৬৬ সাল)। " এই শিলালিপি থেকে এর প্রতিষ্ঠাতার নামও পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, এই মসজিদে পাওয়া সকল শিলালিপির সাথে সিরিয়ার "রাক্কা নগর"-এর স্থাপত্যকলার মিল পাওয়া যায়।

Matrix BCS Series

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার চট্টগ্রামের নন্দন কাননে অবস্থিত। বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে এই বিহার প্রতিষ্ঠা করে। এই বিহার বাংলাদেশের বৌদ্ধদের অন্যতম পূণ্যস্থান হিসাবে বিবেচিত হয়।

ইতিহাস

শতাব্দী পুরাতন বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির (তৎকালীন চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি) প্রথম সভাপতি শ্রীমৎ উ. গুনামেজু মহাথের এবং সাধারণ সম্পাদক নাজিরকৃষ্ণ চৌধুরী বিহার স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। প্রাথমিকভাবে ভক্ত এবং পূজারীদের আর্থিক সহযোগিতায় ভবনটির একতলা নির্মিত হয়। ১৯০৩ সালে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লাস্থ রংমহলপাহাড়ে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালনির্মাণের জন্য মাটি খননকালে একটা পুরাতন বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়। বিহারেরসে সময়ের অধ্যক্ষ অগ্ গমহা পন্ডিত-উ-ধম্মবংশ মহাথের এর তৎপরতার কারণে মূর্তিটি বঙ্গীয় সরকার এ বিহারে প্রদান করে। বিহারের মূল ভবনটির পাশেই অপর একটি মন্দিরে মূর্তিটি স্থাপন করা হয়। এটি "বুড়াগোঁসাই মন্দির" নামে পরিচিত।

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষবৃন্দ

১৮৮৯সালে প্রতিষ্ঠার পর এই বিহারের প্রথম অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন অগ্ গমহা পন্ডিত-উ-ধম্মবংশ মহাথের, দ্বিতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহাথের, তৃতীয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক শীলাচার শাস্ত্রী, চতুর্থ অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন শ্রীমৎ সুবোধিরত্ন মহাথের, পঞ্চম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাথের এবং ষষ্ঠ অধ্যক্ষ আছেন শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির। ২০০৫ সালে বিহারে প্রবেশের দুই পাশে অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহাথের এবং অধ্যক্ষ অধ্যাপক শীলাচার শাস্ত্রী মহাস্থবিরের স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও বিহারের মূল ভবনের দ্বিতীয় তলায় গৌতম বুদ্ধেরআসনের নিচে দুইপাশে পন্ডিত-উ-ধম্মবংশ মহাথের এবং শ্রীমৎ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহাথের এর আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

Matrix BCS

বিহারের যা কিছু উল্লেখযোগ্য

বিহারের মূল ভবনের দ্বিতীয় তলায় গৌতম বুদ্ধের মূর্তি।

গৌতম বুদ্ধের কেশধাতু: ত্রিশের দশকে আচার্য শাক্য নামে তিব্বতের এক সন্ন্যাসী চট্টগ্রাম ভ্রমণে আসেন। তিনি তখন কিছুদিনের জন্য বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করেন এবং বিহারের অধ্যক্ষ অগ্ গমহা পন্ডিত-উ-ধম্মবংশ মহাথেরকে বুদ্ধের কেশধাতু প্রদান করেন। অতি দুর্লভ এই কেশধাতুর কিছু অংশ ১৯৫৮ সালে শ্রীলংকায়, ১৯৬৪ সালে জাপানে, ১৯৭৯ সালে থাইল্যান্ডে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রদান করা হয়। শ্রীলংকার সরকার ২০০৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে বৌদ্ধ সমিতি হতে আবারো কেশধাতু গ্রহণ করে।

বিহার প্রাঙ্গণের বোধিবৃক্ষ।

অষ্টধাতুর মূর্তি

থাইল্যান্ড থেকে আনা গৌতম বুদ্ধেরদুই প্রধান শিষ্য অগ্রশ্রাবক ধর্মসেনাপতি "সারিপুত্র" এবং ঋষিশ্রেষ্ঠ "মহামোগলায়ন" মহাস্থবিরদ্বয়ের অষ্টধাতুর নির্মিত মূর্তি বুড়াগোঁসাই মন্দিরে স্থাপন করা হয়।

বোধিমন্ডপ

শ্রীলংকার সরকারপ্রদত্ত গৌতম বুদ্ধেরস্মৃতিধন্য বোধিবৃক্ষেরএকটি চারা ১৯৮০সালের ১৫ নভেম্বরচট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারেরোপণ করা হয়। ১৯৯১সালে বোধিবৃক্ষেরনিচে বোধিমন্ডপ নির্মাণ করা হয়।

চিন্তামনি গ্রন্থাগার

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে বিভিন্ন দূর্লভ পাণ্ডুলিপিসমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার আছে। এটির নাম চিন্তামনি গ্রন্থাগার। এখানে তালপাতার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। এই সংগ্রহশালায় আছে পালি ভাষা, বর্মী

Matrix

ভাষা, সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন ধর্মীয় শাস্ত্র। শাস্ত্রীয় সাহিত্য এবং তালপাতায় রচিত শিল্পকর্ম এই গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেছে।

অন্যান্য

বৌদ্ধ বিহারে এছাড়াও আছে বুডিডষ্ট হোস্টেল, ধংবংশ ইন্সটিটিউট, চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি।

চট্টেশ্বরী মন্দির

শ্রী শ্রী চট্টেশ্বরী কালী মায়ের বিগ্রহ মন্দিরবাংলাদেশের বিখ্যাত হিন্দু মন্দিরসমূহের মধ্যে অন্যতম। জনশ্রুতি মতে, প্রায় ৩০০-৩৫০ বছর পূর্বে আর্য ঋষি যোগী ও সাধু সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে শ্রী শ্রী চট্টেশ্বরী দেবীর প্রকাশ ঘটে। এটি বাংলাদেশের বন্দর নগরী চট্রগ্রামের চট্টেশ্বরী সড়কে তিন পাহাড়ের কোনে অবস্থিত।

মূল রাস্তা থেকে একটু উঁচুতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মধ্যের বাঁধানো চত্বরটির বাঁদিকে কালী মন্দির ও ডানদিকে শিব মন্দির। শিব মন্দিরের পাশে রয়েছে একটি কুন্ড। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেরসময় পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা এই মন্দিরটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং মন্দিরের সেবায়েতের বাড়ী ও বিগ্রহ বিনষ্ট করা হয়। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর মন্দিরের সেবায়েত ডাঃ তারাপদ অধিকারী তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য মন্ত্রী তরুণ কান্তি ঘোষ এবং সনাতন ধর্মীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় কষ্টি পাথরের কালী মূর্তি ও শ্বেত পাথরের শিব মূর্তি পুনঃনির্মান করেন, যাতে ও বাংলাদেশ সরকারও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে।

কদম মোবারক মসজিদ, কদম মোবারক, চট্টগ্রাম

মোগল-আমলের অনুপম পুরাকীর্তি মোমিন সড়কের কদম মোবারক মসজিদ। এ মসজিদটি চসিক-এর অধীন জামালখান ওয়ার্ডে অবস্থিত। এই মসজিদ সংলগ্ন এলাকাটিও 'কদম মোবারক' নামে পরিচিত। কদম মোবারক নামটি এসেছে দুটি পাথরের পবিত্র পদচিহ্ন থেকে। এ মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ পাশে দুটি ছোট কামরা আছে। উত্তর দিকের কামরায় হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর ডান পায়ের ছাপ বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড সংরক্ষিত আছে। এর পাশে রয়েছে বড়পীর হজরত আবদুল কাদের জিলানি (র.)-এর পদচিহ্ন। কথিত আছে, মসজিদের প্রথম মুতওলি ইয়াছিন মুহাম্মদ খান পবিত্র মদিনা শরিফ থেকে মহানবী (স.)-এর কদমের ছাপ সংগ্রহ করেছিলেন। উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত আয়তাকার মসজিদটি পাঁচ গম্বুজের। একটি বড় গম্বুজ আর দুপাশে দুটি ছোট গম্বুজ যার উত্তর ও দক্ষিণে চারকোনা আরও দুটি গম্বুজ রয়েছে। সামনের দেয়ালের মাঝের দরজার দুপাশে আছে খিলান দেওয়া তিনটি দরজা। দরজা-সোজা ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে ...আছে তিনটি মেহরাব। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মোগলেরা খিলান গম্বুজ ও খিলান ছাদকে প্রাধান্য দিত। লতাগুল্মের নকশা, আরবি ক্যালিগ্রাফি, জ্যামিতিক রেখাচিত্র, মোজাইক নকশা বসানো পাথরের সাজে সজ্জিত মসজিদটি। বিভিন্ন সময়ে সংস্কার ও সম্প্রসারণের পরও সর্বত্র প্রাচীনতা ও মোগল স্থাপত্যের সৌন্দর্য এতটুকু কমেনি। এ মসজিদকে কেন্দ্র করে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রতিষ্ঠা করেন কদম মোবারক মুসলিম এতিমখানা। এটিই চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় এতিমখানা। গড়ে উঠেছে কদম মোবারক উচ্চবিদ্যালয় ও ইসলামাবাদী স্মৃতি মিলনায়তন। মুতওলি আজাদ উল্লাহ খান বলেন, 'মসজিদ-দরগাসংলগ্ন প্রশস্ত আঙিনায় একটি ইসলামি গবেষণাকেন্দ্র, চিকিৎসাকেন্দ্র ও কবরস্থান গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলছে। এ ছাড়া একটি আধুনিক ইসলামি কমপ্লেক্স গড়ে তোলার পরিকল্পনাও আছে।'

ছুটি খাঁ জামে মসজিদ

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন ঐতিহাসিক ছুটি খাঁ জামে মসজিদ। ঢাকা-চট্টগ্রাম পুরনো মহাসড়কের পশ্চিম পাশে উপজেলার জোরারগঞ্জ বাজারের আধাকিলোমিটার উত্তরে ছুটি খাঁ দীঘির পূর্ব পাড়ে এ মসজিদের অবস্থান।

এ মসজিদের ইতিহাস সম্বন্ধে জানা যায়, গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের আমলে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন লস্কর পরাগল খাঁ ও পরবর্তীতে তার ছেলে ছুটি খাঁ। পরাগল খাঁর পিতা রাস্তি খাঁ ও গৌড়ের শাসনকর্তা রুকুনুদ্দীন বারবাক শাহের শাসনামলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ'র শাসনামলে চট্টগ্রামের শাসন কেন্দ্র ছিল পরাগলপুর। এ সময় এখানে বেশ কিছু দিঘি ও কয়েকটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ছুটি খাঁ মসজিদের মূল মসজিদটি বহুদিন আগে ভেঙে পড়েছে। পরবর্তীতে একটি মসজিদ নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে। যেখানে মূল মসজিদের বেশকিছু ছোট-বড় পাথর ও শিলালিপি দেখতে পাওয়া যায়। পুরনো মসজিদের কিছু ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেছে বলে জানা যায়। পাথরগুলো ভারতের রাজস্থান বা অন্যান্য প্রদেশ থেকে আনা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। কৃষ্ণবর্ণের নানা ডিজাইন ও সাইজের পাথরগুলো মসজিদ প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এখনো। স্থানীয়রা জানান, ছুটি খাঁ দিঘির অভ্যন্তরে ও মসজিদের ভেতরে একাধিক শিলালিপি রয়েছে। তার মধ্যে একটি শিলালিপিতে পবিত্র কোরআন শরিফের আয়াতুল কুরসি লিখা আছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ছুটি খাঁ মসজিদ লিপি খোদিত পাথরের ব্লক দিয়ে নির্মিত ছিল। সেগুলো ইতস্তত পড়ে আছে বর্তমান মসজিদের আঙিনায়। কিন্তু সবগুলোতেই দেখা গেছে তোগরা হরফে কোরআনের নানা আয়াত ও আরবি দোয়া। তবে ঐতিহাসিক মূল্যবিশিষ্ট কোনো লিপি পাওয়া যায়নি। ছুটি খাঁ কর্তৃক এ মসজিদ স্থাপন করা হয় ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে।

তবে মসজিদটির নির্মাতা পরাগল খাঁ নাকি ছুটি খাঁ, তার কোনো লিখিত সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। নির্মাতা যেই হোন, এ মসজিদটি অদ্যাবধি পাঁচশ বছর ধরে এ অঞ্চলের কীর্তিমান শাসক, পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা ও আরাকানী অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াকু সৈনিক ছুটি খাঁ'র স্মৃতি হিসেবে টিকে আছে।

বদর আউলিয়ার দরগাহ

চট্টগ্রাম শহরের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপনাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি নগরীর বকশির হাট এলাকায় বদরপাতি রোডে অবস্থিত। বদর পীরের নামানুসারে স্থাপনাটির নামকরণ করা হয়। চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারক প্রথম সুফি সাধক হিসাবে বদর শাহই পরিচিত। চট্টগ্রামে তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন-

বদর আলম, বদর মোকাম, বদর পীর, বদর শাহ, বদর আউলিয়া প্রভৃতি। তাঁর আগমন নিয়ে অনেক মজার মজার কথা প্রচলিত আছে। বদর পীরের চাটির কথা চট্টগ্রামে আজো কিংবদন্তি; কেউ কেউ মনে করেন, বদর শাহের চাটি থেকে চাটিগ্রাম হয়ে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি।

চট্টগ্রাম মুসলমানদের রাজ্যভূক্ত হওয়ার আগে অর্থ্যাৎ ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ চট্টগ্রাম জয় করার আগেই ইসলাম প্রচারের জন্য সুদূর আরব থেকে হযরত বদর শাহ (রঃ) এখানে আসেন। বলা হয়, পাথরের বুকে চেপে সাগর পাড়ি দিয়ে চট্টগ্রামে পৌঁছেন তিনি। চট্টগ্রামের মানববর্জিত পরিবেশে তিনি দৈত্যদানবের কাছ থেকে এবাদত করার জন্য এক চাটি পরিমাণ জায়গা চেয়ে নেন। চাটির আলো ও আজানের ধ্বনির বিস্তারে দৈত্য-দানবরা পালিয়ে যায়। এ ঐতিহ্যবাহী চাটি হতে চট্টগ্রামের নামকরণ বলে ব্যাপক জনশ্রুতি আছে। আউলিয়া বদর শাহই প্রথম চট্টগ্রামে চেরাগ জেলে গোড়াপত্তন করেন এ শহরের। আর এই ঐতিহাসিক স্মৃতি বহন করছে মোমিন রোডস্থ 'চেরাগী পাহাড়'।

অনেকে মনে করেন, ১৪৪০ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া বিহারের ছোট দরগাহে শায়িত পীর বদর উদ্দীন বদর-ই-আলম আর বন্দরনগরীর বদরপাতি পীর একই ব্যক্তি। কিন্তু এর সাথে দিমত পোষণ করেন। বদরশাহ মানুষের গানের মধ্য দিয়েও বেঁচে আছেন, তার প্রমাণ- মাঝিদের বিখ্যাত উদ্দীপনামূলক গান-"বদর বদর বদর বদর হেঁইয়ো-বদর বদর বদর বদর হেঁইয়ো"। চট্টগ্রামে পীর বদরের আস্তানা প্রায় সাড়ে ছয়শো বছরের স্মৃতি বহন করছে। পীর বদরের সমাধি ভবনটি সুলতানি আমলে তৈরী করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

বখশী হামিদ মসজিদ

চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার ইলশা গ্রামে একটি দীঘির পাড়ে নির্মিত প্রাচীন একটি মসজিদ। এই মসজিদটির নির্মাণ কৌশলের সাথে ঢাকার শায়েস্তা খান (আনুঃ ১৬৬৪ খৃঃ) মসজিদ এবং নারায়নগঞ্জের বিবি মরিয়ম মসজিদের (আনুঃ ১৬৮০ খৃঃ) মিল লক্ষ্য করা যায়। মিহরাবের উপর স্থাপিত আরবী শিলালিপির বক্তব্য মতে, এটি সুলাইমান কররানি কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করার কথা থাকলেও লোকমুখে বখশী হামিদের নির্মিত মসজিদ বলে পরিচিত। বর্তমান এ মসজিদ এর পাশে একটী হেফজখানা রয়েছে।মসজিদ এবং হেফজখানার পরিচালনাই আছেন মাওলানা মুজিবুর রহমান।

ভাষা ও সংস্কৃতি

চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। জানা ইতিহাসের শুরু থেকে চট্টগ্রামে আরাকানী মঘীদের প্রভাব লক্ষনীয়। ফলে গ্রামীণ সংস্কৃতিতেও এর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সে সময় এখানকার রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হওয়ায় তার প্রভাবও যথেষ্ট। সুলতানি, আফগান এবং মোগল আমলেও আরাকানীদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত মঘীদের প্রভাব বিলুপ্ত হয়নি। এছাড়া চট্টগ্রামের মানুষ আতিথেয়তার জন্য দেশ বিখ্যাত।

চট্টগ্রামের বর্তমান সংস্কৃতির উন্মেষ হয় ১৭৯৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর। এর ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে সামাজিক ধানোৎপাদন ও বন্টনে পদ্ধতিগত আমূল পরিবর্তন হয়। অন্যান্য স্থানের মতো চট্টগ্রামেও একটি নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। নতুন এরই ফাঁকে ইংরেজরা প্রচলনা করে ইংরেজি শিক্ষা। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের ইতিহাস সমৃদ্ধ। শেফালী ঘোষ এবং শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণবকে বলা হয় চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞি। মাইজভান্ডারী গান ও কবিয়াল গান চট্টগ্রামের অন্যতম ঐতিহ্য। কবিয়াল রমেশ শীল একজন বিখ্যাত কিংবদন্তি শিল্পী। জনপ্রিয় ব্যান্ড সোলস, এল আর বি, রেঁনেসা, নগরবাউল এর জন্ম চট্টগ্রাম থেকেই। আইয়ুব বাচ্চু, কুমার বিশ্বজিৎ, রবি চৌধুরী, নাকিব খান, পার্থ বড়ুয়া, সন্দিপন, নাসিম আলি খান, মিলা ইসলাম চট্টগ্রামের সন্তান। নৃত্যে চট্টগ্রামের ইতিহাস মনে রখার মত। রুনু বিশ্বাস জাতীয় পর্যায়ে বিখ্যাত নৃত্যগুরু। চট্টগ্রামের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংগঠন হল দৃষ্টি চট্টগ্রাম www.drishtyctg.com, বোধন আবৃত্তি পরিষদ, প্রমা, আলাউদ্দিন ললিতকলা একাডেমি, প্রাপন একাডেমি, উদিচি, আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ, ফুলকি, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সংস্থা, রক্তকরবী, আর্য সঙ্গীত, সঙ্গীত পরিষদ। মডেল তারকা নোবেল, মৌটুসি, শ্রাবন্তীর চট্টগ্রামে জন্ম । সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয় জেলা শিল্পকলা একাডেমি, মুসলিম হল, থিয়েটার ইন্সটিটিউট।

চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রাজনৈতিক তৎপরতা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এখানে হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে। কখনও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে আসন্ন রাজনৈতিক সংকটের পূর্বলক্ষণ দেখে, কখনও বা রাজনৈতিক আন্দোলনের সহযোগী শক্তি হিসেবে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর অসহযোগ, খেলাফত আন্দোলনের কালেও এখানকার সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা স্তিমিত না হয়ে জোরদার ছিল। বিশ এর দশকে সুরেন্দ্রলাল দাসের নেতৃত্বে আর্য সংগীতের শিল্পী দলের নিখিল বঙ্গ কংগ্রেস সম্মেলনে যোগদান ঐ সময়ে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিকঅঙ্গনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চট্টগ্রামের 'প্রগতিলেখক সংঘের'প্রতিষ্ঠা, কবিয়াল সমিতি গঠন, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন উপলক্ষে মাণিক বন্দোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ সাহিত্যিক কবির আগমন, ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের অশান্ত পরিবেশে জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাব জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে নজরুল জয়ন্তী উদযাপন, প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকা সীমান্ড় প্রকাশের উদ্যোগ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে এর বহিঃ প্রকাশ ঘটে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিখ্যাত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, কবিয়ালরমেশ শীল ও ফনি বড়ুয়া, সুরেন্দ্রলাল দাশ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলায় যে সকল সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে তাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে সাংস্কৃতিক ফোরাম। এ ফোরামের সমন্বয়ে আছেন বর্তমান জেলা প্রশাসক। এ ফোরামের উদ্যোগে চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে উন্মুক্ত মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করাসহ অন্যান্য কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

Matrix BCS Series

প্রাকৃতিক সম্পদ

খনিজ সম্পদ:

জেলার একমাত্র গ্যাস ফিল্ড সাঙ্গু ১৯৯৪ সালে আবিস্কৃত হয়। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কেয়ার্ণ এনার্জির এই গ্যাস ফিল্ড নিয়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে এ গ্যাস ফিল্ড থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়।

কৃষি সম্পদ:

তামাক: ১৯৬০ এর দশকে শংখ ও মাতামুহুর নদীর তীরবর্তী এলাকায় তামাক চাষ শুরু হয়। বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানি (এখন ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানী) রাঙ্গুনিয়াতে তামাক চাষের ব্যবস্থা করে এবং পরে লাভজনক হওয়ায় চাষীরা তা অব্যাহত রাখে।

লবণ: সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় লবন চাষ লাভজনক। ইতিহাসে দেখা যায় ১৭৯৫ সালে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলে গড়ে বার্ষিক ১৫ লাখ টন লবন উৎপন্ন হতো।

বনজ সম্পদ: চট্টগ্রাম জেলায় মাছচাষের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। সমুদ্র এবং নদী-নালার প্রাচূর্য এর মূল কারণ। শহরের অদূরের হালদা নদীর উৎসমুখ থেকে মদুনাঘাট পর্যন্ত মিঠা পানির প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র হিসাবে বেশ উর্বর। বৃহত্তর চট্টগ্রামে দিঘী, বিল ও হাওড়ের সংখ্যা ৫৬৮, পুকুর ও ডোবার সংখ্যা ৯৫,৯৪১। মোট আয়তন ৮৫,৭০০ একর (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮১), কর্ণফুলী নদীর মোহনায় প্রায় ৬ লাখ ৪০ হাজার একর বিস্তৃত মাছ ধরার জায়গা হিসাবে চিহ্নিত।

মৎস চাষ ও আহরণ:

রপ্তানির ক্ষেত্রে সামুদ্রিক মাছ হাঙ্গর, স্কেট, রে, হেরিং, শার্কফিন এবং চিংড়ি উল্লেখ্য।

শুঁটকি: চট্টগ্রামের মাছ চাষ ও আহরনের একটি উল্ল্যেখযোগ্য দিক হলে শুঁটকি (মাছ শুকিয়ে সংরক্ষণ করা)। সোনাদিয়া, স্বদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপাঞ্চল থেকে শুঁটকি মাছ চট্টগ্রামের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে পাঠানো হয়। ব্রিটিশ আমলে শুঁটকি রেঙ্গুনে রপ্তানি করা হতো

নদ-নদী:

চট্টগ্রাম জেলার নদ-নদীসমূহঃ

১। কর্ণফুলি নদী: কর্ণফুলী নদীবাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের একটি প্রধান নদী। এটি ভারতের মিজোরামেরলুসাই পাহাড়ে শুরু হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চট্টগ্রামের পতেঙ্গার কাছে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। এই নদীরমোহনাতে বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বন্দর অবস্থিত। এই নদীরদৈর্ঘ্য ৩২০ কিলোমিটার।

Matrix BCS Series

নামের ইতিকথাঃ

কর্ণফুলীনদীর নামের উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, আরাকানের এক রাজকন্যা চট্টগ্রামের এক আদিবাসী রাজপুত্রের প্রেমেপড়েন। এক জ্যোৎস্নাস্নাত রাতে তাঁরা দুই জন এই নদীতে নৌভ্রমণ উপভোগ করছিলেন। নদীরপানিতে চাঁদের প্রতিফলন দেখার সময় রাজকন্যার কানে গোঁজাএকটি ফুল পানিতেপড়ে যায়। ফুলটি হারিয়ে কাতর রাজকন্যা সেটা উদ্ধারেরজন্য পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু প্রবল স্রোতে রাজকন্যা ভেসে যান, তাঁরআর খোঁজ পাওয়া যায়নি। রাজপুত্র রাজকন্যাকে বাঁচাতে পানিতে লাফ দেন, কিন্তু সফল হন নি।রাজকন্যার শোকে রাজপুত্র পানিতে ডুবে আত্মাহুতি দেন। এইকরুণ কাহিনী থেকেই নদীটির নাম হয় 'কর্ণফুলী। মার্মা আদিবাসীদের কাছে নদীটির নাম কান্সা খিওং।

কর্ণফুলী নদীর চরঃ ১৮৮৩ সালে কর্ণফুলীর মোহনায় সৃষ্টি হয় লুকিয়া চর। ১৮৭৭ সালেজুলদিয়া চ্যানেল। জুলদিয়া চ্যানেলটি আড়াই মাইল দীর্ঘ এবং দেড় মাইলপ্রশস্ত। ১৯০১ সাল থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে পতেঙ্গা চ্যানেলটি জুলদিয়া চ্যানেল থেকে প্রায় দেড় হাজার ফুট পশ্চিমে সরে যায়। হালদা নদীর সাথে কর্ণফুলীর সংযোগস্থলে আছে বিশাল চর। যা হালদা চর হিসাবে পরিচিত। নদীর প্রবাহের কিছু অংশনাজিরচর ঘেঁষে, কিছু অংশ বালু চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে এবং কিছু মুল স্রোত হিসেবে প্রবাহিত হচ্ছে। ১৯৩০ সালে কালুরঘাট রেলওয়ে সেতু নির্মাণের আগেনদীর মূল প্রবাহ প্রধানত কুলাগাঁও অভিমুখে বাম তীর ঘেষেই প্রবাহিত হত। কালুরঘাট সেতু হওয়ার পর সেতুর ডান দিকে আরও একটি প্রবাহের মুখ তৈরি হয়। ফলে নদীর মাঝ পথে সৃষ্টি হয় বিশাল একটি চর- যা কুলাগাঁও চর নামেপরিচিত।

কাপ্তাই বাঁধঃ

কর্ণফুলীনদীর উপর বাঁধ দিয়ে রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কাপ্তাই বাঁধ তৈরি করা হয়। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে এই বাঁধে সঞ্চিত পানি ব্যবহার করে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে প্রভাব:

কবি ওহীদুল আলম ১৯৪৬ সালে কর্ণফুলীর মাঝিনামে একটি কাহিনী-কাব্য রচনা করেন। ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৯৬২ সালে রচনা করেন তার উপন্যাস কর্ণফুলী। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার কবিতায় লিখেছেন,

ওগো ও কর্ণফুলী
তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কানফুল খুলি
তোমার স্রোতের উজান ঠেলিয়া কোন তরুণী, কে জানে
সাম্পান নায়ে ফিরেছিল তার দয়িতের সন্ধানে।

এছাড়াও চট্টগ্রামী ভাষার গানে এবং লোক-সংস্কৃতিতে এই নদীর প্রভাব অনেক। চট্টগ্রামী ভাষার ক'টি জনপ্রিয় গান,

১. ছোড ছোড ঢেউ তুলি পানিত ছোড ছোড ঢেউ তুলি
লুসাই ফা-রত্তুন লামিয়ারে যারগই কর্ণফুলী'।
২. 'ওরে সাম্পানওয়ালা,
তুই আমারে করলি দিওয়ানা'।

২। হালদা নদী

হালদা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের একটি নদী। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাটনাতলী পাহাড় হতে উৎপন্ন হয়ে এটি ফটিক ছড়িরমধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম জেলায় প্রবেশ করেছে। এটি এর পর দক্ষিণ-পশ্চিমে ও পরে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ফটিকছড়ির বিবিরহাট, নাজিরহাট, সাত্তারঘাট, ও অন্যান্য অংশ, হাটহাজারী, রাউজান, এবং চট্টগ্রাম শহরের কোতোয়ালী থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এটি কালুর ঘাটের নিকটে কর্ণফুলী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এর মোট দৈর্ঘ্য ৮১ কিলোমিটার, যার মধ্যে ২৯ কিলোমিটার অংশ সারা বছর বড় নৌকা চলাচলের উপযোগী থাকে।

BCS Series

নামকরণ

হালদা খালের উৎপত্তি স্থলমানিকছড়ি উপজেলার বাটনাতলী ইউনিয়েনর পাহাড়ী গ্রাম সালদা। সালদার পাহাড়ী ঝর্ণা থেকে নেমে আসা ছড়া সালদা থেকে হালদা নামকরণ হয়। সালদা নামে বাংলাদেশে আরো একটি নদী আছে যেটি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উৎপন্ন ব্রাহ্মন বাড়িয়া জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

উপনদী

হালদা নদীতে পতিত দুপাশের উপনদী গুলো প্রশস্ততার বিচারে সাধারণত নদীর পর্য্যায়ে পড়েনা। বেশির ভাগ ছড়া, খাল কিংবা ঝর্ণা জাতীয়। তবে মানিকছড়ি, ধুরুং এবং সর্তা যথেষ্ট প্রশস্ত। পূর্বদিক হতে যেসব খাল হালদার সাথে মিলিত হয়েছে তার উৎপত্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে। পশ্চিম দিক হতে আসা খাল গুলোর উৎপত্তিস্থল সীতাকুন্ড পাহাড়। দুই পাহাড়ের মাঝখানে হালদা নদী প্রবাহিত হয়েছে উত্তর দিক হতে দক্ষিণদিকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় থেকে উৎপন্ন খালগুলো হচ্ছে মানিকছড়ি, ধুরুং, তেলপারই, সর্তা, কাগতিয়া এবং ডোমখালী খাল। সীতাকুন্ড পাহাড়ী রেঞ্জহতে উৎপন্ন হওয়া খালগুলোর মাঝে আছেগজারিয়া,ফটিকছড়ি, হারুয়ালছড়ি, বারমাসিয়া, মন্দাকিনী, বোয়ালিয়া এবং পোড়া কপালী খাল।

মাছের ডিম ছাড়া

প্রতি বছর হালদা নদীতে একটি বিশেষ মূহুর্তে ও বিশেষ পরিবেশেই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউসওকার্প জাতীয় মাতৃমাছ প্রচুর পরিমাণ ডিম ছাড়ে। ডিম ছাড়ার বিশেষ সময়কে তিথি বলা হয়ে থাকে। স্থানীয় জেলেরা ডিম ছাড়ার তিথির পূর্বেই নদীতে অবস্থান নেন এবং ডিম সংগ্রহ করেন। ডিমসংগ্রহ করে তারা বিভিন্ন বাণিজ্যিক হ্যাচারীতে উচ্চমূল্যে বিক্রী করেন।

হালদা নদীতে রুই জাতীয় মাছের ডিম ছাড়ার কারণ

হালদানদী এবং নদীর পানির কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য এখানে মাছ ডিম ছাড়তে আসে যা বাংলাদেশের অন্যান্য নদী থেকে ভিন্ন তর। এই বৈশিষ্ট্য গুলো ভৌতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক। ভৌতিক কারন গুলোর মধ্যে রয়েছে নদীর বাঁক , অনেক গুলো নিপাতিত পাহাড়ী ঝর্ণা বা ছড়া , প্রতিটি পতিত ছড়ার উজানে এক বা একাধিক বিল, নদীর গভীরতা, কম তাপমাত্রা , তীব্র খরস্রোত এবং অতি ঘোলাত্ব। রাসায়নিক কারণ গুলোর মধ্যে রয়েছে কম কন্ডাক্টিভিটি, সহনশীল দ্রবীভুত অক্সিজেন। জৈবিক কারণ গুলো হচ্ছে বর্ষার সময় প্রথম বর্ষণের পর বিলথাকার কারণে এবং দুকুলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে নদীর পানিতে প্রচুর জৈব উপাদানের মিশ্রণের ফলে পর্যাপ্ত খাদ্যের প্রাচুর্য থাকে যা প্রজনন পূর্ব গোনাডের পরিপক্কতায় সাহায্য করে। অনেক গুলো পাহাড়ী ঝর্ণা বিধৌত পানিতে প্রচুরম্যেক্রো ও মাইক্রো পুষ্টি উপাদান থাকার ফলে নদীতে পর্যাপ্ত খাদ্যাণুরসৃষ্টি হয়, এই সব বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে হালদা নদীতে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে রুই জাতীয় মাছকে বর্ষাকালে ডিম ছাড়তে উদ্ভুদ্ধ করে যা বাংলাদেশের অন্যান্য নদী থেকে আলাদা।

সাঙ্গু নদী

সাঙ্গু নদী, স্থানীয় ভাবে শঙ্খ নদী, বাংলাদেশের দক্ষিণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত একটি পাহাড়ি নদী। কর্নফুলীর পর এটি চট্টগ্রাম বিভাগের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কয়টি নদীর উৎপত্তি তার মধ্যে সাঙ্গু নদী অন্যতম। মিয়ানমার সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার মদক এলাকার পাহাড়ে এ নদীর জন্ম। বান্দরবান জেলা ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে

Matrix BCS Series

প্রবাহিত হয়ে এটি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। উৎসমুখ হতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এই নদীর দৈর্ঘ্য ১৭০ কিলোমিটার।

সাঙ্গু নদী বান্দবান জেলার প্রধানতম নদী। বান্দরবান জেলা শহরও এ নদীর তীরে অবস্থিত। এ জেলার জীবনুজীবিকার সাথে সাঙ্গু নদী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বান্দরবানের পাহাড়ি জনপদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ নদী একটি অন্যতম মাধ্যম।

বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি পাহাড়ি নদীর মধ্যে সাঙ্গু নদী অন্যতম। বান্দরবান জেলা এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল এ নদীবিধৌত। বাংলাদেশের বেশিরভাগ নদী উত্তর হতেদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। কিন্তু সাঙ্গু নদী বান্দরবানের দক্ষিণাঞ্চলে সৃষ্টি হয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে শেষ হয়েছে।

দর্শনীয় স্থানঃ

- ফয়েজ লেক
- চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা
- চট্টগ্রাম ওয়ার সিমেট্রি
- কোর্ট বিল্ডিং
- ভাটিয়ারী
- জাতিতাত্ত্বিক যাদুঘর(চট্টগ্রাম)
- পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত
- বাটালী হিল
- বায়েজিদ বোস্তামী
- লালদীঘি

Facebook Page: Matrix BCS Series

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

১ম ধাপের মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলা পরিচিতি

Facebook Page: Matrix BCS Series

লালমনিহাট জেলা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর নং: ৬
সেক্টর কমান্ডার: উইং কমান্ডার এম. এ. বাশার
উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা:

- তমিজউদ্দীন প্রামানিক বীরবিক্রম
- আমির হোসেন

কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি:

- কবি শেখ ফজলুল করিম
- ফকির মজনু শাহ

সংসদীয় আসন: ৩টি

১৬	লালমনিরহাট-১	মোঃ মোতাহার হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৭	লালমনিরহাট-২	নুরুজ্জামান আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৮	লালমনিরহাট-৩	গোলাম মোহাম্মদ কাদের	জাতীয় পার্টি

Matrix

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৪
উপজেলা: ৫টি;
ইউনিয়ন: ৪৫টি
যে নদীর তীরে অবস্থিত: তিস্তা
আয়তন: ১২৪৭.৩৭১ বর্গ কি.মি.
ভৌগলিক অবস্থান: লালমনিরহাট বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত সীমান্তবর্তী একটি জেলা। ২৫.৪৮ ডিগ্রি থেকে ২৬.২৭ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.৩৮ ডিগ্রি থেকে ৮৯.৩৬ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে জেলাটির অবস্থান। এ জেলার উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা, দক্ষিণে রংপুর জেলা, পূর্বে কুড়িগ্রাম ও ভারতের কোচবিহার জেলা এবং পশ্চিমে রংপুর ও নীলফামারী জেলা। এ জেলার উত্তরে ধরলা নদী ও দক্ষিনে তিস্তা নদী প্রবাহিত।
আন্তর্জাতিক সীমান্ত দৈর্ঘ্য: ২৮১.৬ কি.মি.
জল সীমান্ত: ২৪ কি.মি.

জনসংখ্যা: ক) পুরুষ : ৬২৮,৭৯৯ জন
খ) মহিলা : ৬২৭,৩০০ জন
গ) মোট : ১২,৫৬,০৯৯ জন
শিক্ষার হার: ৪৬.০৯%
থানার সংখ্যা: ৫টি
পৌরসভার সংখ্যা: ২টি
মৌজার সংখ্যা: ৩৫৪টি
গ্রামের সংখ্যা: ৪৭৮টি
নদীর সংখ্যা: ৬টি
নদী পথের দৈর্ঘ্য: ১৮০ কি.মি.
মসজিদের সংখ্যা: ২,৪৫০ টি
মন্দিরের সংখ্যা: ৭৪১টি
এনজিওর সংখ্যা: ৫৭টি
খাদ্য গুদামের সংখ্যা: ৭টি
খাদ্য গুদামের ধারন ক্ষমতা: ১৬,৫০০ মেট্রিক টন

Matrix BCS Series

ব্যাংকের সংখ্যা: ৪৯টি
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ: ৫টি
ডাকঘর: ৭০টি
বিওপি: ২৩টি
মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা: ৪৫ টি
উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা: ১৯৭ টি
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা: ৭৬৭ টি
বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা: ০৯টি
মাদ্রাসার সংখ্যা: ৮১টি
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সংখ্যা: ৩টি
টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ: ১টি
মোট জমির পরিমান: ১,২৫,৪০৪ হেক্টর
আবাদি জমির পরিমান: ১,০০,৯৮৪ হেক্টর
সেচযোগ্য জমির পরিমান: ৯৯,৯৭৫ হেক্টর
গভীর নলকুপের সংখ্যা: ২৫৮ টি
অগভীর নলকূপের সংখ্যা: ৪২,৫১৮ টি
শক্তি চালিত পাম্পের সংখ্যা: ৯৪ টি
উপজেলা ভূমি অফিস: ৫টি
ইউনিয়ন ভূমি অফিস: ৩৩টি
আদর্শ গ্রামের সংখ্যা: ৫৬টি
আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা: ৩৮টি
আবাসন প্রকল্প: ১৭টি
হাট বাজারের সংখ্যা: ১০১টি
খাস জলমহালের সংখ্যা: ৪৪টি
সরকারী হাসপাতাল: ১টি
বেসরকারী ক্লিনিক: ১২টি
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স: ৫টি
কুটির শিল্প: ৭,৫৮২টি
ক্ষুদ্র শিল্প: ৬৪২টি
পাকা রাস্তা: ৭৮৫.৮৪ কি.মি.
কাঁচা রাস্তা: ১,৫৭১.৭০ কি.মি.
এইচবিবি রাস্তা: ১৪.৪০ কি.মি.
রেলপথ: ৯৬ কি.মি.
রেল স্টেশন: ১৫টি
দর্শনীয় স্থান:

- তিন বিঘা করিডোর ও দহগ্রাম-আংগরপোতা ছিটমহল

Matrix BCS Series

- নিদাড়িয়া মসজিদ
- তুষভান্ডার জমিদার বাড়ি
- তুষভান্ডার জমিদারী বংশ ও জমিদার বাড়ী
- কাকিনা জমিদারী বংশ ও জমিদার বাড়ী
- বুড়িমারী স্থলবন্দর

জেলার ঐতিহ্য: তুষভান্ডার জমিদার বাড়ি, কাকিনা জমিদার বাড়ি, নিদাড়িয়া মসজিদ

মানচিত্রে জেলা

আয়তন: ১২৪১.৪৬ বর্গ কিমি।

অবস্থান: ২৫°৪৬´ থেকে ২৬°৩৩´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°০১´ থেকে ৮৯°৩৬´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

সীমানা: উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, দক্ষিণে রংপুর জেলা, পূর্বে কুড়িগ্রাম ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, পশ্চিমে নীলফামারী ও রংপুর জেলা।

লালমনিরহাটকে ছিটমহলবেষ্টিত জেলা বলা যায়। এ জেলায় ৩৩ টি সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহল রয়েছে। তন্মদ্ধে বৃহত্তম দুটি হচ্ছে দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা। তিন বিঘা করিডরের মাধ্যমে এই দুই সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলকে মূল ভূখন্ডের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

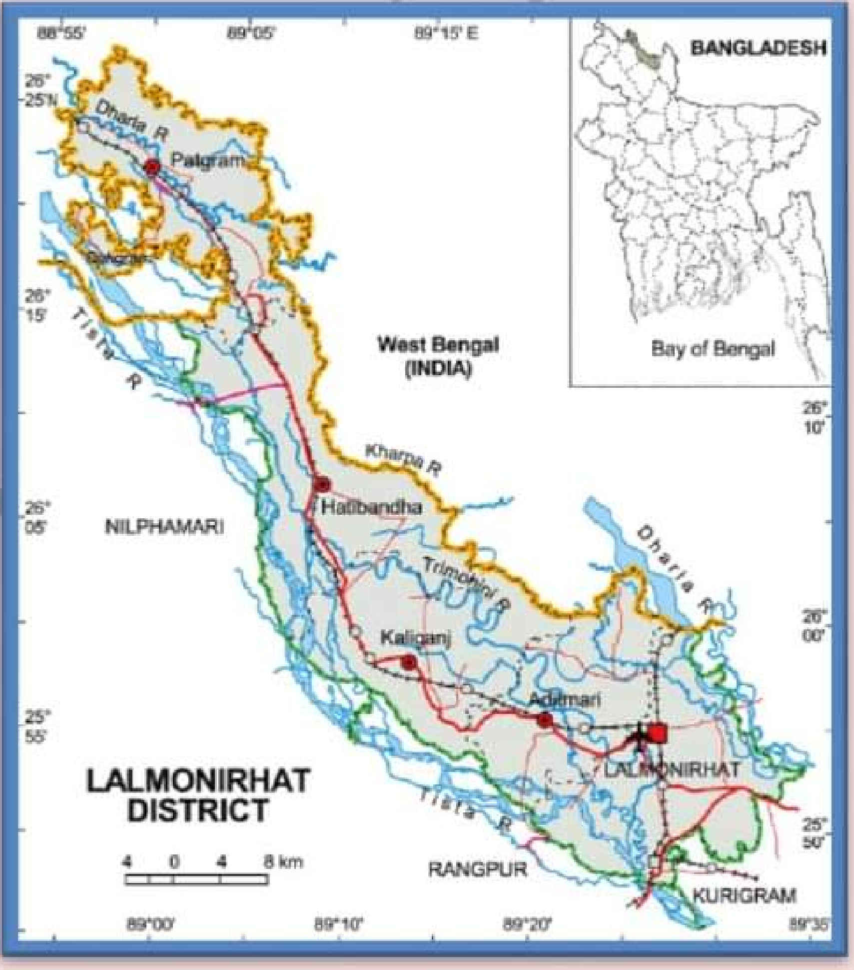

MATRIX BCS Series

লালমনিরহাট জেলার ৫টি উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান নিম্নরূপ-

উপজেলার নাম	আয়তন	অবস্থান
লালমনিরহাট সদর	২৫৯.৫৪ বর্গ কিমি	উত্তরে ভারতের কোচবিহার জেলা ও লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলা, দক্ষিনে রংপুরের কাউনিয়া উপজেলা ও কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলা, পূর্বে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলা ও রাজারহাট উপজেলা এবং পশ্চিমে লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলা ও রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলা।
আদিতমারী	১৯০.০৩ বর্গ কিমি	উত্তরে ভারতের কোচবিহার জেলা, দক্ষিনে রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলা, পূর্বে লালমনিরহাট সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে কালীগঞ্জ উপজেলা।
কালীগঞ্জ	২৩৬.৯৬ বর্গ কিমি	উত্তরে ভারতের কোচবিহার জেলা ও লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলা, দক্ষিনে রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলা ও নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে আদিতমারী উপজেলা এবং পশ্চিমে নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলা।
হাতীবান্ধা	২৮৮.৪২ বর্গ কিমি	উত্তরে ভারতের কোচবিহার জেলা ও লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলা, দক্ষিনে কালীগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে ভারতের কোচবিহার জেলা এবং পশ্চিমে নীলফামারী জেলার ডিমলা ও জলঢাকা উপজেলা।
পাটগ্রাম	২৬১.৫১ বর্গ কিমি	পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরে ভারতের কোচবিহার জেলা এবং দক্ষিনে ভারতের কোচবিহার জেলা ও লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলা।

Matrix BCS Series

জেলার পটভূমি

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক উপদেষ্টা (মন্ত্রী) ডঃ শাফিয়া খাতুন কর্তৃক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে লালমনিরহাট মহকুমা 'জেলা' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ মার্চ লালমনিরহাট সদর থানা 'উপজেলা' হিসেবে ঘোষিত হয়। ফলে লালমনিরহাট জেলার অধীনে উপজেলার সংখ্যাঃ দাড়ায় - ৫টি; পাটগ্রাম, হাতীবান্ধা, কালীগঞ্জ, আদিতমারী এবং লালমনিরহাট সদর। এসময় লালমনিরহাট সদর থানার ছিনাই, রাজারহাট এবং ঘড়িয়ালডাঙ্গা ইউনিয়ন পার্শ্ববর্তী কুড়িগ্রাম জেলার সাথে যুক্ত হলে নবগঠিত লালমনিরহাট জেলায় **ইউনিয়নের সংখ্যা** দাড়ায় ৪১টি এবং পৌরসভার **সংখ্যা** ১টি। তাছাড়া লালমনিরহাট সদর উপজেলার আয়তন দাড়ায় ১০৪ বর্গমাইল।

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিটমহল পাটগ্রাম উপজেলার একটি স্বতন্ত্র ইউনিয়ন হিসেবে পরিগণিত হয় এবং ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ আগস্ট এখানে ইউনিয়ন পরিষদের শুভ উদ্বোধন ঘটে, ফলে লালমনিরহাট জেলায় ইউনিয়ন সংখ্যাঃ দাড়ায় ৪২টি। ডায়াবেটিক সমিতি, লালমনিরহাট এর সাবেক কার্যালয়ের স্থলে ছিল জেলা প্রশাসকের প্রথম কার্যালয়। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসক কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় বর্তমান মজিদা খাতুন সরকারি মহিলা কলেজের স্থলে। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে আবার তা স্থানান্তরিত হয়ে বর্তমান স্থানে চলে আসে।

১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি বিদ্যমান জেলা প্রশাসকের কার্যালয় তথা কালেক্টরেট ভবনের উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট লে. জে. এইচ. এম. এরশাদ।

ভৌগলিক পরিচিতি

লালমনিরহাট বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত সীমান্তবর্তী একটি জেলা। ২৫.৪৮ ডিগ্রি থেকে ২৬.২৭ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.৩৮ ডিগ্রি থেকে ৮৯.৩৬ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে জেলাটির অবস্থান। এ জেলার উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা, দক্ষিণে রংপুর জেলা, পূর্বে কুড়িগ্রাম ও ভারতের কোচবিহার জেলা এবং পশ্চিমে রংপুর ও নীলফামারী জেলা। এ জেলার উত্তরে ধরলা নদী ও দক্ষিনে তিস্তা নদী প্রবাহিত।

Matrix BCS Series

তুষভান্ডার জমিদার বাড়ি

প্রায় চারশত বৎসর আগে জমিদার মুরারিদেব ঘোষাল ভট্টাচার্য লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জে তুষভান্ডার জমিদার বাড়ি (Tushbhander Jaminderbari) প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে, ১৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজা প্রাণ নারায়ণের শাসনামলে মুরারিদেব ঘোষাল ভট্টাচার্য চব্বিশ পরগনা জেলা হতে রসিক রায় বিগ্রহ নামক একটি ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কোচবিহারে আসেন। তৎকালীন সময়ে ধর্মীয় কাজের জন্য ভূমি দান করা হত। মহারাজা প্রাণ নারায়ণ ঘোষাল ভট্টাচার্যকে বিগ্রহ পূজা করার জন্য ৯টি মৌজা দান করেন। কিন্তু ঘোষাল ভট্টাচার্য একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন তাই তিনি মহারাজার দান ভোগে আপত্তি জানান এবং তিনি রাজাকে সেই সম্পত্তি ভোগের উপর খাজনা নেওয়ার প্রস্তাব করেন। তবে রাজা খাজনা হিসেবে ধানের তুষ নেওয়ার জন্য দাবী করেন। ফলে কোচবিহারের রাজাকে দেওয়ার জন্য পুরো জমিদারি এলাকা ধানের তুষ সংগ্রহ করে জমিদার বাড়ির পূর্ব পাশে রাখা হত। এই ঘটনা থেকে এই জমিদার বাড়িটি তুষভাণ্ডার জমিদার বাড়ি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

এই জমিদার বংশের আরেক জমিদার কালী প্রসাদ রায় চৌধুরীর নামে কালীগঞ্জ উপজেলার নামকরণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠার প্রায় চারশত বছর পর ১৯৩৫ সালে জমিদার গীরিন্দ্র মোহন রায় চৌধুরীর মৃত্যুর মাধ্যমে তুষভাণ্ডার জমিদার বাড়ির ঐতিহাসিক শাসনামলের অবসান ঘটে।

দর্শনীয় স্থানসমূহঃ

নিদাড়িয়া মসজিদ

লালমনিরহাট সদর উপজেলাধীন পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের বড়বাড়িতে প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন মুসলিম স্থাপত্য নিদর্শন নিদাড়িয়া মসজিদ (Nidaria Mosjid) অবস্থিত। ইট, সুরকি ও চুন দিয়ে নির্মিত এই মসজিদে মোঘল স্থাপত্য শিল্পের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিদাড়িয়া মসজিদের দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট এবং প্রস্থ ১৬ ফুট। মসজিদের উপরিভাগে এক সারি তিনটি গম্বুজ ও চারকোণে নকশা করা চারটি বুরুজ রয়েছে। ৩টি দরজা ও ছোট বড় ১২ টি মিনারের সমন্বয় মসজিদের মূল কাঠামোর শোভা বাড়িয়েছে। আর মসজিদের সামনে আছে একটি দোচালা ঘর ও বিশাল ঈদগাহ মাঠ। এই মাঠে ঈদের নামাজ ও বিভিন্ন ইসলামিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। নিদাড়িয়া মসজিদ থেকে ফার্সি ভাষায় লিখিত শিলালিপি মতে, ১১৭৬ হিজরি সনে মোঘল সুবেদার মাসুদ খাঁ ও তাঁর পুত্র মনসুর খাঁর তত্ত্বাবধানে এই মসজিদটি নির্মিত হয়। পরবর্তীতে সুবেদার মনসুর খাঁ মসজিদের জন্য আরও ১০.৫৬ একর জায়গা দান করেন। জনশ্রুতি আছে, সুবেদার মনসুর খাঁর মুখে দাড়ি না থাকায় তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁর মুখে দাড়ি গজালে একটি মসজিদ নির্মাণ করবেন। পরবর্তীতে সুবেদারের মুখে দাড়ি উঠলে প্রতিশ্রুতি স্বরূপ তিনি এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। তাঁর দাড়িহীনতার কারণেই ফার্সি ভাষায় মসজিদটির নাম নিদাড়িয়া করা হয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা, মসজিদের পাশে থাকা বাধানো কবরটি মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মোঘল সুবেদার মনসুর খাঁয়ের। কালের বিবর্তন ও যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে লালমনিরহাট জেলা শহরের অন্যতম এই মোঘল স্থাপত্যের সৌন্দর্য অনেকাংশে নষ্ট হয়ে গেছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের দ্বিতীয়তম প্রাচীন এই মসজিদটি বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের অধীনে রয়েছে। ৩ গম্বুজ বিশিষ্ট নিদাড়িয়া মসজিদে স্থানীয় মুসল্লিরা নিয়মিত নামায আদায় করে থাকে।

Matrix BCS

কাকিনা জমিদার বাড়ি

মোগলদের দেয়া সনদের উপর ভিত্তি করে ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে কাকিনার জমিদারী শুরু হয়। বৃহত্তর রংপুর জেলার জমিদারদের মধ্যে এই কাকিনা জমিদারদের বেশ সুনাম ও প্রতিপত্তি ছিল। তৎকালীন সময়ে আওরঙ্গজেব দিল্লীর মোগল সম্রাট ছিলেন। আর আওরঙ্গজেবের মামা শায়েস্তা খাঁ ছিলেন বাংলার সুবেদার। শায়েস্তা খাঁর পুত্র এবাদত খাঁ কাকিনা পরগনার প্রভাবশালী রঘু রামের ছেলে রাম নারায়নকে কাকিনা জমিদারি সনদ প্রদান করেন। এরপর রাজা রায় চৌধুরী, রুদ্র রায়, রসিক রায়, অলকা দেবী, রাম রুদ্র রায় চৌধুরী, শম্ভুচরণ রায় চৌধুরী পর্যায়ক্রমে কাকিনার জমিদারী লাভ করেন।

১৮৬০ সালে শম্ভুচরণ রায় চৌধুরী নিজ অর্থায়নে বৃহত্তর রংপুর জেলার প্রথম পত্রিকা সাপ্তাহিক 'রঙ্গপুর প্রকাশ' বের করেন। এছাড়া শম্ভুসাগর নামে একটি বিশালাকার দিঘী খনন করেন। পরবর্তীতে শম্ভুচরণ রায় চৌধুরীর দত্তক পুত্র মহিমা রঞ্জন রায় চৌধুরীর উপর জমিদারীর দায়িত্ব অর্পিত হয়।

তিন বিঘা করিডোর (Tin Bigha Corridor)

Matrix BCS Series

কিংবা চারপাশের পরিবেশের মনভোলানো সৌন্দর্য্য এখানে আগত দর্শনার্থীদের এক অলৌকিক মায়ায় কাছে টানে।

বুড়িমারী স্থলবন্দর

৮ নং বুড়িমারী স্থলবন্দর বাংলাদেশের স্থলবন্দরগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি স্থলবন্দর। বাংলাদেশের শেষ প্রান্ত দেখতে

অনেকেই আসে এই স্থলবন্দরে। রাজধারী ঢাকা থেকে বুড়িমারী স্থলবন্দর ৪৫৭ কিলোমিটার। সড়ক পথে বুড়িমারী স্থলবন্দর আসা যায় এছাড়া ঢাকা থেকে রেলপথ এর মাধ্যমে বুড়িমারী স্থলবন্দরে আসা যায়।

নদনদী

তিস্তা নদী

তিস্তা লালমনিরহাটের উপর দিয়ে প্রবাহিত প্রধান নদী। এটি ব্রহ্মপুত্রের একটি উপনদী। ভারতের উত্তর সিকিমের পার্বত্য এলাকায় এর উৎপত্তি। পার্বত্য এলাকায় এর প্রবাহ সৃষ্টি করেছে অপরুপ দৃশ্যের। লাচেন এবং লাচুং নামের দু'পর্বত স্রোতধারাই তিস্তার উৎস। এ দু'স্রোত ধারা সিকিমের চুংথাং-এ এসে মিলেছে। চুংথাংক এর ভাটিতে তিস্তা আস্তে আস্তে প্রশস্থ হতে থাকে। সিংতামে এর প্রশস্ততা ৪৩ কিলোমিটার। জলপাইগুড়ি জেলার মোট ৫৬ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তিস্তা নীলফামারী জেলার ডিমলা থানার ছাতনাই গ্রামের প্রায় ১ কিলোমিটার উত্তর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশে ১শ ১২ কিলোমিটার পথ প্রবাহিত হয়ে তিস্তা চিলমারীর দক্ষিনে গাইবান্ধা জেলার কামারজনি মৌজায় ব্রহ্মপুত্র নদে মিলিত হয়।

এ নদী বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের অধিকাংশ জেলা অর্থাৎ নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার উপর দিয়ে প্রভাবিত হয়। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিস্তা ছিল উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী। তিস্তা নদীর দুটি ব্যারেজ একটি ভারতের গজলডোবায়, অন্যটি বাংলাদেশের দোয়া নীড়ে। বুড়ি তিস্তা, ঘাঘট, মানাস, ধাইজান ইত্যাদি তিস্তার শাখা নদী ছিলো কিন্তু ধীরে ধীরে উৎস নদী থেকে এগুলো পৃথক হয়ে গেছে।

Matrix BCS Series

ভারতের মালিকানাধীন তিন বিঘা জায়গা জুড়ে অবস্থিত একটি স্বতন্ত্র ভূমি। বাংলাদেশের লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেঘলীগঞ্জ জেলা সীমান্তে তিনবিঘা করিডোরের অবস্থান। বাংলাদেশের দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলে যাতায়াতের সুবিধার্থে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইজারার মাধ্যমে তিনবিঘা করিডোর বাংলাদেশকে দেওয়া হয়।

দহগ্রাম এবং আংগরপোতা হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ছিটমহল বা এনক্লেভ। সর্বমোট ১৮.৬১ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ভূখণ্ডের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার। চারপাশে ভারতীয় ভূখন্ড দিয়ে ঘেরা তিনবিঘা করিডোর বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে অবস্থিত। ১৭৮ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ৮৫ মিটার প্রস্থের করিডোরটি বাংলাদেশকে দহগ্রামের সাথে যুক্ত রেখেছে। বর্তমানে তিনবিঘা করিডোর একটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। আর এই করিডোর ব্যবহার করে দহগ্রামে যাওয়ার সময় রাস্তা ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত।

তিস্তা ব্যারেজ

তিস্তা ব্যারেজ (Teesta Barrage) বা তিস্তা সেচ প্রকল্প বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম সেচ প্রকল্প। তিস্তা নদীর উপর নির্মিত তিস্তা ব্যারেজের একপাশে আছে লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলাধীন গড্ডিমারী ইউনিয়নের দোয়ানী গ্রাম এবং অন্য পাশে আছে নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলাধীন খালিসা চাপানী ইউনিয়নের ডালিয়া নামক স্থান। রংপুর, দিনাজপুর, নিলফামারী ও বগুড়া জেলার অনাবাদী জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন সরকার তিস্তা ব্যারেজ তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে ৬১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের ৪৪ রেডিয়াল গেট বিশিষ্ট ব্যারেজের নির্মাণ কাজ শুরু হয়, যা ১৯৯০ সালে শেষ হয়।

তিস্তা ব্যারেজের নদীর দুই পাশে গড়ে তোলা হয়েছে সবুজ বেষ্টনি। এছাড়াও ব্যারেজ এলাকায় রয়েছে কয়েকটি পিকনিক স্পট। ব্যারেজের কালো পিচের রাস্তা ধরে ছুটে চলা

Matrix Series

ধরলা নদী

ধরলা নদী বাংলাদেশ-ভারতের একটি আন্তঃসীমান্ত নদী। নদীটি পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। প্রবেশের পর নদীটি পাটগ্রাম থানার কাছে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং অকস্মাৎ বাঁক নিয়ে কুড়িগ্রাম জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশ অংশে ধরলার দৈর্ঘ্য ৭৫ কিলোমিটার। এর গড় গভীরতা ১২ ফুট বা ৩.৭ মিটার এবং কুড়িগ্রামে সর্বোচ্চ গভীরতা ৩৯ ফুট বা ১২ মিটার। উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে দীর্ঘ সড়ক সেতু টি এই নদীর উপর অবস্থিত। ৯৫০ মিটার দৈর্ঘবিশিষ্ট পিসি গার্ডার সেতুটি ২য় ধরলা সেতু/ফুলবাড়ী ধরলা সেতু/ শেখ হাসিনা ধরলা সেতু নামে ২০১৮ সালে চালু হয়।

সতী-স্বর্ণামতি-ভাটেশ্বরী নদী

সতী-স্বর্ণামতি-ভাটেশ্বরী নদী বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লালমনিরহাট জেলার একটি নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ৩৫ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ১৫০ মিটার এবং নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার।

রত্নাই নদী

রত্নাই নদী বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লালমনিরহাট জেলার একটি নদী। এছাড়াও লালমনিরহাট জেলার উপর দিয়ে সানিয়াজান, সাঁকোয়া, মালদহ, ত্রিমোহিনী, গিরিধারী, ছিনাকাটা, ধলাই নদী প্রবাহিত হয়েছে

জেলার ঐতিহ্য

তুষভান্ডার জমিদার বাড়ী

কালীগঞ্জ উপজেলার তুষভান্ডার ইউনিয়নের উত্তর ঘনেশ্যাম মৌজায় অবস্থিত। তৎকালে ধর্মীয় কার্যাদির জন্য উপঞ্চৌকি ব্যবস্থায় ভূমি দান করা হতো। মুরারি দেব ঘোষাল ভট্রাচার্য ব্রাহ্মন হওয়ায় শূদ্র রাজার দান ভোগে আপত্তি উত্থাপন করেন এবং প্রদত্ত সম্পত্তির জন্য খাজনা গ্রহণের আবেদন জানান। মহারাণী অবশেষে খাজনা স্বরূপ ধানের তুষ গ্রহণে সম্মত হন।

Matrix BCS Series

খাজনা স্বরূপ প্রদানের জন্য তুষ সংগ্রহ করে বর্তমানে জমিদার বাড়ীর পূর্ব পাশে অনতিদূরে স্তুপাকারে রাখা হতো এবং পরে তা কোচবিহার রাজবাড়ীতে প্রেরণ করা হতো। এ তুষ দিয়ে রাজবাড়ীতে বিভিন্ন ধরণের যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন করা হতো। জনশ্রুতি মতে, সংগৃহীত তুষের স্তুপের কারণে তৎকালে স্থানটি তুষভান্ডার (তুষের ভান্ডার) হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল।

কাকিনা জমিদার বাড়ি

অবস্থান

লালমনিরহাট জেলা সদর হতে ৩০ কিমি দুরত্বে কালীগঞ্জ উপজেলাধীন কাকিনা ইউনিয়নের কাকিনা মৌজায় এ জমিদার বাড়িটি অবস্থিত।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মহারাজা মোদ নারায়নের সময় কাকিনা ছিল কোচবিহার রাজ্যাধীন একটি চাকলা। তৎকালে কাকিনার চাকলাদার ছিলেন ইন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী। ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ঘোড়াঘাটের ফৌজদার এবাদত খাঁ মহারাজা মোদ নারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কোচ রাজ্যে অভিযান চালানোর সময় রঘু রামের দু'পুত্র রাঘবেন্দ্র নারায়ণ ও রাম নারায়ণ ফৌজদারের পক্ষ অবলম্বন করেন। মোগলদের এ অভিযানে কোচ বাহিনী পরাজিত হলে ইন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তীকে কাকিনার চাকলাদার পদ থেকে অপাসারণ করা হয় এবং রাঘবেন্দ্র নারায়ণকে পরগনা বাষট্রি ও রাম নারায়ণকে পরগনা কাকিনার চৌধুরী নিযুক্ত করা হয়। এভাবেই ইন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তীর চাকলাদারী শেষ হয়ে কাকিনায় রাম নারায়ণের মাধ্যমে নতুন জমিদারীর সূচনা ঘটে। ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে রাম নারায়ণ কাকিনা পরগনার চৌধুরী নিযুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে কাকিনায় যে জমিদারীর সূচনা ঘটেছিল, জমিদার মহেন্দ্ররঞ্জনের সময় তাঁর অপরিণামদর্শী ব্যয় ও বিলাসীতার কারণে তা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। মহাজনদের বকেয়া ও সরকারি রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জমিদারী নিলাম হয়ে যায় এবং এর পরিচালনার ভার কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর অধীন চলে যায়। অতঃপর তিনি প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় সপরিবারে কাকিনা ত্যাগ করে কার্সিয়াং-এ চলে যান। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সেখানেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

নিদাড়িয়া মসজিদ

অবস্থান

লালমনিরহাট সদর উপজেলাধীন কিশামত নগরবন্দ মৌজায় অবস্থিত। এর অবস্থান রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়ক হতে ২ কিমি দক্ষিনে।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মোগল সুবেদার মনছুর খাঁ ১১৭৬ হিজরীতেমসজিদটির জন্য ১০.৫৬ একর জমি দান করেন এবং মসজিদটি নির্মান করেন। ঐ সময়ের মোতয়াল্লি ছিলেন ইজার মাহমুদ শেখ , বিজার মাহমুদ শেখ, খান মাহমুদ শেখ প্রমূখ। সুবেদার মনছুর খাঁর দাড়ী না থাকায় তার নির্মিত্ত মসজিদটি নিদাড়ীয়া মসজিদ হিসেবে জনগন অবহিত করে আসছে মর্মে জনশ্রুতি রয়েছ। বর্তমানে স্থানীয় জনগন মসজিদটিতে নামাজ আদায় করেন।

Matrix BCS Series

হারানো মসজিদ

অবস্থান

রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়কের ১ কিমি দক্ষিনে লালমনিরহাট উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজায় এ প্রাচীন মসজিদটি অবস্থিত।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

লালমনিরহাট সদর উপজেলাধীন পঞ্চগ্রাম ইউনয়নের রামদাস মৌজায় রংপুর কুড়িগ্রাম মহাসড়কের অনতিদূরে বহুদিন ধরে একটি পতিত জঙ্গল ছিল। এ জঙ্গলের নাম মজদের আড়া। স্থানীয় ভাষায় আড়া শব্দের অর্থ জঙ্গলময় স্থান।কেউ হিংস্র জীব-জন্তু, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদির ভয়ে ভেতরে প্রবেশ করতো না। জঙ্গল পরিষ্কার করতে যেয়ে বেরিয়ে আসে প্রাচীন কালের তৈরী ইট যার মধ্যে ফুল অংকিত। এমনিভাবে মাটি ও ইট সরাতে গিয়ে একটি পূর্ন মসজিদের ভিত বেরিয়ে আসে। এর মধ্যে ৬"×৬"×২" সাইজের একটি শিলালিপি পাওয়া যায় যার মধ্যে স্পষ্টাক্ষারে আরবীতে লেখা আছে 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ, হিজরী সন ৬৯। তখনই স্থানীয় লোকদের মনে প্রত্যয় জন্মে যে, এটি-একটি প্রচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। বর্তমানে সেখানে একটি মসজিদ নির্মান করা হয়েছে

বসিক শিল্প নগরীতে জেপিএল ফার্ণিচারের কারখানা অবস্থিত। উক্ত উন্নতমানের সিজন ও ট্রিটেড কাঠের বিভিন্ন ডিজাইনের দরজা ও ফার্ণিচার তৈরী হয়।

প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব

কবি শেখ ফজলল করিম

নীতিবাদী সাহিত্যসাধক কবি শেখ ফজলল করিমের জন্ম ১৮৮৩ সালের ১৪ এপ্রিল কালীগঞ্জের কাকিনা গ্রামে। তাঁর মাতার নাম কোকিলা বিবি। পিতামহ জসমত উল্লাহ সরদার ছিলেন জমিদার শম্ভুরঞ্জন রায় চৌধুরীর একজন বিশ্বস্থ কর্মচারী। পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে শেখ ফজলল করিম দ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় ১৯০৮ সালে কাকিনা থেকে প্রকাশিত হয় 'বাসনা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা। তৎকালে এ পত্রিকা ভূয়সী সুনাম অর্জন করেছিল। অতঃপর ১৯৩০ সালে শিশুদের জন্য 'জমজম' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে তৃষ্ণা, মানসিংহ, এসবাত-ইস-ছামী বা ছামী তত্ত্ব, পরিত্রান, ভগ্নবীণা, লাইলী মজনু, মহর্ষী এমাম রব্বানী মুজাদ্দেদ আলফেসনী

(রহঃ), আফগানিস্থানের ইতিহাস, পথ ও পাথেয়, চিন্তার চাষ, বিবি রহিমা, রাজর্ষী এবরাহীম, বিবি খাদিজা, বিবি ফাতেমা সহ আরও অনেক গ্রন্থ।

'স্বর্গ ও নরক' শীর্ষক কবিতাখানি লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন ।

সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য নদীয়া সাহিত্য সভা তাঁকে সাহিত্যবিশারদ (১৯১৬) এবং কাব্যরত্নাকর (১৯১৭) উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে।

১৯৩৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মধ্য রাতে কাকিনায় নিজ বড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাড়ির সম্মুখে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

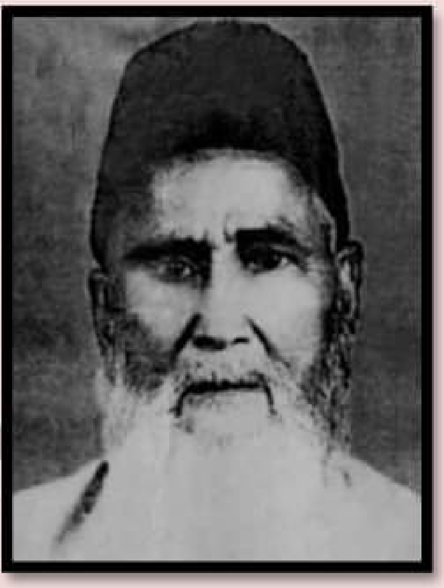

কাজী শেখ রেয়াজ উদ্দিন আহমেদ – শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক

১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে কালীগঞ্জের দলগ্রাম ইউনিয়নের কাজী পরিবারে কাজী শেখ রেয়াজ উদ্দিন আহমেদ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হাজী শেখ মুহম্মদ জয়েন উল্লাহ এবং মাতার নাম ফুল বিবি। তিনি একাধারে একজন লাঠিয়াল, শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক এবং সমাজ সচেতন সংগ্রামী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্যার সৈয়দ আমীর আলী রচিত 'শর্ট হিস্ট্রি অব দি স্যারাসেনস' গ্রন্থের সার্থক অনুবাদ করেছিলেন। তিন খন্ডে অনুবাদকৃত গ্রমহটি 'আরব জাতির ইতিহাস' নামে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে প্রথম খন্ড ১৯১০ সালে, দ্বিতীয় খন্ড ১৯১২ সালে এবং তৃতীয় খন্ড ১৯১৫ সালে। বাংলা একাডেমী ১৯৭১ সালে গ্রন্থটির তিন খন্ড একত্রে প্রকাশ করে। তাছাড়া তিনি ১৮৯৬ সালে লন্ডন ও আলীগড় থেকে প্রকাশিত Sir Thomas Walker Arnold রচিত The Preaching of Islam গ্রন্থটি অনুবাদ করে এর নাম দেন 'ইসলাম প্রচারের ইতিহাস'। তার রচিত উপন্যাস 'মালেকা' ১৯২০ খ্রিস্টব্দে প্রকাশিত হয়। কাজী শেখ রেয়াজ উদ্দিন আহমেদ একজন লাঠিয়াল হিসেবে ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ লাঠিয়াল সমিতির সভাপতি ছিলেন। দেশ বিভাগের পর এ সমিতির নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান লাঠিয়াল বাহিনী। প্রায় ২০ হাজার লাঠিয়াল এ বাহিনীর সদস্য ছিল। পাকিস্তান সরকার তাকে 'তমঘা-ই মজলিস' খেতাবে ভূষিত করে। ১৯৭২ সালের ২৫ জুন তিনি মারা যান।

Matrix BCS

ভাষা ও সংস্কৃতি

ভাষা

লালমনিরহাট, কালীগঞ্জ অঞ্চলের লোকসমাজে প্রচলিত ভাষার লক্ষ্যণীয় কিছু বিশেষ দিক নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. ক্রিয়াপদের আগে 'না' এর ব্যবহার। যেমন ; না খাওঁ (খাইনা), না যাওঁ (যাইনা)।

২. 'র' বর্ণের স্থলে 'অ' বর্ণ ব্যবহারের প্রবণতা। যেমন ; অং (রং), অসূণ (রসূণ)।

৩. 'ল'বর্ণের স্থলে 'ন' বর্ণ ব্যবহারের প্রবণতা। যেমন ; নাল (লাল), নাউ (লাউ)।

৪. স্থানের নামের শেষের বর্ণে এ-কার থাকলে তা তুলে দিয়ে শব্দের শেষে 'ত' বর্ণ যুক্তকরণের প্রবণতা। যেমন; মাঠত (মাঠে), ঘাটত (ঘাটে), হাটত (হাটে)।

৫. ভবিষ্যতে স্বয়ং কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের শেষে 'ম' বর্ণ ব্যবহারের প্রবণতা। যেমন ; যাইম, খাইম, দেখিম।

৬. সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের উদাহরণ হচ্ছে- মুঁই (আমি), হামরা (আমরা), তুঁই (তুমি), তোমরাগুলা (তোমরা), অঁয় (সে), ওমরা/ওমরাগুলা (তারা)।

লোকসমাজে প্রচলিত ছড়া, হেল্লক (ধাঁধাঁ বা ছিল্কা), প্রবাদ-প্রবচন, মেয়েলী গীত, মন্ত্র, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি লোক সাহিত্যের মূল্যবান উপাদান। এগুলোর মধ্য দিয়ে সন্ধান মিলে আবহমানকাল ধরে চলে আসা মানুষের রুচি, বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সংস্কার, রসবোধ, সুখ-দুঃখ, উপদেশ, নিষেধ ইত্যাদির। নিম্নে এ জেলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো-

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ছড়া

শিশু মনের অন্যতম খোরাক হচ্ছে-ছড়া। লোকসমাজে মায়েরা যেমন বিভিন্ন ছড়া বলতে বলেতে শিশুদের ঘুমপাড়ায়, তেমনি ছোট ছেলে-মেয়েরা খেলায় বিভিন্ন ধরণের ছড়া ব্যবহার করে থাকে। তাছাড়া অন্যকে ক্ষেপিয়ে তুলতেও এরব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

বিশেষ অর্জন

১। বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৯ এ লালমনিরহাট জেলার ২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিভাগীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত ২৯ শে জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে রংপুর স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বিভাগীয় ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার পশ্চিম জগতবের ছিচার পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার রতনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দলকে ৫-০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় এবং বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে পাটগ্রাম উপজেলার টেপুরগাড়ি বিকে সরকারি প্রাথমিক

Matrix BCS Series

বিদ্যালয় রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার ঝুমাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দলকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।

২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) দুই প্রতিযোগিতার ফাইনালে জয়ী হয়েছে পাটগ্রাম দল। ২১ সেপ্টেম্বর বিকেলে লালমনিরহাট শেখ কামাল স্টেডিয়ামে প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক আবু জাফর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। জেলা প্রশাসন এবং জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে জেলা পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ৫ দিনব্যাপী এ টুর্নামেন্টে জেলার ৬টি বালক ও ৬টি বালিকা দল অংশ নেয়।

Matrix BCS Series

Facebook Page: Matrix BCS Series

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

১ম ধাপের মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলা পরিচিতি

Facebook Page: Matrix BCS Series

ঢাকা জেলা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর নং: ২

সেক্টর কমান্ডার:

- মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল- সেপ্টেম্বর);
- মেজর এ. টি. এম. হায়দার (সেপ্টেম্বর- ডিসেম্বর)

উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা:

ক্র: নং	পদবী	নাম
০১	বীর প্রতীক	মনসুরুল আলম দুলাল(মৃত)
০২	বীর প্রতীক	মৃত তৈয়ব আলী
০৩	বীর প্রতীক	মো: শাহজাহান কবীর
০৪	অনা: ক্যাপ্টেন	সায়েব সুবেদার আব্দুল হাই
০৫	বীর মুক্তিযোদ্ধা	মো: আনোয়ার হোসেন

Matrix BCS

০৬	বীর মুক্তিযোদ্ধা	মো: মোজাম্মেল হক
০৭		শহীদ আবুল হোসেন
০৮		শহীদ মো: শহীদুল্লাহ
০৯	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	বীর শ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান
১০	বীর প্রতীক	শেখ আব্দুল মান্নান
১১		শহীদ আমীর হোসেন
১২	সুবেদার	হাসান উদ্দিন আহম্মেদ
১৩	সুবেদার	মো: গোলাম মোস্তফা

কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি:

- নবাব আবদুল গণি
- নবাব খাজা আহসান উল্লাহ
- নবাব স্যার সলিমুল্লাহ
- কবি শামসুর রহমান
- আজম খান
- আব্দুর রহমান বয়াতী
- লে. জেনারেল মীর শওকত আলী (সেক্টর কমান্ডার)

সংসদীয় আসন: **২০টি**

১৭৪	ঢাকা-১	সালমান ফজলুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৭৫	ঢাকা-২	মোঃ কামরুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৭৬	ঢাকা-৩	নসরুল হামিদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৭৭	ঢাকা-৪	সৈয়দ আবু হোসেন	জাতীয় পার্টি
১৭৮	ঢাকা-৫	কাজী মনিরুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৭৯	ঢাকা-৬	কাজী ফিরোজ রশীদ	জাতীয় পার্টি
১৮০	ঢাকা-৭	হাজী মোঃ সেলিম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৮১	ঢাকা-৮	রাশেদ খান মেনন	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি
১৮২	ঢাকা-৯	সাবের হোসেন চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৮৩	ঢাকা-১০	মোঃ শফিউল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৮৪	ঢাকা-১১	এ কে এম রহমতুল্লাহ্	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৮৫	ঢাকা-১২	আসাদুজ্জামান খাঁন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৮৬	ঢাকা-১৩	মোঃ সাদেক খান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৮৭	ঢাকা-১৪	আগাখান মিন্টু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৮৮	ঢাকা-১৫	কামাল আহমেদ মজুমদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

Matrix BCS Series

জেলার পুরাতন নাম: **জাহাঙ্গীরনগর**

জেলার ঐতিহ্য: **একুশে বইমেলা, বৈশাখী বর্ষবরণ।**

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭২

উপজেলা: ৫ টি

ইউনিয়ন: ৬২ টি

যে নদীর তীরে অবস্থিত: বুড়িগঙ্গা

দর্শনীয় স্থান: জাতীয় সংসদ, শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, লালবাগ কেল্লা, ছোট কাটরা, বড় কাটরা, আহসান মঞ্জিল, শাহী মসজিদ, তারা মসজিদ, ঢাকা গেইট।

নামকরণ

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা মোঘল-পূর্ব যুগে কিছু গুরুত্ব ধারণ করলেও শহরটি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে মোঘল যুগে। ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট করে তেমন কিছু জানা যায় না। এ সম্পর্কে প্রচলিত মতগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপঃ

ক) একসময় এ অঞ্চলে প্রচুর ঢাক গাছ (বুটি ফুডোসা) ছিল;

খ) রাজধানী উদ্বোধনের দিনে ইসলাম খানের নির্দেশে এখানে ঢাক অর্থাৎ ড্রাম বাজানো হয়েছিল;

গ) 'ঢাকাভাষা' নামে একটি প্রাকৃত ভাষা এখানে প্রচলিত ছিল;

ঘ) রাজতরঙ্গিণী-তে ঢাক্কা শব্দটি 'পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র' হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে অথবা এলাহাবাদ শিলালিপিতে উল্লেখিত সমুদ্রগুপ্তের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ডবাকই হলো ঢাকা।

মোঘল পূর্ব যুগের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে ঢাকা শহরে দু'টি এবং মিরপুরে একটি মসজিদ রয়েছে। এর মধ্যে প্রাচীনতমটির নির্মাণ তারিখ ১৪৫৬ খ্রিষ্টাব্দ (জোয়াও দ্য ব্যারোস ঢাকাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে দেখতে পান এবং ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে তার অঙ্কিত মানচিত্রে এর অবস্থান নির্দেশ করেন।

আকবর নামা গ্রন্থে ঢাকা একটি থানা (সামরিক ফাঁড়ি) হিসেবে এবং আইন-ই- আকবরী গ্রন্থে সরকার বাজুহার একটি পরগনা হিসেবে ঢাকা বাজু উল্লিখিত হয়েছে। ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খান চিশতি সুবাহ বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন এবং সম্রাটের নামানুসারে এর নামকরণ করে জাহাঙ্গীরনগর।

Matrix BCS Series

প্রশাসনিকভাবে জাহাঙ্গীরনগর নামকরণ হলেও সাধারণ মানুষের মুখে ঢাকা নামটিই থেকে যায়। সকল বিদেশী পর্যটক এবং বিদেশী কোম্পানির কর্মকর্তারাও তাদের বিবরণ এবং চিঠিপত্রে ঢাকা নামটি ব্যবহার করেন।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও প্রশাসনিক বিবর্তন

মুসলিম পূর্ব যুগে বর্তমান ঢাকা জেলা অঞ্চল 'বঙ্গ' নামে পরিচিত প্রশাসনিক অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এর কিয়দংশ কখনো কখনো সমতট এবং কখনো কখনো হরিকল নামে পরিচিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী বঙ্গ দেশে সেন রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম রাজত্বের সূচনা করেন।

মোঘল যুগের পূর্বে বাংলার হিন্দু ও মুসলিম শাসকেরা ঢাকার চারিদিকের বিভিন্ন অবস্থানে তাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এসব রাজধানী নগরীর কয়েকটি নিদর্শন এখনো বিক্রমপুর, ভাওয়াল ও সোনারগাঁওয়ে দেখা যায়। ১৫৭৫ সালে মোঘলরা পাঠান সুলতানের কাছ থেকে বাংলার শাসনভার ছিনিয়ে নিলেও তাদেরকে বাংলার ভূস্বামী বা ভূইয়াদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য যথেষ্ঠ বেগ পেতে হয়।

১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর প্রায় একশত বছর ঢাকার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। এ শহরে ছিল প্রশাসনিক সদর দফতর এবং সুবাহদার ও অন্যান্য কর্মচারীদের বাসস্থান। ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে মাহজাদা সুজা (১৬৩৯-৫৯) রাজধানী স্থানান্তর করেন। সুবাহদারি স্থানান্তরিত হলে ঢাকা রাজধানীর গুরুত্ব হারিয়ে একটি স্থানীয় প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

Matrix BCS Series

পরবর্তী সুবাহদার শাহ সুজা ঢাকায় নির্মাণ কর্মকান্ড শুরু করেন। শাহ সুজার দীউয়ান মীর আবুল কাশিম ১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে বড় নামে একটি সুপ্রশস্ত ইমারত নির্মাণ করেছিলেন। ইমারতটির অবস্থান বুড়িগঙ্গার তীরে এবং বর্তমান চকবাজারের দক্ষিণে।

ঢাকার ইতিহাসে বেশ কয়েকটি নির্মাণ কাজের সঙ্গে মীরজুমলা নাম জড়িয়ে আছে, প্রথমে মীরজুমলার গেট পরবর্তী সময়ে যা রমনা গেট নামে পরিচিত হয়। কার্জন হল এর কাছাকাছি ও পুরাতন হাইকোর্ট ভবনের পশ্চিমে ময়মনসিংহ রোডে গেটটি অবস্থিত।

পরবর্তী সুবাদার শায়েস্তা খান ছিলেন একজন খ্যাতিমান নির্মাতা। অবশ্য তিনি একটি কাটরাও নির্মাণ করেন। এটি ছোট কাটরা নামে পরিচিত, শাহ সুজার বড় কাটরা থেকে পৃথক করার জন্য এ নামকরণ। তিনি বেশ কয়েকটি মসজিদ ও সমাধিসৌধও নির্মাণ করেন। মসজিদ গুলির মধ্যে চকবাজার মসজিদ, বাবুবাজার মসজিদ ও সাতগম্বুজ মসজিদ বিখ্যাত। সমাধিগুলির মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিবি পরীর সমাধি।

নদীপথের পাশে অবস্থানের কারণে ঢাকা প্রাক-মোঘল যুগেই স্থানীয় বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। কেননা ঢাকা ছিল একটি উৎপাদন কেন্দ্র।

এখানে উৎপাদিত সুতিবস্ত্র উচ্চমান সম্পন্ন এবং বহির্বিশ্বে ছিল এর প্রচুর চাহিদা। মসলিন নামে পরিচিত বিভিন্ন ধরনের সুতিবস্ত্র বাইরে রপ্তানি হতো। এ সব ক্রয়ের জন্য ইউরোপীয় কোম্পানীগুলো আমদানি করত প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য পিন্ড।

বাংলার নওয়াবদের রাজনৈতিক ক্ষমতার পতন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান আঠারো শতকের শেষভাগে ঢাকার প্রশাসনিক গুরুত্বকে ম্লান করে দেয়। উপরন্তু, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক ও উৎপাদন নীতি নগরীর আর্থিক ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়।

উন্নয়নের নতুন ধারা এবং সমৃদ্ধির নতুন যুগের সূত্রপাতের মাধ্যমে ১৮৪০- এর দশক নগর ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করে। নগর উন্নয়নের এ যাত্রা তখন থেকেই অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। প্রশাসনিক ক্রমবৃদ্ধি ইতঃপূর্বে ঢাকা জেলা প্রশাসনের কেন্দ্র ছিল। এটি ১৮২৯ সালে ঢাকা বিভাগ নামে একটি বৃহৎ বিভাগের সদর দফতরে পরিণত হয়। এরপর ঢাকার প্রশাসনিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৮৮৫ সালের মধ্যে বঙ্গপ্রদেশে কলকাতার পরে ঢাকা নগরীকে সর্ববৃহৎ বেসামরিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

১৯০৫-১১ সালের দিকে ঢাকার প্রশাসনিক গুরুত্ব নাটকীয়ভাবে আরও বৃদ্ধি পায় যখন এটিকে পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয়। একটি হাইকোর্ট এবং একটি সচিবালয়সহ একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

Matrix BCS Series

বর্তমানে অবশ্য ছোট কাটরা বলতে কিছুই বাকি নেই শুধু একটি ভাঙা ইমারত ছাড়া। যা শুধু বিশাল তোরনের মতন সরু গোলির উপর দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে অসংখ্য দোকান এমন ভাবে ঘিরে ধরেছে যে দেখে বোঝার উপায় নেই যে এখানে মুঘল আমলের এমন একটি স্থাপত্য ছিল।

ছোট কাটরার ব্যবহারঃ

শায়েস্তা খানের আমলে ছোট কাটরা নির্মিত হয়েছিল সরাইখানা বা প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য। কোম্পানি আমলে ১৮১৬ সালে মিশনারি লিওনারদ ছোট কাটরায় খুলেছিলেন ঢাকার প্রথম ইংরাজি স্কুল। ১৮৫৭ সালে, এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ঢাকার প্রথম নরমাল স্কুল। উনিশ শতকের শেষ দিকে অথবা বিশ শতকের প্রথম দিকে ছোট কাটরা ছিল নবাব পরিবারের দখলে। এবং তাতে তখন কয়লা ও চুণার কারখানার কাজ চলত।

ছোট কাটরার বর্তমান অবস্থাঃ

বর্তমানে, ছোট কাটরাকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এখনও এর ধ্বংসাবশেষ দেখলে বোঝা যায় মোঘল আমলে নদীতীরে এমন সুন্দর একটি কাটরা দাঁড়িয়ে ছিলো।

বিবি চম্পার সৌধঃ

ছোট কাটরার সাথে বিবি চম্পার স্মৃতিসৌধ অবস্থিত ছিল। এক গম্বুজ, চার কোণা, প্রতিপাশে ২৪ ফুট দীর্ঘ ছিল স্মৃতিসৌধটি। তায়েশ (গবেষক) লিখেছেন, 'পাদ্রী শেফার্ড ওটা ধ্বংস করে দিয়েছেন'। শেফার্ড বোধহয় কবরটি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। বিবি চম্পা কে ছিলেন তা সঠিক জানা যায় নি। তবে কারো কারো মতে তিনি শায়েস্তা খাঁর মেয়ে ছিলেন।

Matrix BCS Series

লালকুঠি/ নর্থব্রুক হল

প্রতিষ্ঠাকাল

১৮৭২- ১৮৭৬ সালে নগর মিলনায়তন হিসেবে লালকুঠি / নর্থব্রুক হল প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঠিকানা ও অবস্থান

বাংলাবাজার থেকে ১০০ গজ এগিয়ে বুড়িগঙ্গার পাড় ঘেশে ফরাশগঞ্জ মহল্লায় ১ নং ফরাশগঞ্জ ঢাকা এই ঠিকানায় লালকুটি/নর্থব্রুক হলটির অবস্থান।

খোলা ও বন্ধের সময়সূচী

নর্থব্রুক হলটি শুধু অনুষ্ঠান, সম্মেলন, সভা ও অন্যান্য কাজে খোলা হয়। এছাড়া প্রতিদিনই সকাল থেকে রাত পর্যন্তই খোলা থাকে এই হল প্রাঙ্গণ। এছাড়া গ্রন্থাগার ও ব্যায়ামাগার প্রতিদিনই খোলা থাকে।

কর্তৃপক্ষ

নর্থব্রুক হলটি এখন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অধীনে। ৭৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সির বর্তমানে এটির তত্ত্বাবধায়ক।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পূর্ব দিক থেকে একটি গাড়ি বারান্দা দিয়ে প্রবেশযোগ্য। এ ইমারতে প্রবেশ করলেই প্রথমে একটি চতুরস্ত্র হলঘর পড়বে। এর দক্ষিণে কয়েকটি ছোট আকারের কোঠা এবং আধানলাকার ছাদে ঢাকা বারান্দা রয়েছে। হলঘরটির উত্তরের গাড়ি বারান্দা। দক্ষিণের ছোট ছোট কোঠা এবং আধানলাকার ছাদ ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে উঠায় ইমারতটিকে বাইরের দিক থেকে দেখতে পিরামিড আদলের মনে হয়। আর সার্বোপরি লালকুঠির মাঝের হলঘরটির উপর রয়েছে মোঘল ধাঁচে তৈরী একটি আদর্শ গম্বুজ। এবং স্থাপনাটির ছাদের প্রতিটি কোনায়ও একটি করে অনুরুপ গম্বুজ রয়েছে। অনুভূমিক কার্নিস ছাদ বড় (Parapet) দিয়ে সজ্জিত। সবকটি গম্বুজের চূড়ায় একটি করে সুচ্যগ্র চূড়াদন্ড রয়েছে। দরজা ও জানালাগুলোর উপরের অংশ ঘোড়ার পদতল আকৃতির খিলান ধারন করছে।

এই খিলানগুলোর কাঠের পাল্লায় ভেনেসীয় ব-াইন্ড ব্যবহৃত হয়েছে। নর্থব্রুক স্থাপত্যশৈলীতে মোঘল ও ইউরোপীয় প্রথাসিদ্ধতার অপূর্ব সংমিশ্রন ঘটেছে।

Matrix BCS Series

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলা নামে নতুন প্রদেশের রাজধানী হওয়ায় ঢাকার উথানে অধিকতর স্থায়ী উন্নয়ন সাধিত হয়। এ সময় হতে ঢাকা শুধু এ নতুন প্রদেশের প্রশাসনিক সদর দফতরই ছিল না বরং এখানে আইন পরিষদ এবং জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসত।

অনেক সংগ্রাম, ত্যাগ এবং রক্তের বিনিময়ে নয়মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে ঢাকা রাজনৈতিক , প্রশাসনিক কার্যকলাপ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ররূপে মর্যাদা লাভ করে।

পুরাকীর্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ঐতিহাসিক স্থাপনা

ভ্রমন, বেড়ানো নিঃসন্দেহে একটি বিনোদনমূলক কাজ। আর স্থানটি যদি হয় কোন ঐতিহাসিক স্থাপনা তবে সে ভ্রমন একদিকে যেমন ভ্রমনের আনন্দকে বাড়িয়ে তোলে অন্যদিকে জ্ঞান বিকাশেরও মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ঢাকার মধ্যেই রয়েছে এরকম বেশ কিছু ঐতিহাসিক স্থাপনা। এগুলোর বেশীর ভাগই মুঘল আমলে নির্মিত। লালবাগ কেল্লা, ছোট কাটারা, বড় কাটারা, আহসান মঞ্জিল, শাহী মসজিদ, তারা মসজিদ, সাত মসজিদ ও ঢাকা গেইট ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন। মসজিদগুলো ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং বাকি স্থাপনাগুলো সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রীত।

ছোট কাটরা

ছোট কাটরা শায়েস্তা খানের আমলে তৈরি একটি স্থাপনা বা ইমারত। আনুমানিক ১৬৬৩ থেকে ১৬৬৪ সালের দিকে এ ইমারতটির নির্মান কাজ শুরু হয় এবং তা ১৬৭১ সালে শেষ হয়েছিল। এটির অবস্থান ছিল বড় কাটরার পূর্বদিকে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে। ইমারতটি দেখতে অনেকটা বড় কাটরার মত হলেও এটি আকৃতিতে বড় কাটরার চেয়ে ছোট এবং এ কারণেই হয়তো এর নাম হয়েছিল ছোট কাটরা। তবে ইংরেজ আমলে এতে বেশ কিছু সংযোজন করা হয়েছিল। ১৮১৬ সালে মিশনারি লিওনার্দ ঢাকার প্রথম ইংরেজি স্কুল।

লালকুঠি নামকরণ

১৮৭২ সালে নির্মিত এই নর্থব্রুক হলটির ইমারতটি লালরঙ্গে রাঙ্গানো ছিল। এবং পরবর্তীতে এই নর্থব্রুক হলটিকে লালকুঠি নামে ডাকা হতো। তাই এর নাম হল নর্থব্রুক হল বা লালকুঠি।

গ্রন্থাগার

নর্থব্রুক হল বা লালকুটিতে একটি বহুপুরনো গ্রন্থাগার আছে। প্রতিদিন এই গ্রন্থাগার খোলা থাকে। এইখানে বহু পুরনো মূল্যবান বই আছে। এই গ্রন্থাগারটি লালকুঠির দক্ষিণ-পূর্ব কোনের একটি জরাজীর্ন ভবনে অবস্থিত। এখানে মূল্যবান বই ছাড়াও দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। প্রায় ৮ টি স্বনামধন্য পত্রিকা থাকে। স্থানীয় লোকজন এখানে বেশীর ভাগ সময় বেসে পত্রিকা পড়েন। গ্রন্থাগারটিতে সংগৃহীত মূল্যবান বইগুলো ঢাকার নবাব আহসান উল্লাহ সাহেব এবং আরও অনেকেই দিয়েছিলেন এই গ্রন্থাগারটিতে প্রায় ১৫ টি তাক আছে এবং বসে পড়ার জন্য টেবিল ও চেয়ার আছে। গ্রন্থাগারের দুইজন কেয়ারটেকার আছেন।

বর্তমান অবস্থা

নর্থব্রুক হলটি বর্তমানে আগের অবস্থায় নেই। সময়ের প্রয়োজনে এখানে নতুন স্থাপনা গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠা নতুন স্থাপনাগুলো হল-

-মঈন উদ্দিন চৌধুরী মেমোরিয়াল হল।
-কমিশনার কার্যালয়।
-স্পোর্টিং ক্লাব।
-কমিউনিটি সেন্টার।
-ব্যায়ামাগার।
-বিট পুলিশিং অফিস।
-ডায়াবেটিস সমিতি।
-ছোট বড় সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যক্রম।

মঈনউদ্দিন চৌধুরী মেমোরিয়াল হল

১৯৬৭ সালে এই লালকুঠিতে একটি মেমোরিয়াল মঞ্চ নির্মাণ করার জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এবং পরবর্তীতে তৎকালীন ঢাকার মেয়র জনাব মোঃ হানিফ এই হলটির পুনঃ নির্মান কাজ শুরু করেন ২৫ শে এপ্রিল ১৯৯৬ ইং সালে। এবং ১৪ ই নভেম্বর ১৯৯৭ ইং এই

হলটির উদ্বোধন করেন। ৩৫০ আসন বিশিষ্ট এ হলটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং অন্যান্য সুবিধা সম্বলিত।

কমিশনার কার্যালয়

এই লালকুঠির মূল প্রবেশপথের ডান পাশের তিনতলা বিশিষ্ট ভবনটির ২য় তলায় ৭৯ নং ওয়ার্ড কমিশনারের কার্যালয় রয়েছে। বর্তমানে কমিশনার জনাব হাজী মোঃ সাইদ। তিনিই এই লালকুঠির সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে আছেন।

ফরাশগঞ্জ স্পোটিং ক্লাব

১৯৫৯ ইং সালে কথিত সরদার বাড়িতে ফরাশগঞ্জ ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৬৭ ইং সালে এই ক্লাবটি লালকুঠিতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ক্লাবটির প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আলহাজ্ব মাওলা বখস সরদার। লালকুঠিতে এর উদ্বোধন করেন জনাব মঈনুদ্দিন চৌধুরী। এখানে এই ক্লাবের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ছাড়াও আরও অন্যান্য কার্যক্রম চলে।

কমিউনিটি সেন্টার

এই নর্থব্রুক হলের ঠিক ডান পাশেই ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কমিউনিটি সেন্টার নির্মিত হয়েছে। পূর্বে এটি নগর মিলনায়তন হিসেবে নির্মিত হলেও বর্তমানে এটি একটি কমিউনিটি সেন্টার। প্রায় ২,০০০ লোক স্থান সংকুলান হয় এ সেন্টারটিতে। তৃতীয় তলা পর্যন্ত সেন্টারটি ছিমছাম। যে কোন বিয়ে ও অনুষ্ঠানের জন্য সেন্টারটিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা ৪,৫০০ টাকা এবং সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ভাড়া পড়বে।

অডিটোরিয়াম

লালকুঠিতে একটি অডিটোরিয়াম আছে। এখানে সভা, সম্মেলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করা যায়। প্রায় ৩০০ জন লোক বসার ব্যবস্থা আছে এবং এই অডটোরিয়াম হলটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ভাড়া পড়বে ৪,৫০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকা।

ব্যায়ামাগার

লালকুঠির মূল প্রবেশপথের বাঁ দিকে ভবনের নিচতলায় একটি সু-সজ্জিত ব্যায়ামাগার আছে। এখানে প্রতিদিন স্থানীয় এবং অন্যত্র থেকে আসা সকলেই শারিরিক কসরতের জন্য এখানে আসেন। সিটি কর্পোরেশন ব্যায়ামাগারটিতে অনেক সরঞ্জামাদি আছে। সদস্য হওয়ার জন্য ভর্তি হতে হয়। এটি স্থাপিত হয় ২০০১ ইং সালে।

বিট পুলিশিং অফিস

লালাকুঠিতে স্থাপিত কমিশনার কার্যালয়ের নীচতলায় অস্থায়ীভাবে পুলিশিং কার্যক্রমের জন্য বিট পুলিশিং বসানো হয়েছে। সূত্রাপুর থানাধীন ৭৯ নং ওয়ার্ডে ফরাশগঞ্জ বিট পুলিশিং অফিস বসানো হয়েছে।

Matrix BCS Series

ডায়াবেটিস সমিতি

লালকুটিতে বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার নেটওয়ার্ক এর একটি স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্থানীয় লোকজন এখান থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহন করে থাকেন।

সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

নর্থব্রুক হলের পেছনে তিনটি কক্ষ। স্থানীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ সকল সংগঠনের সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ তথা আনুষ্ঠাষাঙ্গিক কার্যক্রমগুলো আলাদা আলাদা দিনে করে থাকে।

ফোয়ারা

১৯৭১ ইং সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ৭৯ নং ওয়ার্ডের বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই নর্থব্রুক হল/ লালকুঠির দুটি প্রবেশদ্বারের মাঝামাঝি একটি সুদৃশ্য তারা আকৃতির ফোয়ারা নির্মান করা হয়েছিল।

রবীন্দ্র স্মৃতিফলক

লালকুঠির মূল ফটকের সামনে একটি রবীন্দ্র স্মৃতিফলক স্থাপন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্থানীয় একাধিক সংগঠনের আমন্ত্রনে ঢাকা শহরে লালকুঠিতে ঢাকা মিউনিসিপলিটি ও পিপলস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাকে সম্বর্ধনা জানিয়ে মানপত্র পাঠ করা হয়। জবাবে কবি দেশপ্রেম সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিশ্ব শান্তির পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

লালবাগ কেল্লা (ঐতিহাসিক স্থান)

লালবাগ কেল্লা, মোঘল আমলের বাংলাদেশের একমাত্র ঐতিহাসিক নিদর্শন যাতে একই সাথে ব্যবহার করা হয়েছে কষ্টি পাথর, মার্বেল পাথর আর নানান রঙবেরঙের টালি। লালবাগ কেল্লা ছাড়া আর বাংলাদেশের আর কোন ঐতিহাসিক নিদর্শনে এমন কিছুর সংমিশ্রণ পাওয়া যায়নি আজ পর্যন্ত। প্রায় প্রতিদিন হাজারো দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীর পদচারণয় মুখরিত হয় ঢাকার লালবাগ এলাকার এই দুর্গটি।

লালবাগ কেল্লার নামকরণঃ

স্বাভাবিকভাবে যেকেউ যদি এর নামকরণের কারণ চিন্তা করে তাহলে স্বাভাবিকভাবে তার মাথায় আসবে যে লালবাগে থাকার কারণেই এর নাম লালবাগ কেল্লা রাখা হয়েছে। ধারণাটি মোটেও ভুল নয়, আসলেই এর নামকরণ করা হয়েছে এলাকার উপর ভিত্তি করে। তবে প্রথমে এর নাম ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, যাতে এলাকার কোন প্রভাব ছিলনা। একদম শুরুর দিকে এই কেল্লার নাম ছিল **"কেল্লা আওরঙ্গবাদ"**।

Matrix BCS Series

লালবাগ কেল্লার ইতিহাসঃ

লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৬৭৮ সালে। তৎকালীন মুঘল সম্রাট আজম শাহ এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। যদিও আজম শাহ খুব কম সময়ের জন্যেই মুঘল সম্রাট হিসেবে ছিলেন। তবুও তার অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তার এই অসাধারণ কাজটি শুরু করেন। উল্লেখ্য আজম শাহ ছিলেন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব এর পুত্র আর সম্রাট শাহজাহানের নাতি, যিনি তাজমহল তৈরির জন্যে বিশ্ব মহলে ব্যাপক সমাদৃত।

এই দুর্গ নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার প্রায় এক বছরের মাথায় তার বাবার ডাকে তাকে দিল্লিতে চলে যেতে হয় সেখানকার মারাঠা বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে। সম্রাট আজম শাহ চলে যাওয়ার পর দুর্গ নির্মাণের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তখন এই দুর্গ নির্মাণের কাজ আদৌ সম্পূর্ণ হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। কিন্তু সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে তৎকালীন নবাব শায়েস্তা খাঁ পুনরায় লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু করে দেন কাজ থেমে যাওয়ার প্রায় এক বছর পরে। পুরো উদ্যমে আবার কাজ চলতে থাকে দুর্গ নির্মাণের।

তবে শায়েস্তা খাঁ পুনরায় কাজ শুরু করার প্রায় চার বছরের মাথায় দুর্গের নির্মাণ কাজ আবার বন্ধ হয়ে যায়, এরপর দুর্গটি নির্মাণের কাজ আর শুরু করা হয়নি। নবাব শায়েস্তা খাঁ এর মেয়ে পরী বিবি মারা যাওয়ার কারণেই মূলত শায়েস্তা খাঁ লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন। পরী বিবির মৃত্যুর পরে সবার মধ্যে দুর্গটি সম্পর্কে বিদ্রূপ ধারণা জন্ম নেয়, সবাই দুর্গটিকে অপয়া ভাবতে শুরু করে দেয়।

পরী বিবির মৃত্যুর পর তাকে লালবাগ দুর্গের মাঝেই সমাহিত করা হয়, আর এরপর থেকে একে পরী বিবির সমাধি নামে আখ্যায়িত করা হয়। পরী বিবির সমাধির যে গম্বুজটি আছে

Matrix BCS Se

তা একসময় স্বর্ণখোচিত ছিল, কিন্তু এখন আর তেমনটি নেই, তামার পাত দিয়ে পুরো গম্বুজটিকে মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরীবিবির সমাধিঃ

এই ভবনটি মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খানের প্রিয় কন্যা পরীবিবির সমাধি নামে পরিচিত। বাংলাদেশে এই একটি মাত্র ইমারতে মার্বেল পাথর, কষ্টি পাথর ও বিভিন্ন রং এর ফুল-পাতা সুশোভিত চাকচিক্যময় টালির সাহায্যে অভ্যন্তরীণ নয়টি কক্ষ অলংকৃত করা হয়েছে। কক্ষগুলির ছাদ কষ্টি পাথরে তৈরি। মূল সমাধি সৌধের কেন্দ্রীয় কক্ষের উপরের কৃত্রিম গম্বুজটি তামার পাত দিয়ে আচ্ছাদিত। ২০.২ মিটার বর্গাকৃতির এই সমাধিটি ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের পুর্বে নির্মিত। তবে এখানে পরীবিবির মরদেহ বর্তমানে নেই বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

দেখার মত যা যা রয়েছেঃ

লালবাগ কেল্লার তিনটি বিশাল দরজার মধ্যে যে দরজাটি বর্তমানে জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া সেই দরজা দিয়ে ঢুকলে বরাবর সোজা চোখে পড়ে পরী বিবির সমাধি। সচরাচর টেলিভিশনে, খবরের কাগজে, ম্যাগাজিনে লালবাগ কেল্লার যে ছবিটি দেখা যায় সেটা মূলতঃ পরী বিবির সমাধির ছবি।

কেল্লার চত্বরে তিনটি স্থাপনা রয়েছে-

১। কেন্দ্রস্থলের দরবার হল ও হাম্মাম খানা
২। পরীবিবির সমাধি
৩। উত্তর পশ্চিমাংশের শাহী মসজিদ

কেল্লাতে একটি মসজিদ আছে, আজম শাহ দিল্লি চলে যাওয়ার আগেই তিনি এই মসজিদটি তৈরি করে গিয়েছিলেন। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি যে কারো দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম। মসজিদটিতে জামায়াতে নামায আদায় করা হয়। ঢাকায় এতো পুরনো মসজিদ খুব কমই আছে।

লালবাগ কেল্লাতে এখানে ওখানে বেশ কয়েকটি ফোয়ারার দেখা মিলবে, যা শুধুমাত্র কোনো বিশেষ দিনে চালু থাকে (যেমনঃ ঈদ)। কেল্লাতে সুরঙ্গ পথ ও আছে, লোক মুখে শোনা যায় যে আগে নাকি সুরঙ্গ পথগুলোতে যাওয়া যেতো, তবে এখন আর যাওয়া যায়না। উল্লেখ্য সুরঙ্গ পথ এ যাওয়ার কথাটি নিতান্তই শোনা কথা, এর কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি।

লালবাগ কেল্লায় সর্বসাধারণের দেখার জন্যে একটি জাদুঘর রয়েছে, যা পূর্বে নবাব শায়েস্তা খাঁ এর বাসভবন ছিল আর এখান থেকেই তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন। জাদুঘরটিতে দেখার মতো অনেক কিছুই রয়েছে। মুঘল আমলের বিভিন্ন হাতে আঁকা ছবির দেখা মিলবে সেখানে, যেগুলো দেখলে যে কেউ মুগ্ধ না হয়ে পারবে না। শায়েস্তা খাঁ এর ব্যবহার্য নানান জিনিসপত্র

Matrix BCS Series

সেখানে সযত্নে রয়েছে। তাছাড়া তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র, পোশাক, সেসময়কার প্রচলিত মুদ্রা ইত্যাদিও রয়েছে।

গুরুদুয়ারা নানকশাহী

ঢাকার গুরুদুয়ারা নানকশাহী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে অবস্থিত একটি শিখ ধর্মের উপাসনালয়। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ক্যাম্পাসের কলাভবনের পাশে অবস্থিত। এই গুরুদুয়ারাটি বাংলাদেশে অবস্থিত ৯ থেকে ১০টি গুরুদুয়ারার মধ্যে বৃহত্তম।

Matrix BCS

ইতিহাসঃ

কথিত আছে যে, ঢাকার এই গুরুদুয়ারাটি যেখানে অবস্থিত, সেই স্থানে ষোড়শ শতকে শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করেছিলেন। এই স্থানে থাকা কালে তিনি শিখ ধর্মের একেশ্বরবাদ এবং ভ্রাতৃত্ববোধের কথা প্রচার করেন, এবং ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালনের শিক্ষা প্রদান করেন।

শিখ ধর্মের ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ সিং এর সময়কালে (১৫৯৫-১৬৪৪ খ্রিঃ) ভাইনাথ (মতান্তরে আলমাস্ত) নামের জনৈক শিখ ধর্ম প্রচারক এই স্থানে আগমন করে গুরুদুয়ারাটি নির্মাণের কাজ শুরু করেন। কারো কারো মতে, গুরুদুয়ারাটি নির্মাণের কাজ শুরু হয় ৯ম শিখ গুরু তেগ বাহাদুর সিং এর সময়কালে (১৬২১-১৬৭৫ খ্রিঃ)। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এটি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সালে গুরুদুয়ারাটির ভবনের কিছু সংস্কার করা হয়। ১৯৮৮-৮৯ সালে এটির ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয়, এবং বাইরের বারান্দা ও সংলগ্ন স্থাপনা যোগ করা হয়। সংস্কার কার্যের অর্থায়ন করা হয় বাংলাদেশে ও বিদেশে অবস্থানরত

শিখ ধর্মাবলম্বীদের দানের মাধ্যমে। ঢাকার আন্তর্জাতিক পাট সংস্থার তদানিন্তন প্রধান সর্দার হরবংশ সিং এর নির্মাণকার্য তদারক করেন।

স্থাপনাশৈলীঃ

একসময় গুরুদুয়ারা নানকশাহীর বিপুল পরিমাণ ভূসম্পত্তি ছিল। আজকের মতো বিরাট ও জমকালো উপাসনালয় না থাকলেও তখন গুরুদুয়ারা নানকশাহীর আয়তন ছিল বিপুল। এর উত্তর দিকে ছিল একটি প্রবেশদ্বার। দক্ষিণদিকে ছিল কূপ ও সমাধিস্থল এবং পশ্চিমে ছিল একটি শান বাঁধানো পুকুর। মূল উপাসনালয় ছাড়াও ভক্তদের থাকার জন্য ছিল কয়েকটি কক্ষ। তবে সেসবের এখন আর অবশিষ্ট নেই। বর্তমান উপাসনালয়টি সীমিত জায়গার ওপর গড়ে উঠেছে এবং বারবার সংস্কারের ফলে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে।

উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত গুরুদুয়ারা নানকশাহীর বর্তমান প্রবেশপথটি রয়েছে দক্ষিণদিকে। উপাসনালয়টির সামনে রয়েছে চমৎকার সবুজ লন। এর বাম দিকে আছে শিখ রিসার্চ সেন্টার, ডানদিকে দোতলা দরবার হল। সামনে পতাকা টাঙানোর স্ট্যান্ড, বৈশিষ্ট্যময় এই উপাসনালয়টি শিখদের নিজস্ব স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত। উপাসনালয়টির ওপর পৃথিবী আকৃতির একটি কাঠামো নির্মিত। তার চারদিকে শিখ ধর্মীয় চিহ্ন শোভিত। উপাসনালয়ের শীর্ষে রয়েছে ছাত্রার। এটি শিখদের উপাসনালয়ের চিহ্ন। গুরুদুয়ারা নানকশাহীর ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটি বড় কক্ষ। এই কক্ষের চারদিকে চারটি দরজা আছে। মাঝখানে কাঠের তৈরি বেদির ওপর রয়েছে শিখ ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেব। বেদির সামনে নবম শিখগুরু তেগ বাহাদুর সিংয়ের ব্যবহৃত একজোড়া খড়ম একটি কাচের বাক্সের মধ্যে যত্নসহকারে রাখা আছে। এ কক্ষের মেঝেতে লাল রঙের কার্পেট পাতা আছে। তাতে ভক্তরা বসে গ্রন্থসাহেব পাঠ শোনেন। কক্ষের চারদিকে বারান্দা আছে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানঃ

গুরুদুয়ারা নানকশাহীতে একেক সময় একেকজন গ্রন্থির (পুরোহিত) দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত শ্রীচন্দ্র জ্যোতি নামে এক শিখসাধু এই উপাসনালয়ের পুরোহিত ছিলেন। ১৯৪৭ সালের পর থেকে ষাট দশক পর্যন্ত উপাসনালয়টি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংস্কার করে এর বর্তমান রূপ দেওয়া হয়। বর্তমানে ভাই পিয়ারা সিং প্রধান গ্রন্থির দায়িত্ব পালন করছেন।

গুরু নানকশাহীতে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা দুবার গ্রন্থসাহেব পাঠ ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া প্রতি শুক্রবার দুপুর ১২টা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত সাপ্তাহিক জমায়েত ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। পুরোহিত গ্রন্থসাহেব পাঠ ও কীর্তন করেন। গুরুদুয়ারার এই কীর্তন ভক্তদের আকুল করে তোলে। সংগীতশিল্পী কিরনচন্দ্র রায় এই গুরুদুয়ারার অতিথিনিবাসে থেকে দীর্ঘদিন এখানে কীর্তন পরিবেশন করেন। কীর্তন ও প্রার্থনা শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এখানে শুক্রবারে আগত অতিথিদের জন্য মধ্যাহ্নভোজেরও ব্যবস্থা আছে। গুরুদুয়ারায়

Matrix BCS Series

আয়োজিত বার্ষিক অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে গুরু নানকের জন্মবার্ষিকী এবং পয়লা বৈশাখ। এ দুটি পর্ব এখানে অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হয়।

পরিশেষঃ

গুরুদুয়ারায় কারও প্রবেশে বাধা নেই, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব বয়সী নারী ও পুরুষ এখানে প্রবেশ, প্রার্থনায় অংশগ্রহণ এবং প্রসাদ পেতে পারেন। ঢাকায় বসবাসরত শিখ সম্প্রদায়ের লোকজন নিয়মিত এই গুরুদুয়ারায় আসেন। এছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনকেও শুক্রবার এই উপাসনালয়ে আসতে দেখা যায়। স্থানীয় ভক্ত ও বিদেশি দাতাদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানটির ব্যয় নির্বাহ হয়।

আহসান মঞ্জিল

ইসলামপুরের কুমারটুলী নামে পরিচিত পুরনো ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বর্তমান ইসলামপুরে আহসান মঞ্জিল অবস্থিত। এটি ব্রিটিশ ভারতের উপাধিপ্রাপ্ত ঢাকার নওয়াব পরিবারের বাসভবন ও সদর কাচারি ছিল। অনবদ্য অলঙ্করন সমৃদ্ধ সুরম্য এ ভবনটি ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শন।

নওয়াব আব্দুল গনির পিতা খাজা আলিমুল্লাহ ১৮৩০ সালে ফরাসিদের নিকট থেকে এই কুঠিটি ক্রয়পূর্বক সংস্কারের মাধ্যমে নিজ বাসভবনের উপযোগী করেন। পরবর্তীতে নওয়াব আব্দুল গনি ১৮৬৯ সালে এই প্রাসাদটি পুন:নির্মাণ করেন এবং প্রিয় পুত্র খাজা আহসানুল্লাহর নামানুসারে এর নামকরণ করেন আহসান মঞ্জিল।

দর্শনীয় জিনিস

ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শন হলো আহসান মঞ্জিল। নবাব পরিবারের স্মৃতি বিজড়িত এই প্রাসাদটি বর্তমানে জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বর্তমানে আহসান মঞ্জিলের মূল প্রাসাদটি গ্যালারি আকারে রূপান্তর করা হয়েছে। মোট গ্যালারি ২৩ টি। ১৯০৪ সালে তোলা ফ্রিৎজকাপের আলোকচিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন কক্ষ ও গ্যালারীগুলো সাজানো হয়েছে।

গ্যালারি নং

০১. উনিশ শতকের সৈনিকের বর্ম, ভবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সংস্কারপূর্ব ও পরবর্তী আলোকচিত্র ও পেইন্টিং। আহসান মঞ্জিল নিলামে বিক্রির জন্য এবং নতুন ভবন তৈরির নির্দেশ নামা।

০২. নবাবদের ব্যবহৃত আলমারি, তৈজসপত্র, ফানুস ও ঝাড়বাতি।

০৩. প্রাসাদ ডাইনিং রুম, নবাবদের আনুষ্ঠানিক ভোজন কক্ষ এটি।

০৪. বক্ষস্ত্রান ও শিরস্ত্রান, হাতির মাথার কংকাল (গজদন্তসহ), অলংকৃত দরমা বেড়া/কাঠ ছিদ্র অলংকরন সম্বলিত।

০৫. প্রধান সিড়িঘর নিচতলা। দরজার অলংকৃত পাল্লা, ঢাল-তরবারি, বল্লম, বর্শাফলক।

০৬. স্যার আহসানুল্লাহ জুবিলী মেমোরিয়াল হাসপাতালে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক কিছু সরঞ্জামাদি ও খাতপত্র এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

০৭. মুসলিম লীগ কক্ষ। এ কক্ষটি নবাবদের দরবার হল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকালে শাহবাগের সম্মেলনে আগত সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দর একটি বড় তৈলচিত্র এই গ্যালারিতে আছে।

০৮. বিলিয়ার্ড কক্ষ। ১৯০৪ সালে তোলা আলোকচিত্র অনুযায়ী বিলিয়ার্ড টেবিল, লাইটিং ফিটিংস, সোফা ইত্যাদি তৈরি করে সাজানো হয়েছে।

Matrix BCS Series

০৯. সিন্দুক কক্ষ- ঢাকার নবাবদের কোষাগার হিসেবে ব্যবহৃত কক্ষ। এতে আছে ৯৪ লকার বিশিষ্ট বৃহদাকার লোহার সিন্দুক। বড় কাঠের আলমারি ও মাঝারি ও ছোট কয়েকটি সিন্দুক। লোহার গ্রীল, দরজার পাল্লা ইত্যাদি।

১০. নওয়াব পরিচিতি- এই গ্যালারিতে ঢাকার নওয়াব পরিবারের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের পরিচিতি ও বংশ তালিকা এবং নবাবদের কাশ্মীরবাসী আদিপুরুষ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বংশ তালিকা ও ইংরেজীতে লেখা আহসানউল্লাহর ডায়েরি ও উর্দূতে জমি পত্তন দেয়ার দলিল।

১১. প্রতিকৃতি- এই গ্যালারিতে খ্যাতনামা, দেশবরেণ্য রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী, ভূস্বামী, বুদ্ধিজীবী, সমাজসংস্কারক, কবি সাহিত্যিক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের তৈলচিত্র ছবি রয়েছে।

১২. নওয়াব সলিমুল্লাহ স্মরণে- নওয়াব সলিমুল্লাহর ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র, নবাবের ব্যবহার্য ব্যক্তিগত ও অফিসিয়াল জিনিস।

১৩. প্রতিকৃতি- নবাব পরিবারের সদস্যগণদের অন্দর মহলে প্রবেশ করার জন্য রংমহল থেকে পশ্চিমাংশের একটি গ্যাংওয়ের মাধ্যমে যাতায়াত করতেন। বর্তমানে তা নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে বন্ধ।

১৪. হিন্দুস্তানি কক্ষ-১৯০৪ সালে ফ্রিৎজকাপের তোলা আলোকচিত্র অবলম্বনে এই গ্যালারি।

১৫. প্রধান সিড়িঘর দোতলা- সাদা সিমেন্টের ভাস্কর্য, আলোকচিত্র ও খোদাই করা কাঠের সিড়ি লাল গালিচার্য এবং ছাদে কাঠের অলংকৃত সিলিং।

১৬. লাইব্রেরি কক্ষ ।

১৭. কার্ডরুম- ঢাকার নওয়াবদের তাশ খেলার কক্ষ।

১৮. নবাবদের অবদান ঢাকায় পানিয় জলের ব্যবস্থা। এ কক্ষটি গেষ্টরুম হিসেবে ব্যবহার হতো। এখানে পানির ড্রাম, আইসক্রীম, বালতি, কফি তৈরির মেশিন, কফির কাপ, কুলফি গ্লাস, পানির ট্যাপ, অলংকৃত বালতি রয়েছে।

১৯. স্টেট বেডরুম-রাজকীয় অতিথীদের থাকা ও বিশ্রামের জন্য এই বেডরুম, শোবার খাট, আলমারী, ঘড়ি, ড্রেসিং টেবিল, আয়না, তাক, টেবিল-চেয়ার এখানে রয়েছে।

২০. নওয়াবদের অবদান ঢাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। ঢাকায় বিদ্যুৎ, কেরোসিন বাতি, হারিকেন চুল্লি, হারিকেন সার্চ বাতি, দেশে বিদেশে জনকল্যাণ কাজে ঢাকার নওয়াবদের অর্থদানের বিবরণ, সিগন্যাল বাতি, বিভিন্ন দেশী বৈদ্যুতিক বাল্ব, কেরোসিন চালিত পাখা, বিভিন্ন প্রকার কাঁচের লাইট, মোমবাতি ষ্ট্যান্ড, ফানুস ইত্যাদি।

Matrix BCS Series

বড় কাটরা

প্রায় ৩৭৫ বছর পূর্বে শায়েস্তা খাঁ এর আমলে তারই জামাতা বড় কাটরা নির্মাণ করেন। মূলত এটি নদী তীরবর্তী একটি দূর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর পূর্বে বড় কাটরা ভবনে হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকার চকবাজার থানা থেকে দক্ষিণ দিকে ১৬, বড় কাটারায় এটি অবস্থিত।

বর্তমান অবস্থা

অতীতের অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত করে বর্তমানে আরও নতুন ভবন সংযোজন করে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করছে। মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানে শুধুমাত্র বড় কাটারার মূল গেইটসহ কিছু ভবন রয়েছে। অন্যগুলো বেদখল হয়ে গেছে। স্থাপনা ভবনটি সময়ের পরিবর্তনে সংস্কারের অভাবে অতীত সৌন্দর্য হারাচ্ছে। স্থাপনা প্রাঙ্গনে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি লাইব্রেরী রয়েছে। এখানে কোন জাদুঘর নেই।

রূপলাল হাউজ

ধারনা করা হয় ইংরেজী উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী রুপলাল দাস তার পরিবার সহ বসবাসের জন্য ইমারতের নকশা তৈরী করেন। পরবর্তীতে তিনি এই অভিজাত ও রাজকীয় রুপলাল হাউজ নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর তার উত্তরাধিকারীদের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে এ ইমারত ধীরে ধীরে রুপলাল হাউজের সম্প্রসারণের কাজ করতে থাকে।

Matrix BCS Series

ঠিকানা ও অবস্থান

ঢাকা শহরের সূত্রাপুর থানাধীন ৭৯ নং ওয়ার্ডের শ্যামবাজার এলাকার মোড়ের ৭০ গজ উত্তর দিকে হাতের বাম পাশে ১২ নং ফরাশগঞ্জে এই রুপলাল হাউজের অবস্থান।

ভবনের বর্ণনা

পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি পরিকল্পিত এ ইমারতের সর্ব পশ্চিমাংশ উত্তর দিকে উদগত। এ উদগত অংশের সামনের দিকে একটি বারান্দা আছে। ফ্যাসাদে আছে ছয়টি করনিথীয় থামের একটি সারি। এদের ধড় শীরতোলা। অনুরুপ কার্নিস থামের আছে একটি বিরাট আকারের পডিয়াম। বারান্দা ব্যতীত ইমারতটির অপরটি দ্বিতল। মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে ইমারতের বিপরীত দিকে যাতায়াতের জন্য আছে একটি উন্মুক্ত অংশ। এ ফটকের অনতিদূরে পূর্বদিকে সম আকৃতির আরও একটি বারান্দা দেখা যায়। এ ইমারতের পূর্বাংশের প্রান্ত থেকে উদগত অংশ উত্তর দিকে অগ্রসর হয়েছে। তবে এ অংশ মূল নির্মাণ যুগের পরবর্তীকালের বলে অনুমান করা যায়। সমতল ছাদের কয়েকটি ছাদের কয়েকটি স্থানে তিনটি চিলেকোঠা আছে। এর দরজা ও জানালাগুলোতে কাঠের ভেনেসীয় গ্রিল সম্বলিত পাল্লা ব্যবহৃত হয়েছে। সিঁড়ির বেড়িতে লোহার অলঙ্করণ খচিত ফ্রেম আছে। খিলানের টিমপেনামে রঙ্গিন কাঁচের অলঙ্করনও লক্ষ্য করা যায়।

স্থাপনার পরিবর্তন

রুপলাল হাউজের সর্বশেষ মালিক ছিল শ্রী রুপলাল দাসের পৌত্র যোগেন্দ্র দাস ও তারক নাথ দাস। তারা ১৯৭১ ইং সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের পূর্বে এদেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়ে কলকাতার রোটারি উকিলের মাধ্যমে দলিল করে রুপলাল হাউজের মালিকানা ভারতের বাসিন্দা জনাব জালালের পূত্র মোহাম্মদ সিদ্দিক জামালকে প্রদান করে। এই রুপলাল হাউজের সর্বশেষ মালিক মোঃ সিদ্দিক জামাল পরবর্তীতে ১৯৭৩ ইং সালে জামাল পরিবার ভারতে চলে যায়।

Matrix BCS

কর্তৃপক্ষ

১৯৭৪ ইং সালে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এ পরিত্যাক্ত বাড়িটি রক্ষী বাহিনীর জন্য রিকুইজিশন করে নেন। রক্ষী বাহিনীর বিলুপ্তি ঘোষনার পর ১৯৭৬ ইং সালে রুপলাল হাউজ পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ঘোষিত হয়। পরবর্তী সময় থেকে এ বাড়িটি পূর্ত মন্ত্রনালয়ের নিয়ন্ত্রনে আছে।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমান রুপলার হাউজ তথা জামাল হাউজ এর বিভিন্ন কোঠায় কিছু বি.ডি আর সদস্য নিজ নিজ পরিবার পরিজনসহ বসবাস করছে। তারা পোস্তগোলাস্থ ১২৪৩ নং খুটির সদস্য এবং কমান্ডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রনাধীন। উক্ত ভবনে বসবাসকারীদের কোন ভাড়া পরিশোধ করতে হয় না। এছাড়া ইমারতে অপরাপর কোঠাগুলো বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে। তারা মাসিক নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের বিনিময়ে পূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে লীজ নিয়ে কোঠাগুলো নিজ নিজ কাজে ব্যবহার করছে। তারা তাদের প্রদেয় RGH খাতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করে চালান সংরক্ষন করে আসছে। রুপলাল হাউজ আহসান মঞ্জিলের প্রতিপক্ষের ভূমিকা পালন করতো এবং এর একটি অংশ রংমহল হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

Matrix B

হোসেনী দালান

আঞ্জুমানে হোসাইনী তথা শিয়া সম্প্রদায়ের কতিপয় মুসলমানগণ ৪৫০ বছর পূর্ব হযরত মুহাম্মদ (স:) এর ২য় প্রোপৌত্র ইমাম হোসেনের রওজা শরীফ অনুকরণে শিয়া

সম্প্রদায়ের আত্মশুদ্ধি ও অনুতপ্ত প্রকাশ তথা কারবালায় ঘটে যাওয়া পৃথিবীর সবচাইতে নিকৃষ্ট হত্যাকান্ডের ষড়যন্ত্রকারী, প্ররোচনাকারী ও হত্যাকারী জাতি হিসেবে শিয়া সম্প্রদায় ইমামবাড়া হোসেনী দালান ও তৎসম্পর্কিত উপকরণে এই দালানটি নির্মাণ করেন। শিয়া আঞ্জুমানে হোসাইনী তথা শিয়া সম্প্রদায় ১৮৯১ ইং সালে মীর ইয়াকুব ইমামবাড়া স্থাপন করেন। পরবর্তীতে শিয়া সম্প্রদায়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২০০৪ ইং সালে ইয়াকুব ইমামবাড়া পুনঃসংস্কার করা হয়। এছাড়া গাছপালা বেষ্টিত মনোরম পরিবেশ এবং সেখানকার নিস্তব্ধ নিরবতা মনে প্রশান্তি এনে দেয়। ইমামাবাড়া হোসেনী দালান পুরনো ঢাকার নিমতলী ও চানখাঁরপুল এলাকার হোসেনী দালান রোডে অবস্থিত। ঠিকানা : ৩০/১ হোসেনী দালান রোড, লালবাগ,ঢাকা।

দর্শনীয় স্থাপনা

এখানে একমাত্র দর্শনীয় জিনিস হিসেবে ইমামবাড়া বা হোসেনী দালানের কথাই প্রথমে বলতে হয়। ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর রওজা মোবারক অনুকরণে নির্মিত এই ইমামবাড়া। সকল মুসলমান শিয়া, সুন্নী তথা নর-নারী, আবাল বৃদ্ধ সব বয়সের লোক এখানে আসেন ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর রওজা মোবারক দেখতে। সকলেই ব্যক্তিগত ভাবে নানা রকম মানত, মাজার নিয়াজ ও আত্মতৃপ্তির জন্য এখানে আসেন। মহিলা ও পুরুষদের আলাদা ব্যবস্থা থাকায় এখানে মহিলাদের আনাগোনা চোখে পড়ার মত। সবাই তাদের মানতের টাকা চেরাগী বাক্সে দেয়। এছাড়া ইমামবাড়ায় তিনজন খাদেম আছেন। যারা এ সকল বিষয়ে আগত দর্শনার্থীদের সাহায্য করে থাকেন।

ইমামবাড়া পুকুর

এখানে দর্শনীয় আরেকটি জিনিস হল ইমামবাড়া পুকুর। যা দেখতে খুবই দর্শনীয়। চারদিকে ওয়াল ও ঘাট বাঁধাই করা এবং পুকুরের নানা মাছ দর্শনার্থী তথা আগতদের নজড় কারে।

ইমামবাড়া কবরস্থান

শিয়া সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট কিছু কবরস্থানের মধ্যে ইমামবাড়া হোসেনী দালান কবরস্থান অন্যতম। দর্শনীয় স্থান না হলেও সবাই এখানে আসেন, কবর জিয়ারত করেন। বর্তমানেও এখানে নতুনভাবে কবর দেয়া হয়। অবশ্য সেটা ইমামবাড়া শিয়া আঞ্জুমানে হোসাইনীদের জন্য।

গাম্বে শাইদা ও নাজার নিয়াজ

ইমামবাড়া হোসেনী দালানে মূল ফটকের পার্শ্বে যে মূল ভবনটি সেটি গাম্বে শাইদা। মহররমের ৭, ৮, ৯ ও ১০ই তারিখে এই গাম্বে শাইদা খোলা হয় এখানে। মূল মিছিল ও শিয়াদের গাওরা ও নিশান সহ আরও প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো রক্ষিত আছে।

এছাড়া মূল ভবন/দালানের নিচের স্থানটি নাজার নিয়াজ ও নানারকম মানত উপলক্ষ্যে মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালিয়ে এবং নানা রকম নিয়াত বাধা হয়।

Matrix BCS Series

মাতম ঘর

ইমামবাড়া মূল ভবনটির দ্বিতীয় তলায় মাতম ঘর আছে যেখানে মহররমের সময় মাতম করা হয়।

খান মোহাম্মাদ মৃধা মসজিদ

পুরনো ঢাকার লালবাগে বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থাপনা রয়েছে। খান মোহাম্মাদ মৃধা মসজিদ তার মধ্যে একটি। ১৭০৪/৫ সালে ঢাকার প্রধান কাজী, কাজী খান মোহাম্মাদ এবাদউল্লাহ এর নির্দেশে এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়।

অবস্থান

পুরনো ঢাকার লালবাগে ঐতিহাসিক এই মসজিদটি অবস্থিত।

যা দেখতে পাবেন

লালবাগ দুর্গের পশ্চিমে পুরনো ঢাকায় আতিশখানায় দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর এ মসজিদটি। এই তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির ভিত্তি প্রায় সতের ফুট উঁচু একটি প-্যাটফর্মের ওপর। প-্যাটফর্মের নীচে টানা করিডোর,পাশে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ. এখানে আলো বাতাশের খেলা মনোমুগ্ধকর। মসজিদ আর মাদ্রাসা ছাড়া বাকি অংশ একদমই উন্মুক্ত,ধারণা করা হয় এখানেই শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হতো,আর নীচের ঘর গুলো ছিল থাকার জায়গা!

Matrix

জিনজিরা প্রাসাদ

জিনজিরা প্রাসাদ একটি ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি, যার অবস্থান ঢাকা শহরের বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে কয়েক'শ গজ দূরে। সিরাজদ্দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নেছা এবং তাঁর শিশুকন্যাকে মীরজাফর পুত্র মীরনের নির্দেশে ঢাকায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল। সিরাজের পতনের পূর্ব পর্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীরা ঘষেটি বেগমকে ব্যবহার করলেও সিরাজের পতনের পর আর তাকে কোনো সুযোগই দেয়া হয়নি। এ সময় তারা তাদের মা শরফুন্নেছা, সিরাজের মা আমেনা, খালা ঘষেটি বেগম, সিরাজের স্ত্রী লুৎফুন্নেছা ও তার শিশুকন্যা সবাইকে ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদে বন্দী করে রাখা হয়। ঢাকার বর্তমান কেরানীগঞ্জের জিঞ্জিরা প্রাসাদে তারা বেশ কিছুদিন বন্দী জীবন যাপন করার পর মীরনের নির্দেশে ঘষেটি বেগম ও আমেনা বেগমকে নৌকায় করে নদীতে ডুবিয়ে মারা হয়। ক্লাইভের হস্তক্ষেপের ফলে শরফুন্নেছা, সিরাজের স্ত্রী লুৎফুন্নেছা এবং তাঁর শিশুকন্যা রক্ষা পান এবং পরবর্তীতে তাদেরকে মুর্শিদাবাদে আনা হয়। ইংরেজ কোম্পানি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সামান্য বৃত্তির ওপর নির্ভর করে তাদেরকে জীবন ধারণ করতে হয়। সিরাজের মৃত্যুর দীর্ঘ ৩৪ বছর পর লুৎফুন্নেছা ১৭৯০ সালে ইন্তেকাল করেন।

প্রাসাদের ইতিহাসঃ

সোয়ারীঘাট সংলগ্ন বড় কাটরা প্রাসাদ বরাবর বুড়িগঙ্গা, ওপারে জিনজিরা। জিনজিরা-জাজিরার অপভ্রংশ, যার অর্থ আইল্যান্ড বা দ্বীপ। এ দ্বীপে ১৬২০-২১ খ্রিস্টাব্দে জিনজিরা প্রাসাদ 'নওঘরা' নির্মাণ করেছিলেন তৎকালীন সুবেদার নওয়াব ইব্রাহিম খাঁ। আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে শহর থেকে জিনজিরার মধ্যে চলাচলের জন্য একটি কাঠের পুল ছিল। পলাশীর যুদ্ধে সর্বস্বান্ত সিরাজদ্দৌলার পরিবার পরিজনকে জরাজীর্ণ জিনজিরা প্রাসাদে প্রেরণ করা হয়েছিল। আর সেই সাথে নবাব আলিবর্দী খাঁর দুই কন্যাঘসেটি বেগম ও আমেনা বেগমকেও আনা হয়। তারা দু'জনই পিতার রাজত্বকালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অবশেষে এক দিন পরিচারিকাদের সাথে একই নৌকায় তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়। সে দিন বুড়িগঙ্গার তীরের জিনজিরা প্রাসাদে বন্দীদের নিয়ে রক্ষীদল উপস্থিত হয়েছিল।

Matrix Series

উল্লেখ্য, নবাব আলিবর্দী খাঁ ও তার পরিবার আগেই এখানে স্থান লাভ করেছিল। এভাবে পরাজিত নবাবের পরিবার-পরিজন জিনজিরা প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার পর মীরজাফরের পুত্র মীরনের চক্রান্তে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মের কোনো এক সন্ধ্যায় সিরাজ পরিবার জিনজিরা প্রাসাদ থেকে নেমে বুড়িগঙ্গা নদীর বুকে এক নৌকায় আরোহণ করে। নৌকা যখন বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরীর সঙ্গমমূলে ঢাকাকে পেছনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন মীরননিযুক্ত ঘাতক বাকির খান নৌকার ছিদ্রস্থান খুলে দিয়ে নৌকাটি ডুবিয়ে দেয়।কিছু বুঝে ওঠার আগেই সবাই তলিয়ে যান বুড়িগঙ্গায় ।

সর্বশেষ মালিকানাঃ

পুরো প্রাসাদ ও এর আশপাশ মালিকি ও তত্ত্বাবআয়ক পরিবারের পূর্বপুরুষ হাজী অজিউল্যাহ ব্রিটিশ আমলে ১৪ শতক জমি সাফ কবলা মূলে খরিদসূত্রে মালিক। ওয়ারিশসূত্রে বর্তমান মালিক ও পরিবার প্রধান হলেন জাহানারা বেগম এবং হাজী অজিউল্যাহ তার শ্বশুর।

প্রাসাদের বর্তমান অবস্থাঃ

একদা এটা ছিল নির্জন গ্রাম যার নাম হাওলি বা হাবেলী। বর্তমানে ঘিঞ্জি বসতি। ছোট গলিপথে একটু এগোতে একটা প্রবেশ তোরণ। তোরণের দুই পাশে স্থায়ী ভবন নির্মাণ করে আবাস গড়ে তোলা হয়েছে। চার দিকে দোকানপাট, ঘরবাড়ি, অট্টালিকা প্রবেশ অনেক কষ্টসাধ্য। প্রাসাদটির পূর্বাংশ তিনতলা সমান, দেখতে অনেকটা ফাঁসির মঞ্চ বা সিঁড়িঘর বলে মনে হয়। মাঝ বরাবর প্রকান্ড প্রাসাদ তোরণ। মোগল স্থাপত্যের অপূর্ব কারুকার্যখচিত তোরণ প্রাসাদকে দুই ভাগ করে অপর প্রান্তে খোলা চত্বরে মিশেছে। প্রাসাদ তোরণের পূর্বাংশেই ছিল সুড়ঙ্গপথ। ব্রিটিশ-পাকিস্তান আমল থেকে দেখে এলেও অন্ডধকার প্রকোষ্ঠে কেউ ঢুকতে সাহস করত না এই সুড়ক পথে। পশ্চিমাংশের অন্ডধকার কুঠরি ময়লা আবর্জনায় পূর্ণ অব্যবহৃত। এ প্রাসাদটির নির্মাণশৈলী বড়কাটরার আদলে হলেও কক্ষ ও আয়তন অনেক কম।

প্রাসাদের নির্মাণশৈলীঃ

এ প্রাসাদটির নির্মাণশৈলী বড়কাটরার আদলে হলেও কক্ষ ও আয়তন অনেক কম। পশ্চিমাংশে দু'টি সমান্তরাল গম্বুজ, মাঝ বরাবর ঢাকনাবিহীন অন্য একটি গম্বুজ ও পূর্বাংশ দোচালা কুঁড়েঘরের আদলে পুরো প্রাসাদের ছাদ। প্রাসাদের পূর্বাংশে ছাদ থেকে একটি সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। স্থানীয়রা এ প্রাসাদকে হাবেলী নগেরা বা হাওলি নগেরা বলে। এ প্রাসাদের তিনটি বিশেষ অংশ আজো আংশিক টিকে আছে তাহল্যো প্রবেশ তোরণ, পৃথক দু'টি স্থানে দু'টি পৃথক প্রাসাদ, একটি দেখতে ফাঁসির মঞ্চ ও অজ্ঞাত অন্যটি প্রমোদাগার।কয়েক একর জমির ওপর এ প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছিল অবকাশ যাপন ও চিত্তবিনোদনের প্রান্তনিবাস হিসেবে। চার দিকে সুনীল জলরাশির মাঝখানে একখন্ড দ্বীপ ভূমি জিনজিরা। নারিকেল-সুপারি, আম-কাঁঠালসহ দেশীয় গাছগাছালির সবুজের সমারোহে ফুলে ফুলে শোভিত অপূর্ব কারুকার্যখচিত মোগল স্থাপত্যশৈলীর অনুপম নিদর্শন জিনজিরা প্রাসাদ।স্থানীয়দের মতে মোগল আমলে লালবাগ দুর্গের সঙ্গে জিঞ্জিরা প্রাসাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য বুড়িগঙ্গার

তলদেশ দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করা হয়েছিল। এপথে মোগল সেনাপতি ও কর্মকর্তারা আসা-যাওয়া করত। লালবাগ দুর্গেও এমন একটি সুড়ঙ্গ পথ রয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বলা হয়ে থাকে এই সুড়ঙ্গ পথে যে একবার যায় সে আর ফিরে আসে না। তবে ইতিহাসে এ সম্পর্কে জোরালোভাবে কিছু বলা নেই।

ইতিহাসবিদদের কাছে জিনজিরা প্রাসাদঃ

প্রখ্যাত ব্রিটিশ লেখক জেমস টেইলর তার 'টপোগ্রাফি অব ঢাকা' গ্রন্থে নবাব ইব্রাহিম খাঁকে জিঞ্জিরা প্রাসাদের নির্মাতা বলে উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. মুনতাসির মামুন বলেন, জিঞ্জিরা প্রাসাদের সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের এক বিষাদময় স্মৃতি জড়িত। নবাব সিরাজউদ্দৌলার মা, স্ত্রী ও শিশু কন্যা এক সময় এই জিঞ্জিরা প্রাসাদে বন্দি ছিলেন। উমি চাঁদ, জগত শেঠ এবং রায় দুর্লভদের পরামর্শে প্রাসাদ থেকে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যাবার ছল করে নওয়াজিস মহিয়সী ঘসেটি বেগম, নবাব সিরাজের মা আমিনা বেগম, নওয়াজিসের উত্তরাধিকারী একরাম উদ্দৌলার শিশুপুত্র মুরাদউদ্দৌলা, নবাব বেগম এবং শিশু কন্যাকে ধলেশ্বরীর বুকে ৭০ জন অনুচরসহ ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। হুসেন কুলি ও সরফরাজের বংশধরগণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে দেওয়ানী ভার অর্পণ করার পর বন্দিদশায় জিঞ্জিরা প্রাসাদেই অবস্থান করছিলেন। ইতিহাসবিদ নাজির হোসেনের কিংবদন্তি ঢাকা গ্রন্থে বলা হয়, নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরিবারকে দীর্ঘ ৮ বছর জিঞ্জিরা প্রাসাদে বন্দি করে রাখা হয়। মোগল শাসকদের অনেককে এই দুর্গে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল।

তারা মসজিদ (ঐতিহাসিক স্থাপনা)

বাংলাদেশের পুরানো ঢাকার আরমানিটোলা-র আবুল খয়রাত সড়কে অবস্থিত 'তারা মসজিদ'। খ্রিষ্টীয় আঠারো শতকে ঢাকার জমিদার মির্জা গোলাম পীর (মির্জা আহমদ জান) এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। তারা মসজিদের আরও কিছু প্রচলিত নাম আছে, যেমন, মির্জা গোলাম পীরের মসজিদ বা সিতারা মসজিদ।

সতের শতকে দিল্লি, আগ্রা ও লাহোরে নির্মিত মোঘল স্থাপত্য শৈলী অনুসরণে এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। মসজিদের কোথায়ও এর তৈরির সময় উল্লেখ নেই বলে কবে এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়, তার সুস্পষ্ট কোনো নথি পাওয়া যায়নি। তবে, মসজিদটি তৈরির পর ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে মির্জা গোলাম পীর মৃত্যুবরণ করেন।

মসজিদের পূর্বের আকার ও আকৃতিঃ

প্রথম থেকেই মসজিটি আয়তাকার ছিল। মির্জা গোলাম পীর তৈরির আদি মসজিদটির পরিমাপ ছিল দৈর্ঘ্য ৩৩ ফুট (১০.০৬ মিটার) এবং প্রস্থে ১২ ফুট (৪.০৪ মিটার), গম্বুজ ছিল তিনটি। এর ভিতরে মাঝের গম্বুজটি অনেক বড় ছিল। সাদা মার্বেল পাথরের গম্বুজের উপর নীলরঙা তারার নকশা যুক্ত ছিল। সেই থেকে এই মসজিদটি তারা মসজিদ নামে পরিচিত

Matrix BCS Series

হয়ে উঠে। এর পূর্ব দিকে মসজিদে প্রবেশের জন্য তিনটি এবং উত্তর দিকে ১টি এবং দক্ষিণ দিকে ১টি দরজা ছিল।

মসজিদের সংষ্করণঃ

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার তৎকালীন স্থানীয় ব্যবসায়ী, আলী জান বেপারী মসজিদটির সংস্কার করেন। এই সময় মসজিদটির আকার বৃদ্ধি করা হয়। এই সময় এর পূর্বদিকে একটি বারান্দা যুক্ত করা হয়। এই সময় মসজিদের মেঝে মোজাইক করা হয়। চিনিটিকরি (ঈযরহহরঃরশৎর) কৌশলের এই মোজাইকে ব্যবহার করা হয় জাপানী রঙিন চীনা মাটির টুকরা এবং রঙিন কাঁচের টুকরা। ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে এই মসজিদটির পুনরায় সংস্কার করা হয়। এই সময় পুরনো একটি মেহরাব ভেঙে দুটো গম্বুজ আর তিনটি নতুন মেহরাব বানানো হয়। সব মিলিয়ে বর্তমানে এর গম্বুজ সংখ্যা পাঁচটিতে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে মসজিদের জায়গা সম্প্রসারিত হয়।

মসজিদের বর্তমান আকারঃ

মসজিদের বর্তমান দৈর্ঘ্য ৭০ ফুট (২১.৩৪ মিটার), প্রস্থ ২৬ ফুট (৭.৯৮ মিটার)। এছাড়া মসজিদের দেয়াল ফুল, চাঁদ, তারা, আরবি ক্যালিওগ্রাফিক লিপি ইত্যাদি দিয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

Matrix Series

সাত গম্বুজ মসজিদ

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত মোগল শাসনের ধারাবাহিকতায় যে স্থাপত্যরীতি প্রচলিত রয়েছে তারই উদাহরণ 'সাত গম্বুজ মসজিদ'টি। ধারণা করা যায়, ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খাঁ মসজিদটি নির্মাণ করেন। অন্য এক তথ্যে জানা যায়, নবাব শায়েস্তা খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বুজুর্গ উদ্দিন (উমিদ) খাঁ এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে, মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে আছে।

অবস্থানঃ

ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুর এলাকার সাত মসজিদ রোডে এই ঐতিহাসিক 'সাত গম্বুজ মসজিদ'টি অবস্থিত। মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে থাকলেও স্থানীয় মুসল্লিগণ সেখানে নিয়মিত নামাজ আদায় করেন।

মসজিদের বিবরণঃ

এর ছাদে রয়েছে তিনটি বড় গম্বুজ এবং চার কোণের প্রতি কোনায় একটি করে অনু গম্বুজ থাকায় একে সাত গম্বুজ মসজিদ বলা হয়। এর আয়তাকার নামাজকোঠার বাইরের দিকের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১৭.৬৮ এবং প্রস্থে ৮.২৩ মিটার। এর পূর্বদিকের গায়ে ভাঁজবিশিষ্ট তিনটি খিলান এটিকে বেশ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। দূর থেকে শুভ্র মসজিদটি অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। মসজিদের ভিতরে ৪টি কাতারে প্রায় ৯০ জনের নামাজ পড়ার মত স্থান রয়েছে।

মসজিদের পূর্বপাশে এরই অবিচ্ছেদ্য অংশে হয়ে রয়েছে একটি সমাধি। কথিত আছে, এটি শায়েস্তা খাঁর মেয়ের সমাধি। সমাধিটি 'বিবির মাজার' বলেও খ্যাত। এ কবর কোঠাটি ভেতর

BCS Series

থেকে অষ্টকোনাকৃতি এবং বাইরের দিকে চতুষ্কোনাকৃতির। বেশ কিছুদিন আগে সমাধিক্ষেত্রটি পরিত্যক্ত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল। বর্তমানে এটি সংস্কার করা হয়েছে। মসজিদের সামনে একটি বড় উদ্যানও রয়েছে। একসময় মসজিদের পাশ দিয়ে বয়ে যেত বুড়িগঙ্গা। মসজিদের ঘাটেই ভেড়ানো হতো লঞ্চ ও নৌকা। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তা কল্পনা করাও কষ্টকর। বড় দালানকোঠায় ভরে উঠেছে মসজিদের চারপাশ।

মুসা খান মসজিদ

ঢাকায় বারোভুঁইয়াদের বংশধরদের কীর্তির মধ্যে একটি স্থাপনা বেশ ভালোভাবেই টিকে আছে এখনো। এটি একটি মসজিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের উত্তর-পশ্চিম কোণে তিন গম্বুজবিশিষ্ট মলিন পুরোনো এ মসজিদ এখন চারপাশের বহুতল ভবনগুলোর আড়ালে পড়ে গেছে। তাই চট করে আর চোখে পড়ে না। নাম 'মুসা খান মসজিদ'। ইতিহাসখ্যাত বারোভুঁইয়াদের অন্যতম মসনদ-ই-আলা ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খানের নামে মসজিদটির নামকরণ। মুসা খানের কবরও রয়েছে অদূরেই, মসজিদের পূর্ব-উত্তর পাশের মাঠের কোনায়। একটি হেলে পড়া পলাশগাছ নামফলকবিহীন সাদামাটা কবরটিকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে।

ইতিহাসঃ

পিতা ঈশা খাঁর মতো অতটা পরাক্রমশালী ও খ্যাতিমান না হলেও বাংলার ইতিহাসে মুসা খানের নাম একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষ করে, রাজধানী ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা সুবাদার

Series

ইসলাম খান এখানে আসার পথে যাঁদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, দিওয়ান মুসা খান তাঁদের অন্যতম। বেশ কয়েক দফা প্রবল লড়াই হয়েছিল দিওয়ান বাহিনীর সঙ্গে সুবাদার বাহিনীর। তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে মির্জা নাথানের বাহারিস্তান-ই-গায়বীতে। শেষ পর্যায়ে অবশ্য মুসা খান সুবাদার ইসলাম খানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সুবাদারের সঙ্গে সম্পর্কও সহজ হয়ে এসেছিল একপর্যায়ে। কার্জন হলের পশ্চিম দিকের চত্বরটি 'বাগ-মুসা খান' বা মুসা খানের বাগান বলে পরিচিত ছিল একসময়।

অবস্থানঃ

পূর্বদিকে ভূতত্ত্ব বিভাগ, উত্তরে বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের কার্যালয় ও অগ্রণী ব্যাংক, দক্ষিণে শহীদুল্লাহ হল এবং আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অনুষদের ডিনের কার্যালয়। মাঝখানে তিন গম্বুজবিশিষ্ট মুসা খান মসজিদ। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পাশেই জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিমের কবর। তারপর সীমানাপ্রাচীর-সংলগ্ন নামিজউদ্দিন রোড। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের দ্বিতল বাসের সারি। ফলে একেবারে কাছে না গেলে মসজিদটি চোখে পড়ে না। দক্ষিণ দিকে ডিনের কার্যালয়ের সামনে দিয়ে একটি সরু রাস্তা ধরে আসতে হয় মসজিদে।

প্রতিষ্ঠাতা নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতাঃ

নাম মুসা খান মসজিদ হলেও তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা নন বলেই ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত। এর স্থাপত্যশৈলী শায়েস্তা খানের স্থাপত্যরীতির মতো। সে কারণেই সন্দেহ। শায়েস্তা খান ঢাকায় আসেন আরও পরে। অধ্যাপক এম হাসান দানীর মতে, মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন মুসা খানের নাতি মনোয়ার খান। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনও তাঁর 'ঢাকা: স্মৃতিবিস্মৃতির নগরী' বইয়ে উল্লেখ করেছেন, 'দানীর মতোই যুক্তিযুক্ত'। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়াও তাঁর 'বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ' বইয়ে উল্লেখ করেছেন, মসজিদটির নির্মাতা সম্ভবত মুসা খানের পুত্র মাসুম খান অথবা পৌত্র মনোয়ার খান। পিতা বা পিতামহের নামে মসজিদটির নামকরণ করা হয়েছিল বলেই তাঁর অনুমান। নাজিমউদ্দিন রোডের নামও একসময় ছিল মনোয়ার খান রোড। মসজিদে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি বলে এর সঠিক নির্মাণকাল ও নির্মাতার নাম নিয়ে এ ধরনের ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে অষ্টাদশ শতকের শুরুর মধ্যে মসজিদটি নির্মিত বলে ঐতিহাসিকদের অনুমান।

মসজিদের বিবরণঃ

মুসা খান মসজিদটি দেখতে অনেকটা খাজা শাহবাজের মসজিদের (তিন নেতার মাজারের পেছনে) মতো। ভূমি থেকে উঁচু মঞ্চের ওপর মসজিদটি নির্মিত। নিচে অর্থাৎ মঞ্চের মতো অংশে আছে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ। এগুলো এখন বন্ধ। দক্ষিণ পাশ দিয়ে ১২ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় মসজিদের দরজায়। পূর্ব দিকে খোলা বারান্দা। চওড়া দেয়াল। পূর্ব-পশ্চিমের দেয়াল ১ দশমিক ৮১ মিটার ও উত্তর-দক্ষিণের দেয়াল ১ দশমিক ২ মিটার চওড়া। পূর্বের দেয়ালে তিনটি ও উত্তর-দক্ষিণে দুটি খিলান দরজা। ভেতরে পশ্চিম দেয়ালের মধ্যে একটি প্রধান ও পাশে দুটি ছোট মেহরাব। চারপাশের দেয়ালে মোগলরীতির নকশা। বাইরের

দেয়ালের চার কোণে চারটি মিনারখচিত আট কোণ বুরুজ। তার পাশে ছোট ছোট মিনার। বুরুজ ও ছোট মিনার ১৬টি। ছাদে তিনটি গম্বুজ। মাঝেরটি বড়। ওপরের কার্নিশ নকশাখচিত। বাইরের দেয়ালের পলেস্তারা মাঝেমধ্যেই খসে গেছে। ছাদে ও কার্নিশে জন্মেছে পরগাছা।

মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণঃ

গত ২৪ বছর ধরে মসজিদের খাদেমের দায়িত্ব পালন করছেন সানাউল্লাহ নামের এক ব্যক্তি। তিনি সেখানে খন্ডকালীন কাজ করেন। তিনি পারিশ্রমিক হিসেবে ১০০ টাকা নেন প্রতিদিন। সানাউল্লাহ-র কাছে জানা যায় যে মসজিদটির সংস্কার হওয়া দরকার, নতুবা এই ঐতিহাসিক মসজিদের সমাপ্তি আর খুব বেশি দূরে নয়। ওজুখানা ও শৌচাগারও বেহাল অবস্থায় আছে। পশ্চিম দিকে একটি তোরণ নির্মাণ করলে এই ঐতিহাসিক মসজিদটি সামনের পথ থেকে লোকজনের চোখে পড়ত। তবে যাঁরা মসজিদটি চেনেন তাঁরা আসেন। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় হয় এখানে। ঢাকার পুরোনো দিনের গৌরবের স্মৃতি হয়ে আছে এই ঐতিহাসিক স্থাপনাটি।

আর্মেনিয়ান চার্চ

পুরনো ঢাকার আর্মেনীটোলায় যে আর্মেনীয় গীর্জাটি রয়েছে তা-ই 'আর্মেনিয়ান চার্চ' (Armanian Church) হিসেবে পরিচিত। এটি নির্মিত হয় ১৭৮১ সালে। ঐতিহ্যবাহী এই গীর্জার সাথে জড়িয়ে আছে ঢাকায় আর্মেনীয়দের ইতিহাস। আর্মেনীটোলা বা আর্মানিটোলা নামটিও এসেছে আর্মেনীদের কারণে। ধারণা করা হয় এই গীর্জা নির্মাণের আগে তাদের ছোট একটি উপাসনাগার ছিলো। এখন যে জায়গায় গীর্জাটি দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে এক সময় ছিলো আর্মেনীদের গোরস্থান। গীর্জা নির্মাণের জন্য গোরস্থানের আশেপাশে যে বিস্তৃত জমি তা দান করেছিলেন আগা মিনাস ক্যাটচিক নামের এক আর্মেনীয়। আর লোকশ্রুতি অনুযায়ী গীর্জাটি নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন চারজন আর্মেনীয়। এরা হলেন মাইকেল সার্কিস, অকোটাভাটা সেতুর সিভর্গ, আগা এমনিয়াস এবং মার্কার পোগজ।

Matrix BCS Series

গীর্জার বিবরণঃ

গীর্জাটি লম্বায় সাড়ে সাতশো ফুট, দরজা চারটি, জানালা সাতটি। এর পাশেই ছিলো একটি ঘড়িঘর। এটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন জোহানস কারু পিয়েত সার্কিস। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ঘড়িঘরটি ভেঙে গিয়েছিলো বলে জানা যায়। গীর্জায় বৃহৎ আকারের একটি ঘণ্টা ছিলো। এই ঘণ্টা বাজার শব্দ নগরের প্রায় সব স্থান থেকে শুনা যেত বলে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই ঘণ্টার শব্দ শুনেই নাকি অধিকাংশ ঢাকাবাসী নিজ নিজ সময়ঘড়ি ঠিক করে নিতেন। ১৮৮০ সালের দিকে আর্মেনী গীর্জার এই বিখ্যাত ঘণ্টাটি স্তব্ধ হয়ে যায়, যা আর কখনো বাজেনি।

আর্মানীদের বিবরণঃ

বর্তমানে ঢাকায় আঠারোটি আর্মেনী বংশদ্ভূত পরিবার রয়েছে বলে শোনা যায়। তবে কোন কালেই ঢাকায় আর্মেনীদের সংখ্যা খুব একটা বেশি ছিলো না। আর্মেনীরা কবে ঢাকায় এসেছিলেন তা জানা না গেলেও ধারণা করা হয় মুঘল আমলে ভাগ্য বদলাতে দেশ-বিদেশ থেকে যখন অনেকেই এসেছিলেন ঢাকায়, সম্ভাব্য সপ্তদশ শতকে আর্মেনীরাও তখন দু'-একজন করে ঢাকায় এসে বসবাস শুরু করেন এ অঞ্চলে। সেই থেকে এই অঞ্চল আর্মেনীটোলা নামে পরিচিত। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অতিক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা শহরে আর্মেনীরা ছিলো যথেষ্ট প্রভাবশালী। এর কারণ, তাদের ছিলো বিত্ত। অষ্টাদশ শতকে লবণ ব্যবসা ছিলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া। লবণ উৎপাদন ও বিতরণের জন্য কোম্পানি নিয়োগ করতো ঠিকাদার। পূর্ববঙ্গে লবণের

Matrix BCS

ঠিকাদারদের অধিকাংশই ছিলেন আর্মেনী। ঠিকাদারি ছাড়াও পান, পাট ও কাপড়ের ব্যবসায় ছিলো তাদের কর্তৃত্ব। জমিদারীও ছিলো অনেকের।

উনিশ শতকের ঢাকায় পরিচিত ও প্রভাবশালী পরিবার হিসেবে যে কয়েকটি আর্মেনী পরিবারের নাম পাওয়া যায় সেগুলো হলো- পোগস, আরাতুন, পানিয়াটি, স্টিফান, লুকাস, কোজা মাইকেল, মানুক, হার্নি, সিরকোর এবং সার্কিস। এদের বিত্তের ভিত্তি ছিলো জমিদারি ও ব্যবসা। বিদেশি হয়েও জমিদারি কেনার কারণ হতে পারে- আভিজাত্য অর্জন এবং সমাজের শীর্ষে থাকা। এসব ধনী আর্মেনীয়নরা ঢাকায় নিজেদের থাকার জন্য তৈরি করেছিলেন প্রাসাদতুল্য সব বাড়ি। যেমন ফরাসগঞ্জের বর্তমান রূপলাল হাউস ছিলো আরাতুনের। মানুক থাকতেন সদরঘাটে। বর্তমানে 'বাফা' যে বাড়িতে, সেটি ছিলো নিকি পোগজের। পরে আর্মেনীটোলায় নির্মিত হয়েছিলো 'নিকি সাহেবের কুঠি'। আনন্দরায় স্ট্রিটে ছিলো স্টিফানের বাড়ি। যেখানে তাজমহল সিনেমা রয়েছে সেখানে ছিলো পানিয়াটির অট্টালিকা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি অনেক আর্মেনী ঝুঁকে পড়েন ব্যবসার দিকে। চা, মদ, ইউরোপীয় জিনিসপত্র, ব্যাংক ইত্যাদি। ১৮৫৬ সালে সিরকোরই ঢাকায় প্রথম ঘোড়ার গাড়ি চালু করেন, যা পরিচিত ছিলো 'ঠিকা গাড়ি' নামে। কিছুদিনের মধ্যেই এই ব্যবসা বেশ জমে উঠে এবং কালক্রমে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ঢাকার প্রধান যানবাহন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর্মেনীদের অনেকের জমিদারি হাতছাড়া হতে থাকে। এমনিতে আর্মেনীরা খুব রক্ষণশীল, কিন্তু ঐ সময় চলছিলো একটি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। এরা তখন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং অনেকে জমিদারি বিক্রি করে ব্যবসার জন্য কলকাতায় চলে যান। ফলে উনিশ শতকের শেষার্ধে ষাট-সত্তরের দশক থেকে সম্প্রদায়গতভাবে আর্মেনীদের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে। তখন ঢাকা শহরের বিভিন্ন কাজকর্মে, সভাসমিতিতে আর্মেনীরা নিজেদের যুক্ত করে নেন। নিকি পোগজ প্রতিষ্ঠা করেন পোগজ স্কুল। আরাতুন ছিলেন ঢাকা নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ। ঢাকার প্রথম মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে ছিলেন সার্কিস। ১৮৭৪-৭৫ সালে ঢাকা পৌরসভার নয়জন কমিশনারের মধ্যে দুইজন ছিলেন আর্মেনী- জে.জি. এন পোগজ এবং এন.পি. পোগজ।

গীর্জা প্রাঙ্গণঃ

আর্মেনীটোলায় থিতু হয়ে বসার পর আর্মেনীরা এখানে তাঁদের এই গীর্জা নির্মাণ করেন। মৃত্যুর পর ঢাকার আর্মেনীদের কবর দেয়া হয় আর্মেনী গীর্জার চতুর্দিকের প্রাঙ্গণের পরিসর ছোট হওয়ার কারণেই হয়তো গীর্জাটির গোটা প্রাঙ্গণ এমনকি বারান্দার মেঝেতেও প্রচুর সমাধিফলক চোখে পড়ে। অধিকাংশ এপিটাফ বা স্মৃতিফলকে উদ্ধৃত রয়েছে ধর্মগ্রন্থের বাণী। এছাড়া জনৈক ক্যাটচিক আভেটিক থমাসের সমাধির ওপর তাঁর স্ত্রী কলকাতা থেকে কিনে এনে বসিয়েছিলেন সুন্দর এক মূর্তি, যা এখনো টিকে আছে। এপিটাফে তিনি তার স্বামীকে উল্লেখ করেছিলেন 'বেস্ট অব হাজব্যান্ডস' বলে।

পরিশেষঃ

পুরনো ঢাকার আর্মানীটোলার, 'আর্মেনিয়ান চার্চে' -এর মতো শান্ত, নিরিবিলি জায়গা ঢাকা শহরে খুব কমই আছে। দুইশতেরও বেশি সময়ের পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী গীর্জাটির রক্ষণাবেক্ষণ এখনো অবশিষ্ট আর্মেনী পরিবাররাই করে থাকে।

পরিদর্শনের সময় যা কিছু চোখে পড়বে

বিদেশী শত শত দর্শক এসব স্থাপনায় ঘুরতে আসে। ঢাকার এসব স্থাপনার নির্মান শৈলীতে তৎকালীন স্থাপত্যাকলার চিত্র ফুটে উঠেছে। তাছাড়া এসব নির্মানগুলোর নান্দনিক কারুকার্য দেখে সে সময়কার নবাব জমিদার ও নির্মাতাদের শিল্পমন সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। নির্মানের সময়কালও ইতিহাস সংরক্ষিত আছে স্থাপনার গায়ে। জাদুঘরের গ্যালারী/ অন্দরমহলে সাজানো আছে নবাব জমিদারদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র ,অস্ত্র-শস্ত্র, তৈজসপত্র, আলোকচিত্র ও বংশ পরম্পরায় ইতিহাস, শাসনভার, গ্রহনের সময়কাল, বিভিন্ন সময়ের রাজাদের প্রতিকৃতি, শিলিলিপিসহ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ন অনেক উপাদান সংরক্ষিত আছে। মসজিদগুলোতে ধর্মপ্রান মুসল্লিরা এখনও নামাজ আদায় করেন। কোন কোন মসজিদের মাদ্রাসার কার্যক্রম চালু আছে।

ভাষা ও সংস্কৃতি

ঢাকা জেলার ভাষাকে সাধারণত: পূর্ববঙ্গীয় ভাষা নামে অভিহিত করা হয়। কেননা যদিও এ অঞ্চলের ভাষা মুগল বাংলা ভাষারই অঞ্চল। তবে কথোপকথনে এর ঢঙ একটু ভিন্ন এবং এ ভিন্নতার রীতিগুলি স্থানীক ভাষার জন্ম দিয়েছে, যেমন বিভিন্ন শব্দের সাথে ই অক্ষর যোগ করে ব্যবহারের ফলে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন 'করিয়াছ' শব্দটিকে 'কইরাছ' ব্যবহার। তাহলেও এ স্থানীক ভাষা বাংলা ভাষার অন্তর্গত একটি চমৎকার উদাহরণ যা অনুকরণীয়ও বটে। বাংলাভাষা আধুনিক রূপ নেয়ার পরে উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকা জেলার বহু লেখক ও সাহিত্যিক তাদের সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে, যেমন- হরিশচন্দ্র মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র ইত্যাদি। বর্তমান সময়ে ঢাকা জেলায় বাংলাভাষায় উত্তমমানের সাহিত্য চর্চা অতীতের সাধুভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষায় ব্যবহার স্থায়ীত্ব লাভ করেছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য মহানগরী ঢাকার এক শ্রেণীর জনগোষ্ঠী বাংলা, উর্দু, হিন্দী, ফার্সী মিশ্রিত এক প্রকার ভাষার ব্যবহার করে যা ঢাকাইয়া ভাষা বা উপভাষা নামে পরিচিত। তবে এই ভাষাটির চর্চা ধীরে ধীরে কমে আসছে (দেখুন ঢাকাই উপভাষা প্রবাদ প্রবচন কৌতুক ছড়া, এশিয়াটিক সোসাইটি, এপ্রিল ২০১২)

ঢাকার সংস্কৃতি আবহমানকাল থেকে বিবর্তিত হয়ে এক বর্ণাঢ্য রূপ নিয়েছে। এই সংস্কৃতির পেছনে ঢাকা অঞ্চলের আবহাওয়া, জলবায়ু, স্থান প্রভাব রেখেছে তেমনি পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম যেমন বৌদ্ধ, হিন্দু, ইসলাম, খ্রিষ্টান ধর্ম এবং বিশ্বব্যাপি নানা স্থান থেকে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের ভাষা আচার আচরণ খাদ্যাভাস, পোষাক পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছে। ঢাকা জেলার সংস্কৃতি যেমন একাধারে বাংলাদেশের সংস্কৃতিরই অংশ তবুও এর কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন খাদ্যাভাসে, পোষাকে, সংগীতে,

Matrix BCS Series

লোকগীতিতে, শিল্পকর্মে, খেলাধুলা, স্থাপত্যে, হস্তলিপি এবং অন্যান্য সৃষ্টিশীল কর্মক্ষেত্রে। তবে অনেকটা নিশ্চিত করেই বলা যায় এ সংস্কৃতি উদার, অসাম্প্রদায়িক এবং নিজ স্বকীয়তায় বৈশিষ্টপূর্ণ।

খেলাধুলা ও বিনোদন

সারা বাংলাদেশের খেলাধুলার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম (সাবেক ঢাকা স্টেডিয়াম) ও এর আশেপাশের এলাকা। বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কাবাডি হলেও ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, হকি, হ্যান্ডবলসহ আরো অনেক খেলা ঢাকায় নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

এক সময় প্রতি বছর ঢাকা স্টেডিয়ামে আগা খান গোল্ড কাপ-এর মতো আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট সারাদেশের মানুষকে উদ্দীপিত করে রাখতো। অল্প কিছু সময় প্রেসিডেন্টস গোল্ড কাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট হয়েছিলো এশিয়া কাপ, অনুর্ধ্ব ২১ ফুটবল টুর্নামেন্ট।

বর্তমানে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তায় অন্যান্য খেলাধুলা ম্রীয়মান হয়ে গেছে বলা যায়। স্বাধীনতা পূর্বের ন্যায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম পূণরায় আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট ভেন্যু হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়াও শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম (মিরপুর জাতীয় স্টেডিয়াম) ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভেন্যু হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই স্টেডিয়ামগুলোতে এখন নিয়মিতভাবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক খেলাসমূহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

২০১১ আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ

আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপের ১০ম প্রতিযোগিতা হিসেবে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশে হিসেবে আয়োজিত হয়েছিল। এই বিশ্বকাপেই বাংলাদেশ প্রথম আয়োজক দেশ হওয়ার সুযোগ পায়। বিশ্বকাপের সব ম্যাচই একদিনের আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডের। চৌদ্দটি জাতীয় ক্রিকেট দল এই টুর্নামেন্টে অংশ নেয়। এদের মধ্যে দশটি পূর্ণ সদস্য ও চারটি সহকারী সদস্য দল। বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় ফেব্রুয়ারি ও ২ এপ্রিল, ২০১১-এর মধ্যে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মীরপুরের শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম ম্যাচটি খেলা হয়। টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার দু'দিন আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে। ২০১৪ সালে আইসিসি টি ২০ বিশ্বকাপ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশের খেলাধুলার সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থা হচ্ছে জাতীয় ক্রীড়া কাউন্সিল। এর সদর দপ্তর হচ্ছে ঢাকায়। এছাড়াও প্রায় ৩০টি ক্রীড়া ফেডারেশন ঢাকার সদরদপ্তর হতেই জেলা ক্রীড়া সমিতিগুলোর মাধ্যমে সারা দেশের খেলাধুলার কার্যক্রম দেখাশোনা ও পরিচালনা করে। এই ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোর শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন যার

Matrix BCS Series

সদরদপ্তরও ঢাকায় অবস্থিত। উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া ফেডারেশনগুলো হলোঃ বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন; বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড; বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন; বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন; বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন; বাংলাদেশ শ্যুটিং ফেডারেশন; বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন; বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন; বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন; বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন; বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন; বাংলাদেশ আর্চারী ফেডারেশন; বাংলাদেশ এ্যামেচার এথলেটিক ফেডারেশন; বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশন; বাংলাদেশ তায়কান্ডো ফেডারেশন প্রভৃতি।

ঢাকার উল্লেখযোগ্য খেলাধুলার কেন্দ্রগুলো হচ্ছে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম এলাকা সংলগ্ন আউটার স্টেডিয়াম, শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ন্যাশনাল সুইমিংপুল, মাওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়াম, মোহাম্মদ আলী বক্সিং স্টেডিয়াম, উডেনফ্লোর জিমনেশিয়াম, ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি; মিরপুর জাতীয় ষ্টেডিয়াম ও তা সংলগ্ন সুইমিংপুল কমপ্লেক্স; মিরপুর জাতীয় ইনডোর স্টেডিয়াম; বনানীর আর্মি স্টেডিয়াম ও নৌবাহিনীর সুইমিং কমপ্লেক্স। এছাড়াও ধানমন্ডির আবাহনী ক্লাব মাঠ, ধানমন্ডি ক্লাব মাঠ এবং কলাবাগান ক্লাব মাঠেও সারা বছর ধরে বিভিন্ন লীগ ও টুর্নামেন্টের খেলা চলে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মত ঢাকা জেলার মানুষেরাও প্রাচীন কাল থেকে নানান ধরণের খেলাধুলা ও বিনোদনের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে। খেলাধুলাগুলো অতি প্রাচীন এবং এগুলি স্থলে-জলে এমনকি আকাশেও বিদ্যমান ছিল। যুগের পরিবর্তনে এই খেলাগুলি বিবর্তিত হয়েছে এবং কিছু কিছু বর্তমান সময়ে দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। একসময়ের এক্কাদোক্কা বা বাঘবন্দি, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, ডাংগুলি, ষোলগুটি খেলা থেকে শুরু করে আজকের অতি জনপ্রিয় ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার আবির্ভাব ঘটেছে। তেমনি নদীতে নৌকাবাইচ, জলকুমির, সাঁতার, আকাশে ঘুড়ি ও পায়রা উড়ানো, বুলবুলির লড়াই। বিনোদনের দৃষ্টান্ত হিসেবে পালাগান, যাত্রা, লোকসংগীত, থিয়েটার, সিনেমা এবং অধুনা টেলিভিশন।

ভৌগলিক পরিচিতি

ঢাকা মধ্য বাংলাদেশে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ২৩০৪২' থেকে ২৩ড়৫৪' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২০' থেকে ৯০°২৮' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিতে অবস্থিত এই শহরের মোট আয়তন ৩৬০ বর্গ কি.মি.ং (১৪০ বর্গ মাইল)।ঢাকায় মোট ২৪ টি থানা আছে। এগুলো হলো - লালবাগ, কোতোয়ালি, সূত্রাপুর, হাজারীবাগ, রমনা, মতিঝিল, পল্টন, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, তেজগাঁও, গুলশান, মিরপুর, পল্লবী, শাহ আলী, তুরাগ, সবুজবাগ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ডেমরা, শ্যামপুর, বাড্ডা, কাফরুল, কামরাঙ্গীর চর, খিলগাঁও ও উত্তরা। ঢাকা শহরটি মোট ১৩০টি ওয়ার্ড ও ৭২৫টি মহল্লায় বিভক্ত। ঢাকা জেলার আয়তন ১৪৬৩.৬০ বর্গ কিলোমিটার (৫৬৫ বর্গমাইল)। এই জেলাটি গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলা দ্বারা বেষ্টিত। ক্রান্তীয় বৃক্ষ, আর্দ্র মৃত্তিকা ও

সমুদ্রপৃষ্ঠের সঙ্গে সমান সমতলভূমি এই জেলার বৈশিষ্ট্য। এই কারণে বর্ষাকালে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ঢাকা জেলায় প্রায়শই বন্যা দেখা যায়।

নদ-নদী

ঢাকা জেলা একটি নদী বিধৌত এলাকা। এ জেলার অভ্যন্তরীন গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলো হচ্ছে :-

ক) ধলেশ্বরী
খ) বুড়িগঙ্গা
গ) বংশী
ঘ) তুরাগ
ঙ) বালুনদী।

প্রাকৃতিক সম্পদ

সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। জেলায় উল্লেখযোগ্য কোন প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকলেও এখানে রয়েছে বুড়িগঙ্গা নদী। বুড়িগঙ্গা নদীর পানি প্রবাহিত হয়ে যায় কেরানীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন নদী, খাল, বিল পানি দিয়ে ভরে যায়। নদীর পানি জেলার মাটিকে করে উর্বর। এই উর্বর মাটিতে জন্মায় বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি,ধান, পাট এবং বিভিন্ন ধরনের ফসল।
নদী তীরবর্তী এলাকা হিসেবে এ জেলার মাটি উর্বর।

Matrix BCS Series

Facebook Page: Matrix BCS Series

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

১ম ধাপের মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলা পরিচিতি

Facebook Page: Matrix BCS Series

ফেনী জেলা

চিত্র: মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধ

Matrix

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর নং: ১

সেক্টর কমান্ডার:

- মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল- জুন);
- মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন - ডিসেম্বর)

উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা:

- সুলতান মাহমুদ বীরউত্তম
- ফয়েজ আহমেদ বীরউত্তম
- সালাহ উদ্দীন বীরউত্তম
- আবদুস সালাম বীরবিক্রম

কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি:

- হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী (পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম স্বাস্থ্যমন্ত্রী)
- ভাষা শহীদ আবদুস সালাম

সংসদীয় আসন: ৩টি

২৬৫	ফেনী-১	বেগম শিরীন আখতার	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)
২৬৬	ফেনী-২	নিজাম উদ্দিন হাজারী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৬৭	ফেনী-৩	মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী	জাতীয় পার্টি

জেলার পুরাতন নাম : শমসের নগর;
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৮৪
উপজেলা : ৬ টি;
ইউনিয়ন : ৪৩ টি
যে নদীর তীরে অবস্থিত: ফেনী

দর্শনীয় স্থান:

০১) বিজয় সিংহ দিঘি
০২) জগন্নাথ কালী মন্দির
০৩) চাঁদ খাঁ মসজিদ
০৪) চারশত বছরের প্রাচীন কড়ই গাছ
০৫) ফেনী সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
০৬) গান্ধী আশ্রম
০৭) শমসের গাজীর দীঘি
০৮) সাত মন্দির

ভৌগলিক পরিচিতি

ফেনী চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটি জেলা। এ জেলার মোট আয়তন ৯২৮.৩৪ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে কুমিল্লার লাংগলকোট উপজেলা, পশ্চিমে নোয়াখালীর সেনবাগ, পশ্চিম-দক্ষিণে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ, পূর্ব-উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্ব-দক্ষিণে চট্টগ্রামের মিরেরসরাই উপজেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গপোসাগরের মোহনা।

ফেনী চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটি জেলা। এ জেলার মোট আয়তন ৯২৮.৩৪ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে কুমিল্লার লাংগলকোট উপজেলা, পশ্চিমে নোয়াখালীর সেনবাগ, পশ্চিম-দক্ষিণে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ, পূর্ব-উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্ব-দক্ষিণে চট্টগ্রামের মিরেরসরাই উপজেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গপোসাগরের মোহনা।

Matrix BCS Series

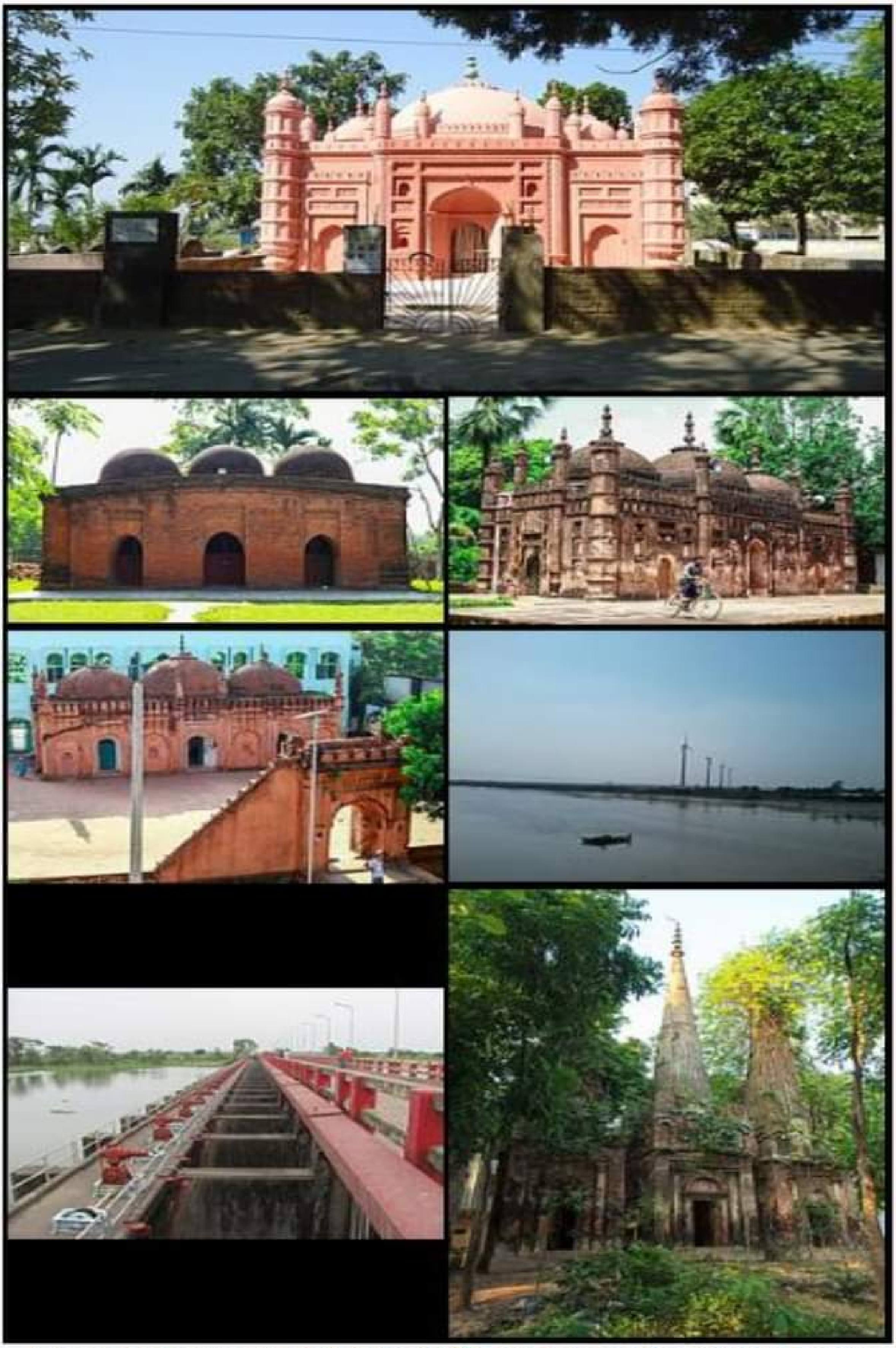

From top: Asgar Ali Chowdhury Mosque, Sharshadi Shahi Mosque, Chandgaji Bhuiyan Mosque, Mohammad Ali chowdhury mosque, Wind electricity-Muhuri Project and Feni ShathMoth

এক নজরে ফেনী

অবস্থানঃ ফেনী জেলার উত্তরে কুমিল্লা জেলা ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য,দক্ষিণে চট্টগ্রাম জেলা ও বঙ্গোপসাগর, পূর্বে চট্টগ্রাম জেলা ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে নোয়াখালী জেলা।

ফেনী জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা ৪টি , ইউনিয়ন ১২ টি। ফেনী সদর উপজেলার ৩টি সীমান্তবর্তী ইউনিয়ন হচ্ছে- ধর্মপুর ,শর্শিদী, এবং কাজীরবাগ ইউনিয়ন; ছাগলনাইয়া উপজলেয়ার ২টি সীমান্তবর্তী ইউনিয়ন হচ্ছে- শুভপুর ও মহামায়া ইউনিয়ন; ফুলগাজী উপজেলার ৪টি সীমান্তবর্তী ইউনিয়ন হচ্ছে- আমজাদ হাট, আনন্দপুর, মুন্সির হাট, ও ফুলগাজী; পরশুরাম উপজলেয়ার ৩টি সীমান্তবর্তী ইউনিয়ন হচ্ছে- চিথলিয়া, বক্সমাহমুদ, এবং মির্জানগর ইউনিয়ন।

আয়তনঃ ৯২৮.৩৪ বর্গ কিঃ মিঃ

প্রশাসনিক কাঠামোঃ
* উপজেলাঃ ৬ টি, ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, সোনাগাজী, ফুলগাজী, পরশুরাম, দাগনভূঞা
* থানাঃ ৬ টি, ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, সোনাগাজী, ফুলগাজী, পরশুরাম, দাগনভূঞা
* পৌরসভাঃ ৫ টি
* ইউনিয়নঃ ৪৩ টি
* গ্রামঃ ৫৬৪ টি
* মৌজাঃ ৫৪০ টি
* ইউনিয়ন ভূমি অফিসঃ ২৭ টি, আদায় শিবির ক্যাম্প ০২ টি
* হাট বাজারঃ ১২৩ টি

জনসংখ্যাঃ (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুয়ায়ী)
* মোট জনসংখাঃ ১৪,৯৬,১৩৮ জন
* পুরষঃ ৭,২২,৬২৬ জন
* নারীঃ ৭,৭৩,৫১২ জন
* জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৪৫১ জন (প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ)

শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যঃ শিক্ষা ব্যবস্থায় ফেনী জেলার অগ্রগতি উলেখযোগ্য। ফেনীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয় ১৮৮৪ সালে ফেনী আদর্শ পাইলট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। এর দুই বছরের মাথায় ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফেনী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়। নারী শিক্ষায় ফেনী বাংলাদেশের অনেক জেলা থেকে অগ্রগামী। শুধুমাত্র নারীদের শিক্ষার জন্য ১৯১০ সালে ফেনীতে প্রতিষ্ঠিত হয় সরলাদেবী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় যা বর্তমানে ফেনী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় নামে প্রতিষ্ঠিত। মাদ্রাসা শিক্ষায় ১৯২৩ সালে ফেনীতে প্রতিষ্ঠিত হয় ফেনী আলিয়া মাদ্রাসা। বর্তমানে ফেনীতে-
* সাক্ষরতার হারঃ ৫৯.৬%

Matrix BCS Series

* ডিগ্রী কলেজঃ ১১ টি
* উচ্চ মাধ্যমিক কলেজঃ ১০ টি
* গার্লস ক্যাডেট কলেজঃ ১ টি
* পলিটেকনিকঃ ১টি
* কম্পিউটার ইনস্টিটিউটঃ ১টি
* মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ ১৫৫ টি
* নিঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ ১৯ টি
* মাদ্রাসাঃ ৯৭ টি
* টিচার্স ট্রেনিং কলেজঃ ১ টি
* পি টি আইঃ ১ টি
* প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ৫২৮ টি
* মসজিদ : ২২৪৫ টি
* মন্দির ১৩৮ টি
* গীর্জা ১টি ।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য:

*২৫০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল : ১ টি
* ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সঃ ২ টি (ছাগলনাইয়া, পরশুরাম)
* ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সঃ ৩ টি (সোনাগাজী, ফুলগাজী, দাগনভূঞা)
* হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালঃ ১টি
* ডায়াবেটিস হাসপাতালঃ ১ টি
* বক্ষ ব্যাধি ক্লিনিকঃ ১ টি
* ট্রমা সেন্টারঃ ১ টি
* মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রঃ ১ টি
* সেবা (নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট): ১টি
* ইউনিয়ন উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রঃ ১৯ টি
* ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রঃ ৩৩ টি
* কমিউনিটি ক্লিনিক: প্রস্তাবিতঃ ১৫৩ টি
স্থান নির্বাচিতঃ ১৪৮ টি
সম্পূর্ণ নির্মিতঃ ১১৪ টি
বর্তমানে চালুকৃতঃ ১১৪ টি

যাতায়াত ব্যবস্থাঃ

* জাতীয় মহাসড়কঃ ৩১ কিঃ মিঃ (ঢাকা- চট্টগ্রাম)
* জাতীয় মহাসড়কঃ ২০ কিঃ মিঃ (ফেনী-নোয়াখালী)
* রেল পথঃ ২৬ কিঃ মিঃ
* পাকা রাস্তা ১,০৪৪.৮৫ কিঃ মিঃ

Matrix BCS Series

* আধা পাকা রাস্তাঃ ৮৭.৯৬ কিঃ মিঃ
* কাঁচা রাস্তাঃ ২,১৩২.৯৬ কিঃ মিঃ

প্রধান নদীঃ ফেনী নদী, মুহুরী নদী, কহুয়া নদী, সিলোনিয়া নদী, কালিদাস পাহালিয়া নদী।

শিল্প সংক্রান্ত তথ্যঃ

* শিল্প নগরীঃ ২ টি
* ভারী শিল্পের সংখ্যাঃ ৫ টি
* দুলা মিয়া কটন মিলস
* দোস্ত টেক্সটাইল মিলস
* কোয়ালিটি জুট ইয়ার্ন মিলস লিঃ
* আবুল খায়ের ম্যাচ ফ্যাক্টরী লিঃ
* মাঝারী শিল্পঃ ৭ টি
* ক্ষুদ্র শিল্পঃ ৮২৬ টি
* কুটির শিল্প : ৩৪১৯ টি

খনিজ সম্পদঃ

* ফেনী গ্যাস ফিল্ড। সদর উপজেলার ধলিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত।
* বি জি বি সেক্টর হেড কোয়ার্টারঃ ১টি (জয়লস্কর, দাগনভুইয়া)।
* কারাগার : ১ টি
* মিলনায়তনঃ ১ টিঃ

বিখ্যাত ব্যক্তিত্বঃ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ফেনী জেলার উলেখ যোগ্য অবদান রয়েছে। ফেনী জেলার বরেণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে উলেখযোগ্য কয়েকজনঃ কবি নবীন চন্দ্র সেন, কবি হাবিবুলাহ বাহার চৌধুরী, ভাষা সৈনিক আব্দুস সালাম, ভাষা সৈনিক গাজীউল হক, শহীদ বুদ্বিজীবি ও সাহিত্যিক শহীদুলাহ কায়সার, শহীদ বুদ্বিজীবি, সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান, শহীদ বুদ্বিজীবি ও সাংবাদিক সেলনা পারভীন, আধুনিক বাঙালি কবি বেলাল চৌধুরী কবি সামছুন্নাহার মাহমুদ, স্যার এ,এফ রহমান, নাট্যকার ও গবেষক সেলিম আল দীন প্রমুখ।

ঐতিহাসিক স্থানঃ

* হযরত শাহ সৈয়দ আমির উদ্দীন রঃ (পাগলা বাবার) মাজার ।
* শতবর্ষী চাঁদগাজী ভুঞাঁ মসজিদ, ছাগলনাইয়া।
* প্রাচীর সুড়ঙ্গ মঠ, ফুলগাজী।
* বিলোনিয়া সীমান্ড় পোস্ট, পরশুরাম।
* বিলোনিয়া পুরাতন রেল স্টেশন।

Matrix BCS Series

দর্শনীয় স্থানঃ

* মুহুরী সেচ প্রকল্প এলাকাঃ ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেচ প্রকল্প
এলাকা। ১৯৭৭-৭৮ অর্থ বছরে শুর হয়ে ১৯৮৫- ৮৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ হয়।
* মুহুরী সেচ প্রকল্প সংলগ্ন দক্ষিণাংশে ও অদুরের কেওড়া বাগান সহ চর এলাকা।
*ফেনী সদর উপজেলার ধর্মপুর মৌজার পাহাড়ী এলাকা।
*ফেনী সদর বিজয় সিংহ দীঘি এলাকা।
* ফুলগাজী উপজেলার দক্ষিণ সোনাপুর ও মান্দারপুর মৌজার পাহাড়ী এলাকা।
* দাগনভূইয়া এলাকার ভাষা শহীদ সালাম নগর এলাকা।

নির্বাচনী এলাকাঃ ৩ টি

* ফেনী- ১(২৬৫): পরশুরাম, ফুলগাজী, ছাগলনাইয়া উপজেলা।
* ফেনী- ২(২৬৬): ফেনী সদর উপজেলা।
* ফেনী- ৩(২৬৭): সোনাগাজী ও দাগনভুইয়া উপজেলা।

ফেনী জেলার সমস্যাঃ

* ঘূর্ণিঝড়
* পাহাড়ী ঢল
* জলাবদ্ধতা
* বন উজাড়
* জলোচ্ছাস/আকস্মিক বন্যা
* নদী ভাঙ্গন
* মাছের প্রজাতি হ্রাস
* সীমান্ত বিরোধ

সম্ভাবনাঃ

* ইপিজেড
* বিদ্যুৎ উৎপাদন
* শিল্প সম্ভাবনা
* বায়ু বিদ্যুৎ
* প্রাকৃতিক গ্যাস
* সমুদ্র বন্দর

Matrix BCS Series

ইতিহাস

ফেনী নদীর নাম অনুসারে এ অঞ্চলের নাম রাখা হয়েছে ফেনী। মধ্যযুগে কবি ও সাহিত্যিকদের কবিতা ও সাহিত্যে একটা বিশেষ নদীর স্রোতধা ও ফেরী পারা পারের ঘাট হিসেবে আমরা ফনী শব্দ পাই। ষোড়শ শতাব্দীতে কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগলপুরের বর্ণনায় লিখছেনঃ "ফনী নদীতে বেষ্টিত
চারিধার, পূর্বে মহাগিরি পার নাই তার।" সতের শতকে মির্জা নাথানের ফার্সী ভাষায় রচিত "বাহরিস্তান-ই-গায়েবীতে" ফনী শব্দ ফেনীতে পরিণত হয়। আঠার শতকের শেষভাগে কবি আলী রেজা প্রকাশ কানু ফকির তার পীরের বসতি হাজীগাওর অবস্থান সম্পর্কে লিখছেনঃ " ফেনীর দক্ষিণে এক ষর উপাম, হাজীগাও করিছিল সেই দেশের নাম।"কবি মোহাম্মদ মুকিম তার পৈতৃক বসতির বর্ণনাকালে বলেছেনঃ " ফেনীর পশ্চিমভাগে জুগিদিয়া দেশে.........।" বলাবাহুল্য, তারাও নদী অর্থে ফেনী ব্যবহার করেছেন। মনে হয় আদি শব্দ ফনী মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকদের ভাষায় ফেনীতে পরিণত হয়েছে।

১৮৭২-৭৪ সালের মধ্যে মোগল আমলের আমীরগাও থানা নদী ভাঙ্গনের মুখোমুখি হলে তা ফেনী নদীর ঘাটের অদূরে খাইয়অ্যাতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ঐ থানাটি কোম্পানীর কাগজ পত্রে ফেনী থানা (ফেনী নদীর অদূরে বলে) নামে পরিচিত হয়।অতঃপর ১৮৭৬ সালে নতুন মহকুমার পত্তন হলে খাইয়অ্যা থেকে থানা দপ্তরটি মহকুমা সদরে স্থানান্তরিত হয় ও নতুন মহকুমাটি ফেনী নামে পরিচিত হয়।

দূর অতীতে এ অঞ্চল ছিল সাগরের অংশ; তবে উত্তর পূর্ব দিক ছিল পাহাড়িয়া অঞ্চলের পাদদেশ। ফেনীর পূর্বদিকের রঘুনন্দন পাহাড় থেকে কাজির বাগের পোড়ামাটি অঞ্চলে হয়তঃ আদিকালে শিকারী মানুষের প্রথম পদচিহ্ন পড়েছিল।এখানকার ছাগলনাইয়া গ্রামে ১৯৬৩ সালে একটা পুকুর খননকালে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের ব্যবহৃত একটা হাতিয়ার বা হাতকুড়াল পাওয়া গেছে। পন্ডিতদের মতে ঐ হাতকুড়াল প্রায় পাচ হাজার বছরের পুরাতন।

বৃহত্তর নোয়াখালীর মধ্যে পূর্বদিকের ফেনী অঞ্চলকে ভূ-খন্ড হিসেবে অধিকতর প্রাচীন বলে পন্ডিতগণ মত প্রকাশ করেছেন। ফেনীর পূর্বভাগের ছাগল নাইয়া উপজেলার শিলুয়া গ্রামে রয়েছে এক প্রাচীন ঐতিহাসিক শিলামূর্তির ধ্বংসাবশেষ। প্রকাশ শিলামূর্তির অবস্থানের কারণে স্থানটি শিলুয়া বা শিল্লা নামে পরিচিত হয়েছে।প্রাচীন কালে হয়ত এখানে বৌদ্ধ ধর্ম ও কৃষ্টির বিকাশ ঘটেছিল।

ডঃ আহমদ শরীফ চট্টগ্রামের ইতিকথায় বলেছেনঃ প্রাচীনকালে আধুনিক ফেনী অঞ্চল ছাড়া নোয়াখালীর বেশির ভাগ ছিল নিম্ন জলা ভূমি। তখন ভুলুয়া (নোয়াখালীর আদি নাম) ও জুগিদিয়া (ফেনী নদীর সাগর সঙ্গমে অবস্থিত) ছিল দ্বীপের মতো। ছাগল নাইয়া নামকরণ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে ইংরেজ আমলের শুরুতে সাগর (Sagor) শব্দটি ভুল ক্রমে সাগল (Sagol) নামে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তাই ছাগল নাইয়া শব্দটি প্রচলিত হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য ইংরেজ আমলের পূর্বে কোন পুথি পত্রে ছাগল নাইয়া নামের কোন স্থানের নাম পাওয়া যায় না।

Matrix BCS Series

ফেনী নদীর তীরে রঘুনন্দন পাহাড়ের পাদদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বীর বাঙ্গালী শমসের গাজীর রাজধানী ছিল। তিনি এখান থেকে যুদ্ধাভিযানে গিয়ে রৌশনাবাদ ও ত্রিপুরা রাজ্য জয় করেন। তিনি চম্পক নগরের একাংশের নামকরণ করেছিলেন জগন্নাথ সোনাপুর।

সংক্ষেপে, ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে যে সকল মহকুমাকে মানোন্নীত করে জেলায় রূপান্তর করা হয়েছিল ফেনী জেলা তার একটি। জেলাটির আয়তন ৯২৮.৩৪ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৮৪ সালের পূর্বে এটি নোয়াখালী জেলার একটি মহকুমা ছিল। এ মহকুমার গোড়াপত্তন হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মিরসরাই, ছাগলনাইয়া ও আমীরগাঁও এর সমন্বয়ে। প্রথম মহকুমা প্রশাসক ছিলেন কবি নবীন চন্দ্র সেন। ১৭৭৬ সালে মিরসরাইকে কর্তন করে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম মহকুমা সদর দপ্তর ছিল আমীরগাঁওয়ে। ১৮৮১ সালে তা ফেনী শহরে স্থানান্তরিত হয়।

জেলার ঐতিহ্য

১) বিজয় সিংহ দিঘি ঃ চারিদিকে উচু পাহাড় ঘেরা এই দিঘি শত বছরের প্রাচিন রুপকথার ইতিহাস বহন করছে। কথিত আছে যে এটি রাজা বিজয় সিংহ এর আমলে রাজার মা কে খুশি করার জন্যে দিঘি টি খনন করেন। স্থানীয়দের মতে এই দিঘিতে সোনা এবং রুপা থালা ভেসে উঠত। একদিন এক ভিখারীনি এক টা থালা চুরি করার পর থেকে আর এই থালা ভেসে উঠেনা। এখন পর্যন্ত এই দিঘি পুরোপুরি ভাবে সেচ দিতে পারেনি কেউ। এখনো মানুষ দুর দুরান্ত থেকে আসে এই দিঘি তে পবিত্র গোসল এবং পানি পান করার জন্যে। এই দিঘিতে অনেক বড় মাছ পাওয়া যেত, যার ওজন হতো ৮০-১০০ কিলো। বর্তমানে এটি সর্কারি মালিকানাধীন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের বাসভবন আছে এটির উত্তর পাড়ে। মানুষের আগ্রাসনে এটির পাড় এবং গাছ গুলো মারাত্তক ক্ষয় ও খতির সম্মুখীন হচ্ছে। দিঘিটিতে ছুটির দিন ছাড়াও বিশেষ বিশেষ দিনে অনেক মানুষের সমাগম হয়।

২) জগন্নাথ কালী মন্দিরঃ ছাগলনাইয়া উপজেলায় অবস্থিত। শসসের গাজী তার বাল্যকালে লালনকর্তা জগন্নাথ সেনের স্মৃতিতে এ মন্দির ও কালী মূর্তি নির্মাণ করেন।

৩) চাঁদ খাঁ মসজিদঃ মোগল আমলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন চাঁদ গাজী ভূঞা। তার নামানুসারে ছাগলনাইয়া উপজেলা সদরের অদূরে চাঁদগাজী বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চাঁদগাজী বাজারের কাছে মাটিয়া গোধা গ্রামে অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে অবস্থান করছে চাঁদগাজী ভূঞা মসজিদ। মধ্যযুগের রীতি অনুযায়ী চুন, সুড়কী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইট দ্বারা তৈরী এ মসজিদের দেয়ালগুলো বেশ চওড়া। মসজিদের ছাদের উপর রয়েছে তিনটি সুদৃশ্য গম্বুজ। মসজিদের সামনে একটি কালো পাথরের নামফলকে এ মসজিদের নির্মানকাল ১১১২ হিজরী সনউল্লিখিত আছে।

৪) চারশত বছরের প্রাচীন কড়ই গাছ: তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক কবি নবীন চন্দ্র সেন এই গাছের ছায়ায় বসে কবিতা লিখতেন।

৫) ফেনী সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়: ১৮৮৬ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত।

৬) গান্ধী আশ্রমঃ নতুন মুন্সিরহাট বাজারে অবস্থিত গান্ধী আশ্রম ট্রাষ্ট এর একটি টিন সেড ঘর আছে। ঘরের ভিতর প্রশিক্ষনের সরঞ্জাম সংরক্ষিত আছে। গান্ধী আশ্রম ট্রাষ্টের বিভিন্ন কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবদ্দশায় ১৯২১ সালের ৩১ আগষ্ট ফেনীতে আগমন করেন এবং রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে সভা করেন। ঐদিন ফুলগাজী উপজেলার নতুন মুন্সিরহাট (সাবেক বীরেন্দ্রগঞ্জ বাজার) এর খাদি প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তিনি সশরীরে বর্তমান আশ্রমের স্থানে ছিলেন।

৭) শমসের গাজীর দীঘিঃ শমসের গাজী তার মাতা কৈয়ারা বেগমের নামে এ দীঘি খনন করেন। এ দীঘি ছাগলনাইয়া উপজেলা সদরের নিকটবর্তী কোনাপুর গ্রামে অবস্থিত। ৪.৩৬ একর আয়তনের এ দীঘির ১/৩ ভাগ ভারতীয় অংশে পড়েছে। ফেনী সদর হতে ছাগলনাইয়ার দূরত্ব ১৮ কি.মি.।

পুরাকীর্তি সম্পর্কিত

প্রাচীনতম মন্দিরঃ

পরেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী, দীনবন্ধু রায় চৌধুরী, সুদর্শন রায় চৌধুরী ও ধীরেন্দ্র রায় চৌধুরী কর্তৃক দানকৃত জমিতে বাশুরা গ্রামে ১৯৭২ সনে ফুলগাজী কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৮ সনে এটি সরকারী কলেজ করা হয়। কলেজের পশ্চিম পাশে রয়েছে বহু পুরানো শ্মশান ও মন্দির। বাংলা ১২৫২ সনে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আগে এ মন্দিরের পাশে প্রতিবছর মেলা বসত। বর্তমানে এখানে আর মেলা বসানো হয়না। মন্দিরের সামনে ৭ একর জমিতে একটি দীঘি রয়েছে। এখানে প্রতিবছর প্রচুর অতিথি পাখি আসে।

পাগলা মিঞাঁর মাজারঃ

দরবেশ পাগলা মিঞাঁর প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ আমীর উদ্দিন(রঃ) । ১৮২৩ সালে ফাযিলপুর ছনুয়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয় এবং১৮৮৭ সালেমাত্র৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে (তাঁর জন্মদিনে) তাঁর মাজারে ওরশ হয়। সেখানে জাতি ধর্মনির্বিশেষে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়। তিনি আধুনিক ফেনী জনপদের মানুষেরজীবন ও জীবিকার ওপর অপরিসীম প্রভাব রেখে গেছেন । তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে ফেনী অঞ্চলে বহু জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। এখনো প্রতিদিন তাঁর মাজারে মানুষ দলে দলে ফাতেহা পাঠ করে,জেয়ারত করে এবং মানতকরে ।

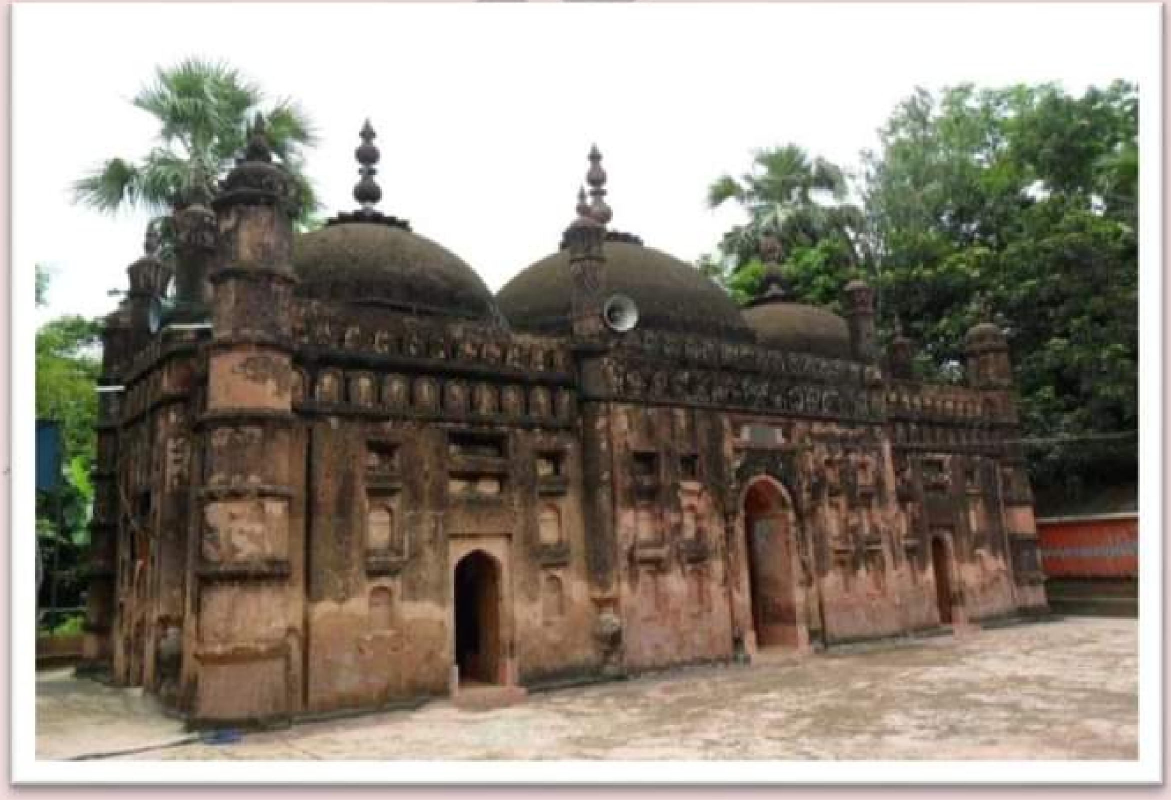

চাঁদগাজী ভূঁঞা মসজিদঃ

ফেনীর ছাগলনাইয়া থানার বিভিন্ন স্থানে বহু প্রাচীন কীর্তি বিদ্যমান। এসব প্রচীন কীর্তির মধ্যে মসজিদ, মন্দির, ইটের নির্মিত দালান, মাজার, দীঘি, রাস্তা, পাথর, প্রাচীন বৃক্ষ অন্যতম। মোঘল ও নবাবী আমলে নির্মিত এসব প্রাচীনকীর্তির পাশাপাশি ত্রিপুরার শাসক "ভাটির বাঘ" শমসের গাজীর সময়ে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্থাপত্য কীর্তিও এ এলাকার গৌরব হিসাবে কালের স্বাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে। ছাগলনাইয়া থানার চাঁদগাজী এলাকা মোগল আমলে বেশ উন্নত ছিল। এখানেই রয়েছে তিনশত বছরের পুরোনো চাঁদগাজী ভূঁঞা মসজিদ। চাঁদগাজী ভূঁঞা ছিলেন মোগল আমলে ফেনীর পূর্বঅঞ্চলে এক স্বনামধন্য জমিদার। জানা যায়, আঠার শতকের গোড়ার দিকেতিনি প্রথম নদী ভাঙ্গনের কারণে প্রচুর ধন-সম্পদ ও লোকলস্করসহ দুরদেশ থেকে এসে বতর্মান ছাগলনাইয়ার মাটিয়াগোধা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

সাত মন্দিরঃ

সাত মন্দির ছাগলনাইয়ায় ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হিসেবে সাত মন্দির ঘোষণা করছে নিজের অস্তিত্ব। ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার পশ্চিম ছাগলনাইয়া গ্রামে এটি অবস্থিত। নিজ চোখে না দেখলে উপলব্ধিকরা যাবেনা এর অপুর্ব সৌন্দর্য্য। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি যখন সংকটময় মুহুর্ত অতিক্রম করছে। যখন ম্যার জন শোরের পর লর্ড মনিংটন অর্থ্যাৎ লর্ড ওলেয়েসলী গভর্ণর জেনারেল হয়ে ভারতে আগমন করেন, ঠিক তখনই ফ্রান্সের সাথে ইংল্যান্ড এক মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয়। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের দিগ্বিজয় এবং তার ভারত বিজয়ের কল্পনায় ইংল্যান্ড সন্ত্রস্তঃ ভারতের পেশোয়া, সিন্ধিয়া, হোলকার ও নিজাম বৃটিশ শাসনের আগে ভারতীয় উপমহাদেশে (তথা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ) মুসলীম শাসকরাই রষ্ট্র পরিচালনা করতেন।তাদের মধ্যে বাংলার বীর শমসের গাজী অন্যতম। তার জন্মস্থান ছিল ছগলনাইয়া (ফেনী) উপজেলার চম্পক নগরে। এই জন্মস্থানছিল বর্তমানে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পড়েছে। এখানে তার স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক সুরঙ্গ পথ, শমসের গাজী দিঘী, এবংতারই খনন করে তৈরী করা এক খোইল- । দিঘীসহ প্রবেশ পথ, বসত ঘরের চিহ্ন হিসাবে পড়ে আছে। এটি ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পাহাড়ে। শমসের গাজীর বসত ঘরের দঃ পূর্বে যে দিঘী রয়েছে তার নাম শমসের গাজী দিঘী। এই দিঘীতে তারস্ত্রী সহ গোসল করতেন। স্ত্রী ছিলেন পদা শীল। শমসের গাজী পর্দাকে পছন্দ করতেন। স্ত্রীর পর্দার জন্য এই সুরঙ্গ পথটি তৈরি করেন। যাতে তার সৌন্দর্য্যরে প্রতি কারও দৃষ্টি না পড়ে। সে জন্য এ পথে দিঘীতে যাওয়া আসা করতেন।

Matrix BCS Series

প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব

হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী

জন্মঃ ১৯০৬ সাল, ফেনী।

মৃত্যুঃ ১৫ এপ্রিল, ১৯৬৬।

রাজনীতিক, সাংবাদিক, ফুটবল খেলোয়াড়ঃ
ফেনীর এ কৃতিপুরুষ ৪০ এর দশক থেকে বাঙালী মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অবদান রাখেন। তিনি ছিলেন কলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অন্যতম স্থপতি। ১৯৩৩ সালে কলকাতা থেকে বুলবুল নামে তিনি একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৪৬ সালে ফেনী অঞ্চল থেকে নির্বাচিত আইন সভার সদস্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম স্বস্বাস্থ্যমন্ত্রী।

ভাষা শহীদ আব্দুস সালাম

জন্মঃ ১৯২৫ সাল, লক্ষণপুর গ্রাম (বর্তমান সালাম নগর), দাগনভূঁএগা, ফেনী। মৃত্যুঃ ০৭ এপ্রিল, ১৯৫২, ঢাকা।

মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সম্মুখে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশের গুলিতে আহত হন। দেড় মাস ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন থাকার পর ১৯৫২ সালের ০৭ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁকে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবী সেলিনা পারভীন

জন্মঃ ৩১ মার্চ ১৯৩১ সাল, ৩৬০, নাজির রোড, ফেনী (বর্তমানে শহীদ সেলিনা পারভীন সড়ক)।

মৃত্যুঃ ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহিত্যিক, কবি, লেখিকা, বুদ্ধিজীবী শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে পাকিস্তানী ও তাদের এ দেশীয় দালাল রাজাকার, আবদর বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। তিনি কর্মজীবনের শুরুতে ললনা পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা শিলালিপির প্রকাশক ও

Matrix BCS Series

সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শিলালিপিতে তিনি অক্ষয় অমর হয়ে থাকবেন সমস্ত অত্যাচারিত নারীদের সাহস, শক্তি ও প্রেরণাদাত্রী হয়ে। মহাকালের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ তার নাম অম্লান দীপ্তিতে উদ্ভাসিত থাকবে বিশ্ববাসীর কাছে।

শহীদুল্লাহ কায়সারঃ

জন্মঃ ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭ সাল, মজুপুর গ্রাম, ফেনী।
নিখোঁজঃ ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ থেকে।

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার এর প্রকৃত নাম আবু নাঈম মোহা শহীদুল্লাহ। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে তিনি অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেন। তার এ অনমনীয় সাহসিকতার জন্য তিনি একাধিকবার গ্রেফতার হয়ে কারাভোগ করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে ১৪ ডিসেম্বর তিনি অপহৃত হন এবং আর ফিরে আসেননি। বাংলা সাহিত্যে তিনি যথেষ্ট আলো ছড়িয়েছেন। উপন্যাস, কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, ভ্রমনকাহিনীসহ সাহিত্যের বহুমুখী সৃষ্টিশীল জগতে ছিল তার সদর্প পদচারণা। সারেং বউ, সংশপ্তক, এবং কৃষ্ণচূড়া মেঘ দিগন্তে ফুলের আগুন, কুসুমের কান্না চন্দ্রভানের কন্যা (গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত), রাজবন্দীর রোজনামচা, পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (ভ্রমন কাহিনী) পরিক্রমা (প্রবন্ধ সংকলন) তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

জহির রায়হানঃ

জন্মঃ ১৯ আগষ্ট, ১৯৩৫ সাল, মজুপুর গ্রাম, ফেনী। মৃত্যুঃ ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঢাকা। মহান ভাষা আন্দোলনের একনিষ্ঠ এ কর্মী ২১ ফেব্রুয়ারির ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী প্রথম ১০ জনের একজন। পরবর্তীতে তিনি একজন সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে দিয়েছেন ভিন্নমাত্রিকতা এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে সম্পৃক্ত করেছেন আধুনিকতার ধারায়। বরফ গলা নদী, শেষ বিকেলের মেয়ে, আর কতদিন, তৃষ্ণা, হাজার বছর ধরে প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস এবং জীবন থেকে নেয়া, কাঁচের দেয়াল তাঁর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ নিয়ে তিনি প্রামান্যচিত্র স্টপ জেনোসাইড নির্মান করেন যা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৭১ সালের ৩০ ডিসেম্বর তিনি তাঁর অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সার এর খোঁজে বের হয়ে আর ফিরে আসেন নি।

Matrix BCS

ড. সেলিম আল দীনঃ

জন্মঃ ১৯ আগষ্ট, ১৯৪৯ সাল, সেনেরখীল গ্রাম, সোনাগাজী, ফেনী। মৃত্যুঃ ১৪ জানুয়ারী,২০০৮। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক, নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়,

নাট্যকার ও গবেষক: কালজয়ী নাট্যকার বাঙালী সংস্কৃতির নবরুপের দ্রষ্টা-স্রষ্টা, খ্যাতনামা অধ্যাপক গবেষক আচার্য সেলিম আলদীন ছিলেন ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও শিল্পনন্দনতত্ত্বের সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মূর্তিমান প্রতিবাদ। বাঙালীর শিল্পতত্ত্বের পাথুরে ভূমিতে পড়ে থাকা বাংলা নাটকের কঙ্কালে প্রাণের ফুল ফোটানো বাঙালী নাটকের বিশ্বায়নে অন্যতম পুরোধা। বাংলা নাট্য আঙ্গিকের ধারণক্ষমতা এবং এর বিচিত্র স্বভাব আবিষ্কারে, নাট্যভাষার ব্যাপক নবীকরণে, সংলাপে গভীর অর্থান্যাসে, দর্শনের নব নব দিগন্তের ছোঁয়ায় সমুজ্জ্বল এবং আঙ্গিকের নতুনতায় স্বতন্ত্র সৃষ্টির আলোক প্রভায় এবং বাংলা নাটকের ইতিহাস বিণির্মানে ও বিশ্বায়নে তিনি ছিলেন তন্নিষ্ট শিল্পী। তিনি প্রবর্তন করেন বিশেষ শিল্পরীতি কথনাট্য এবং প্রতিষ্ঠা করেন গ্রাম থিয়েটার। নাট্য মঞ্চায়ন,আঙ্গিক বিনির্মাণ, নাট্য ভাবনায় প্রতিনিয়ত তিনি অতিক্রম করেছেন নিজেকে । মুনতাসির ফ্যান্টাসী, যৈবতী কন্যার মন, কীর্তন খোলা, প্রাচ্য, বনপাংশুল, নিমজ্জনের মত নাটক রচনা করে বাংলা নাটক ও নাট্যতত্ত্বকে বিশ্ব নাটক ও নাট্যতত্ত্বের পংক্তিভূক্ত করেছেন।

নদ-নদী

প্রধান নদীঃ ফেনী নদী, মুহুরী নদী, কহুয়া নদী, সিলোনিয়া নদী, কালিদাস পাহালিয়া নদী।

চিত্রঃ ফেনী নদী

MATRIX BCS Series

চিত্রঃ মুহুরী নদী

চিত্রঃ কহুয়া নদী

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

১ম ধাপের মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলা পরিচিতি

Facebook Page: Matrix BCS Series

নেত্রকোনা জেলা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর নং: ১১

সেক্টর কমান্ডার:

- মেজর আবু তাহের (এপ্রিল- নভেম্বর)
- ফ্লাইট লেঃ এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর -ডিসেম্বর)

উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা:

- মেজর আবু তাহের বীর উত্তম
- নিজাম উদ্দীন বীরবিক্রম

কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি:

- কবি নির্মলেন্দু গুণ
- হুমায়ুন আহমেদ
- ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
- হেলাল হাফিজ
- মনসুর বয়াতি

Matrix B

সংসদীয় আসন: ৫টি

১৫৭	নেত্রকোনা-১	মানু মুজুমদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৫৮	নেত্রকোনা-২	মোঃ আশরাফুল আলী খান খসরু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৫৯	নেত্রকোনা-৩	অসীম কুমার উকিল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৬০	নেত্রকোনা-৪	বেগম রেবেকা মোমিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৬১	নেত্রকোনা-৫	ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৪

উপজেলা: ১০ টি

ইউনিয়ন: ৮৬ টি

যে নদীর তীরে অবস্থিত: সমেশ্বরী

আয়তন: ২,৮১০ বর্গ কিঃ মিঃ।

জনসংখ্যা: ২২,২৯,৪৬৪ জন, পুরুষ-১১,১১,৩০৬জন, মহিলা-১১,১৮,৩৩৬জন (২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী)

পৌরসভা: ০৫ টি (১. নেত্রকোণা, ২.মোহনগঞ্জ, ৩.দূর্গাপুর, ৪. কেন্দুয়া, ও: ৫.মদন)।

সীমান্তফাঁড়ি: ০৮ টি

গ্রাম: ২,২৯৯ টি

যোগাযোগব্যবস্থা :

ক. রেল পথ: ৬৫ কি. মি.

খ. সড়ক পথ পাকা সড়কঃ: ৫৬৬ কিঃ মিঃ,কাঁচা সড়কঃ: ১৬৬০ কিঃ মিঃ

গ. নদী পথ: ২০০ নটিক্যাল মাইল (প্রায়)।

কৃষি: ৪,৭৩,০০০.০০ একর

আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ: ৫১,৩৩১.০০ একর

Matrix

অনাবাদী জমির পরিমাণ: ৬৬,০৬৫.৬৯ একর

খাস জমির পরিমাণ কৃষি-৩৫৯৮৩.৮৭ একর, অকৃষি-: ১৭১৫৭.১৩ একর।

বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমাণ-: ২৩০২৭.২৮(কৃষি), ৩০৪.৮২(অকৃষি)।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বিশ্ববিদ্যালয় (শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়): ০১টি

মেডিকেল কলেজ (নেত্রকোণা মেডিক্যাল কলেজে): ০১টি

মহাবিদ্যালয়: ২৭টি

শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়: ০১টি

উচচ বিদ্যালয়: ১৮৭টি

জুনিয়র স্কুল: ৫৯টি

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়: ৬৩০টি

বে-সরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়: ৪৬৩টি

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়: ১৪৪টি

ইংরেজী মাধ্যম প্রাঃ বিদ্যালয়: ০১টি

কারিগরী প্রতিষ্ঠান: ০২টি (সরকারী: ১টি এবং বেসরকারী: ১টি)

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: ১টি

মাদ্রাসা: ৩১০টি (কামিল-০১টি,ফাযিল-৯টি, আলিম-১৪টি, দাখিল-৫৯টি এবংএবতেদায়ী-২২৭টি)

সরকারী শিশু পরিবার (বালক): ০১টি

এতিমখানা: ০৫টি

উপজাতীয় কালচালার একাডেমী: ০১টি

পাবলিক লাইব্রেরী-কাম-অডিটরিয়াম: ০৬টি

চিকিৎসা:

মানচিত্রে জেলা

নেত্রকোণা জেলা বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলের ময়মনসিংহ বিভাগের একটি প্রশাসনিক এলাকা। এই জেলার উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ জেলা, পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলা, পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলা।

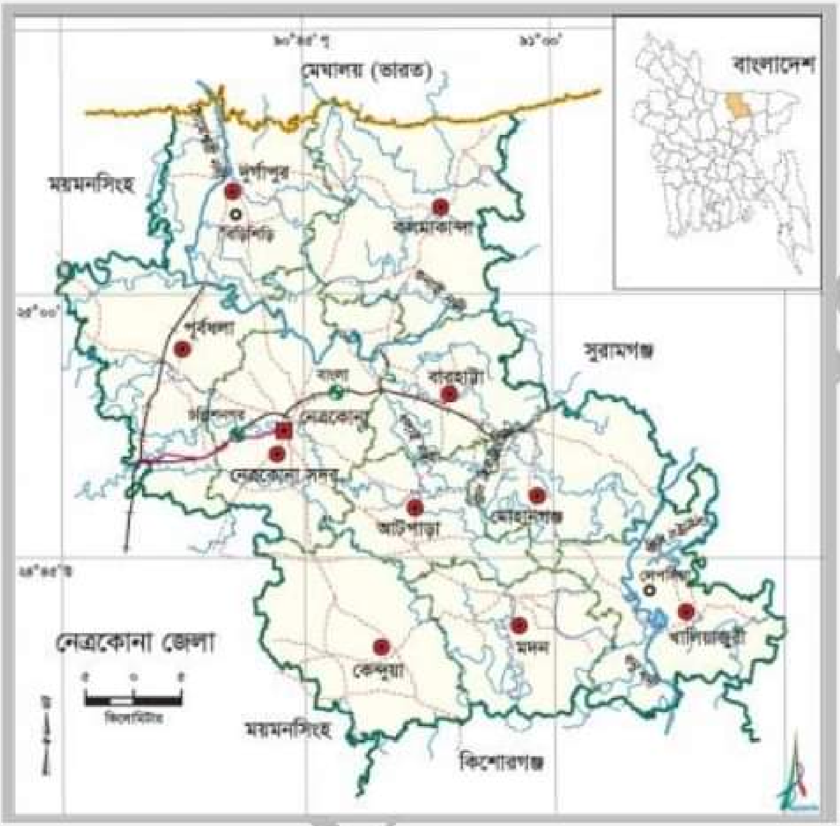

ভৌগলিক পরিচিতি

অবস্থানঃ

নেত্রকোণা জেলা ২৪০৩৫'থেকে ২৫০১০'উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০০৩০'থেকে ৯১০১৫'পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ জেলার পশ্চিমে ময়মনসিংহ, পূর্বে সুনামগঞ্জ, দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ, উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য অবস্থিত।

নামকরণের ইতিহাসঃ নেত্রকোণা বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার অংশ। এক সময় এটি ময়মনসিংহ জেলার কালিগঞ্জ থানা নামে পরিচিত ছিল। শহর থেকে ৭/৮ কিঃমিঃ উত্তর পশ্চিমে নাটরকোণা নামক স্থানে ইংরেজরা সর্বপ্রথম জরিপ চালায় এবং নাটরকোণাতেই মহকুমা সদর স্থাপিত হয়। ইংরেজদের বিকৃত উচ্চারণের বদৌলতে প্রথম দিকে নাটরকোণা নামটি পরবর্তীতে নেত্রকোণায় রূপান্তরিত হয়। কেউ কেউ মনে করেন শহরের মধ্য দিয়ে প্রবহমান মগরা নদীর বাঁকটি চোখের বাঁকের মত সেজন্য নামাকরণ করা হয়েছে নেত্রকোণা।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যঃ নেত্রকোণা প্রাকৃতিক সৌন্দয্যের লীলাভূমি। দূর্গাপুর উপজেলায় রয়েছে সু-উন্নত গারো পাহাড়। তাছাড়া মগড়া, কংশ,সোমেশ্বরী, ধনু নদী। পাহাড়ের সাথে হাওড় বাওরের অবস্থান প্রকৃতিতে বিরল। এ বিরল সৌন্দর্যের অধিকারী একমাত্র নেত্রকোণা জেলা।

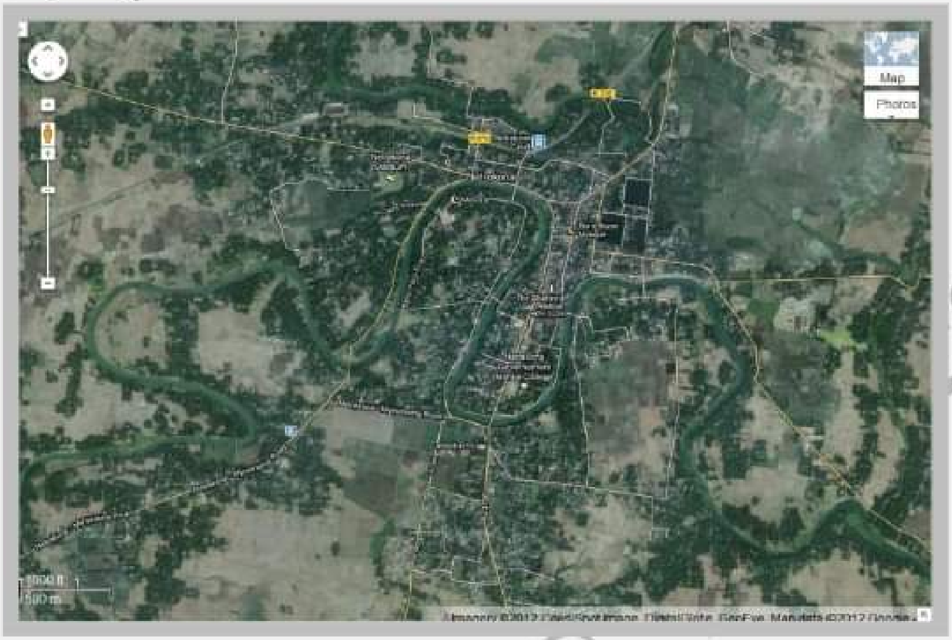

জেলার পটভূমি

নেত্রকোণা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যঃ

ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত নেত্রকোণা জেলার ইতিহাস প্রাচীন ঐতিহ্যে টই-টুম্বুর ও ঐতিহ্যের বিচিত্র ঘটনা সম্ভারে গর্বিত। বিভিন্ন তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় স্পষ্টতঃ প্রমাণ করে যে সাগর বা সমুদ্রগর্ভ থেকে জেগে ওঠায় এ অঞ্চলটি মানব বসবাসের যোগ্য ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। গারো পাহাড়ের পাদদেশ লেহন করে এঁকেবেঁকে কংস, সোমেশ্বরী, গণেশ্বরী, মহেশ্বরী, গোরাউৎরা নদীসহ অন্যান্য শাখা নদী নিয়ে বর্তমান নেত্রকোণা জেলার জলধারার উদ্ভব। এ জেলার প্রত্যেক নদীই জেলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত। ফলে সমগ্র জেলার ভূমি উত্তরাংশে উঁচু এবং ক্রমে দক্ষিণ-পূর্বাংশে ঢালু।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এ অঞ্চল গুপ্ত সম্রাটগণের অধীন ছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, গুপ্তযুগে সমুদ্রগুপ্তের অধীনস্থ এ অঞ্চলসহ পশ্চিম ময়মনসিংহ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুরাজ শশাংকের আমন্ত্রণে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন সাঙ যখন কামরূপ অঞ্চলে আসেন, তখন পর্যন্ত নারায়ণ বংশীয় ব্রাহ্মণ কুমার ভাস্কর বর্মণ কর্তৃক কামরূপ রাজ্য পরিচালিত ছিল। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব ময়মনসিংহের উত্তরাংশে পাহার মুল্লুকে বৈশ্যগারো ও দুর্গাগারো তাদের মনগড়া রাজত্ব পরিচালনা করতো। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে জনৈক মুসলিম শাসক পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চল আক্রমণ করে অল্প কিছুদিনের জন্য মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। অতঃপর চতুর্দশ শতাব্দীতে জিতারা নামক জনৈক সন্ন্যাসী কর্তৃক কামরূপের তৎকালীন রাজধানী ভাটী অঞ্চল আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। সে সময় পর্যন্তও মুসলিম শাসক ও অধিবাসী স্থায়ীভাবে অত্রাঞ্চলে অবস্থান ও শাসন করতে পারেনি। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলে (১৪৯৩-১৫১৯) সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল মুসলিম রাজত্বের অন্তর্ভূক্ত হয়।

Matrix BCS Series

আধুনিক সদর হাসপাতাল: ০১টি

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স: ০৯টি

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র: ৬২টি

মাতৃসদনও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র: ০১টি

কমিউনিটি ক্লিনিক: ২৪৪ টি

অন্যান্য

প্রেস: ২২টি

বি,জি,বি ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার: ০১টি

টেলিফোন অফিস: ১০টি

সাধারণ পাঠাগার: ০২টি

এল,এস,ডি গোডাউন: ১৫টি

এফ,এস, গোডাউন: ৩০টি

স্টেডিয়াম: ০১টি

জেলা হিসেবে শুভ উদ্বোধন: ১ ফেব্রুয়ারী: ১৯৮৪ খ্রিঃ।

দর্শনীয় স্থান:

- বিজয়পুর পাহাড়ে চিনামাটির নৈসর্গিক দৃশ্য, দূর্গাপুর।
- টংক আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ, দূর্গাপুর।
- রাণীখং মিশন টিলাতে ক্যাথলিক গির্জা, দূর্গাপুর।
- বিরিশিরি কালচারাল একাডেমী, দূর্গাপুর।
- কমলা রাণীর দীঘি, দূর্গাপুর।
- কথিত নইদ্যা ঠাকুরের ভিটা, দূর্গাপুর।
- রাশমণি স্মৃতি সৌধ, দূর্গাপুর।
- লেঙ্গুরা, চেংটি, গোবিন্দপুরের পাহাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য, কলমকাকান্দা।
- সাত শহীদের মাজার, কলমকাকান্দা।
- হযরত শাহ সুলতান কমরউদ্দিন রুমী (রাঃ)-এঁর মাজার শরীফ, নেত্রকোণা সদর।
- রোয়াইলবাড়ীর পুরার্কীতি, কেন্দুয়া।

Matrix BCS Series

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ'র পুত্র নসরৎ শাহ'র শাসনামলে (১৫১৯-১৫৩২) দু'একবার বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও বিদ্রোহীরা সফল হয়নি। সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চলেই নসরৎ শাহ'র শাসন বলবৎ ছিল। নসরৎ শাহ'র পদচিহ্ন লোপ পেলেও তার অনেক স্মৃতিচিহ্ন কালের সাক্ষী হয়ে আছে। নসরৎ শাহ-র উত্তরাধিকারীরা (১৫৩৩-১৮৩৮) কিংবা তার পরবর্তী লক্ষ্মণাবতীর অন্য শাসকেরা ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপর আধিপত্য বজায় রাখতে পারেনি। ময়মনসিংহের উত্তরাংশ কোচদের পুনরাধীন হয়ে পড়ে। বাকী অংশ দিল্লীর পাঠান সুলতান শেরশাহ-র (১৫৩৯-১৫৪৫) শাসনভুক্ত হয়েছিল। তৎপুত্র সেলিম শাহ'র শাসনের সময়টি (১৫৪৫-১৫৫৩) ছিল বিদ্রোহ ও অস্থিরতায় পূর্ণ। রাজধানী দিল্লী থেকে অনেক দূরে ও কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দূর্বলতার সুযোগে প্রধান রাজস্ব সচিব দেওয়ান সুলায়মান খাঁ (যিনি পূর্বে কালিদাস গজদানী নামে পরিচিত ছিলেন) সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করেন। এতে করে দেশী ও বিদেশী রাজ্যলিপ্সুরা এতদঞ্চল দখলের প্রয়াস পায়। এর মধ্যে ভাটী অঞ্চল (পূর্ব-উত্তরাংশ) সোলায়মান খাঁ-র দখলভুক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় শাসকের প্রেরিত সৈন্যদের হাতে সোলায়মান খাঁ নিহত হলেও তার দু'পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশা খাঁ খিজিরপুর থেকে ভাটী অঞ্চলে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ঈশা খাঁ'র মৃত্যুর পর তৎপুত্র মুসা খাঁ ও আফগান সেনা খাজা উসমান খাঁ কর্তৃক অত্রাঞ্চল শাসিত ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৫-১৬২৭) সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

মোগল সেনাদের যুদ্ধ কৌশল জনিত কারণে অনেক দূর্গ প্রতিষ্ঠা হয়। এছাড়া পূর্ববর্তী শাসকদের তৈরী ভগ্নদুর্গও তারা সংস্কার সাধন করে ব্যবহার করেছিল। ওই সকল ঐতিহাসিক যুদ্ধদূর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রোয়াই বাড়ি দূর্গ যা পরবর্তীকালে ঈশা খাঁ'র পারিষদ মসজিদ জালাল এর আবাস বাটী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নেত্রকোণা সদরের অদূরে পুকুরিয়ার ধ্বংস প্রাপ্ত দূর্গসহ অনেক নিদর্শন মাটি চাপায় হারিয়ে গেছে। এরপরও কিছু নিদর্শন এখানকার ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। পাশাপাশি সে সময়কার শাসকদের অনেক জনহিতকর কাজের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখ্য খোঁজার দিঘী নামে পরিচিত জলাশয়গুলো। অনেকে মনে করেন খাজাদের জায়গীর ভূমিতে জনহিতকর কাজের অন্যতম পানীয় জল ব্যবস্থায় খাঁ দিঘীগুলো খনন করেছিলেন। তাই খোয়াজ খাঁ'র দিঘী থেকে খোজার দিঘী। এর ভিন্ন মতামতও রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন খাজা উসমান খাঁ'র দিঘী থেকে খাজার দিঘী, সে থেকে খোজার দিঘী নামে পরিচিতি পায়। তৎকালীন সুসঙ্গ, নাসিরূজিয়াল, মৈমনসিংহ, সিংধা ও খালিয়াজুরী পরগণার ভূমি নিয়ে বর্তমান নেত্রকোণা জেলার অবস্থান।

ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৮০ খিস্টাব্দে নেত্রকোণা মহকুমা মঞ্জুর করে (কারণসমূহ নেত্রকোণা সদর অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে)। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি থেকে নেত্রকোণা মহকুমার কার্য শুরু হয়। ব্রিটিশ আমলে এ জেলায় কৃষক বিদ্রোহ, পাগলপন্থী বিদ্রোহ, টংক আন্দোলন ও তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হয়। ১৯৪৫ সালে জেলা সদরের নাগড়ায় তিনদিনব্যাপী সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তান আমলে নেত্রকোণা মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করার জন্য গণদাবী ওঠে। সে দাবী পূরণের লক্ষ্যে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সরকার কেন্দুয়ায় জেলা সদর স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করেছিল। কিন্তু সরকারের সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়নি। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি

Matrix BCS Series

নেত্রকোণা মহকুমাকে জেলা ঘোষণা করা হয়। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নম্বর-এস-আর, ও ১৭-এল/৮৪/এম,ই,আর(জ,এ-২)/২৬৪/৮৩-৩০)। একই খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে নব প্রতিষ্ঠিত জেলার কার্যক্রম শুরু হয়।
নেত্রকোণার স্বাধীনচেতা জনগোষ্ঠী ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের সারাংশ শুনেই অনুধাবন করতে পেরেছিল তাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে যেতে হবে। তাই মুক্তিযুদ্ধের জন্য নেত্রকোণাবাসীর প্রস্তুতি গ্রহণে বেশি সময় ব্যয় হয়নি। ৭ মার্চ এর পর থেকেই নেত্রকোণার প্রত্যেক থানা শহরগুলোতে যুদ্ধে যাবার জন্য যুব সমাজ উদগ্রীব হয়ে ওঠে। প্রতিদিন থানা পর্যায়ে গ্রামগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ সশস্ত্র মিছিল করে আসতে থাকে। নেত্রকোণা শহরসহ থানা শহরগুলোর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান মানুষগুলোও নীতি নির্ধারণের কাজ শুরু করে দেন। নেত্রকোণার রণাঙ্গনগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় তৎকালীন নেত্রকোণা মহকুমার ৫০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাৎ বরণ করেছেন। নেত্রকোণা মহকুমার মুক্তিযোদ্ধাগণ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানের অনেক মুক্তিযোদ্ধা নেত্রকোণার বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন এবং অনেকে শহীদ হয়েছেন। তেমনি দেশের বিভিন্ন জেলার রণাঙ্গনগুলোতে নেত্রকোণা মুক্তিযোদ্ধারাও যুদ্ধ করেছেন এবং অনেকে শহীদ হয়েছেন।

দর্শনীয় স্থানসমূহঃ

উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী

নেত্রকোনা জেলা থেকে ৩৭ কিলোমিটার দূরে দূর্গাপুরের বিরিশিরিতে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী (Ethnic Cultural Academy) অবস্থিত। মূলত বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে বসবাসরত হাজং, কোচ, ডালু, মান্দাই, বানাইসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করার লক্ষ্য নিয়ে উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরা নিজস্ব ভাষা, সামাজিক প্রথা, পোশাক- পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস, আচার- অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। কালের বিবর্তনে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনেকটাই হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের

সংস্কৃতি বিশ্ব পরিমণ্ডলে তুলে ধরতে ১৯৭৭ সালে সংস্কৃতি মন্ত্রাণালয়ের একটি বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩.২১ একর জায়গার উপর উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এই কালচারাল একাডেমী "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক আইন" অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে।

বিভিন্ন ধরণের গাছ-গাছালীর সমন্বয়ে সাজানো উপজাতীয় কালচারাল একাডেমীতে সংস্কৃতি, গবেষণা, লাইব্রেরী, জাদুঘর প্রভৃতি ৪টি শাখা রয়েছে। দোতালার উপজাতীয় মিউজিয়ামে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জীবন যাত্রার বিভিন্ন নিদর্শন ও ব্যবহৃত জিনিস সংরক্ষণ করে রাখা আছে। এছাড়া একাডেমীর ক্যাম্পাসে একটি অডিটোরিয়াম এবং গেস্ট হাউজ রয়েছে। প্রতিবছর উপজাতীয়দের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এখানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে।

ডিঙ্গাপোতা হাওর

নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত ডিঙ্গাপোতা হাওর (Dingapota Haor) দেশের বৃহত্তম হাওরগুলোর মধ্যে অন্যতম। ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন নবরূপে এই হাওরের সৌন্দর্য ফুটে উঠে। বর্ষাকালে হাওরের অথৈ জলের ধারা, শুষ্ক মৌসুমে চারপাশের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য সবকিছুই প্রকৃতিপ্রেমী দর্শনার্থীদের মোহিত করে। তবে সকল মৌসুমেই হাওরের বিশাল জলরাশির গভীরতম স্থানে থাকা আধডোবা হিজল গাছ, জলরাশির উচ্ছল ঢেউ ও নীল আকাশের মিতালী চোখে পরে। বিশেষ করে শরৎ ও হেমন্তকালে হাওরের দুপাড়ের সবুজ সোনালি ধানক্ষেত ও নীলচে আকাশের সৌন্দর্য দর্শনার্থীদের সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে।

এছাড়া মাছের মৌসুমে হাওরের পাড়ে জেলেদের পরিবার নিয়ে অস্থায়ী আবাসস্থল গুলো কাছ থেকে হাওরের জেলেদের জীবনযাপন দেখার সুযোগ করে দেয়। এখান থেকে ইচ্ছে হলে হাওরের বিভিন্ন তাজা মাছ কিনে নেয়া যায়। প্রকৃতির দানে অপরূপ ডিঙ্গাপোতা হাওর নেত্রকোনা জেলার পর্যটন শিল্পে এক বিপুল সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করেছে।

কমলা রাণী দিঘী

কমলারাণীর সাগরদীঘি বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলায় অবস্থিত একটি বৃহদায়তনের জলাধার। ৬৬.০০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই দীঘিটি আয়তনের দিক থেকে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাধার হিসাবে স্বীকৃত। এই দীঘিটি খনন করান স্থানীয় সামন্ত রাজা পদ্মনাভ। [১] দেশ-বিদেশে এটি রাণী কমলাবতীর দীঘি, বা বানিয়াচং-এর সাগরদীঘি, বা কমলারাণীর দীঘি অথবা এলাকাবসীর কাছে এটি সাগরদিঘী নামেও বহুল পরিচিত। কমলারাণীর দীঘিটি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার বানিয়াচং দক্ষিন পূর্ব ও বানিয়াচং দক্ষিন পশ্চিম ইউনিয়ন মিলে অবস্থিত এবং এটি সাগরদীঘি মৌজায় অবস্থিত। প্রায় দ্বাদশ শতাব্দিতে রাজা পদ্মনাভ প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য বানিয়াচং গ্রামের মধ্য ভাগে একটি বিশাল দিঘি খনন করেন। এ দিঘি খননের পর পানি না উঠায় স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে রাজা পদ্মনাভের স্ত্রী রাণী কমলাবতী এ দিঘিতে আত্মবিসর্জন দেন বলে একটি উপাখ্যান এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। এ জন্য এ দিঘিকে কমলারাণীর দিঘিও বলা হয়ে থাকে। এ দিঘি নিয়ে বাংলা ছায়াছবিসহ রেডিও মঞ্চ নাটক রচিত হয়েছে। এর পাড়ে বসে পল্লী কবি জসিমউদ্দিন 'রাণী কমলাবতীর দিঘি' নামে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। সে কবিতাটি তার 'সূচয়নী' কাব্য গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ দিঘিটি বাংলা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দিঘি বলে খ্যাতি রয়েছে। ১৯৮৬ সালে দিঘিটি পুনঃখনন করান তৎকালীন মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রী সিরাজুল হোসেন খাঁন। কবি জসীমউদ্দীন বানিয়াচংয়ে পরিদর্শনে কালে নয়নাভিরাম সাগরদীঘির প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে 'রানী কমলাবতীর দীঘি' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন, যা তার সূচয়ণী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

সাত শহীদের মাজার

নেত্রকোণা জেলার কমলাকান্দা উপজেলার লেঙ্গুরা ইউনিয়নের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফুলবাড়ি শান্ত এক গ্রাম। গ্রামের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে ভারতের মেঘালয় রাজ্য থেকে গারো পাহাড়ের ভিতর দিয়ে বয়ে আসা গনেশ্বরী নদী। আমাদের সীমান্তের ভিতরেই রয়েছে বেশ কিছু পাহাড় ও টিলা, আর সীমান্তের বাইরে যতদূর চোখ যায় দেখা যায় মেঘালয়ের পাহাড় রাজ্য। চারপাশে অগনিত মেহগনি গাছের সারির নির্জন সেই জায়গায় সমাহিত আছেন ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা। এই জায়গা সাত শহীদের মাজার নামে পরিচিত।

সোমেশ্বরী নদী, দুর্গাপুর

সোমেশ্বরী নদী (Someshwari River) ও তার সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে যেতে হবে নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলায়। ভারতের মেঘালয়ের গারো পাহাড়ের সীমসাংগ্রী নামক স্থান থেকে উৎপন্ন হয়ে সোমেশ্বরী নদীটি দুর্গাপুরে প্রবেশ করেছে। লোকমুখে প্রচলিত

অনেককাল আগে সোমেশ্বর পাঠক নামে এক ব্যক্তির দ্বারা এ অঞ্চল দখল হয়ে যায়, পরবর্তীতে তার নামানুসারেই নদীটি সোমেশ্বরী নদী হিসাবে পরিচিতি পায়। বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময় সোমেশ্বরী নদী একেক রকম সৌন্দর্য মেলে ধরে। শীতকালে পানি কমে গেলেও সদা স্বচ্ছ জলের সোমেশ্বরী নদী বর্ষায় যেন যৌবন ফিরে পায়। বর্তমানে কয়লা খনি হিসেবে অধিক পরিচিত হলেও সোমেশ্বরী নদী সৌন্দর্য্যে একটুও ভাটা পরেনি। সামেশ্বরী নদীর তীরে রয়েছে পাথর, কয়লা ও বালুর খনি। এই কয়লা, পাথর, বালু সংরক্ষন করে চলে অনেকের জীবিকা। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে সাদা মাটি অন্যতম খনিজ সম্পদ। আর এই খনিজ সম্পদ সংগ্রহের সবচেয়ে বৃহৎ অঞ্চল এটি। সমতল ভূমি, ছোট-বড় টিলা সহ প্রায় ১৫. কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৬০০ মিটার প্রস্থ জুড়ে এই খনিজ অঞ্চলের বিস্তৃতি। চীনা মাটি খননের সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি। তবে ধারনা করা হয়ে থাকে ১৯৫৭ সাল থেকে এই মাটি খননের যাত্রা শুরু। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী এই অঞ্চলে সাদা মাটির পরিমান ২৪ লক্ষ ৭০হাজার মেট্রিক টন ধরা হয়েছিল ১৯৫৭ সালে যা কিনা বাংলাদেশের ৩ শত বছরের চাহিদা পূরণে সক্ষম।

বিরিশিরি

বিরিশিরি (Birishiri) নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলায় অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। বিরিশিরির বিজয়পুরে আকর্ষনীয় চীনামাটির পাহাড় ও নীল পানির হ্রদ রয়েছে। বিজয়পুরের এই চীনামাটির পাহাড় এবং সমভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬ কিলোমিটার ও প্রস্থে ৬০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। হ্রদের নীল জল নিমিশেই সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে দেয়। হ্রদের অপরুপ নীল জলের প্রধান উৎস হচ্ছে সমেশ্বরী নদী। এই নদী বর্তমানে কয়লা খনি হিসেবে অধিক পরিচিত। নীল জ্বলের হ্রদের মতই সোমেশ্বরী নদী আপন রুপে অনন্যা।

বিরিশিরিতে আর যা যা দেখবেন

বিরিশিরিতে চীনামাটির পাহাড়, নীল জলের হ্রদ এছাড়াও সোমেশ্বরী নদী, রানীখং গির্জা এবং কমলা রানীর দীঘি ভ্রমণের জন্য আদর্শ জায়গা। সোমেশ্বরী নদীর তীরে কাশবন আর দূরের গারো পাহাড়ের সৌন্দর্য্য বিরিশিরিতে আসা সকল ভ্রমণকারীদের মুগ্ধ করে। বর্ষাকালে সোমেশ্বরী নদী সমস্ত রুপ মেলে ধরে, তখন বিরিশিরির যৌবনের সৌন্দর্য্য দেখতে পর্যটকরা এসে ভিড় জমায়। এছাড়াও এখানে আছে পাহাড়ী কালচারাল একাডেমী, গারো, হাজং ইত্যাদি নৃগোষ্ঠী, হাজং ভাষায় টুঙ্কা বিপ্লব বা তেভাগা আন্দোলনের বেশকিছু স্মৃতিস্তম্ভ এবং সেন্ট যোসেফের গির্জা।

সাধু যোসেফের ধর্মপল্লীঃ দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী। ধর্মপল্লী খোলা থাকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত। এটি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের একটি উপসনালয়। এখানে রয়েছে একটি বিশ্রামাগারও। এর মনোরম পরিবেশ মুগ্ধ করবে নিশ্চিত।

রাণী খং উচ্চ বিদ্যালয়ঃ সাধু যোসেফের ধর্মপল্লীর কাছাকাছিই রয়েছে রাণী খং উচ্চ বিদ্যালয়। রাণী খং উচ্চ বিদ্যালয়টির প্রাঙ্গনটি মনোমুগ্ধকর। টিলাময় প্রাঙ্গনটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আরেকটি অনন্য রূপ। শোনা যায় খং-রাণী নামক এক রাক্ষস এই অঞ্চলে বাস করতো। গারো সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐ রাক্ষসকে মেরে এই অঞ্চলে শান্তি এনেছিল আর ঐ রাক্ষসের নাম অনুসারে এই অঞ্চলের নাম রাণী খং। রাণী মাতা রাশমনী স্মৃতিসৌধঃদর্শনীয় স্থানের মধ্যে আছে রাণী মাতা রাশমনী স্মৃতিসৌধ। বছর বছর ধরে স্মৃতিসৌধটির সৌন্দর্য যেন অক্ষত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। রাণী মাতা রাশমনী হাজন ছিলেন টংক ও কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী। ১৮৯৮ সালে তিনি ধোবাউড়া উপজেলায় দেবীকুড়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তিনি জমিদার ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কৃষকদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে কুমুদিনী হাজং কে বাচাতে গিয়ে ব্রিটিশ বাহিনীর সৈন্যদের গুলিতে তার সহযোদ্ধা সুরেন্দ্র হাজংসহ বহেরাতলী গ্রামে তিনি শহীদ হন। তার স্মরণে প্রতি বছর ৩১ জানুয়ারী রাশমনী দিবস এবং টংক শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। রাণী রাশমনী হাজং এবং সুরেন্দ্র হাজং টংক আন্দোলনের প্রথম শহীদ।

Matrix BCS Series

নদনদী

নেত্রকোণা জেলা নদী ও হাওড় বেষ্টিত । এর বুকচিড়ে বয়ে চর্তুদিক হতে উপজেলাগুলিকে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন নদী ও হাওড় । এ বিস্তীর্ণ জলরাশি দিয়ে প্রতিদিন শতশত কার্গো, ট্রলার যোগাযোগে পাথর, কয়লা, বালু সারা দেশেরপ্তানি হয়ে থাকে এবং নদী নিয়ে প্রতিদিন লঞ্চ বিভিন্ন জায়গায় চলাচল করে।

সোমেশ্বরী নদী

ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড়ের বিঞ্চুরীছড়া, বাঙাছড়া প্রভৃতি ঝর্ণাধারা ও পশ্চিম দিক থেকে রমফা নদীর স্রোতধারা একত্রিত হয়ে সোমেশ্বরী নদীর সৃষ্টি। অবশ্য এক সময় সমগ্র নদীটি সিমসাং নামে পরিচিত ছিল। ৬৮৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে সোমেশ্বর পাঠক নামে এক সিদ্ধপুরুষ অত্রাঞ্চল দখল করে নেয়ার পর থেকে নদীটি সোমেশ্বরী নামে পরিচিতি পায়। গারো পাহাড় অঞ্চলে গারো সমাজ সচেতন হওয়ার পর থেকে তারা আবারো সোমেশ্বরী নামের পরিবর্তে সিমসাং ডাকতে শুরু করেছে।

মেঘালয় রাজ্যের বাঘমারা বাজার (পূর্ব নাম বঙ বাজার) হয়ে বাংলাদেশের রাণীখং পাহাড়ের কাছ দিয়ে সোমেশ্বরী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। রাণীখং পাহাড়ের পাশ বেয়ে দণি দিক বরাবর শিবগঞ্জ বাজারের কাছ দিয়ে সোমেশ্বরী নদী বরাবর পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। কলমাকান্দা, মধ্যনগর হয়ে ধনু নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে সোমেশ্বরী। সোমেশ্বরীর মূলধারা তার উৎসস্থলে প্রায় বিলুপ্ত। বর্ষা মৌসুম ছাড়া অন্য কোন মৌসুমে পানি প্রবাহ থাকেনা। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে পাহাড়ীয়া ঢলে সোমেশ্বরী বরাবর দণি দিকে প্রবাহিত হয়ে নতুন গতিপথের সৃষ্টি করেছে। যা স্থানীয় ভাবে শিবগঞ্জ ঢালা নামে খ্যাত। বর্তমানে এ ধারাটি সোমেশ্বরীর মূল স্রোতধারা। এ স্রোতধারাটি চিতলির হাওর হয়ে জারিয়া-ঝাঞ্জাইল বাজারের পশ্চিমদিক দিয়ে কংস নদী সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ১৯৮৮ সালে পাহাড়ীয়া ঢলে আতরাখালী নামেসোমেশ্বরী নদীর একটি শাখা নদীটির সৃষ্টি হয়। সুসঙ্গ দুর্গাপুর বাজারের উত্তর দিক দিয়ে সোমেশ্বরী নদী থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে আতরাখালী । কিছু দূর এগিয়ে সোমেশ্বরীর মূলধারা সঙ্গে

যুক্ত হয়েছে। আতরাখালী নদী এখন বেশ খরস্রোতা। আরো ভাটিতে সোমেশ্বরীর শাখা নদীর সৃষ্টি হয়েছে গুনাই, বালিয়া ও খারপাই।

কংস নদী

ভারতের তুরা পাহাড়ে বিভিন্ন ঝর্ণার সম্মিলনে কংস নদীর উৎপত্তি। শেরপুরের হাতিবাগার এলাকা দিয়ে কংস বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। উৎপত্তি স্থল থেকে শেরপুরের নালিতাবাড়ী পর্যন্ত এ নদীটির নাম ভূগাই। নালিতাবাড়ীর ৫মাইল ভাটিতে এসে দিংঘানা, চেল্লাখালী, দেওদিয়া মারিসি, মলিজি নামে উপনদী গুলো ভূগাইয়ের মিলিত হয়েছে। ভূগাই সে স্থানে বেশ খরস্রোতা হলে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে ফুলপুরের কাছাকাছি এসে খড়িয়া নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। খড়িয়া ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী। ফুলপুর উপজেলার পর থেকে ভূগাই নদীটি কংস নামে খ্যাত। মেঘালয় থেকে শিববাড়ীর পাশ দিয়ে নিতাই নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ধোবাউড়া সদর হয়ে দুর্গাপুরের শঙ্করপুরের কাছে নিতাই কংস নদীতে মিলিত হয়েছে। এতে কংস তার পূর্ব পথের গতির চেয়ে অনেকাংশে বেড় গেছে। নেত্রকোণা জেলার ভেতরে পূর্বধলা উপজেলায় কংসের দৈঘ্য ৯ মাইল। দুর্গাপুর, ধোবাউড়া ও পূর্বধলা উপজেলার সীমানা বরাবর ২০ মাইল। নেত্রকোণা সদর উপজেলায় ৬ মাইল। নেত্রকোণা সদর, বারহাট্টা সীমানা বেয়ে ৭ মাইল। বারহাট্টা উপজেলায় কংসের দৈঘ্য ১১ মাইল। বারহাট্টা, মোহনগঞ্জ সীমানা বেয়ে ৬ মাইল। মোহনগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার সীমানা বরাবর ১৯ মাইল প্রবাহিত হয়ে ঘোরাউৎরা নদীতে মিলিত হয়েছে। নেত্রকোণা জেলার ভেতর অনেক শাখা নদী কংস নদী থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। পূর্বধলার সীমানোয় কংস থেকে একটি শাখা নদী দণি দিকে ছুটে গিয়ে ধলাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। যা কালিহর নদী নামে পরিচিত। কালিহর এর শাখা নদী খানিগাঙ। এক সময় খানিগাঙ বেশ খরস্রোতা ছিল। এখর মরাগাঙ। এর মধ্যে জারিয়া বাজারের পূর্বদিক দিয়ে শলাখালী শাখা নদীটি বেরিয়ে ধলামূলগাঁও ইউনিয়নের ভেতরদিয়ে লাউয়ারী নামে ত্রিমোহনীতে এসে মগড়া নদীতে পতিত হয়েছে। নেত্রকোণার পূর্ব ইউনিয়ন ঠাকুরাকোণা বাজারের পাশদিয়ে বরাবর দক্ষিণাদিকদিয়ে আটপাড়া উপজেলার পাশে এসে মগড়া নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে এ নদীটিতে তেমন পানি প্রবাহ থাকেনা। বর্ষায় বেশ খরস্রোতাহয়।

ধনুনদী

কোন স্থানে এ নদী বৌলাই কোন স্থানে ঘোরাউৎরা নামে পরিচিত। এটি মেঘনা নদীর অন্যতম উপ নদী। এর উৎপত্তিস্থল ভারতের মেঘালয় রাজ্যে। মেঘালয়ের যাদুকাটা ও ধোমালিয়া এ দুটি নদী একত্রিত হয়ে ধনু নদীর মূল প্রবাহেরসৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের সীমান্তে এসে এর একাংশ সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর হয়ে দক্ষিণেচলতে শুরু করেছে। তাহিরপুরে সোমেশ্বরী এসে ধনু নদীতে পতিত হয়েছে। এ নদীটি মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরী হয়ে কিশোরগঞ্জে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এ নদীটির প্রথমাং ধনু, মধ্যভাগ বৌলাই, শেষাংশ ঘোরাউৎরা নামে মেঘনায় পতিত হয়। ধনু একটি খরস্রোতানদী। নেত্রকোণা জেলার প্রায় সব কটি নদীই এ নদীতে পতিত হয়ে ভাটিতে গেছে।

Matrix BCS Series

মগড়া নদী

ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে মগড়ার উৎপত্তি। সেনেরচর নামক স্থান থেকে খড়িয়া নদী বেয়ে সারাসরি মগড়া নদীর প্রবাহ। সে প্রবাহ ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার বুড়বুড়িয়া বিলে এসে পতিত হয়েছে। বুড়বুড়িয়া বিল থেকে বেরিয়ে গজারিয়া ও রাংসা নদীর স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়ে ফুলপুরের ঢাকুয়া নামক স্থানের ভেতর দিয়ে সরাসরি পূর্বদিকে ধলাই নামে প্রবাহিত হয়েছে। পূর্বধলা উপজেলার হোগলা বাজারের পাশ দিয়ে পূর্বধলা সদরের ভেতর দিয়ে ত্রিমোহনী নামক স্থানে এসে দক্ষিণেপ্রবাহিত হয়েছে। ত্রিমোহনীতে এসে ধলাইয়ের সঙ্গে উত্তর দিক থেকে এসে লাউয়ারী নদী মিলিত হয়েছে। সে স্থান থেকে মগড়া নামে পরিচিত। সেখান থেকে প্রথমে পাঁচ মাইল পর্যন্ত দক্ষিণেদিকে প্রবাহিত হয়ে দয়াগঞ্জ ঘাট থেকে সরাসরি পূর্ব দিকে আকাঁবাকা হয়ে নেত্রকোণা শহরের পাশ দিয়ে আটপাড়া উপজেলার দিকে চলে গেছে। পশ্চিম দিক থেকে শ্যামগঞ্জ হয়ে দয়াগঞ্জ ঘাটের কাছে মগড়ার সঙ্গে ধলাই নামের একটি স্রোতধারা মিলিত হয়েছে।

নেত্রকোণা জেলার ঠাকুরাকোণা থেকে কংস নদী একটি শাখা নদী আটপাড়ায় মগড়ার মিলিত হয়েছে। গৌরীপুর দিক থেকে ছুটে আসা পাটকুড়া নদীটি বসুর বাজার এলাকায় এসে মগড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সাউডুলি, মগড়া ও পাটকুড়ার মিলিত স্রোতেকেন্দুয়ার গুগবাজার কাছে এসে যোগ হয়েছে। সেখানে বর্ষায় স্রোতেপ্রবাহ আনুপাতিক হারে বেশি থাকে। গুগবাজার হয়ে সে নদীটি মদন হয়ে ধনু নদীতে পতিত হয়েছে।

নেত্রকোণা জেলায় মগড়া নদীর গতিপথ সব চেয়ে বেশি। এ নদীটি কোথাও ধলাই নামে কোথাও মগড়া নামে খ্যাত। এ জেলার চারশ বর্গ মাইল এলাকা দিয়ে মগড়া নদীর প্রবাহ রয়েছে। মগড়া কংস নদী ৮/১০ মাইল ব্যবধানে প্রায় ৪০ মাইল সমান্তরায় ভাবে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

হাওর

নেত্রকোণার অন্যতম হাওর মোহনগঞ্জের ডিঙ্গাপোতা, কেন্দুয়া উপজেলার জালিয়ার হাওর। জালিয়ার হাওর একসময় জলমহালের আওতায় ছিল। প্রকৃতিক কারনে হাওর এলাকাটি ভরাট হয়ে গেছে। বর্তমানে ২টি মাত্র ২০ একরের উর্ধে জলমহাল রয়েছে।

মদন উপজেলার উল্লেখযোগ্য হাওড় তলার হাওর, গনেশ্ব হাওর ও জালিয়ার হাওরের অংশ বিশেষ মদন উপজেলার আওতা। আটপাড়ার আটপাড়া উপজেলায় বাগড়ার হাওর ও গনেশ্বর হাওর উল্লেখযোগ্য।

খালিয়াজুরী উপজেলার উলেখযোগ্য নদী ধনু ও ধলাই।

হাওর : কীর্ত্তনখোলা, গোবিন্দডোবা, লক্ষীপুর, উত্তরবন্ধ, খৈড়তলা, লেপসিয়া ও জগনাতপুর হাওর। খালিয়াজুরী উপজেলায় ২৫টি জলমহাল রয়েছে। রোয়াইল, রানীচাপুর, ধলীমাটি, চৌতারা, চোনাই, বাজুয়াইল, মরাধনু, রতনী, জগনাতপুর গুনা, পেটনা, জগনাতপুর, খালিয়াজুরী গুনা, বেকী, ফেনী, মাকলাইন, বানোয়াইর,চেলাপাইয়া, কীর্ত্তনখোলা, মরাগাঙ, কাঠালজানা, চিনামারা, নরসিংহপুর,ছাইয়া, নাজিরপুর, মোরাদপুর জলমহাল।

Matrix BCS Series

জেলার ঐতিহ্য

ঐতিহাসিক স্থাপত্য

নেত্রকোণা জেলায় অনেক প্রাচীন স্থাপত্য রয়েছে। সে সকল স্থাপত্যগুলো অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। কিছু স্থাপত্য এখনো ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। নেত্রকোণার ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মদনপুরের হযরত শাহ্ সুলতান কমর উদ্দিন রুমি(র) মাজার, শাহ্ সুখূল আম্বিয়া মাজারের পাশে মোগল যুগের এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, পুকুরিয়ার ধ্বংশপ্রাপ্ত দূর্গ, নাটেরকোণার ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের স্মৃতি চিহ্ন, দূর্গাপুর মাসকান্দা গ্রামের সুলতানি যুগের এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ।

সুসলরাজ

সুসলরাজ রঘুনাথ সিংহ মাধবপুর ছোট পাহাড়ের উপর একটি শিব মন্দির স্থাপন করেছিলেন। সে মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। তবে মাধবপুরের সেই পাহাড়ে এখন পর্যন্ত অসংখ্য ভগ্নইট পাওয়া যায়। সুসল জমিদার বাড়ির শেষ অস্তিত্বও এখন বিলীন। ষোড়শ শতাব্দির প্রথম ভাগে সুসল রাজ জানকি নাথ মল্লিক এক বিশাল পুকুর খনন করেছিলেন। সে পুকুর স্থানীয় ভাবে কমলারাণী দীঘি নামে খ্যাত। একটি মাত্র পাড় ছাড়া কমলারাণীর দীঘির আর কোন চিহ্ন নেই। কালে ভরাট হয়ে গেছে। সুসল রাজ পরিবারের প্রথম পুরুষ সুমেশ্বর পাঠক একটি দশভূজা মন্দির স্থাপন করেছিলেন। সে মন্দিরটি কোথায় নির্মিত হয়েছিল তা এখন আর কেউ বলতে পারেন না।

পূর্বধলার জমিদার বাড়ি ও পাগল পন্থি

পূর্বধলার জমিদার বাড়ির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে স্বাধীনতার পূর্বেই। ঘাগড়া জমিদার বাড়ির প্রাচীন ইমারত গুলো ও বাঘবেড় এবং নারায়নদহ জমিদার বাড়ির ইমারতগুলো প্রায় বিলুপ্ত। সোনাইকান্দা, লেটিরকান্দা ও একই থানার লালচাপুর গ্রামের মোঘল যুগের মসজিদ গুলো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইচুলিয়া গ্রামের সুলতানি যুগের মসজিদ ও আগল সরকারের আক্রার মন্দিরটি ৭১ পরবর্তি কালে বিলুপ্ত হয়েছে। লেটিরকান্দা গ্রামে পাগল পন্থিদের পারিবারিক কবর রয়েছে। সে কবরস্থানে পাগল পন্থিকরণ শাহ্, টিপু শাহ্, ছপাতি শাহ্ সহ তাঁদের বংশের অন্যান্যদের কবর রয়েছে। সে কবরস্থানের প্রাচীরটি বৃটিশ শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল, যা এখনো দাঁড়িছে আছে । কিন্তু পাগল পন্থিদের সমাধিগুলো আধুনিক টাইলসে বেঁধে দেয়ায় ঐতিহাসিক মূল্য হারিয়ে ফেলেছে।

সাত পুকুর ও হাসানকুলী খাঁর সমাধি

আটপাড়া থানার রামেশ্বরপুর ও সালকি গ্রামে সাতটি পুকুর রয়েছে। বিশাল এ পুকুরগুলো অতি প্রাচীনকালে খনন করা বলে মনে হয়। বড় পুকুরের পশ্চিম পাশে হাসানকুলী খাঁর সমাধি। সে সমাধিটি কালো শিলা দিয়ে বাঁধানো। হাসানকুলী খাঁ ছিলেন একজন পুঁথি লেখক। তার পুঁথির সুত্র ধরে বিচার করলে এ পুকুর ও সমাধিটি মোঘলযুগের বলে ধরে নিতে হয়। এ ছাড়া শুনই গ্রামের প্রাচীন দূর্গ এখন বিলুপ্ত।

Matrix BCS Series

রোয়াইল বাড়ির প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন

কেন্দুয়া থানার ঐতিহাসিক স্থাপত্যের সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি প্রাচীন। রোয়াইল বাড়ির প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন অন্যতম। ১৯৯২ খৃস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কতৃক রোয়াইল বাড়িতে খনন কাজ পরিচালিত হলে বেরিয়ে আসে মসজিদ, দূর্গ, রাস্তা, পরিখা, কবরস্থান ও অনেক অট্টালিকা। তারমধ্যে বারোদুয়ারী ঢিবির দক্ষিণাংশে সমতল ভূমি। খননে আরো পাওয়া গেছে কারুকার্যময় অট্টালিকার চিহ্ন ও দূর্গে সৈনিকদের কুচকাওয়াজের প্রসস্ত মাঠ। ঐ প্রাচীন চিহ্নবহ স্থানটি ৮ হেক্টর। এটি আয়তকার ছিল বলে ধারনা করা হয়। দক্ষিণে বেতাই নদীর তীর ঘেঁষে ভাঙ্গন অথবা নোঙ্গরঘাটের জন্য দেয়াল গাঁথুনি ছিল। মূল দুর্গের দৈঘ্য ৪৫০ মিটার ও প্রস্থ ১৫৭ মিটার। ইটের পরিমাণ ৩৭১৮৬ সেন্টিমিটার। সন্মুখভাগে জোড়াদিঘি। এর একটির দৈঘ্য ২৭০ মিটার ও প্রস্থ ৭০ মিটার, অপরটির দৈঘ্য ১৫০ মিটার ও প্রস্থ ৯০ মিটার। খননে বেরিয়ে আসা মসজিদটির কারুকাজ ও ইটের আকৃতি সুলতানী আমলের। সংস্কার ও কারুকাজ সংযোজন হয়েছিল মুঘল যুগে।

একই থানার জাফরপুর গ্রামে একটি মসজিদের ইটের নকশা ও কারুকাজে রোয়াইল বাড়ির মসজিদের ইট ও কারুকাজের সঙ্গে মিল রয়েছে। মনে হয় এ দুটি মসজিদ একই সময়ে প্রাতিষ্ঠা লাভ করেছিল। একই এলাকা পরিখা বেষ্টিত ছিল বলে প্রমাণ মিলে। নোয়াপাড়া গ্রামের জমিদার ও আশুলিয়া গ্রামের অনেক প্রাচীন স্থাপত্য আজ বিলুপ্ত।

প্রাচীন নিদর্শন

মদন থানার ফতেপুর ও জাহাঙ্গীরপুরের দেওয়ানদের বাতিঘরের অস্তিত্ব এখন আর নেই। চাঁনগাও গ্রামে ১টি প্রচীন মসজিদ রয়েছে। ধারনা করা হয় মসজিদটি মোঘল যুগে নির্মিত হয়েছিল। জেলার মোঘল যুগে নির্মিত অন্যান্য মসজিদের আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। এছাড়া মদন সদরে শাহ্ সুফি সাধক সৈয়দ আহম্মদ বসরির মাজার শরীফ। বারহাট্রা থানার পিরিজপুর গ্রামে প্রাচীন জোড়া পুকুর। এর মধ্যে বড় পুকুরটি ৬ শতাংশ ও ছোট পুকুরটি ২ শতাংশ ভূমি নিয়ে গঠিত। প্রাচীন পাট্রা ইটের গাথুনীতে পুকুরের ঘাট বাঁধানো ছিল। তার ধ্বংসপ্রাপ্তের চিহ্ন এখনো পরিলক্ষিত হয়। বাড়ির নাম কোর্টবাড়ি, বাজার এখন না থাকলেও স্থানের নাম দেওয়ানের বাজার। সে এলাকায় ভগ্ন ইটের ছড়াছড়ি রয়েছে। বাড়ি নির্মাণের পরিবেশ এখনো চমৎকার। আমঘোয়াইল গ্রামের দক্ষিণের সাউথপুরে একটি ভাঙ্গা ইমারত রয়েছে। যা ৩৬০ বর্গফুট। এ ইমারতটি অতি প্রাচীন তা সহজেই অনুমিত হয়। সিংদা গ্রামে একটি প্রাচীন দেব মন্দির ছিল। মন্দিরটি এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। বারহাট্রা বাজারের মন্দিরটিও অতি প্রাচীন তা সহজেই অনুমিত হয়।

মোহনগঞ্জের সেখের বাড়ির মসজিদটি সুলতানি আমলে নির্মিত। মাঘান গ্রামে মোঘল যুগের আরো একটি মসজিদ রয়েছে। দৌলতপুর গ্রমে ৮৭৬ বঙ্গাব্দে নির্মিত পাশাপাশি দুটি মন্দির আছে। সেথায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতগুলো এখন তার শেষ চিহ্নও ধরে রাখতে পারেনি।

খালিয়াজুরী থানার প্রাচীন স্থাপত্য বলতে শুধুমাত্র একটি পর্যবেক্ষণ ইমারতের ভাঙ্গা অংশ রয়েছে। সেই ইমারতটি প্রাচীন বলে অনুমান করা হয়।

Matrix BCS Series

পুরাকীর্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

রোয়াইলবাড়ি দূর্গ: বাংলার প্রাচীন শাসনকর্তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যমন্ডিত এক ঐতিহাসিক স্থান। একসময় কত ঘটনাই না ঘটেছে এ দূর্গে। বাংলার সুলতান হুসেন শাহ, নছরত শাহ এবং ঈশা খাঁ'র অশ্বারোহী বাহিনীর ঠক ঠক শব্দে কিভাবেই না কেঁপেছে এই রোয়াইলবাড়ির মাটি; সে ইতিহাস আজ পুরোপুরি জানা না গেলেও তাঁদের অহংকার ও শৌর্য-বীর্যের সাক্ষী হয়ে আজো ঠাঁয় দাড়িয়ে আছে প্রাচীন দূর্গটি।

জানা গেছে 'রোয়াইল' একটি আরবী শব্দ। এর বাংলা অর্থ 'ক্ষুদ্র অশ্বারোহী বাহিনী'। সুতরাং 'রোয়াইলবাড়ি' এর অর্থ দাঁড়ায় 'অশ্বারোহী বাহিনীর বাড়ি'। কালক্রমে রোয়াইলবাড়ি এখন একটি পুরো গ্রাম এবং সমগ্র ইউনিয়নের নাম। নেত্রকোণার কেন্দুয়া উপজেলা সদর থেকে সাত কিলোমিটার দূরে গ্রামটির অবস্থান। রোয়াইলবাড়ি দূর্গের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বেতাই নদী। ঈশা খাঁর স্মৃতি বিজড়িত আরেক ঐতিহাসিক স্থান কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উজেলার জঙ্গলবাড়ি দূর্গও রোয়াইলবাড়ি থেকে খুব বেশী দূরে নয়।

ঐতিহাসিকদের মতে, সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কামরূপের রাজা নিলাম্বরের বিরুদ্ধে এক প্রচন্ড যুদ্ধ পরিচালনা করে কামরূপ রাজ্য দখল করেন। এরপর কিছুদিন তাঁর পুত্র নছরত শাহ্ কামরূপে শাসন করেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রতিপক্ষের আক্রমণের মুখে তিনি বিতাড়িত হন এবং এক পর্যায়ে কামরূপ থেকে পালিয়ে আসতে হয়। কথিত আছে, নছরত শাহ্ কামরূপ থেকে পালিয়ে পূর্ব ময়মনসিংহের (বর্তমান নেত্রকোণার) রোয়াইলবাড়িতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি এর নামকরণ করেন 'নছরত ও জিয়াল' (কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে- 'নছরত আজিয়াল')। পরবর্তীতে তাঁর শাসন অন্তর্গত সমগ্র প্রদেশটিই (বৃহত্তর ময়মনসিংহ) 'নছরতশাহী পরগণা' নামে পরিচিত হয় এবং আকবর শাহ্র সময় পর্যন্তও পরগণাটি এ নামেই পরিচিত ছিল। এরপর বাঙ্গালীর গৌরব, মসনদে আলী ঈশা খাঁ এ অঞ্চলে বিশাল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি ও নেত্রকোণার রোয়াইলবাড়ি দূর্গের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নেন। জানা গেছে রোয়াইলবাড়ি থেকে জঙ্গলবাড়ি পর্যন্ত যাতায়াতের একটি রাস্তাও ছিল, যা ধ্বংস হতে হতে কিছুদিন আগে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এদিকে ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পারিষদ দেওয়ান জালাল এখানকার আধিপত্য গ্রহণ করেন। তিনি রোয়াইলবাড়ি দূর্গের ব্যাপক সংস্কার এবং দূর্গের বহিরাঙ্গনে

Matrix BCS Series

একটি সুরম্য মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি 'মসজিদ- এ জালাল' বা 'জালাল মসজিদ' নামে পরিচিত ছিল।

বারোদুয়ারী ঢিবিটির অবস্থান সিংহ দরজার দক্ষিণ প্রান্তে। এলাকায় এটি 'বারো দরজার ইমারত' নামে পরিচিত। খননের পর এখানে কারুকার্যমন্ডিত যে মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়; ধারণা করা হয়- এটিই দেওয়ান জালাল নির্মিত 'মসজিদ-এ জালাল' বা 'জালাল মসজিদ'। জানা যায়, এ মসজিদের ১৫টি গম্বুজ ছিল। এছাড়া মসজিদের কাঠামোতে ছিল ১২টি দরজা, ৫টি খুতবা পাঠের মেহরাব (মিম্বর) এবং মার্বেল পাথরের তৈরি বিশাল কয়েকটি খিলান। মসজিদের দেয়ালগুলো প্রায় সাত মিটার চওড়া। এতে ঝিনুকচুন ও সুড়কির প্রলেপযুক্ত ইট ব্যবহার করা হয়। চমৎকার সূর্যমূখী ফুলের নকশায় পরিপূর্ণ ছিল এটির দেয়ালগুলো। দূর্গের দক্ষিণ দিকের খোলা ময়দানটিকে সৈন্যবাহিনীল প্যারেড গ্রাউন্ড হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও দূর্গের বিভিন্ন অংশে বেশ কয়েকটি ভবন বা ইমারতের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। কথিত আছে- এ দুর্গের একটি কবরে শুয়ে আছেন নেয়ামত বিবি। প্রত্নতত্ত্ব গবেষকদের মতে, রোয়াইলবাড়ি দুর্গের সমস্ত স্থাপনা সুলতানী আমলের স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত হলেও এর কারুকাজ ছিল অনেক বেশী নান্দনিক ও শিল্পসমৃদ্ধ।

দুর্গর ধ্বংসাবশেষের পাশের একটি স্থানে এলাকাবাসীর উদ্যোগে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। দুর্গ এলাকার বেতাই নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে রোয়াইলবাড়ি বাজার। ঐতিহাসিক স্থানটির প্রাচীন নিদর্শনগুলোর সাথে পরিচিত হতে প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু লোক আসেন এখানে। এ এলাকাটি দেশের একটি আকর্ষণীয় পর্যটন স্পটে পরিণত হতে পারে।

ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা থেকে বাস বা যে কোন ধরণের ছোটোখাটো যানবাহন নিয়ে পৌছা যায় রোয়াইলবাড়িতে। সেখানে গেলে অশ্বারোহী বাহিনীর সেই ঠক ঠক শব্দ আর কোনোদিনই শোনা যাবেনা যদিও, কিন্তু আপনার অন্তর্দৃষ্টি ঠিকই কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে সুলতান- ঈশা খাঁ আমলের সেই হারানো দিনগুলোতে নিয়ে যাবে।

ভাষা ও সংস্কৃতি

ভাষা ও সংস্কৃতি

নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর, বন-জঙ্গলেরজনপদ ছিল সমগ্র নেত্রকোণা। লোক সাহিত্য সংগ্রাহক ও গবেষকদের মতে পূর্বময়মনসিংহ হলো লোক ও সাহিত্য সংস্কৃতির এক তীর্থ ভূমি। নেত্রকোণার সন্তানচন্দ্র কুমার দে সংগৃহীত এবং ড. দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত বিশ্ব নন্দিতগ্রন্থ মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশের পর থেকে পূর্ব ময়মনসিংহকে অনেক গবেষক মৈমনসিংহ গীতিকা অঞ্চল বলেও চিহ্নিত করে থাকেন। এই মৈমনসিংহ গীতিকা অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত করা হয়-উত্তরে গারো পাহাড়, দক্ষিণে মেঘনা, যমুনাসঙ্গমস্থল, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং পূর্বে সুরমা কুশিয়ারা নদী। এই মৈমনসিংহ গীতিকা অঞ্চলের লোক সাহিত্য সংস্কৃতি, ভোগলিক ও ঐতিহাসিকবিচার-বিশ্লেষণের কেন্দ্র বিন্দু হলো নেত্রকোণা।

Matrix BCS Series

খনিজ সম্পদ

প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত এ ভান্ডারে রয়েছে সাদামাটি (হোয়াইট ক্লে) এবং অবকাঠামো নির্মাণ সহ কাঁচ তৈরির একমাত্র উপযুক্ত সিল্কী বালু। সাদামাটি (হোয়াইট ক্লে)দূর্গাপুর উপজেলায় অবস্থিত। এ মাটি দিয়ে সিরামিক জাতীয় সামগ্রী নির্মাণ করা হচ্ছে। খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী এ মাটি উত্তোলন করছে। জেলা বা উপজেলা প্রশাসনের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কি পরিমাণ সাদামাটি উত্তোলন করা হচ্ছে তার প্রকৃত চিত্র কখনও পাওয়া যাচ্ছেনা।

জেলার দূর্গাপুর, কলমাকান্দা ও নেত্রকোণা সদর উপজেলায় সায়রাতভূক্ত ৭টি বালুমহাল রয়েছে। প্রাপ্ত সিলিকা বালু অবকাঠামো নির্মাণ ও কাঁচ নির্মাণে অত্যন্ত সহযোগি হওয়া সত্ত্বেও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাতে হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটালে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি হতো এবং গড় আয় বৃদ্ধি পেতো।

সম্প্রতি নেত্রকোণা ও সুনামগঞ্জের হাওরাঞ্চলে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে।

Matrix BCS Series

Facebook Page: Matrix BCS Series

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

১ম ধাপের মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলা পরিচিতি

Facebook Page: Matrix BCS Series

শেরপুর

Matrix

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর নং: ১১

সেক্টর কমান্ডার:

- মেজর আবু তাহের (এপ্রিল- নভেম্বর)
- ফ্লাইট লেঃ এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর -ডিসেম্বর)

উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা:

- মোতাসিন বিল্লাহ বীরবিক্রম
- নাজমুল হোসেন বুলবুল

কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি:

- বেগম মতিয়া চৌধুরী (রাজনীতিবিদ)
- ভাষা সৈনিক আবুল কাশেম

সংসদীয় আসন:

১৪৩	শেরপুর-১	মোঃ আতিউর রহমান আতিক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৪৪	শেরপুর-২	বেগম মতিয়া চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৪৫	শেরপুর-৩	এ, কে, এম, ফজলুল হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

জেলার পুরাতন নাম: **দশ কাহনিয়া**
জেলার ঐতিহ্য: **ঘাগড়া খান বাড়ি মসজিদ, রংমহল**

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৪
উপজেলা: ৫ টি
ইউনিয়ন: ৫২ টি
যে নদীর তীরে অবস্থিত: কংশ

দর্শনীয় স্থান: গজনী অবকাশ কেন্দ্র, মধুটিলা ইকোপার্ক, রাজার পাহাড় ও বাবেলাকোনা, নয়াবাড়ির টিলা

ভৌগোলিক পরিচিতি

শেরপুর জেলার ভৌগোলিক অবস্থান

শেরপুর জেলা পূর্ব পশ্চিমে ৮৯°- ৫০, পূর্ব দ্রাঘিমা হতে ৯০°- ১৫ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত। উত্তর দক্ষিণে ২৪°- ৫৫, উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৫°- ১৬ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত। অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমান এবং হিন্দুই প্রধান। তাছাড়া পাহাড়ী জনপদে আদিবাসী, গারো, খ্রিস্টানও রয়েছে।

নদী-খাল-বিল ও পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা শেরপুর এক সময় স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সীমার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছিল। আকাশ খুব পরিষ্কার থাকলে শহর থেকেই উত্তর আকাশে গাঢ় নীল রঙে আঁকা পাহাড়ের রেখা দেখা যেতো। এখনও শহর থেকে বের হয়ে উত্তর সীমান্তে অগ্রসর হতে থাকলে আকাশে পাহাড়ের গাঢ় নীল আবছায়া স্পষ্ট হতে থাকে। সেটাই গারো পাহাড়।

একদা শেরপুরের উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পাহাড়ী অঞ্চল ব্যতিরেকে সবটাই ছিল গভীর জঙ্গলে ঘেরা জলভূমি আর চরভূমি। ব্রহ্মপুত্র নদ বারবার তার গতি পরিবর্তন করে নতুন নতুন চর তৈরী করে শেরপুরের ভূ-প্রকৃতিকে পাল্টে দিয়েছে। এইসব চরভূমিগুলি ধীরে ধীরে বসতি অঞ্চল হয়ে শেরপুর পরগণার মধ্য, দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের জনবহুল গ্রাম ও শহর তৈরি করেছে। মোঘল আমলে চর-খাল বিলে পরিপূর্ণ এ অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্র তখন এত চওড়া ও খরস্রোতা ছিলো যে, সেই নদী পার হয়ে শেরপুর পৌঁছতে সময় লাগতো এক প্রহর বা তিন ঘন্টারও ওপর। আর এই নদী পারাপারের মাশুল ছিল দশ কাহন বা কড়ি। পুরনো দলিল দস্তাবেজে তাই এর উল্লেখ পাওয়া যায় দশকাহনিয়া বাজু (বিভাগ) হিসেবে।

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় ব্রহ্মপুত্র নদ জামালপুর থেকে শেরপুরের শেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাকৃতিক নিয়মেই ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রবাহ সরে যায় দক্ষিণের দিকে। কালক্রমে ব্রহ্মপুত্রের বুকে চর পড়ে লছমনপুর, চরপাড়া, চরশেরপুর, মুচারচর, বয়রা, শীতলপুরসহ অনেকগুলো জনপদ ব্রহ্মপুত্র তথা শেরী নদীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে। শেরপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের মৃগী নদী ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকারূপে প্রসারিত ছিলো। পরবর্তীকালের ইচলি বিল এই অববাহিকারই স্তব্ধ ভগ্নাংশ। বর্তমানে চর এলাকার কোন কোনটির নামের পরিবর্তন

Matrix BCS Series

ঘটেছে। পুরনো নাম হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন শহরের নবীনচরের নাম হয়েছে নবীনগর। চরশেরপুর, চরপক্ষীমারী, লছমনপুর, জঙ্গলদী ব্রহ্মপুত্রের এসব চরভূমি প্রায় তিনশত বছরের পুরনো। শেরপুরের উত্তরাংশে ছিল দুর্গম পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চল। পাহাড়ী এসব উপত্যকায় ছিলো আদিবাসী কোচ, গারো, হাজং, রাজবংশি, হদি, বানাই, বর্মনদের বাস। বন্যহাতি, বনমহিষ, বাঘ, ভল্লুকসহ নানা হিংস্র সব জীবজন্তুর আবাস ছিলো এসব অরণ্য রাজীতে। খ্রিস্ট্রীয় চতুর্দশ শতাব্দিতে শেরপুরের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে আদিবাসী সামন্তর পৃথক রাজত্ব কায়েম করেছিলো। গড়জড়িপা ছিলো তার অন্যতম। পঞ্চদশ শতাব্দির শেষভাগে সেসব সামন্তরাজের অবসান ঘটে।

বর্তমানে শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতী ও নালিতাবাড়ী উপজেলার ৪২ কি.মি, দীর্ঘ ভারত সীমান্তজুড়ে গাড়ো পাহাড়ের অবস্থান। লালমাটি আর পাথরের উঁচু-নীচু টিলার প্রাকৃতিক শাল-গজারীর পাশাপাশি একাশি, মিনজিরাম, কড়ই, সেগুন, মেহগনির বনবাগান সৃজন করা হয়েছে।

মানচিত্রে জেলা

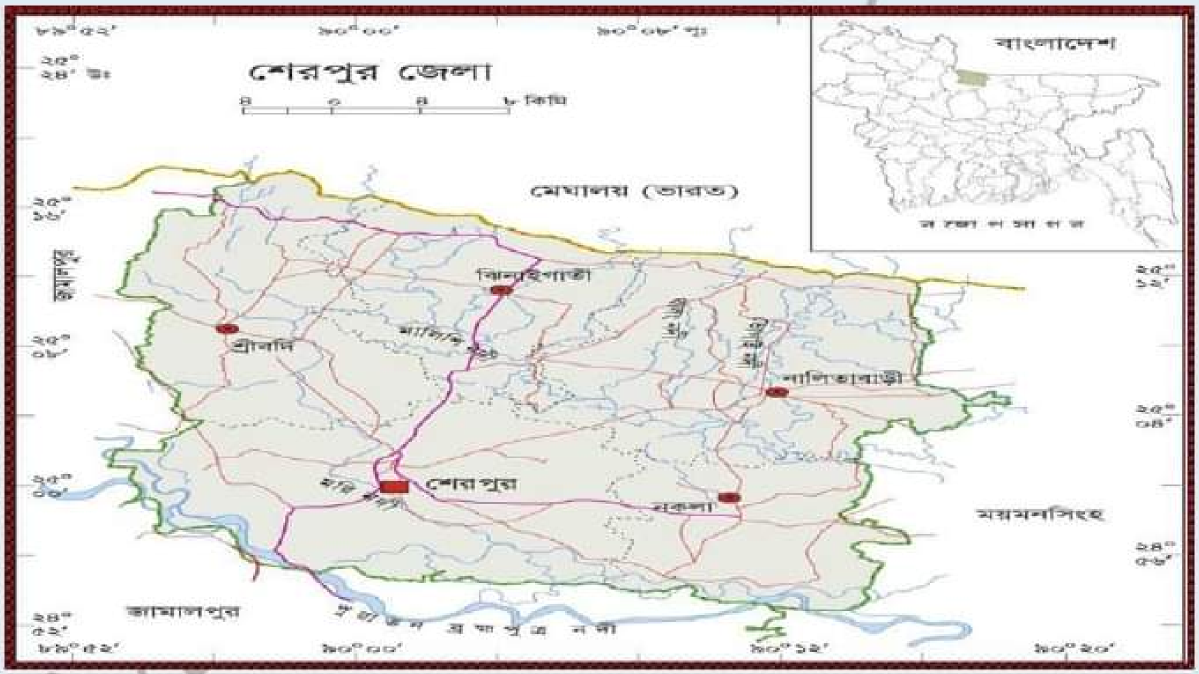

জেলার পটভূমি

শেরপুরের ঐতিহাসিক পটভূমি

শেরপুরের পূর্ব কথার কিছু উল্লেখ না করলে অনেক জানার বিষয় অজানাই থেকে যাবে। কাজেই অতি সংক্ষেপে তার বর্ণনা দেয়া হল। প্রাচীন কামরুপ রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের আদি নাম পাওয়া যায় না। তবে এ অঞ্চলের হিন্দু শাসক দলিপ সামন্তের রাজ্যের রাজধানী গড় জরিপার উল্লেখ আছে। সম্রাট আকবরের সময় এ অঞ্চলের নাম দশ কাহনীয়া বাজু বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। শেরপুর পৌরসভার দক্ষিণ সীমান্তে মৃগী নদী হতে জামালপুর ঘাট পর্যন্ত প্রায় ৮/৯ মাইল প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব নাম ছিল লৌহিত্য সাগর। নদের উভয় পাড়ের নিকটবর্তী লোকদের প্রায় সময়ই নৌকায় যাতায়াত করতে হত। তারা খেয়া ঘাটের ইজারাদারের সহিত যাতায়াত মাশুল হিসবে বাৎসরিক চুক্তি অনুযায়ী ১০ (দশ) কাহন কড়ি প্রদান করত। সে হিসেবেই এ অঞ্চলের নাম হয় দশকাহনীয়া। তৎকালে কড়ির মাধ্যমে বেচা-কেনা বা আর্থিক লেনদেন করা হত।

বাংলার নবাবী আমলে গাজী বংশের শেষ জমিদার শের আলী গাজী দশ কাহনিয়া অঞ্চল দখল করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। এই শেরআলী গাজীর নামে দশ কাহনিয়ার নাম হয় শেরপুর। তখনও শেরপুর রাজ্যের রাজধানী ছিল গড়জরিপা। বর্তমান গাজীর খামার ইউনিয়নের গিদ্দা পাড়ায় ফকির বাড়ীতে শের আলী গাজীর মাজার এবং নকলা উপজেলার রুনী গাঁয়ে গাজীর দরগাহ অবস্থিত। বৃটিশ আমলে এবং পাকিস্তান আমলে নাম হয় শেরপুর সার্কেল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শেরপুরকে ৬১ তম জেলা ঘোষণা করেন। কিন্তু রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে তা স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শেরপুরকে মহকুমা, ১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রপতি এরশাদ শেরপুরকে জেলায় উন্নীত করে জেলার ৫টি থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করেন। জমিদারী আমলে ১৮৬৯ সালে শেরপুর পৌরসভা স্থাপিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত শেরপুরবাসীর একটানা দীর্ঘ একশত বৎসরের সংগ্রামের ইতিহাস। এ সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হয়েছিল প্রজাদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং পরোক্ষভাবে অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ কল্পে। একসময় পাগল পন্থী নেতা টিপু পাগল শেরপুরের ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রই স্থাপন করেছিলেন। কংশ নদীর তীরবর্তী লেটির কান্দা গ্রামে এখন তাঁর বংশধররা পাগল বাড়িতে বসবাস করছে। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজারা প্রায় সময়ই আন্দোলনে লিপ্ত থাকত। আন্দোলনগুলোর মধ্যে ছিল বক্সারী বিদ্রোহ, প্রজা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ক্ষত্রিয় আন্দোলন।

ফকির বিদ্রোহঃ এতদঞ্চলে ফকির বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সোনাবানু ফকির। তার বংশধররা বর্তমানে গাজীরখামার গিদ্দাপাড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। শের আলী গাজী এদের আশ্রয়েই মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক জীবন কাটিয়েছেন।

Matrix BCS Series

টঙ্ক আন্দোলনঃ জমিদাররা প্রজাদের নিকট হতে একর প্রতি পাঁচ মণ ধান এবং নগদ ১৫ টাকা খাজনা আদায় করত। নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান উৎপাদিত না হলেও তা দিতে হতো। এ বিধান রহিত করার জন্য প্রজারা আন্দোলন করেছিল।

নানকার আন্দোলনঃ দরিদ্র প্রজারা জমিদারদের বাড়িতে শারীরিক পরিশ্রম করার পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ভোগদখল করত। পরিশ্রম করতে অক্ষম হলে জমিও ছেড়ে দিতে হত। জমিদারদের বিরুদ্ধে উক্ত টঙ্ক ও নানকার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন বাবু রবি নিয়োগী, খন্দকার মজিবর রহমান, জনাব আব্দুর রশিদ, ছফিল উদ্দীন প্রমুখ।

আদিস্থান আন্দোলনঃ শেরপুরের আদিবাসী উপজাতিদের উদ্যোগে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরাংশে গারো পাহাড় পর্যন্ত একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলের দাবীতে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আদিবাসী নেতা জলধর পাল এবং তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন সদস্য এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এ সমস্ত আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক সমস্যার বৈষম্য দূরীকরণ ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।

স্বাধীনতা আন্দোলনঃ ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন তৎসঙ্গে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। শেরপুরেও একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং পরিষদের কয়েকজন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আহ্বানে যুদ্ধ প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সর্ব প্রথম ১২ জন নির্ভীক বালক স্থানীয় আড়াই আনীন বাড়ীতে (বর্তমানে মহিলা কলেজ) সুবেদার আব্দুল হাকিমের কাছে অস্ত্র ধারণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। শেরপুর অঞ্চলের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব এড. আনিসুর রহমান (শেরপুর - শ্রীবরদী), জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আব্দুল হাকিম (নকলা-নালিতাবাড়ী), প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব নিজাম উদ্দীন আহমদ (শেরপুর), প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব আব্দুল হালিম (শ্রীবরদী)। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠকদের মধ্যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জনাব এড. আব্দুস সামাদ, জনাব মুহসীন আলী মাস্টার, বাবু

রবি নিয়োগী, জনাব আব্দুর রশিদ, জনাব আমজাদ আলী মাস্টার, জনাব এমদাদুল হক হীরা মিয়া, জনাব অধ্যাপক আবু তাহের, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক জনাব আমজাদ হোসেন, জনাব আবুল কাসেম, মোঃ হাবিবুর রহমান, নকলার অধ্যাপক মিজানুর রহমান, মোজাম্মেল হক মাস্টার এবং ডাঃ নাদেরুজ্জামান।

পল্লী অঞ্চল ও শহর অঞ্চলে মক্তব মাদ্রাসা, উচ্চ প্রাইমারি ও নিম্ন প্রাইমারি জুনিয়র মাদ্রাসা, মাইনর স্কুল, সাংস্কৃতিক টোল ছিল। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিলনা। শেরপুরের নয়আনী জমিদারদের উদ্যোগে সর্ব প্রথম একটি মধ্য ইংরেজী স্কুল স্থাপন করা হয়। ১৮৮৭ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব উপলক্ষে সে স্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয় এবং নাম রাখা হয় ভিক্টোরিয়া একাডেমী। আড়াই আনী ও পৌনে তিনআনী জমিদারদের উদ্যোগে ১৯১৮/১৯ সালে গোবিন্দ কুমার পিস মেমোরিয়াল (জি,কে,পি,এম) নামে আরও একটি স্কুল স্থাপিত হয়। নয়আনী জমিদার চারুচন্দ্র চৌধুরীর চারু প্রেস নামে একটি ছাপাখানা ছিল। এ চারু প্রেসেই মীর মোশারফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থটি প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। পাকিস্তান আমলে ১৯৪৯ সালে শেরপুর বালিকা বিদ্যালয়, ১৯৫৭ সালে সরকারী কৃষি প্রশিক্ষায়তন, ১৯৬৪ সালে শেরপুর কলেজ এর পরে এস.এম. মডেল স্কুল, প্রতি উপজেলায় হাইস্কুল, স্বাধীনতা উত্তরকালে শেরপুর মহিলা কলেজ, ডাঃ সেকান্দর আলী কলেজ, পলিটেকনিক স্কুল, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও শেরপুর জেলার প্রতি উপজেলাগুলোতেও অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শেরপুর তেরাবাজার জামিয়া সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসাটি জেলার বৃহত্তম কৌমী মাদ্রাসা। ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসার কারিকুলাম অনুসারে এতে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয়। প্রাচীন মসজিদগুলোর মধ্যে গড়জড়িপার বার দুয়ারী মসজিদ, মাইসাহেবার মসজিদ ও খরমপুর জামে মসজিদ দুটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ। দরবেশ মীর আব্দুল বাকীর সততায় মুগ্ধ হয়ে সুসঙ্গের মহারাজা তাকে মসজিদ সংলগ্ন ২৭ একর জমি দান করেছিলেন।

আব্দুল বাকীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী ছালেমুন নেছা মাই সাহেবার সময় তিনআনী জমিদার রাধা বল্লাভ চৌধুরী মসজিদের আট শতাংশ জমি বাদে সম্পূর্ণ জমিই জবর দখল করেন। শেরপুর শহরে আধ্যাত্মিক পাগল মমিন সাহেব একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন।

পক্ষান্তরে পৌনে তিনআনী জমিদার সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী শেরপুরের অবিসংবাদিত মুসলমান নেতা খান সাহেব আফছর আলী মিয়া সাহেবের মাধ্যমে খড়মপুর জামে মসজিদের নামে স্থানটুকু দান করেন। প্রাচীন তিনটি মন্দিরের মধ্যে একটি শ্রী শ্রী রঘুনাথ জিউর মন্দির আড়াই আনী বাড়ীর মহিলা কলেজ সংলগ্ন অপর দুটি যথাক্রমে শ্রী শ্রী মা ভবতারা মন্দির নয়আনী বাজারে এবং শ্রী শ্রী প্যারিমোহন মন্দির তিন আনী বাড়ীর শেরপুর কলেজ সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। শেরপুর রোটারী ক্লাব ও রেড ক্রিসেন্ট রোডে শনি মন্দিরটি অত্যন্ড় জাঁকজমকপূর্ণ মন্দির হিসেবে শেরপুরে পরিচিত।

শেরপুর পৌরসভার ঐতিহ্যবাহী ৪টি বাজার প্রতি সপ্তাহে বসত। সেগুলি ছিল নয়আনী বাজার, রঘুনাথ বাজার, তেরাবাজার ও তিনানী বাজার। পৌরসভার দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় শহরের বড় একটি পাট গুদাম ছিল।

ঐতিহ্যবাহী তথ্যজড়িত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে বর্তমান শেরপুর পৌর এলাকার পশ্চিমাংশে একটি গ্রামের নাম কসবা। এর আরবী মুল শব্দ কসবাহ এবং এর অর্থ শহর হতে ছোট কিন্তু গ্রামের মধ্যে বড় সমৃদ্ধশালী গ্রাম। মোগল আমলে বাঙ্গলার সুবেদার শাহজাদা সুজা এ কসবাতেই তার আঞ্চলিক প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। চারদিকে পরিখাবেষ্টিত মোগলবাড়ী, কাছারী পাড়া, তার পশ্চিমে কাঠগড়, তার উত্তর পশ্চিমে বিচারক কাজীদের বসতবাড়ী কাজী গলী, কাজী গলী মসজিদ, দরবেশ শাহ কামালের দরগাহ, ধোপা ঘাট, নাপিত বাড়ী নামের স্থানগুলোর মাধ্যমে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তারও আগে বার ভূঁইয়া নেতা ঈসা খান হাজরাদীর কোচ রাজা লক্ষণ হাজোকে পরাজিত করে হাজারাদী দখল করেন এবং ব্রহ্মপুত্রের উজান পথে দশকাহনীয়া বাজু বা বর্তমান শেরপুরে আরও দুটি দুর্গ নির্মাণ করেন। রাজা লক্ষণ হাজো তার লোক-লস্করদের নিয়ে ভারতের বিহার প্রদেশের উত্তর-পূর্বাংশে চলে যায় এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করে। তাদের নামেই এ অঞ্চলের নাম হয় কোচ বিহার। ঠিক সে সময়ই ঈশা খাঁর শক্তি বৃদ্ধির কাহিনী শুনে সম্রাট আকবর ঈশা খানকে দমন করার জন্য রাজপুত বীর সেনাপতি মানসিংহকে এ অঞ্চলে প্রেরণ করেন।

শেরপুর পৌর এলাকার উত্তরাংশে কালীগঞ্জে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ছিল। আসামের দক্ষিণাঞ্চল, পশ্চিমে দেওয়ানগঞ্জ হতে পূর্বে নেত্রকোনা পর্যন্ত বিচার কার্য ও শাসন সংরক্ষণ এ কেন্দ্র হতেই সম্পন্ন হত। এই কালীগঞ্জেই সেনানিবাস ছিল এবং নিকটস্থ মোবারকপুর গ্রামে কোদালঝাড়া নামক উঁচু টিলার উপর সামরিক কসরৎ পরিচালনা করা হত। জনশ্রুতি আছে যে, পার্শ্ববর্তী ইচলী বিল ও গড়জরিপার কালীদহ সাগর খননকালে শ্রমিকেরা এখানে একত্র হয়ে তাদের কোদালের মাটি ঝেড়ে ফেলত। তাতেই ঐ টিলাটির সৃষ্টি হয় এবং নামকরণ করা হয় কোদাল

Matrix BCS Series

ঝাড়া। কোদাল ঝাড়ার দক্ষিণে মীরগঞ্জে মৃগী নদীর পূর্ব তীরে থানা ছিল। পরবর্তীকালে থানা কার্যালয়টি শহরের পূর্ব দক্ষিণে স্থাপিত হয়। থানাঘাট নামটি এখনও রয়ে গেছে।

বৃটিশ আমলের শুরু থেকেই শেরপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ছিল। শেরপুরের অনেক উচ্চশিক্ষিত পন্ডিত ব্যক্তির মাধ্যমে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে শেরপুর পাক-ভারত বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাঁদের মধ্যে বাগরাকসার অধিবাসী চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লোখযোগ্য। শেরপুরের নাট্য সংগঠনগুলোও নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে প্রায় সব সময়ই লোকদের আনন্দ দিত।

খেলাধূলার দিক দিয়েও শেরপুর কোন সময়ই পিছিয়ে ছিল না। জনপ্রিয় খেলাধূলার মধ্যে ফুটবল ছিল পীঠস্থানে। তৎকালীন ফুটবল খেলোয়ারদের মধ্যে হযরত আলী মৃধা, মোহাম্মদ আলী, রাইচরণ সাহা, সৈয়দ আঃ খালেক, শামছুল গণি চৌধুরী, ঝন্টু মৈত্র, মজিবুর রহমান, টুরু মিয়া, কালা বল, ছানা বোস প্রমুখ অন্যতম। অন্যান্য খেলাধুলার মধ্যে বর্ষাকালে নৌকা বাইচ, খড়ায় ঘোড়ার দৌড়, বলদের দৌড়, হা-ডু-ডু, মহেলদার, বৌছির খেলা মহরমের সময় লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলায় মেতে উঠতো সর্বত্র।

বাজারদরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এক মণ ধানের দাম ছিল ১ টাকা। আনুপাতিক হারে অন্যান্য জিনিসের দামও খুবই কম ছিল। সরকারি প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টারের বেতন ছিল ১০ টাকা। মোগল আমলের স্থাপত্য শিল্পের নমুনা ধারণ করে ১৯৬৯ সালে শের আলী গাজী স্মরণে নির্মিত তোরণটি বহিরাগত মেহমানদের স্বাগত জানাবার জন্য স্থানীয় জি,কে পাইলট বিদ্যালয়ের পূর্ব দক্ষিণে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৩৯ সালে ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর পূর্বক্ষণে সম্ভবত এপ্রিল মাসে তৎকালীন ফরওয়ার্ড বকনেতা সুভাষ চন্দ্র বসু (যে ব-কের শ্লোগান ছিল জয় হিন্দ) শেরপুরে আগমন করেন। প্রথমে তিনি স্কুলের হলরুমে শিক্ষক-ছাত্র সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, পরে তৎকালীন মুনসেফ কোর্টের উকিল বারে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা ভাষায় স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত শেরপুরের সন্তান জিতেন সেন, সদ্য আন্দামান ফেরৎ রবি নিয়োগী, হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দের সহিত মত বিনিময় করেন।

পরবর্তীকালে খান সাহেব আফছর আলী মিয়া, তৎকালীন এম,এল,এ খান বাহাদুর ফজলুর রহমান, কামারেরচর কৃষাণ নেতা খুস মাহমুদ চৌধুরীর আহবানে কুসুমহাটিতে এক প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক, সিরাজগঞ্জের আসাদ উদ-দৌলা সিরাজী, ধনবাড়ীর নবাব হাসান আলী চৌধুরী, যশোরের অবিভক্ত বাঙ্গলার প্রাক্তন মন্ত্রী সৈয়দ নওশের আলী, কুষ্টিয়ার শামছুদ্দীন এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল মনসুর এ পথেই শেরপুর এসেছিলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্ত ফ্রন্ট ইলেকশনের সময় শেরে বাংলা এ,কে, ফললুল হক, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দী , মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং আইউব খানের শাসন আমলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ পথেই শেরপুরে পদার্পণ করেছিলেন।

Matrix BCS Series

জেলার ঐতিহ্য

ঘাগড়া খান বাড়ি মসজিদঃ নির্মাণকাল আনুমানিক ৬০০ বৎসর পূর্বে। কথিত আছে 'পালানো খা' ও 'জববার খা' দুই সহোদর কোন এক রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন। পরাজিত হয়ে ভ্রাতৃদ্বয় এই অরণ্যে আশ্রয় নেন এবং সেখানে এই মসজিদটি স্থাপন করেন। মসজিদটির বিশেষত্ব হল যে এর ইটগুলো চারকোণা টালির মত। আজ হতে ছয় থেকে সাতশত বৎসর পূর্বে এই ইটগুলির ব্যবহার ছিল। আস্তরণ বা পলেস্তার ঝিনুক চূর্ণ অথবা ঝিনুকের লালার সাথে সুড়কী, পাট বা তন্তু জাতীয় আঁশ ব্যবহার করেছে। এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির নির্মাণ কৌশল গ্রীক ও কোরিন থিয়ান রীতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। প্রবেশ পথের উপর রয়েছে আরবী ভাষায় নির্মাণকাল ও পরিচয় শিলা লিপি দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সেই যুগেও দক্ষ স্থপতি এ অঞ্চলে ছিল। মসজিদটি পুরাকীর্তির এক অনন্য নিদর্শন। যা দেখে যে কোন পর্যটক আকৃষ্ট হবেন, বিমোহিত হবেন।

মাই সাহেবা মসজিদঃ নির্মাণকাল আনুমানিক ২৫০ বৎসর পূর্বে। এটিও এ জেলার প্রাচীন নিদর্শনের একটি। বর্তমানে মসজিদটি আধুনিক ভাবধারায় পুনঃ নির্মাণ হয়েছে। বক্রাকারে খিলানের ব্যবহার এবং সুউচ্চ মীনার ২টি সত্যি দৃষ্টিনন্দিত। স্থাপত্য কলার আধুনিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এই মসজিদটিতে। এটি শেরপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে শেরপুর সরকারি কলেজর দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে অবস্থিত। শেরপুর শহরের প্রবেশের সময় এর মিনার দুইটি অনেক দূর থেকেও দেখা যায়। বিশাল এই মসজিদের সামনের অংশে অনেক জায়গা রয়েছে। এখানে প্রতি বছর ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। শেরপুর শহরে প্রবেশের পর যে কারো এই মসজিদটি দৃষ্টি কাড়বে।

গড়জরিপা বার দুয়ারী মসজিদঃ স্থাপত্য নিদর্শনের অন্যতম গড় জরিপা বার দুয়ারী মসজিদ। এটিও এ অঞ্চলের ঐতিহ্য। জনশ্রুতিতে আনুমানিক ৭-৮ শত বৎসর পূর্বে জরিপ শাহ নামক এক মুসলিম শাসক কতৃক নির্মিত হয়েছিল এই মসজিদটি। তবে এটি বর্তমানে পুনঃ নির্মাণ করা হয়েছে। আসল মসজিদটি ভূ-গর্ভেই রয়ে গেছে। তার উপরেই স্থাপিত

BCS Series

হয়েছে বর্তমান মসজিদটি। জামালপুর সদর উপজেলার তীতপল্লী ইউনিয়নের পিঙ্গলহাটী (কুতুবনগর) গ্রামের (ব্রাহ্মণ ঝি বিলের উত্তর পাড়ে) জনৈক পীর আজিজুল হক ছাহেব খনন কার্য চালান এবং বের করেন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। মসজিদটির ইটের ধরণ কৌশলে খান বাড়ী মসজিদের ইটের সাথে যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন রীতির সাথে আধুনিক রীতির সংমিশ্রণে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে যা সহজেই দর্শকদের মন জয় করে। অপরূপ সুন্দর এই মসজিদটি আসলে পুরাকীর্তির নিদর্শন। ১২টি দরজা থাকায় এর নামকরণ করা হয় বার দুয়ারী মসজিদ। পূর্বেও তাই ছিল। অপূর্ব কারুকাজ সম্বলিত মেহরাব ও কার্ণিশ গুলো সকলের দৃষ্টি কাড়ে। এছাড়াও কিছু দূরে জরিপ শাহ এর মাজার অবস্থিত। এর অনতিদূরে কালিদহ সাগর রয়েছে। জনশ্রুতিতে আছে চাঁন্দ সওদাগরের ডিঙ্গা এখানেই ডুবেছিল। নৌকার আদলে কিছু একটা অনুমান করা যায় এখনও। অঞ্চলটিতে একবার ঘুরে এলে যে কোন চিন্তাশীল মানুষকে ভাবিয়ে তুলবে। খনন কার্য চালালে হয়তো বেরিয়ে আসবে এ অঞ্চলের হাজার বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার নানা উপকরণ।

পৌনে তিন আনী জমিদার বাড়িঃ জমিদার সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী ও জ্ঞানে মোহন চৌধুরীর বাড়িকে বলা হত পৌনে তিন আনি জমিদার বাড়ি। গ্রীক স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত স্থাপত্যটি এখনো অক্ষত অবস্থার সাক্ষ্য বহন করছে জমিদারী আমলের। এ বাড়িটির নির্মাণ কাল গোপীনাথ মন্দির নির্মাণেরও অনেক পূর্বে। সুপ্রশস্ত বেদী প্রবেশ পথে অনেকগুলো ধাপ। প্রবেশদ্বারের দুই প্রান্তে অনেক গুলো অলংকৃত স্তম্ভ। গুলির নিচ থেকে উপর পর্যন্ত কারুকাজ খচিত নকশা। কার্ণিশেও বিভিন্ন প্রকারের মটিভ ব্যবহার করা হয়েছে। তা ভবনটিকে

অনেক আকর্ষণীয় করে তুলেছে। চার পাশের স্তম্ভগুলো চতুষ্কোণ বিশিষ্ট এবং এতে বর্গাকৃতি ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে। আস্তরণ ও পলেস্তারে চুন ও সুড়কীর ব্যবহার লক্ষণীয়। ছাদগুলিতে গতানুগতিক ভাবে লোহার রেলিং এর সাথে চুন সুড়কীর ঢালাই।

রং মহলঃ জমিদার বাড়ির ঠিক দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত রং মহল। যা দেখে সহজেই ধারণা করা যায় জমিদাররা ছিল সংস্কৃতি প্রিয়। নাচ-গানের প্রতি ছিল অনুরাগ। ফলে অনেক জমিদার বাড়িতেই রং মহল ছিল। উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি এই স্থাপত্যটিতে রয়েছে অনেক গুলো কাঠের জানালা। জানালার উপরে দর্শানীয় ভেন্টিলেশনের ব্যবহারও রয়েছে যা ইচ্ছা মত ব্যবহার করা য়ায়। এ ছাড়াও ছাদের নিচের অংশে কাঁচের ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা করা হয়েছে যা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো ও বাতাস প্রবেশ করতে পারে। সমস্ত ভবনটির গা জুড়ে বিভিন্ন রকমের নকশা ফুল, লতা-পাতা ও মটিভ ব্যবহার করা হয়েছে। কার্ণিশ ও কার্ণিশের নিচে রয়েছে অপরূপ নকশা। দক্ষিণ অংশটিতে অনেক কারু কাজের ব্যবহার। এ দিকটাই ভবনটির সম্মুখ অংশ। ছয়টি গোলাকৃতি স্তম্ভ ও দুই কোণায় দুইটি চার কোণা স্তম্ভ নিচ থেকে শেষ ভাগ পর্যন্ত নকশাখচিত। দক্ষিণ দিকের অংশের সম্মুখভাগে রয়েছে ৬টি গোলাকার স্তম্ভ। দুই কোণায় কোণাকৃতির স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়েছে ব্রক। স্তম্ভগুলির নিচে থেকে শেষ পর্যন্ত অলংকৃত। ছাদ এবং কার্নিশের উপরের অংশে পাঁচটি প্রধান ও অনেকগুলো মিনারাকৃতি গম্বুজ এর আদলে নকশা রয়েছে যা স্থাপত্যটিকে অধিক আকর্ষণীয় করেছে। কার্নিশেও বিভিন্ন ফর্মের ব্যবহার দেখা যায়।

গোপী নাথ ও অন্ন পূর্ন্না মন্দিরঃ নির্মাণকাল ১৭৮৩ খ্রিঃ। নির্মাতা জমিদার সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী ও জ্ঞানেন্দ্র মোহন চৌধুরী। মন্দিরটি স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন। পাঁচটি কক্ষ বিশিষ্ট মন্দিরটি পদ্মস্তম্ভ দ্বারা দন্ডায়মান। স্তম্ভ শীর্ষে ও কার্নিশে ফুল ও লতা পাতার নকশা সম্বলিত এক অপরূপ স্থাপত্য। ডরিক ও গ্রীক ভাবধারায় নির্মিত। বেদীর উপরে স্থাপিত অনেক গুলো ধাপে। জানালা গুলোর উপরেও রয়েছে অনেক অলংকার। দক্ষিণ ও পূর্ব পার্শ্বে উপরের কার্নিশে রাজকীয় মুকুটবিশিষ্ট তাজিয়া স্থাপন করা হয়েছে যা মৌর্য যুগের স্থাপত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

লোকনাথ মন্দির ও রঘুনাথ জিওর মন্দিরঃ এ মন্দিরের প্রতিমা গুলির একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট রয়েছে। এটাও বেদীর উপর স্থাপিত। দর্শনার্থীরা সহজেই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে। দেয়াল, কার্নিশ স্তম্ভগুলি ফুল, লতা, পাতার নকশা খচিত নানা রঙে রঞ্জিত করা হয়েছে। এটাও একটি দর্শনীয় প্রাচীন স্থাপত্য।

জিকে পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ঃ নির্মাণ কাল ১৯১৯ সাল। প্রতিষ্ঠাতা জমিদার গোবিন্দ কুমার চৌধুরী। বৃটিশ ধারায় নির্মিত প্রতিষ্ঠানটিতে অনেকগুলো পাঠদান কক্ষ, সুপ্রশস্ত জানালা রয়েছে। সমস্ত ভবন টিতে ফর্মের ব্যবহার এমন ভাবে করা হয়েছে যে, দৃষ্টি সকল স্থানেই সমান পড়ে। ইটের গাঁথুনি দিয়ে সমস্ত ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। এর সম্মুখভাগের পুকুরটি স্কুলের সৌন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি করেছে। এর পশ্চিম পাশে রয়েছে বিশাল সবুজের সমাহার। এটি শের আলী গাজি পৌর পার্কের পশ্চিম পাশে অবস্থান করছে। প্রাচীনতম স্থাপনার মধ্যে এটিও জনসাধারণকে মুগ্ধ করে।

বারোমারি গীর্জা ও মরিয়ম নগর গীর্জা দুটিই শেরপুর জেলার নানা ধর্মের ঐতিহ্য বহন করে। স্থাপত্য কলার অন্যতম নিদর্শন গীর্জা গুলির নির্মাণে অনেক কলা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। শেরপুর শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যতগুলি স্থাপত্য নির্মাণ হয়েছিল তার বেশীর ভাগই নির্মাণ হয়েছিল জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিংবা তাদের প্রয়োজনেই। যেমন বাস ভবন, রংমহল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা ভবনের মধ্যে শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমী ১৮৮৭ সালে জমিদার রায় বাহাদুর চারুঁ চৌধুরী কর্তৃক নির্মিত ভবনটি ছিল অনিন্দ্য সুন্দর যা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

পুরাকীর্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

শেরপুর জেলায় অনেক পুরাকীর্তি রয়েছে। এসব পুরাকীর্তি শেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। শেরপুর জেলার বিভিন্ন পুরাকীর্তির মধ্যে জমিদার গোবিন্দ চন্দ্র চৌধুরীর আমলে নির্মিত সিন্দুক, জমিদার আমলে নির্মিত সাজঘর, জমিদারে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা।

Matrix BCS Series

মুক্তিযুদ্ধে শেরপুর

১৯৪৭ সালের বৃটিশ ভারত হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান নামক দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে বৃটিশ শাসন মুক্ত হয়। তন্মধ্যে পাকিস্তান আবার প্রায় বার শত মাইলের ব্যবধানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পাঞ্জাবী শাসক গোষ্ঠী উভয় অঞ্চলেই তাদের আধিপত্য বিস্তার করে রাখে। ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রায় ২৪ বৎসর কাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত এবং অবহেলিত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ শতকরা ৯১ ভাগ ভোট পেয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অপর দিকে তৎকালীন শাসক ইয়াহিয়া খান বাঙ্গালী নিধনযজ্ঞে মেতে উঠে। এই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের আহবান জানান। সেই আন্দোলনে শেরপুরবাসী যে ভূমিকা পালন করে তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

২৫ মার্চ কালো রাতে ঢাকায় নৃশংস হত্যাকান্ডের খবর শুনে জনতা ২৬ মার্চ সকালে শহরের নিউমার্কেট মোড়ে সমবেত হয়। এ সময় শত্রুকে মোকাবেলা করার জন্য সুদৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। তাদের বক্তব্যে ভীতবিহ্বল ও শোকাহত জনতা দুর্জয় শপথে উজ্জীবিত হয়ে উঠে। উদ্বেলিত জনতা 'বীর বাঙ্গালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' শ্লোগানে প্রকম্পিত করে তোলে চারিদিক।

২৭ মার্চ শনিবার। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের বৈঠক বসে। আলোচনা হতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় নকশী ইপিআর ক্যাম্পসহ আশেপাশের ইপিআর ক্যাম্পগুলোতে চলছিল চরম উত্তেজনা। ঢাকায় নৃশংস হত্যাকান্ডের খবর শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এলাকার সাধারণ মানুষ। তারা পাঞ্জাবী ইপিআর সদস্যদের তাদের হাতে তুলে দেয়ার আহ্বান জানান। তখন নকশী ইপিআর ক্যাম্পের সুবেদার ছিলেন আব্দুল হাকিম। তিনি প্রথমে মোট ২২ জন পাঞ্জাবী ইপিআর সদস্যকে ক্যাম্পের মসজিদে আটকে রাখেন। শেষ পর্যন্ত নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতে পেরে এদের বিচারের ভার তুলে দেন জনতার আদালতে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদের ঘন জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে অবশ্য ২ জন ইপিআর সদস্য পালিয়ে যায়। এদের এক জন গারোকোণা এলাকায় জনতার হাতে ধরা পড়ে মৃত্যুবরণ করে অপরজনের আর খোঁজ পাওয়া যায় নি। এরপরই সুবেদার হাকিমকে নিয়ে গড়ে তোলা হয় ইপিআর পুলিশ, মুজাহিদ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সমন্বয়ে সম্মিলিত প্রতিরোধ বাহিনী।

Matrix BCS Series

একইভাবে অন্যান্য থানা গুলোতেও অস্ত্রসহ পালিয়ে আসা ইপিআর সদস্যরা ছাত্র ও যুব সমাজকে প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে থাকেন।
১লা এপ্রিল, ১৯৭১। ভারত সীমানার কাছাকাছি ঝিনাইগাতীর রাংটিয়া কুম্ভিপাতার ক্যাম্পে স্থাপন করা হয় প্রশিক্ষণ শিবির। এ শিবিরে প্রথম ব্যাচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন শেরপুরের ১২ জন নির্ভীক যুবক। এরা হলেন মুমিনুল হক, মোঃ হযরত আলী হজু, আব্দুল ওয়াদুদ অদু, ফরিদুর রহমান ফরিদ, মোকসেদুর রহমান হিমু, কর্ণেল আরিফ, মাসুদ মিয়া, এমদাদুল হক নীলু, হাবিবুর রহমান ফনু, আশরাফ আলী আসাদ, শাহ তালাপতুপ হোসেন মঞ্জু, ইয়াকুব।

এপ্রিলের ১ম সপ্তাহেই প্রতিবেশী দেশ ভারতের কাছ থেকে সৌজন্যমূলক অস্ত্র পাওয়া যায়। সশস্ত্র বাহিনীর তত্ত্বধানে সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এসব অস্ত্র হস্তান্তর করা হয় মধুপুরে পাকবাহিনীর অগ্রযাত্রারোধে গঠিত প্রতিরোধ বাহিনীর কাছে। পাশাপাশি সুবেদার হাকিমের নেতৃত্বে ইপিআর, পুলিশ, আনসার মুজাহিদদের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ একটি দলকে পাঠানো হয় মধুপুরে। এদিকে একের পর এক খবর আসতে থাকে প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙ্গে পড়ার। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে আসে শেরপুর, নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতীতে। সংগ্রাম পরিষদের লোকজন এসব মানুষের জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আশ্রয়কেন্দ্র খোলেন। তখন কেন্দ্রটির তদারকির দায়িত্ব পড়েছিল আব্দুল মোতালেবের উপর (পরবর্তী কালে শহীদ)। থানা এলাকাগুলোতেও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়।

১৫ এপ্রিল, ১৯৭১। মধুপুরের প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙ্গে পড়ে। তাই এটিকে সরিয়ে এনে প্রথমে জামালপুরের দিগপাইতে ও পরে শেরপুরের চরাঞ্চলে স্থাপন করা হয়। ২০ এপ্রিল, হানাদার বাহিনী হেলিকপ্টার থেকে মারাত্মকভাবে প্রতিরোধ বাহিনীর উপর শেলিং করে। এতে ১৩ জন সামরিক, বেসামরিক ব্যক্তি হতাহত হয়। সারা শেরপুরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শহরের আবাস ছেড়ে লোকজন পালিয়ে যেতে থাকে গ্রামে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে নেতৃবৃন্দ। কেননা যারা ভারত যেতে চাচ্ছে, তাদেরকে বাধা প্রদান করছে পাকিস্তানের পদলেহনকারী দালালরা। এমন সময় সুবেদার হাকিম শেরপুরে এলেন। তিনি যারা দেশত্যাগ করছে, তাদের নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিলেন। মাইকযোগে এ ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর ২২ এপ্রিল, ভোর ৫ টা থেকে মুক্তিকামী শেরপুরবাসী ভারত অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। ২৭ টি বাস- ট্রাক যোগে শুরু হওয়া এ যাত্রা ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে ।

২৬ এপ্রিল ১৯৭১। পাক হানাদার বাহিনী গুলি করতে করতে শেরপুর শহরে প্রবেশ করে। অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও হত্যার মাধ্যমে শেরপুর দখলে নিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করে নয়ানী জমিদার বাড়িতে (বর্তমানে জেলা প্রশাসকের অফিস)। এদিকে শহীদ হন মোস্তফা ও বুলবুল নামের ২ জন ছাত্র। শহীদ হন রুটি বিক্রেতা আহমদ আলী, শনি বিগ্রহ মন্দিরের পুরোহিত সুব্রত ভট্টাচার্যসহ নাম না জানা অনেকে। এছাড়াও ঐ একই দিনে হানাদার বাহিনী ঝাউগড়া গ্রামে হানা দিয়ে শহর থেকে আসা আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যবসায়ী চৌথমল কারুয়া, নিপু সাহা, মহেন্দ্র দে সহ ৮ জনকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এক সপ্তাহের মধ্যেই

Matrix BCS Series

হানাদার বাহিনীরা প্রতিটি থানা সদরসহ সীমান্ত চৌকিগুলোতে শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করে। ঝিনাইগাতীর আহমদ নগর ছিল পাক হানাদারদের সেক্টর, হেডকোয়ার্টার। ১১ নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাগণ ভারতে তুরা, মহেন্দ্রগঞ্জ, ডালু, ট্রেনিং শেষে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাক হানাদার বাহিনীরা কিছু কিছু জায়গায় গণহত্যায় মেতে উঠে। যথাক্রমে জগৎপুর গণহত্যা, নাকুগাও ডালু গণহত্যা, সোহাগপুর গণহত্যা, নকশী যুদ্ধ ও গণহত্যা, নারায়ন খোলা যুদ্ধ ও গণহত্যা, সর্বশেষে ২৪ শে নভেম্বর শেরপুর সদর উপজেলায় সূর্যদীর গণহত্যায় মুক্তিযোদ্ধা ও অনেক বেসামরিক জনগণ শহীদ হন ।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ৯ মাসে শেরপুরের বিভিন্ন স্থানে নিম্মোক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ শহীদ হন।

শেরপুর সদর উপজেলায়ঃ

১। নাজমুল হোসেন বুলবুল ২। আশরাফুল আলম ৩। তালেব আলী ৪। আফছর আলী ৫। গোলাম মোস্তফা ৬। আক্তার হোসেন ৭। কামাল উদ্দিন ৮। আব্দুল্লাহ আবু মোতালেব

নকলা উপজেলায়ঃ

১। আকবর আলী ২। ইয়াদ আলী ৩। সুরুজ্জামান (ডাকাতিয়াকান্দা) ৪। জামাল উদ্দিন ৫। আব্দুর রশীদ ৬। সুরুজ্জামান (লয়খা) ৭। জমশেদ আলী ৮। হযরত আলী ৯। ইদ্রিস আলী ১০। হাসমত আলী ১১। সুলতান মিয়া ১২। সিরাজুল ইসলাম (মঞ্জু) ১৩। ছাইয়েদুর রহমান ১৪। আনোয়ারুল হক ১৫। আজিজুল হক ১৬। ওয়াহেদ আলী ১৭। দুলাল উদ্দিন।

শ্রীবরদী উপজেলায়ঃ

১। নুর ইসলাম ২। আঃ হামিদ ৩। ইসমাইল হোসেন ৪। তৈয়বুর রহমান ৫। শাহ জাহান ৬। আব্দুল বারেক ৭। সোনা মিয়া ৮। শফি উদ্দিন ৯। আব্দুল কাদের ১০। হযরত আলী ১১। তোজাম্মেল হোসেন ১২। আব্দুছ ছালাম ১৩। আব্দুল জববার ১৪। সাজ উদ্দিন ১৫। আঃ আওয়াল ১৬। শাহ মোতাসীম বিল্লাহ খুররম বীর বিক্রম ।

নালিতাবাড়ী উপজেলাঃ

১। শামছুল ইসলাম ২। নূর মোহাম্মদ ৩। আলতাফ হোসেন ৪। চাঁন মিয়া ৫। ডাঃ খালেক ৬। মফিজ উদ্দিন ৭। জসিম উদ্দিন ৮। আলাউদ্দিন ৯। ইছব আলী ১০। আফছার আলী ১১। এন. এম. নাজমুল আহসান ১২। আনোয়ার আলী ।

ঝিনাইগাতী উপজেলায়ঃ

১। ছাইফুর রহমান ২। রফিকুল ইসলাম ৩। আলফাজ উদ্দিন ৪। নুর মোহাম্মদ ৫। পরিমল চন্দ্র দে ৬। মোফাজ্জল হোসেন

Matrix BCS Series

মুক্ত শেরপুরঃ

মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনী যৌথ নেতৃত্বে পাকহানাদারদের দখল হতে শেরপুর জেলা মুক্ত হয় ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১। গৌরব গাঁথা সে দিনটির কথা শেরপুরবাসীর স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে আজও। এইদিনে একদিকে বিজয়ের অনাবিল আনন্দ, অপরদিকে স্বজনহারাদের আহাজারি এর মাঝে শহরের শহীদ দারোগ আলী পৌর পার্কে হেলিকপ্টার যোগে অবতরণ করেছিল ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জগজিৎ সিং অরোরা। এখানে দাঁড়িয়েই তিনি বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, মস্কো, আকাশবাণী সহ বিভিন্ন বেতার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আগামী ৭ দিনের মধ্যে ঢাকা মুক্ত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। তাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এ দিনটি শেরপুর জেলার আপামর জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যময়, গৌরবোজ্জ্বল ও অবিস্মরণীয় দিন। স্বাধীনতা যুদ্ধের দীর্ঘ ৯ মাস জেলার বর্তমান ৫টি উপজেলার ৩০/৪০টি এলাকায় ছোট বড় যুদ্ধ হয়েছে। পাক হানাদারদের নির্মমতার শিকার হয়ে শহীদ হয়েছেন অসংখ্য নিরীহ মানুষ। মূলতঃ নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই এ জেলার শত্রু সেনাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে থাকে ।

৩ ডিসেম্বর শ্রীবরদী, নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতী সীমান্ত ঘাঁটিতে মুক্তিবাহিনী, মিত্র বাহিনীর যৌথ আক্রমণে হানাদাররা দিশেহারা হয়ে পড়ে। তারা তাদের ঘাঁটিগুলোতে রাজাকার-আলবদরদের রেখে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করে জামালপুরের দিকে। তাই অনেকটা বিনা বাধায় ঝিনাইগাতী ৪ ডিসেম্বর, শ্রীবরদী ৬ ডিসেম্বর মুক্ত হয়। টানা ২ দিন যুদ্ধের পর ৭ ডিসেম্বর ও একই দিনে বীর মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়ী বেশে শেরপুর প্রবেশ করে। আরও ১দিন পর ৮ ডিসেম্বর প্রবেশ করে নকলায়। সবার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে সূর্যের আলো। শেরপুর মুক্ত, শেরপুর স্বাধীন। শত শত মুক্তিযোদ্ধার সে কী আনন্দ নৃত্য। স্বাধীনতা যুদ্ধে অনন্য অবদানের জন্য এ জেলার ১ জন বীর বীরবিক্রম, ২ জন বীর প্রতীক উপাধি পেয়েছেন। এরা হলেন, 'শহীদ শাহ মোতাসীম বিল্লাহ খুররম বীর বিক্রম', 'কমান্ডার জহুরুল হক মুন্সি বীর প্রতীক' ও ডাঃ মাহমুদুর রহমান বীর প্রতীক। এ তিন বীর সন্তানই শ্রীবরদী উপজেলার বাসিন্দা।

প্রাকৃতিক সম্পদ

শেরপুর জেলা বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কৃষিজ উৎপাদন, সস্তা শ্রম, ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ - এর উপর ভিত্তি করে শেরপুর জেলাকে বাংলাদেশের একটি অন্যতম সমৃদ্ধ জেলায় পরিণত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাসহ সরকারের সকল কার্যক্রমকে সফল করতে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকতা অত্যন্ত প্রয়োজন।

শেরপুরের সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সম্পদ চিনামাটি বিদেশে রপ্তানী করে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। দেশে যেসব খনিজ সম্পদ রয়েছে তার মধ্যে সিরামিক বা সাদামাটি অন্যতম। জেলার ঝিনাইগাতী ও শ্রীবরদীর পাহাড়ী অঞ্চলে পাওয়া যায় অত্যন্ত মূল্যবান খনিজ পাথর, সাদা মাটি , নুড়ি ও সিলিকা বালি দিয়ে তৈরি বিভিন্ন কাঁচামাল যা বিদেশে রপ্তানি করে বছরে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। শেরপুরের

Matrix BCS Series

পাহাড়ী অঞ্চলে যে সাদা মাটি বা চীনামাটি পাওয়া যায় তা দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে উন্নত জাতের প্লেট,থালা,বাটি জাতীয় সামগ্রী ছাড়াও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম । ইতিপূর্বে বাংলাদেশ ভূ-তত্ত্ব জরিপ দপ্তর (জিএসবি) এক জরিপ চালিয়ে এখানে পর্যাপ্ত পরিমানে সাদা মাটির মজুদ পান।

১৯৯০ সালে ঝিনাইগাতী ও শ্রীবরদীর পাহাড়ী অঞ্চলের সাদা মাটি পরীক্ষা করা হয়। এ মাটি কেওলিন জাতীয় সিরামিক সামগ্রী তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। সরকারিভাবে উত্তোলন করে থালা-বাসন তৈরি ছাড়াও রাবার, সিমেন্ট, কাগজ, ইনসুলেটর বা বৈদ্যুতিক সামগ্রীতে ব্যবহার করে বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। এখানকার সাদামাটি দেখতে হালকা ধূসর অথবা হালকা বাদামী। এতে এসব কারখানায় তৈরি তৈজসপত্র দেশের চাহিদা মেটানো ছাড়াও বিদেশে রপ্তানী করে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় সম্ভব এবং শেরপুরের লাখ লাখ শ্রমিকেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। শেরপুরের পাহাড়ী অঞ্চলসমূহে এ শিল্পের পর্যাপ্ত কাঁচামাল অর্থাৎ কেওলিন জাতীয় সাদা মাটির বিপুল পরিমাণ মজুদ রয়েছে। ১৯৯০ সালের ভু-জরিপ মতে শেরপুর জেলার পাহাড়ী এলাকায় সাদা মাটির সন্ধান মেলে। যার দৈর্ঘ্য ২ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ২ মিটার লেন্স আকারে ছড়ানো। মজুদের পরিমাণ প্রায় ১৩ হাজার টনের মতো। এ মাটি সাধারণতঃ দেখতে হালকা ধূসর বর্ণের, কিছুটা হালকা বাদামী- সাদা বর্ণের। এতে এ্যালুমিনিয়াম (হি-২.৩) পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ থেকে ৩০ভাগ। অনুরুপ সাদামাটি ঝিনাইগাতী উপজেলার তাওয়াকুচা গজনী এবং পার্শ্ববর্তী শ্রীবরদীর পাহাড়ী অঞ্চলেও বিদ্যমান।

নদ-নদী

উল্লেখযোগ্য নদ-নদী

ব্রহ্মপুত্রঃ হিমালয়ের মানস সরোবর থেকে ব্রহ্মপুত্র নদটি চীন ও ভারত হয়ে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে নদটি যমুনা নাম ধারণ করে প্রধান অংশ জামালপুর ও সিরাজগঞ্জ হয়ে চলে যায় এবং জামালপুরের ইসলামপুর ও দেওয়ানগঞ্জ হয়ে এই নদের বাকি অংশ শেরপুর-জামালপুর সীমারেখায় প্রবাহমান হয়ে এই নদ ময়মনসিংহ হয়ে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করে

Matrix BCS Series

কংশ: ভারতের তুরা পাহাড়ে বিভিন্ন ঝর্ণার সম্মিলনে কংশ নদীর উৎপত্তি। শেরপুরের হাতিবাগার এলাকা দিয়ে কংশ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

ভোগাই: ভারতের তুরা পাহাড়ে বিভিন্ন ঝর্ণার সম্মিলনে কংশ নদীর উৎপত্তি। শেরপুরের হাতিবাগার এলাকা দিয়ে কংশ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। উৎপত্তিস্থল থেকে শেরপুরের নালিতাবাড়ী পর্যন্ত এ নদীটির নাম ভোগাই। নালিতাবাড়ীর ৫ মাইল ভাটিতে এসে দিংঘানা, চেল্লাখালী, দেওদিয়া মারিসি, মালিঝি নামে উপনদীগুলো ভোগাইয়ের সাথে মিলিত হয়েছে। ভোগাই সে স্থানে বেশ খরস্রোতা বলে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে ফুলপুরের কাছাকাছি এসে

খড়িয়া নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এছাড়াও শেরপুর জেলার মধ্যে রয়েছে মালিঝি, সোমেশ্বরী, নিতাই, মহারশি প্রভৃতি নদী।

Matrix BCS

Facebook Page: Matrix BCS Series

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

১ম ধাপের মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলা পরিচিতি

Facebook Page: Matrix BCS Series

মাগুরা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর নং: ৮

সেক্টর কমান্ডার:

- মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (জুলাই পর্যন্ত)
- মেজর আবুল মঞ্জুর (আগস্ট-ডিসেম্বর)

উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা:

- আব্দুল মোতালেব বীরউত্তম
- মো. জালাল উদ্দীন বীরউত্তম

কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি:

- কবি ফররুখ আহমদ
- ডাঃ লুৎফর রহমান
- সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শহীদ সিরাজউদ্দিন হোসেন
- সৈয়দ আলী আহসান
- কবি কাদের নেওয়াজ
- সৈয়েদা সুফিয়া খাতুন (সাহিত্য রত্ন)
- শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

Matrix B

নির্দেশ দেন। তিনি বেশ ক'টি পুকুর খনন করে মাগুরা সদর উচু করে এরপর এস.ডি.ও হাতদেন মহকুমা ভবন তৈরীর কাজে। প্রথম প্রশাসনিক ভবনটি বর্তমানে পুলিশ সুপার মাগুরার কার্যালয় সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। ভবনটি দৈর্ঘ ১২৩ হাত ও প্রস্থ বারান্দাসহ ১৮ হাত এবং দক্ষণমুখী অবস্থায় ছিল। এই অফিসের আশেপাশের জায়গায় গড়ে উঠে মহাকুমা শহর। পরবর্তিতে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে পাক সরকার কর্তৃক মহকুমা প্রশাসক মোঃ ফজলুল হাসান ইউসুফ সি.এস.পি সাহেবের সময় ১৯৬৮ সালে কলেজ রোডের পূর্ব পার্শ্বে বর্তমান স্থানে মহকুমা প্রশাসকের অফিসটি স্থানমন্তরিত ও পুনঃস্থাপিত হয়।

স্থানামন্তরের প্রায় তিন দশকের অধিককাল সাবেক মহকুমা অফিসটি পুরাতন কোর্ট বিল্ডিং নামে পরিচয় নিয়ে অতীত স্মৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিত। দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত এই অফিস ভবনে একাধিক অফিসের কাজ চলত। পুলিশ সুপারের অফিস ভবন নির্মানের সময় মহকুমা প্রশাসকের এ অফিস ভেঙ্গে ফেলা হয়। ১৯৮৪ সাল পর্যমন্ত এ একতলা ভবনটিতে সকল মহকুমা প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো এবং ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ মাগুরা মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করার পর মহকুমা প্রশাসকের এই অফিসটিই জেলা প্রশাসকের অফিসে পরিনত হয়।

পরবর্তিতে ১৯৯৮ সালে পুরাতন অফিস ভবনের সামনে জেলা প্রশাসকের অফিস ভবনের কাজশুরম্ন হয়। ২০০২ সালে নতুন ভবন নির্মিত হলে প্রশাসনের কার্যক্রম নতুন তিনতলা ভবনে স্থানামন্তরিত হয় এবং প্রশাসনের সকল কার্যক্রম বর্তমানে এখান থেকেই পরিচালিত হচ্ছে। নামকরণের ইতিহাস মাগুরার নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। "খুলনা শহরের আদিপর্ব" গ্রন্থের লেখক ঐতিহাসিক আবুল কালাম সামসুদ্দিনের মতে, মরা গাঙ থেকে মাগুরা নামের উৎপত্তি। মরা গাঙ আঞ্চলিক ভাষায় মরগা বলে প্রচলিত। অনেকের মতে ধর্মদাস নামক জনৈক মগ জলদস্যু মাগুরার পার্শ্ববর্তী মধুমতি নদী সংলগ্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করে। মগদের অত্যাচারে এলাকার লোকজন অতিষ্ট হয়ে পড়ে এবং তারা বিতাড়িত হয়। সেই মগ ও মরগা থেকে 'মাগুরা' নামের উৎপত্তি। তবে এখনও জনশ্রুতি প্রচলিত যে, মাগুরার খাল বিলে এক কালে প্রচুর মাগুর মাছ পাওয়া যেত। আর সেই মাগুর মাছের প্রসিদ্ধি থেকে "মাগুরা" নামকরণ হয়েছে।

Matrix BCS Series

সংসদীয় আসন: ২টি

৯১	মাগুরা - ১	মোঃ সাইফুজ্জামান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৯২	মাগুরা - ২	শ্রী বীরেন শিকদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৪

উপজেলা: ৪টি

ইউনিয়ন: ৩৬টি

যে নদীর তীরে অবস্থিত: কুমার ও মধুমতি

দর্শনীয় স্থান: রাজা সীতারামের রাজপ্রাসাদ, গড়াই সেতু

মাগুরা জেলার পটভূমি

মাগুরা জেলা প্রশাসনের পটভূমিগঙ্গার প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গরাষ্টে সভ্যতা বিস্তৃত হয়। ক্রমে ক্রমে মিথিলা, পৌন্ড্রবর্ধন ও বঙ্গ প্রভৃতি দেশে আর্যগণের উপনিবেশ স্থাপিত হতে থাকে। আজকের মাগুরা জেলা যে সীমানা নিয়ে গড়ে ওঠেছে তার পিছনে ভাগিরথী ও পদ্মার বিভিন্ন শাখা বা প্রশাখা ভাঙ্গা গড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে। সাবেক ও বর্তমানে মধুমতি/গড়াই, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা, ফটকি/যদুখালী, হানু, মুচিখালী ও ব্যাঙ নদী বিধৌত এই মাগুরা জেলা। মুচিখালী ও গড়াই সঙ্গম স্থলে নবগঙ্গা তীরে ঝিনাইদহ হতে সতেরো মাইল পূর্বে মাগুরা। প্রাচীন বুড়োল দ্বীপ ও গঙ্গা দ্বীপের অধীন এই ভূ-খন্ডটি বিজয় সেনের আমলে বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যুষিত এলাকা ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে কুমার নদীর মোহনায় মাগুরা জেলার প্রথম জন বসতি শুরু হয়েছিল। ভারত বর্ষে বাংলা প্রদেশে পরীক্ষামূলকভাবে ১৭৮১ সালে প্রথম জেলা হিসেবে যশোরকে ঘোষণা করা হয়। মাগুরা তখন যশোর জেলার অন্তর্গত ছিল। মহকুমা স্থাপনের আগে মাগুরা খ্যাত ছিল না। রেনেলম্যাপে মাগুরা বড় অক্ষেচিহ্নিত। অতীতের নথিপত্রে কোথাও মাগুরার উজ্জলতার চিহ্ন দেখা যায়না। নদীর সঙ্গমস্থল মাগুরা ছিল অপরাধের জন্য উপযুক্ত স্থান। এই অঞ্চলে এক সময় মগ জলদস্যুদের উৎপাতে জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। আর তাই এ সমস্ত দস্যু, তস্করদের হাত থেকে সাধারণ জনগণকে রক্ষার্থে, প্রকৃতপক্ষে খ্যাতির জন্য নয়, ডাকাতির মত অপরাধ দমনের ব্যবস্থা নিতে মহকুমা স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। ঐ সময় মাগুরাতে কোন থানাও ছিল না। মহকুমা স্থাপনকালে প্রথমে পুলিশফাঁড়ি ও পরে থানা স্থাপন করা হয়। ১৮৪৫ সালে মাগুরা মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হলেও মাগুরা সদরে থানা স্থাপিত হয় আরও অনেক পরে, ১৮৭৫ সালের ১৬ নভেম্বর। অবশ্য এর আগে ১৮৬৭ সালে শালিখা, ১৮৭৯ সালের ২৮ শে জানুয়ারি শ্রীপুর এবং ১৮৬৯ সালের ২৪ নভেম্বর মহম্মদপুর থানা স্থাপিত হয়। এই চারটি থানা নিয়ে প্রায় ১৪০ বছর মাগুরা যশোর জেলার মহকুমা হিসেবে বজায় থাকে।

মাগুরা মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মিঃ কর্কবার্ণ ছিলেন প্রথম মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। মাগুরা নিচু এলাকা থাকায় সহসাই জলমগ্ন হয়ে পড়ত। সামান্য উচু এলাকার এক অংশে হাট বসত এবং বাকী অংশে ছিল গ্রাম। কর্কবার্ণ গ্রামবসীদের উচ্ছেদ করে অন্যত্র হাট বসানোর

মানচিত্রে জেলা

মাগুরা জেলা মাগুরা ২৩ ডিগ্রী ২৯ মিনিট উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯ ডিগ্রী ২৬ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। জেলার উত্তরে ফরিদপুর, দক্ষিণে যশোর, পূর্বে নড়াইলও ফরিদপুর জেলা এবং পশ্চিমে ঝিনাইদহ জেলা। মাগুরা জেলা সমুদ্র সমতল হতে ২৬ ফুট উচ্চে অবস্থিত। জেলা মোট আয়তন ১০৩০.৫৮ বর্গ কি: মি:। জনসংখ্যার ঘনত্ব ৭৮৭ জন প্রতিবর্গ কিলোমিটার

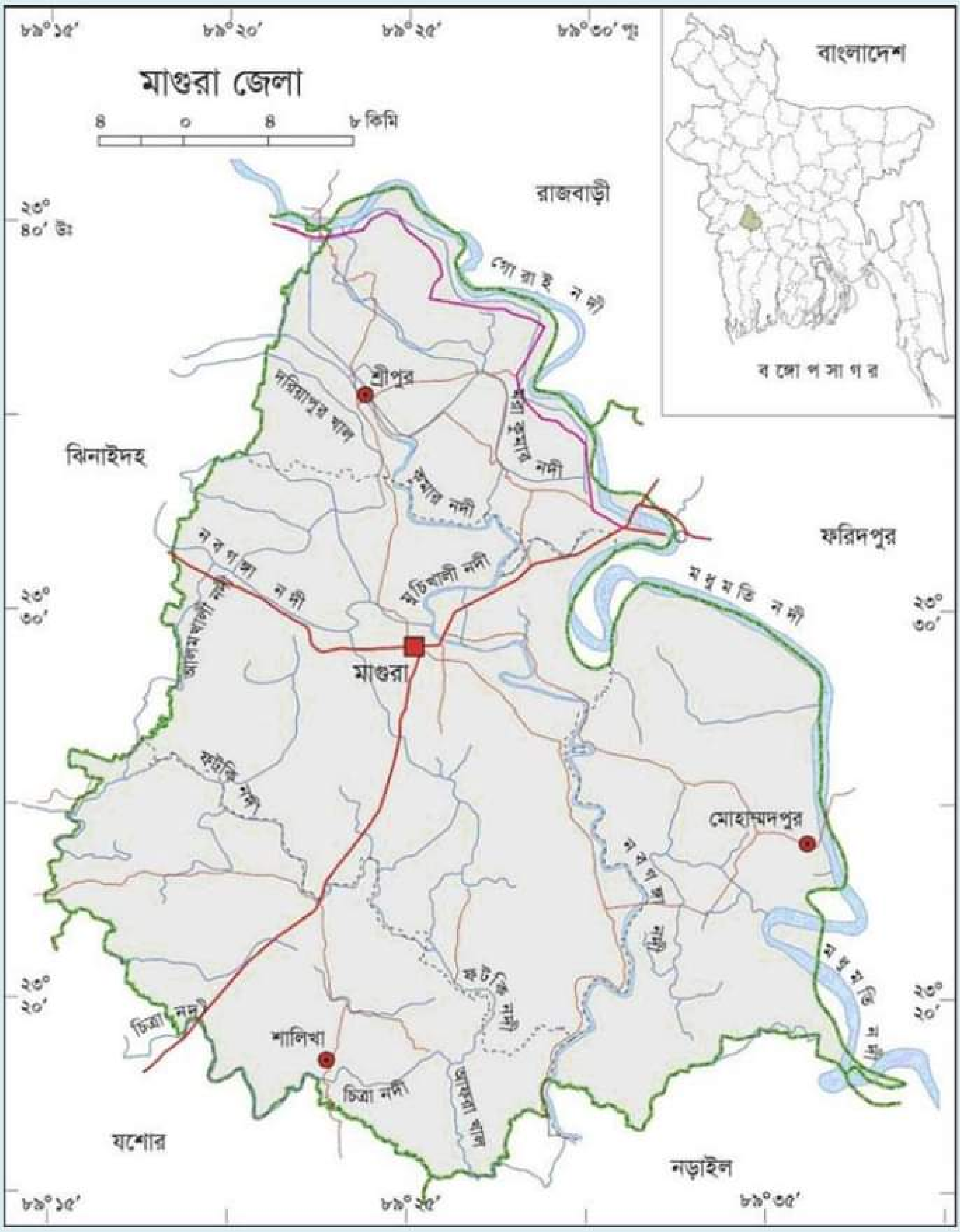

পুরাকীর্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

রাজা সীতারাম এর রাজপ্রাসাদ:

রাজা সিতারাম রায় উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ, তিনি চিত্র গুপ্তের পুত্র। বিশ্বভানুর বংশে জাত কাস্যপদাস বংশীয়। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থের মধ্যে বাৎসসিংহ সৌকালীন ঘোষ, বিশ্বমিত্র, মৌদগল্য দাস ও কাস্যপ দেবদত্ত আদি সুরের সময় বঙ্গে আসেন; এই ৫ ঘরই প্রধান বীজ স্বরূপ বলে খ্যাত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা মানসিংহ যখন রাজ মহলে রাজধানী স্থাপন করেন, সম্ভবতঃ তখন শ্রীরাম দাস তাঁর নিকট হতে “খাস বিশ্বাস” উপাধী লাভ করেন। তিনি সুবাদারের খাস সেরেস্তায় হিসাব বিভাগে বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। তৎপুত্র হরিশচন্দ্র অল্পবয়সে পিতার সঙ্গে রাজ সরকারে কার্যারম্ভ করেন এবং রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে ঢাকায় যান (১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে)। তিনি সেখানে কর্মদক্ষতা দেখিয়ে “রায় বাঁয়া” উপাধি পান। তৎপুত্র উদয় নারায়ণ ভূষণার ফৌজদারের অধীন সাজোয়াল বা তহশিলদার নিযুক্ত হয়ে ভূষণায় আসেন। ইনিই সীতারামের পিতা। মাগুরা জেলা শহর হতে ১০ মাইল পূর্বে মধুমতি নদীর তটে মাগুরা জেলায় অবস্থিত মহম্মদপুর উপজেলা। এই মহম্মদপুর উপজেলা শহর এলাকায় ছিল রাজা সীতারামের রাজধানী ও বাসস্থান। এটা বৃহত্তর যশোরের একটি গৌরবের স্থান। অবশ্য ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বোয়ালমারি উপজেলা শহর থেকেও এই স্থানে যাওয়া যায়। বোয়ালমারী বাজার হতে এই স্থান ৬/৭ মাইল পশ্চিমে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্গিম চন্দ্রের “সিতারাম” নামক উপন্যাসের সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালি মাত্রেই পরিচিত। এই মহম্মদপুরে রাজা সিতারাম রায়ের রাজধানী ছিল। সীতারামের আদিনিবাস ছিল বীরভূম জেলায় জাতিতে তিনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। তাঁর পিতা উদয় নারায়ণ প্রথমে রাজমহলে নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন, পরে ভূষণা পরগণায় তহশিলদার পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার পত্নীর নাম দয়াময়ী। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সীতারামের জন্ম হয়। উদয়ন নারায়ন ক্রমে একটি ক্ষুদ্র তালুক ক্রয় করেন এবং মধুমতি নদীর অপর পারে হরিহর নগরে বাস করিতে থাকেন।সীতারামের মাতা দয়াময়ী তেজস্বিনী নারী ছিলেন। কথিত আছে অল্প বয়সে একটি খড়্গের সাহায্যে এক দল ডাকাতকে তিনি পরাস্থ করিয়াছিলেন। মহম্মদপুরে আজও “দয়াময়ী” তলা নামে একটি স্থান দৃষ্ট হয়; এই স্থানে সীতারামের সময়ে বারোয়ারী উৎসব হইতো। সীতারামের অভুত্থান সম্পর্কে নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বাংলার তদানিন্তন ভৌমিক রাজগণ যথাসময়ে রাজকর না দেওয়ায় দিল্লীর বাদশাহ সীতারামকে তাঁহাদের নিকট হইতে বাকী রাজকর আদায়ের জন্য সৈন্য সামন্তসহ প্রেরণ করেন। সীতারাম আসিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং তাহাদের রাজ্য অধিকার করেন এবং পরে বাদশাহের সহিত বিবাদের ফলে তাহার পতন ঘটে। মতান্তরে সীতারাম ভূষণা পরগণার অন্তর্গত মধুমতির পূর্বর্পারস্থিত হরিহর নগর নামক একটি তালুকের অধিপতি ছিলেন।বর্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্তী শ্যামনগর নামক গ্রামেও তাঁহার কিছু ভু-সম্পত্তি ছিল। প্রবাদ, মহম্মদ শাহ নামক স্থানীয় এক ফকিরের নাম হইতে মহম্মদপুর নাম হইয়াছে। সীতারামের প্রভাবে সমগ্র ভুষণা তাঁহার অধিকারভুক্ত হইলো এবং দস্যু সরদার তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দলবলসহ তাঁহার সেনাবাহিনীতে যোগদান করিল। সীতারাম স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজস্ব করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই ভূষণার ফৌজদার মীর আবু তোরাপের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইলো। সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতির হস্তে

আবু তোরাপ নিহত হইলেন। মেনাহাতীর প্রকৃত নাম রামরূপ (মতান্তরে মৃন্ময়) ঘোষ। তিনি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। মেনাহাতীর অর্থ ছোটখাট স্ত্রী হস্তি, তাঁহাকে একটি ছোটখাট হাতী বলিয়াই মনে হইতো। আবু তোরাপের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ মেনাহাতী ও সীতারামকে দমন করিবার জন্য বক্স আলী খাঁ ও দিঘাপতিয়ার দয়ারাম রায়ের নেতৃত্বে বহু সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করিলেন। জনশ্রুতি যে, মহাবীর মেনাহাতী অক্ষয় কবচের অধিকারী ছিলেন; কোনরূপ অস্ত্র দ্বারা তাঁহার দেহ বিদ্ধ হইতো না। একদিন দোল মঞ্চের নিকট দিয়া যাইবার সময় সিতারামের জনৈক বিশ্বাস ঘাতক কর্মচারীর পরামর্শ মত শত্রুসৈন্য তাঁহাকে অতর্কিতভাবে আক্রমন করিয়া বন্দী করিয়া ফেলিল। সাতদিন পর্যন্ত তাহাদের হস্তে নিদারুন নির্যাতন ভোগ করিবার পর আর সহ্য না করিতে না পারিয়া মহাবীর মেনাহাতী স্বীয় অক্ষয় কবচ পরিত্যাগ করেন এবং মৃত্যুকে বরণ করিয়া লন। ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে যে, তাহার মৃতদেহ হইতে মস্তকটি কাটিয়া লইয়া মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়। মানুষের মাথা যে এত বড় হইতে পারে তাহা দেখিয়া নবাব মুর্শিদকুলি বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বলেন , 'যে এরূপ মহাবীরকে কোনভাবেই হত্যা করা উচিত হয় নাই, নবাব মাথাটি সম্ভ্রমে মহম্মদপুরে ফিরাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে সেনাপতির মস্তকহীন দেহ যথারীতি সৎকার করিয়া অস্থি সমাহিত করা হয়;মস্তকটিও তথায় সমাধি করিয়া সীতারাম একটি উচ্চ সমাধি স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। মেনাহাতীর মৃত্যুর পর সীতারামের পতন ঘটে। যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দি হইয়া তিনি মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন। দয়ারাম রায়ই সঙ্গে করিয়া সীতারামকে মুর্শিদাবাদে লইয়া যান। পথিমধ্যে দিঘাপতিয়ায় যাইবার সময়ে তাহাকে নাটোর রাজবাটির কারাগারে বন্দি করিয়া রাখিয়া যান। মুর্শিদাবাদে কয়েক মাস বন্দী থাকিবার পর তিনি মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হন। কেহ কেহ বলেন, তিনি বিষ পানে আত্মহত্যা করেন। মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইয়াছিল।মহম্মদপুরে সীতারামের বহু কীর্তি আজিও বিদ্যমান আছে। উহাদের মধ্যে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, রাম সাগর, সুখ সাগর ও কৃষ্ণসাগর নামে দীঘি, দোল মঞ্চ ও রাজভবনের ধ্বংসাবশেষ সিংহদরওজা, মালখানা, তোষাখানা, দশভুজা মন্দির, লক্ষ্মী নারায়ণের অষ্টকোন মন্দির, কৃষ্ণজীর মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অতীতে এই দুর্গের চর্তুদ্দিকস্থ খাত দিয়া মধুমতির স্রোত প্রবাহিত হইতো। সীতারামের দুইটি প্রধান বড় কামানের নামকরণ হইয়াছিল কালে খাঁ ও ঝুম ঝুম খাঁ। রামসাগর দীঘিটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০০ ফুট ও প্রস্থে ৬০০ ফুট। ইহার জল এখনও প্রায় নির্ম্মল ব্যবহারোপযোগী আছে। কৃষ্ণসাগর দিঘীটি মহম্মদপুর দুর্গের দক্ষিণ পূবর্ব দিকে কানাই নগর গ্রামে অবস্থিত। সীতারামের পতনের পর ভূষণা রাজ্য নাটোর রাজ বংশের সম্পত্তিতে পরিনত হয়। মহম্মদপুর সমৃদ্ধির সময়ে মধুমতি নদী এই স্থানের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত ছিল। বর্তমানে নদী প্রায় দুই মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ভীষণ মহামারীর ফলে মহম্মদপুর একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এবং তাহার পর হইতে ক্রমশঃ ইহা একটি নগন্য পল্লগ্রামে পরিনত হয়। বাগের হাটের খাঁন জাহান আলী মতো সীতারামেরও একদল বেলদার সৈন্য ছিল। কথিত আছে, সংখ্যায় এরা ২২০০ ছিল এবং যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময়ে জলাশয় খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট দুর করাই তাহাদের কাজ ছিল। কথিত আছে, সীতারাম প্রতিদিন নবখনিত জলাশয়ের জলে স্নান করিতেন এবং এই জন্য প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে রাজধানীতে জল আনা হইতো। এইরূপে তিনি বহু পুস্করিণী প্রতিষ্টা করিয়া

Matrix BCS Series

গিয়াছেন। সীতারামের সৈন্যদলে বহু মুসলমান ছিলেন। কথিত আছে, তিনি মুসলমান সেনাপতিদিগকে ভাই বলিয়া ডাকিতেন এবং হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য সতত চেষ্টিত ছিলেন। গ্রাম্য কবিদের গানে ও গাঁথায় ইহার প্রমাণ আজও পাওয়া যায়।

জেলার ঐতিহ্য

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিমাগুরা তার স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। নান্দনিক কাত্যায়নী পূজা উদযাপন, শতবর্ষী ঘোড়দৌড়, লাঠিখেলা, নৌকাবাইচ, আর নবান্ন উৎসব সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জেলাটিকে করে তুলেছে সুপরিচিত। জারিগান, হলয় গান এবং অষ্টক গানের উৎপত্তিস্থল মাগুরা। লোক সঙ্গীতের এই তিনটি ধারা দলীয় নৃত্যগীতের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়।

কাত্যায়নী পূজা: সম্প্রীতির বার্তা দিতেই মাগুরাতে প্রতি বছর দূর্গাপূজার ঠিক একমাস পর বাংলা কার্তিক ও ইংরেজি নভেম্বর মাসে আয়োজিত হয় পাঁচদিনব্যাপী কাত্যায়নী পূজা ও মাসব্যাপী মেলা। বাংলাদেশে দূর্গাপূজা হিন্দু ধর্মীয় সবচেয়ে বড় উৎসব হলেও কাত্যায়নী পূজা মাগুরার হিন্দু সমাজের জন্য প্রধান উৎসব হিসেবে বিবেচিত। সমগ্র উপমহাদেশের আর কোথাও মাগুরার মত এতটা জাঁকজমকপূর্ণভাবে কাত্যায়নী পূজা উদযাপিত হয় না। কাত্যায়নী হিন্দু দেবী দুর্গার একটি বিশেষ রূপ এবং মহাশক্তির অংশবিশেষ। মাগুরা সদরের পারনান্দুয়ালী গ্রামের রূপচান সকারের (রাজবংশ মাঝি সম্প্রদায়) পুত্র কেষ্টপদ সরকার ১৯৩৯ সালে নিজবাড়ীর অঙিনায় সর্বপ্রথম এই পূজা শুরু করেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এখানে এ পূজা চলতে থাকে। ১৯৫৩ সাল থেকে পুনরায় পারনান্দুয়ালী গ্রামের সতীষ চন্দ্র মাঝি নিজ বাড়ীর আঙিনায় এ পূজা শুরু করেন। পরবর্তীতে মাগুরা নতুন বাজার এলাকায় এ পূজা জাঁকজমকপূর্ণভাবে শুরু হয়। এরপর থেকেই মাগুরার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পূজাটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পূজা উপলক্ষ্যে গোটা শহরকে সাজানো হয় বর্ণিল সাজে। চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জাসহ শহরের বিভিন্ন স্থানে তৈরি করা হয় দৃষ্টিনন্দন তোরণ, প্যান্ডেল।

পূজামন্ডপগুলো তৈরি করা হয় প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্যের স্থাপত্যকলার আদলে এবং সাম্প্রতিক সময়ের উল্যেখযোগ্য ঘটনার আলোকে। মাগুরায় এই বর্ণিল আয়োজনের কাত্যায়নী উৎসবে অংশ নিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লাখ লাখ দর্শনার্থীদের পাশাপাশি নেপাল, ভারত ও অন্য দেশ থেকে বহু দর্শনার্থী ছুটে আসেন। পাঁচদিন পর পূজা শেষ হয়ে গেলেও কাত্যায়নী উৎসব কেন্দ্রিক জমজমাট মেলা চলে এক মাস ধরে। মেলায় সূঁই-সূতা থেকে শুরু করে সবকিছু পাওয়া যায়। কাঠের আসবাবপত্র, মাটির তৈজসপত্র, খেলনা, পুতুলনাচসহ গ্রামীণ ঐতিহ্যের নানা আয়োজন থাকে। দেশের দূরদূরান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ীরা মেলায তাদের পসরা সাজিয়ে বসেন। ধর্মীয় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ মাসব্যাপী মেলা কাত্যায়নী পূজাকে আরো উৎসবমুখর করে তোলে। কাত্যায়নী পূজার জনসমাগমকে কেন্দ্র করে আজও পর্যন্ত কোন দুর্ঘটনার কথা শোনা যায়নি। এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঘোড়দৌড়: শত বছরের ঐতিহ্যবাহী ঘোড়দৌড় এ জেলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে। আজ থেকে প্রায় ১২০ বছর আগে ১৮৯৮ সালে মাগুরা সদরসহ জেলা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার সময় স্থানীয় অধিবাসীগণ মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। সদর উপজেলার বহারবাগ ও গাবতলা এবং মহম্মদপুর উপজেলার বড়রিয়ার ঘোড়দৌড় মেলা সুপ্রসিদ্ধ। শীত মৌসুমে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

Matrix BCS

নৌকা বাইচ: মাগুরা জেলায় বিভিন্ন পার্বণকে ঘিরে স্থানীয় জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ নৌকা বাইচের আয়োজন করতেন। বর্তমানে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার মধুমতি নদীতে আয়োজিত বিহারীলাল শিকদার এর নামে যে নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয় তাতে পার্শ্ববর্তী জেলাসহ মাগুরা জেলার লক্ষাধিক দর্শক সমবেত হয় আনন্দ উপভোগ করেন। অন্যদিকে দুর্গাপূজার পরদিন পলাশবাড়ীয়া ইউনিয়নের ঝামায় নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয় যাতে ৫০,০০০ এর অধিক লোক উপস্থিত হয়ে থাকে। এছাড়াও মাগুরা সদরের কামারখালী ব্রীজের নিচে গড়াই নদীতে মরহুম এ্যাড. আসাদুজ্জামান স্মৃতি নৌকাবাইচ সাম্প্রতিক সময়ে শুরু হয়েছে।

লাঠিখেলা: জমিদারী আমল থেকে জমিদারগণ লাঠিখেলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন যা ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং উৎসবে পরিণত হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে এই লাঠি খেলার আয়োজন করেন যা বিনোদনের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গে পরিণত হয়।

Matrix BCS Series

অষ্টক গান: দক্ষিণাঞ্চলের জনপ্রিয় অষ্টক গানের পীঠস্থান মাগুরা জেলার অন্তর্গত শালিখা উপজেলা। সীমাখালী ও আড়পাড়া অঞ্চলে এ গানের প্রচলন হয় এবং খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের চৈত্র সংক্রান্তিসহ বিভিন্ন উৎসবে এ গান গাওয়া হয়। অষ্টক গায়েনরা দল বেধে শিব, দুর্গা প্রভৃতির সাজে বেহালাদারদের আগে ঢোলের তালে তালে এ গান করেন। আট চরণে এই গান সমাপ্ত বলে এক অষ্টক গান বলা হয়।

মাগুরা জেলার প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব

বিশ্বসেরা অল রাউন্ডার সাকিব আল হাসান

জন্মঃ সাকিব আল হাসান, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার, যার নাম দিয়েই নতুন করে বাংলাদেশকে চিনেছে ক্রিকেট বিশ্ব, মাগুরা জেলায় ২৪ মার্চ, ১৯৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় ফুটবল খেলার প্রতি আগ্রহ থাকলেও বড় হয়ে ক্রিকেটের দিকে ঝুঁকে পড়েন সাকিব এবং বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)-এ ভর্তি হন। তার নান্দনিক খেলার ধারাবাহিকতা তাঁকে নিয়ে গিয়েছে এক অনন্য উচ্চতায়।

অর্জনঃ ২০০৬ সালের আগস্টে হারারে তে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় সাকিব আল হাসানের। অভিষেকের পর হতে যত দিন গড়িয়েছে সাকিব নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন। যে কোন ফরম্যাটের ক্রিকেটেই বাংলাদেশ দলের অন্যতম নির্ভরতার নাম সাকিব আল হাসান। ক্রিকেট ইতিহাসের একমাত্র খেলোয়াড় সাকিব যিনি ক্রিকেটের ৩ ফরম্যাটেই ১ নাম্বার অলরাউন্ডার। পাকিস্তানের ইমরান খান এবং ইংল্যান্ডের ইয়ান বোথামের পর তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে একই টেস্টে

Matrix BCS Series

সেঞ্চুরী এবং ১০ উইকেট লাভ করেন তিনি। এখন পর্যন্ত সাকিবই একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে ৩ ফরম্যাটে দেশের সবোচ্চ উইকেট শিকারী, ২য় সবোচ্চ রান সংগ্রাহক এবং সর্বোচ্চবার ম্যান অব দ্য ম্যাচ। সাকিব ২০১৫ সালের জানুয়ারীতে টেস্ট ,ওডিআই ও টি-২০ প্রত্যেক ক্রিকেট সংস্করণে এক নম্বর অল- রাউন্ডার হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। সাকিব প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে ৪০০০ রান করার গৌরব অর্জন করেন। সারা বিশ্বের ক্রিকেটপ্রেমীরা স্বপ্ন দেখেন সাকিবের মত একজন ক্রিকেটার হওয়ার । মাগুরার এই কৃতি সন্তান সাকিব আল হাসান মাগুরাবাসীর গর্ব।

কবি ফররুখ আহমদ: জন্ম ও মৃত্যুঃ কবি ফররুক আহমদ বৃহত্তর যশোর জেলার বর্তমান মাগুরা জেলার সদর উপজেলাধীন মাঝ-আইল গ্রামে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুন বিখ্যাত সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালের ২৯ শে অক্টোবর মাত্র ৫৬ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। রচিত কাব্য গ্রন্থাবলিঃ সাত সাগরের মাঝি, সিরাজুম মুনিরা, নৌফেল ও হাতেম, হাতেম তায়ী, মুহূর্তের কবিতা, হাবেদা মরুর কাহিনী। ছোটদের কবিতা ও ছড়াঃ- হরফের ছড়া, পাখির বাসা, ছড়ার আসর, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি।

অর্জনঃ তিনি তাঁর সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা থেকে স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬১ সনে তিনি প্রেসিডেন্ট পুরস্কার, "প্রাইড অব পারফরমেন্স", ১৯৬৬ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার ও ইউনেস্কো পুরস্কার, লাভ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি কবিতায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান এবং বাংলা একাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন।

ডাঃ লুৎফর রহমান: জন্ম ও মৃত্যুঃ লেখক মাগুরা শহরের সন্নিকটে পারনান্দুয়ালী গ্রামে ১৮৮৯ সালে মামা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রচিত কাব্য গ্রন্থাবলিঃ মহৎজীবন, উন্নত জীবন, পথহারা, মানবজীবন, ছেলেদের মহত্ব কথা, ছেলেদের কারবালা, রাণী হেলেন, প্রীতি উপহার, উচ্চজীবন, বাসর উপহার, রায়হান, সরলা, উত্তম জীবন, সত্য জীবন, ডনকুইকজোটের অনুবাদ, মুসলমান, মঙ্গল ভবিষ্যৎ লেখককের উল্লেখযোগ্য লেখনী। ডাঃ লুৎফর রহমানের প্রথম বই ছিল একখানা কবিতার বই 'প্রকাশ'।

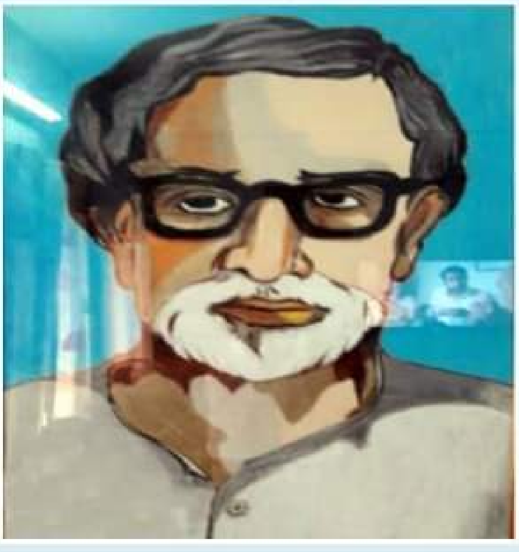

Matrix BCS Series

তিনি 'প্রতিশোধ' নামক একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। তিনি নারীশক্তি নামক পত্রিকা পরিচালনা করে নারীদের জাগরণের চেষ্টা করেছেন এবং নারী তীর্থ নামক "আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করে নারীদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের পথ সুগম করে ছিলেন।

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শহীদ সিরাজউদ্দিন হোসেন: জন্ম ও মৃত্যুঃ ১৯২৯ সালের ১লা মার্চ তারিখে মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার শরুশনা গ্রামে শহীদ সিরাজ উদ্দিন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে স্বাধীনতা বিরোধী হানাদার বাহিনীর হাতে তিনি শহীদ হন। অর্জনঃ ১৯৫৪ সালে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার বার্তা সম্পাদক ও পরে কার্যনির্বাহি সম্পাদক হন। তাঁর লেখা "ইতিহাস কথা কও" "ছোট থেকে বড়" "মহীয়সী নারী" ইংরেজি "A look into the mirror" ইত্যাদি তাঁর অনুদিত গ্রন্থ। জার্মান রূপকথা, পারমানবিক শক্তির রহস্য, আমার জীবন দর্শর্ন, মানব জীবন, অগ্নিপরিক্ষা, ইত্যাদি চল্লিশ খানির অধিক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন।

সৈয়দ আলী আহসান: জন্ম ও মৃত্যুঃ সৈয়দ আলী আহসান ১৯২২সালে মাগুরা জেলার আলোকদিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ড় মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ "চাহার দরবেশ" পুঁথি সাহিত্যের উপদানে রচিত।রচিত কাব্য গ্রন্থাবলিঃতাঁর অনেক আকাশ 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' 'সহসা সচকিত' "উচ্চারণ" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮৬ সালে 'অ াধুনিক কাব্য চেতনা' এবং 'মহম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা' প্রকাশিত হয়। তিনি কিছু বিদেশী কবিতা ও নাটকের অনুবাদ করেছেন। 'ইডিপাস' 'হুইটম্যানের কবিতা', 'ইকবালের কবিতা', 'ইভানগলের কবিতা', মেরিডিথের কবিতা, প্রেমের কবিতা ইত্যাদি। নজরুল ইসলাম, কবি মধুসূদন, কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা, মধুসূদন কবি কৃতি ও কাব্যদর্শ, আধুনিক বাংলা কবিতা শব্দের অনুসঙ্গ, রবীন্দ্র কাব্য বিচারে ভূমিকা ইত্যাদি সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'পদ্মাবতী' ও 'মধুমালতী' প্রভৃতি সম্পাদিত গ্রন্থ।

Matrix BCS S

কবি কাদের নেওয়াজ: জন্ম ও মৃত্যু:১৯০৯ সালে পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলা মঙ্গলকোর্ট গ্রামে কবির জন্ম। ১৯৫২ সালে শ্রীপুর উপজেলার সারঙ্গদিয়া গ্রামে স্থায়ীবসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে মৃত্যু বরণ করেন।রচিত কাব্য গ্রন্থাবলিঃতাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ "মরাল" "নীল কৌমুদি" আশেকে রাসুল। কিশোর গ্রন্থঃ দাদুর বৈঠক। উপন্যাস- উতলাসন্ধ্যা, দুটি পাখী দুটি তীর। ছোটগল্প- দস্যু লাল মোহন, মরুচন্দ্রিকা।

সৈয়েদা সুফিয়া খাতুন (সাহিত্য রত্ন): জন্ম ও মৃত্যুঃ সৈয়েদা সুফিয়া খাতুন ১৯২৭ সালে মাগুরা শহরে জন্ম গ্রহন করেন। সাহিত্যকর্মঃ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গল্পগুলোর একটা সংকলন প্রকাশ করার জন্য একটি পান্ডুলিপি তিনি কবি গোলাম মোস্ড়ফার কাছে দিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরেই কবি গোলাম মোস্ড়ফা মৃত্যুবরণ করেন। সৈয়দা সুফিয়া তাঁর পান্ডুলিপিখানি পরে আর ফেরত পাননি। ফলে তাঁর আশা অপূর্নই থেকে যায়। তার আরো একখানা অপ্রকাশিত গ্রন্থের নাম "স্বপ্ন ছায়া"। যশোরের "অবলাকান্ড় মজুমদার সাহিত্য পরিষদ" সৈয়দা সুফিয়া খাতুনকে তাঁর সাহিত্য কর্মে স্বীকৃতি স্বরূপ সাহিত্যরত্ন "উপাধিতে ভূষিত করে।

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন: জন্ম ও মৃত্যুঃ শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ১৮৯০ মতান্তরে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তদানিন্তন যশোর জেলার বর্তমান মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলাধীন ঘোষগাতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ৭ ই মে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। সাহিত্যকর্মঃ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- পারিজাত কাব্য (১৯১২), কোহিনুর কাব্য, চেতনা কাব্য, আবেহায়াত কাব্য, নিয়ামত, বাঁশরী, গুলশান ইত্যাদি। ফারসী কবি শেখ সাদীর 'গুলিস্তা' ও 'বুস্তা'র কাব্যনুবাদও তিনি করেন। এছাড়া আলগীয়, কর্মবীর মুনশী মেহের উল্লাহ, ভারত সম্রাট বাবর, সুন্দর বনের ভ্রমণ কাহিনী, মালাবারে ইসলাম প্রচার, দবরুল মুখতার, আমার সাহিত্য জীবন ইত্যাদি গদ্য রচনাতেও তিনি মননশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিশোর পাঠকদের জন্য তিনি রচনা করেছেন পরীর কাহিনী, মরনের পরে, ছোটদের হযরত মুসা, হাসির গল্প ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ, শয়তানের সভা এবং শেখ সাদীর জীবনী "হায়াতে সাদী"। তিনি কলকাতার পারিজাত সাহিত্য কুটিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও কবি কুমুদ রঞ্জন মলি- ক তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি একজন সমাজ দরদী সাহিত্যিক ছিলেন।

Matrix BCS Series

মুস্তফা মনোয়ার বা মুস্তাফা মনোয়ার: জন্ম ও মৃত্যুঃ মুস্তাফা মনোয়ার ১৯৩৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর যশোর জেলার মাগুরা (বর্তমান মাগুরা জেলা) মহকুমার শ্রীপুর থানার অন্তর্গত নাকোল গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের একজন গুণী চিত্রশিল্পী। চিত্রশিল্পে তার স্বতঃস্ফুর্ত পদচারণা, বাংলাদেশে নতুন শিল্প আঙ্গিক পাপেটের বিকাশ, টেলিভিশন নাটকে অতুলনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন, শিল্পকলার উদার ও মহত্‌ শিক্ষক হিসেবে নিজেকে মেলে ধরা, দ্বিতীয় সাফ গেমসের মিশুক নির্মাণ এবং ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পেছনের লালরঙের সূর্যের প্রতিরূপ স্থাপনাসহ শিল্পের নানা পরিকল্পনায় তিনি বরাবর তার সৃজনী ও উদ্ভাবনী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

সৈয়দ আতর আলী: সৈয়দ আতর আলী ছিলেন একজন মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক ও রাজনীতিবিদ। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ৮ ও ৯ নং সেক্টরের পলিটিক্যাল কনভেনর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সৈয়দ আতর আলী ১৯১৬ সালে বর্তমান মাগুরা সদর উপজেলার পাটখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিনি গঙ্গারামপুর পিকে হাইস্কুল ও নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উন্নীত হন। এরপর, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। ছাত্রাবস্থায় প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন তিনি। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। ১৯৪৯ সালে তৎকালীন মাগুরা মহকুমা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে মাগুরা-২ আসন থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সোহরাব হোসেন ও মোহাম্মদ আছাদুজ্জামানকে সাথে নিয়ে মাগুরায় পাকিস্তানি বাহিনী ও দোসরদের আক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় ৮ ও ৯ নম্বর সেক্টরের পলিটিক্যাল কনভেনর হিসেবে নিযুক্ত হন। সৈয়দ আতর আলী ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৮ ও ৯ নম্বর সেক্টরের পলিটিক্যাল কনভেনর হিসেবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৭১ সালের ১৩ অক্টোবর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার কল্যাণী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তার শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাকে তৎকালীন মুক্তাঞ্চল যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার কাশিপুর গ্রামে সমাহিত করা হয়। ছবিঃ সৈয়দ আতর আলী মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান ছিলেন একজন বাংলাদেশি রাজনীতিবিদ, যিনি মাগুরা জেলা থেকে চার বার জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান জন্মেছিলেন ১৯৩৫ সালের ১১ নভেম্বরে, মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার পলাশবাড়িয়া ইউনিয়নের মৌলভী জোকা গ্রামে। তিনি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় ভাষা আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে ছাত্রাবস্থাতেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। তিনি ১৯৬২'র ছাত্র আন্দোলন,

Matrix BCS Series

৬৬'র ছয় দফা আন্দোলন, ৬৯'র গণ-অভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। ১৯৬৫ সালে তিনি মাগুরা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৭০ সালে তিনি তৎকালীন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন।মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সোহরাব হোসেন ও সৈয়দ আতর আলীকে সাথে নিয়ে মাগুরায় পাকিস্তানি বাহিনী ও দোসরদের আক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মাগুরায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধে মাগুরা

গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধে মাগুরাবাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মাগুরার রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। দীর্ঘ ৯টি মাস পাক বাহিনী ও তাদের দোসরদের হত্যা, নির্যাতনের কালো অধ্যায় পেরিয়ে ১৯৭১-এর ৭ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হয় মাগুরা। আকাশে ওড়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। মুক্তিযুদ্ধের সেই গৌরবময় কাহিনী সংক্ষেপে তুলে ধরা হলঃ

পাক বাহিনীর প্রবেশ: পাক বাহিনী ও মিলিশিয়ারা মাগুরায় আসে ৭১-এর মার্চের শেষদিকে। মাগুরায় প্রথম শহীদ হন শহরের এক পাগল। পাক বাহিনীকে দেখে সে জয় বাংলা বলে উঠলে হানাদাররা তাকে গুলি করে হত্যা করে। শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জগবন্ধু দত্তকে তার বাড়িতে গুলি করে মারে পাক বাহিনী। পাক বাহিনীর দোসর আলবদর আলসামস শহরের কালি মন্দিরসহ বিভিন্ন মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে ও মূর্তি ভাংচুর করে। তারা জেলার বিভিন্ন বাজার, বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

হানাদারদের ঘাঁটিঃ মাগুরা শহরের পিটিআই, সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, আনসার ক্যাম্প, ডাকবাংলাতে পাক বাহিনী ঘাটি স্থাপন করে। শহরের গোল্ডেন ফার্মেসী ভবন, রেনুকা ভবন, জগবন্ধু দত্তের বাড়ি, চৌধুরী বাড়ি দখল করে রাজাকার ও শান্তি কমিটি তাদের অফিস স্থাপন করে। এসব স্থানে তারা মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে ধরে এনে নির্যাতনের পর হত্যা করতো। পিটিআই এর পিছনে পাক বাহিনী বিমান নামার অস্থায়ী রানওয়ে নির্মাণ করেছিল।

মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটিঃ মাগুরা শহরে নোমানী ময়দানের আনসার ক্যাম্পাসের বিশাল পাকা টিনের ঘরে সংগ্রাম কমিটির অফিস খোলা হয়। এখানে বসেই অ্যাডভোকেট আছাদুজ্জামান অন্যান্য জেলা মহকুমার সাথে টেলিফোন যোগাযোগসহ মাগুরা অঞ্চলের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং সংগ্রাম কমিটির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতেন। এস.ডি.ও অফিসে স্থাপিত কন্ট্রোল রুম থেকে অ্যাড. নাসিরুল ইসলাম আবু মিয়া তার সহযোগী মাগুরা শহরের আবু জোহা পিকুল (ক্রীড়াবিদ ও নাট্যশিল্পী) কে সাথে নিয়ে দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এ সময় মাগুরার বিভিন্ন স্থানে ছুটিতে বাড়ী আসা ই.পি.আর, পুলিশ, সেনা এবং আনসার বাহিনীর সদস্যদের সমাবেত করা হয়। মাগুরা পুলিশ লাইনস্-এর আগ্নেয়াস্ত্র

Matrix BCS Series

গোলাবারুদ তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মাগুরা নোমানী ময়দান, সরকারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ মাঠ, পারনান্দুয়ালী শেখপাড়া আম বাগান প্রভৃতি স্থানে আগ্রহী ছাত্র জনতাকে প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়। মাগুরার বিভিন্ন স্কুল কলেজের বিজ্ঞানাগার থেকে কেমিক্যাল সংগ্রহ করে শহরের ক্ষুদিরাম সাহার আম বাগানের নির্জন স্থানে তৎকালীন ছাত্রনেতা আবু নাসের বাবলু এবং কামরুজ্জামান চাঁদ এর তত্ত্বাবধানে হাতবোমা তৈরি হয়। এসব বিস্ফোরক মাগুরার চর্তুদিকের প্রতিরোধ ক্যাম্পে পৌছেঁ দেয়া হয়। বধ্যভূমি ও গণকবরঃ মাগুরার ওয়াপদা ব্যারেজ, ক্যানেল, পিটিআইতে পাক বাহিনী ও রাজাকাররা শত শত মানুষকে হত্যা করেছে। পিটিআইতে বহু মানুষকে হত্যা করে তারা মাটি চাপা দেয়। আড়পাড়ায় ডাক বাংলোতে পাক বাহিনী ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। ফটকি নদী দিয়ে নৌকাযোগে যাওয়ার পথে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষদের ধরে এনে হত্যার পর ডাক বাংলোর প্রাঙ্গণে একটি ইদারায় ফেলে দিত। ছয় ঘরিয়ায় ১৩ মুক্তিযোদ্ধার গণকবর, হাজরাহাটিতে ৭ মুক্তিযোদ্ধার এবং তালখড়িতে ৭ মুক্তিযোদ্ধার গণকবর রয়েছে।পাক বাহিনীর নির্যাতনঃ পাক বাহিনী মাগুরায় যে বর্বর নির্যাতনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তার তুলনা পাওয়া ভার। হানাদাররা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা লুৎফুর নাহার হেলেনাকে ধরে এনে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন করে। প্রগতিশীল এই নারীকে তারা জিপের পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে সারা মাগুরা শহর টেনেহিঁচড়ে হত্যা করে। ২৬ নভেম্বর ভোরে কামান্না গ্রামে মাধব চন্দ্র কুন্ডুর ঘরে ঘুমন্ত ২৭ মুক্তিযোদ্ধাকে পাক বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। এদের সকলের বাড়ি মাগুরার হাজীপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী গ্রামে। ছয় ঘরিয়ায় ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধাকে এবং হাজরাহাটি নামক স্থানে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে রাজাকাররা নির্মম নির্যাতনে হত্যা করে। সম্মুখযুদ্ধঃ মাগুরায় পাক বাহিনী ও তাদের দোসরদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর বেশ কয়েকটি সম্মুখযুদ্ধ হয়। এগুলোর মধ্যে মহম্মদপুর উপজেলা সদরের যুদ্ধ, বিনোদপুর যুদ্ধ, জয়রামপুর যুদ্ধ প্রভৃতি যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। এসব যুদ্ধে আহম্মদ ও মোহম্মদ (দু'ভাই), আবীর হোসেন, মুকুলসহ বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

আকবর বাহিনীঃ শ্রীপুর উপজেলার টুপি পাড়া গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন মিয়া গড়ে তোলেন লড়াকু মুক্তিযোদ্ধাদের দল 'আকবর বাহিনী'। আকবর হোসেন ছিলেন এ দলের কমান্ডার আর বর্তমান জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার মোল্যা নবুওয়াত আলী তার ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন। এই বাহিনী বিভিন্ন যুদ্ধে পাক বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে।

শত্রুমুক্ত হলো মাগুরাঃ ৬ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হওয়ার পর পাক বাহিনী মাগুরায় এসে আশ্রয় নেয়। কিন্তু মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর যৌথ আক্রমণে টিকতে না পেরে পাক সেনারা সেদিন বিকাল থেকেই মাগুরা ছেড়ে পালাতে শুরু করে। রাতে তারা গড়াই নদী পার হয়ে ফরিদপুরে কামারখালীর দিকে পালিয়ে যায়। ৭ ডিসেম্বর ভোরে মুক্তিযোদ্ধারা মাগুরার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। মাগুরায় ওড়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। সর্বত্র জয় বাংলা ধ্বনীতে মুখরিত হয়ে উঠে। মিত্র বাহিনীর জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা হেলিকপ্টারযোগে মাগুরার নোমানী ময়দানে এসে সকলের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

Matrix BCS Series

রণাঙ্গনের মুখপত্র: মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগর থেকে "বাংলার ডাক" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন মাগুরার সাংবাদিক দীপক রায় চৌধুরী । পত্রিকাটি ভারতের রানাঘাট মহকুমার একটি প্রেস থেকে ছাপা হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে যেত। পত্রিকাটিতে রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের কাহিনী প্রকাশিত হতো। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক: মাগুরা মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক সৈয়দ আতর আলী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতে মারা যান। তাকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে এনে দাফন করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক মন্ত্রী মরহুম সোহরাব হোসেন, সাবেক এমপি মরহুম এডভোকেট আছাদুজ্জামান, সাবেক মহকুমা প্রশাসক ওলিউল ইসলাম প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন।

ভৌগলিক পরিচিতি

মাগুরা জেলার ভৌগোলিক অবস্থান:

১. অবস্থান: মাগুরা জেলা মাগুরা ২৩ ডিগ্রী ২৯ মিনিট উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯ ডিগ্রী ২৬ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ এ জেলাটি খুলনা বিভাগে অবস্থিত। এ জেলার উত্তরে রাজবাড়ী, দক্ষিণে যশোর ও নড়াইল, পূর্বে নড়াইল ও ফরিদপুর জেলা এবং পশ্চিমে ঝিনাইদহ জেলা অবস্থিত। মাগুরা জেলা সমুদ্র সমতল হতে ২৬ ফুট উচ্চে অবস্থিত। মাগুরা খুলনা বিভাগের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত।

২. আয়তন: মাগুরা জেলার মোট আয়তন ১০৪৯ বর্গ কি: মি:। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৭৮৭ জন।

৩. ভূ-প্রকৃতি: মাগুরা বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির অন্তর্গত জেলা। মাগুরা জেলার ভূতাত্ত্বিক যুগে অর্থাৎ সত্তর হাজার বছরআগে সৃষ্ঠি হয়েছে। মূলত পদ্ম নদীর পলি সঞ্চয়নের দ্বারা এ বদ্বীপ অঞ্চল গঠিত হয়েছিল।

৪. ভূ-তাত্ত্বিক গঠন: মাগুরা জেলার পূর্ব অঞ্চল ব্যতিত প্রায় সমগ্র অংশ সমান উচ্চতা বিশিষ্ট। ৪র্থ মহাযুগীয় পলল সঞ্চয় দ্বারা মাগুরা জেলা গঠিত। এ জেলার মৃত্তিকার পর্যালোচনায় দেখা যায় উপরের অংশ কাদা পলি এবং শুষ্ক পলি রয়েছে। এ অংশে ৫০ ফুট হতে ১৫০ ফুট পর্যন্ত গভীর। পরবর্তী অংশে শুষ্ক পলির সাথে মধ্যমাকৃতির মোটা বালিকনা রয়েছে। মাগুরা জেলায় সমভূমি গঠনে পদ্মা এবং তার দুটি প্রধান শাখা নদী মাথা ভাঙ্গা এবং গড়াই/মধুমতির বিশেষ অবদান রেখেছে।

৫. নৃ-তাত্ত্বিক: মাগুরায় বসবাসরত জনগোষ্ঠির তেমন সৃস্পষ্ট নৃতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয় এখানকার জনগোষ্ঠি প্রাচিন দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীর মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে।

৬. নদ-নদী: মধুমতি, গড়াই, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা এবং ফটকী ০৬ টি মাগুরার প্রধান নদী। পূর্বে এ জেলায় নৌকা ও জাহাজে করে দেশী ও বিদেশী পণ্যসামগ্রী আমদানি ও রপ্তানী করা হতো। সে সময় কানায় কানায় পরিপূর্ণ নদী ব্যবসা বানিজ্যের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল যা এখনো অব্যাহত আছে।

৭. মৃত্তিকা: পদ্মা ও তার শাখা নদী দ্বারা বাহিত হিমালয় পর্বতের পলল দ্বারা মাগুরার মৃত্তিকার উপরের অংশ সূক্ষ্ম বালুকণা পলি এবং কাদা দ্বারা গঠিত। এর নীচের সত্মর অপেক্ষাকৃত

মোটা বালুকণা দ্বারা সমৃদ্ধ। মৃত্তিকার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং আদি শিলার উপর ভিত্তি করে মাগুরা জেলার মৃত্তিকাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ-ক) প্লাবন ভূমির চুনযুক্ত গাঢ় ধূসর মৃত্তিকা যা জেলার পূর্বাঞ্চলে দেখা যায়। খ) প্লাবন ভূমির চুনযুক্ত বাদামী মৃত্তিকা যা জেলার পশ্চিমভাবে দেখা যায়। গ) পিট মৃত্তিকা যা জেলার নিম্ন অঞ্চলে দেখা যায়। ৮. জলবায়ু মাগুরার জলবায়ু সমভাবাপন্ন। এখানকার শীতকাল শুষ্ক এবং গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র। গ্রীষ্মকালে এ জেলার উপর দিয়ে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় এবং তখন সর্বাধিক আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হয়। এ সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। মাঝে মধ্যে নভেম্বর-ডিসেম্বরে এখানে বঙ্গোপসাগর থেকে আগত ঘুর্ণিঝড়ের প্রভাবে কয়েকদিন টানা বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে কাল বৈশাখির প্রভাব এখানে স্পষ্ট।

৯. প্রাকৃতিক দুর্যোগ: উপকূলীয় অঞ্চলের কাছাকাছি হওয়ায় মাগুরা জেলা বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দূর্যোগের কবলে পড়েছে। সিডর, আম্পান, নার্গিস, আইলাসহ আরো অনেক ঘূর্ণিঝড়ে মাগুরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ জেলায় বিভিন্ন সময়ে প্রলয়ংকারী বন্যা হানা দিয়েছে।

১০। বিবিধঃ বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত মাগুরা জেলার প্রায় সকল ভূমিই ব্যবহার উপযোগী। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ ও আরামদায়ক।

নদ-নদী

মধুমতিনদী: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মাগুরা, ফরিদপুর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট জেলার একটি নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ১৭০ কিলোমিটার, প্রস্থ ৪০৮ মিটার এবং প্রকৃতি সর্পিলাকার। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা "পাউবো" কর্তৃক মধুমতি নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী নং ৭৪।মধুমতি নদীটি মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার নাকোল ইউনিয়নে প্রবহমান গড়াই নদী হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। অতঃপর এই নদীর জলধারা বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলার কলাতলা ইউনিয়ন পর্যন্ড় প্রবাহিত হয়ে শালদহ নদীতে নিপতিত হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ স্ড়িমিত হলেও বর্ষার সময় দুকূল উপচে নদী অববাহিকায় বন্যা হয়। নদীটির উজানের অংশ জোয়ার ভাটার প্রভাবে প্রভাবিত।

নবগঙ্গা নদী: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা এবং নড়াইল জেলার একটি নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ২১৪ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৮৫ মিটার এবং নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা “পাউবো” কর্তৃক নবগঙ্গা নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী নং ৪৫। এটি মাথাভাঙ্গা নদীর শাখা নদী। মাথাভাঙ্গা থেকে ‘গঙ্গা নবরূপপ্রাপ্ত হয়েছে’- এই বিবেচনায় এর নামকরণ হয়েছে নবগঙ্গা। চুয়াডাঙ্গার কাছ থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত হওয়ার পর মাগুরাতে কুমার নদী ও নড়াইলের চিত্রা নদীর জলধারাসহ এটি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে ভৈরব নদীতে পড়েছে। পূর্বে ইছামতির শাখা নদী ছিল, কিন্তু উৎসমুখ ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে ভৈরব নদীর একটি উপনদীতে পরিণত হয়েছে।

ফটকি নদী: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মাগুরা ও ঝিনাইদহ জেলার একটি নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ৪৯ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৩৫ মিটার এবং নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা "পাউবো" কর্তৃক ফটকি নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী নং ৫৫।

ফটকি নদীটি মাগুরা জেলার মাগুরা সদর উপজেলার হাজরাপুর ইউনিয়ন এলাকায় প্রবহমান নবগঙ্গা নদী হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। অতঃপর এই নদীর জলধারা একই জেলার শালিখা উপজেলার গঙ্গারামপুর বুনাগাতি ইউনিয়ন সদর উপজেলার কুল্লিয়া কুচিয়ামোড়া হয়ে আড়পাড়া পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে চিত্রা নদীতে নিপতিত হয়েছে। বর্ষাকালে নদীটিতে স্বাভাবিকের চেয়ে পানির প্রবাহ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। এ সময় নদীর তীরবর্তী অঞ্চল বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। নদীটির ভাটি অঞ্চল জোয়ার ভাটার প্রভাবে প্রভাবিত।

গড়াই নদী: পদ্মার একটি প্রধান শাখানদী হিসেবে পরিচিত। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী।

গড়াই নদীটি কুষ্টিয়া জেলার হাটশহরিপুর ইউনিয়নে প্রবহমান পদ্মা নদী হতে উৎপত্তি লাভ করে মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার নাকোল ইউনিয়ন পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে মধুমতি নদীতে পতিত হয়েছে। একসময় গড়াই নদী দিয়ে গঙ্গার প্রধান ধারা প্রবাহিত হতো, যদিও হুগলি-ভাগীরথী ছিল গঙ্গার আদি ধারা। কুষ্টিয়া জেলার উত্তরে হার্ডিঞ্জ সেতুর ১৯ কিলোমিটার ভাটিতে তালবাড়িয়া নামক স্থানে গড়াই নদী পদ্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। নদীটি কুষ্টিয়া জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গণেশপুর নামক স্থানে ঝিনাইদহ জেলায় প্রবেশ করেছে। অতঃপর ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়ে চাদর নামক গ্রাম দিয়ে রাজবাড়ী জেলায় প্রবেশ করেছে। এরপর ঝিনাইদহ-রাজবাড়ী জেলা, মাগুরা জেলা-রাজবাড়ী জেলা এবং মাগুরা জেলা-ফরিদপুর জেলার সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়ে মধুমতি নদী নামে নড়াইল ও বাগেরহাট জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

চিত্রা নদীঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ জেলার একটি নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ১৭২ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৫৩ মিটার এবং প্রকৃতি সর্পিলাকার। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা "পাউবো" কর্তৃক চাটখালী নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী নং ৩৪ নদীটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে প্রবাহিত গঙ্গা-পদ্মা সিস্টেমের একটি বিশাল উপকূলীয় নদী ১৭০ কিঃমিঃ দীর্ঘ এ নদীটি চুয়াডাঙা ও দর্শনার নিম্নস্থল থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কালিগঞ্জ, মাগুরার শালিখা ও কালিয়া উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গাজীরহাটে নবগঙ্গা নদীর সাথে মিলেছে এবং এর মিলিত স্রোত খুলনার দৌলতপুরের কাছে ভৈরব নদীতে মিশেছে।

গিনেস ওয়ার্ড রেকর্ড

জীবন বৃত্তান্ত ঃ

নামঃ আব্দুল হালিম
পিতার নামঃ ছানাউল্লাহ পাটোয়ারী
মাতার নামঃ মৃত ফাতেমা বেগমস্থায়ী
ঠিকানাঃ গ্রামঃ ছয়ঘরিয়া, ডাকঘরঃ সীমাখালী, উপজেলাঃ শালিখা, জেলাঃ মাগুরা।
বর্তমান ঠিকানাঃ গ্রামঃ ছয়ঘরিয়া, ডাকঘরঃ সীমাখালী, উপজেলাঃ শালিখা, জেলাঃ মাগুরা।
জন্ম তারিখঃ ২৭/০৩/১৯৭৫ ইং
জাতীয়তাঃ বাংলাদেশী
ধর্মঃ ইসলাম
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৮ম শ্রেণী
যে কারণে গিনেসবুকে নাম উঠেছেঃ ফুটবল মাথায় রেখে ১৫.২০০ কিলোমিটার হেটে অতিক্রম করে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।
তারিখঃ ২২/১০/২০১১ ইং

Matrix

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

১ম ধাপের মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলা পরিচিতি

Facebook Page: Matrix BCS Series

ময়মনসিংহ জেলা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর নং: ১১

সেক্টর কমান্ডার:

- মেজর আবু তাহের (এপ্রিল- নভেম্বর)
- ফ্লাইট লেঃ এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর -ডিসেম্বর)

উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা:

- আব্দুল মান্নান বীরবিক্রম
- হায়দার আলী বীরবিক্রম

কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি:

- সৈয়দ নজরুল ইসলাম (প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
- আব্দুল জব্বার (ভাষা আন্দোলনে শহীদ)
- আবুল মনসুর আহমেদ (সাহিত্যিক)
- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন
- ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (২৫ মার্চ, ১৯৭১ এর কালো রাত্রিতে পাক হানাদার কর্তৃক নিহত)

Matrix BCS

সংসদীয় আসন: ১১টি

১৪৬	ময়মনসিংহ-১	জুয়েল আরেং	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৪৭	ময়মনসিংহ-২	শরীফ আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৪৮	ময়মনসিংহ-৩	নাজিম উদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৪৯	ময়মনসিংহ-৪	রওশন এরশাদ	জাতীয় পার্টি
১৫০	ময়মনসিংহ-৫	কে এম খালিদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৫১	ময়মনসিংহ-৬	মোঃ মোসলেম উদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৫২	ময়মনসিংহ-৭	মোঃ হাফেজ রুহুল আমিন মাদানী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৫৩	ময়মনসিংহ-৮	ফখরুল ইমাম	জাতীয় পার্টি
১৫৪	ময়মনসিংহ-৯	আনোয়ারুল আবেদীন খান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৫৫	ময়মনসিংহ-১০	ফাহমী গোলন্দাজ বাবেল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৫৬	ময়মনসিংহ-১১	কাজিম উদ্দিন আহম্মেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

জেলার পুরাতন নাম: নাসিরাবাদ

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৭৮৭

উপজেলা: ১২ টি

ইউনিয়ন: ১৪৬ টি

যে নদীর তীরে অবস্থিত: পুরাতন ব্রহ্মপুত্র

দর্শনীয় স্থান:

- শহীদ আব্দুল জব্বার জাদুঘর
- গৌরীপুর হাউজ
- ময়মনসিংহ টাউন হল
- মহারাজ সূর্যকান্তের বাড়ি
- রাবার ডেম
- অর্কিড বাগান
- সন্তোষপুর রাবার বাগান
- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা
- মনসাপাড়া সেভেনথ ডে এডভেন্টিস্ট সেমিনারী , ধোবাউড়া
- শশী লজ
- রাজ রাজেশ্বরী ওয়াটার ওয়ার্কস
- কালুশাহ বা কালশার দিঘি
- চীনা মাটির টিলা
- গারো পাহাড়
- আলাদিনস্ পার্ক
- আলেকজান্ডার ক্যাসেল

Matrix BCS Series

এক নজরে জেলা

নামকরণ

মোগল আমলে মোমেনশাহ নামে একজন সাধক ছিলেন, তাঁর নামেই মধ্যযুগে অঞ্চলটির নাম হয় মোমেনশাহী। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার স্বাধীন সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তাঁর পুত্র সৈয়দ নাসির উদ্দিন নসরত শাহ'র জন্য এ অঞ্চলে একটি নতুন রাজ্য গঠন করেছিলেন, সেই থেকেই নসরতশাহী বা নাসিরাবাদ নামের সৃষ্টি। নাসিরাবাদ নাম পরিবর্তন হয়ে ময়মনসিংহ হয় একটি ভুলের কারণে। বিশ টিন কেরোসিন বুক করা হয়েছিল বর্জনলাল এন্ড কোম্পানীর পক্ষ থেকে নাসিরাবাদ রেল স্টেশনে। এই মাল চলে যায় রাজপুতনার নাসিরাবাদ রেল স্টেশনে। এ নিয়ে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। পরবর্তীতে আরো কিছু বিভ্রান্তি ঘটায় রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে ময়মনসিংহ রাখা হয়। সেই থেকে নাসিরাবাদের পরিবর্তে ময়মনসিংহ ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

জেলা ঘোষণার তারিখ

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে ময়মনসিংহ জেলা সৃষ্টি হয়। এই জেলার আকার সময় সময় পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলা থেকে টাঙ্গাইল মহকুমাকে এবং ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে জামালপুর মহকুমাকে পৃথক করে জেলায় উন্নীত করা হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলা থেকে শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমাকে পৃথক পৃথক জেলায় উন্নীত করা হয়।

অবস্থান

২৪°০২'৩১" থেকে ২৫°২৫'৫৬" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৩৯'০০" থেকে ৯১°১৫'৩৫" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ- এ। উত্তরে গারোপাহাড় ও ভারতের মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিণে গাজীপুর জেলা, পূর্বে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমে শেরপুর, জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলা অবস্থিত।

আয়তন ও গঠন

আয়তন ৪৩৬৩.৪৮ বর্গ কিলোমিটার। এটি ১৩টি উপজেলা, ১ টি সিটি করপোরেশন, ১৪টি থানা, ১০ টি পৌরসভা (০৮টি ক শ্রেণীর, ০১টি খ শ্রেণীর, ০১টি গ শ্রেণীর), ১৪৫ টি ইউনিয়ন, ২২০১টি মৌজা, ২৭০৯টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। উপজেলাসমূহের নাম-ঈশ্বরগঞ্জ, গফরগাঁও, গৌরীপুর, ত্রিশাল, ধোবাউড়া, নান্দাইল, ফুলপুর, তারাকান্দা,ফুলবাড়িয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা, হালুয়াঘাট।

জনসংখ্যা

মোট জনসংখ্যা ৫৮,০০,১৫৯ জন (২০২০ সালে প্রাক্কলিত জনসংখ্যা)
মোট জনসংখ্যা ৫৩,১৩,১৬৩ জন (২০১১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী)
পুরষ ২৬,৪০,০৪০ জন, মহিলা ২৬,৭৩,১২৩ জন (২০১১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী)।

প্রাকৃতিক সম্পদ

নদ-নদীর সংখ্যা ২২টি, আয়তন ১১৪৪৫.২০ হেক্টর। নদীর নাম-ব্রহ্মপুত্র, সুতিয়া, ক্ষির, সাচালিয়া, পাগারিয়া, নাগেশ্বর, কাচাঁমাটিয়া, আয়মন, বানার, নরসুন্দা, বোরাঘাট, দর্শনা, রামখালী, বৈলারি, নিতাই, কংশ, ঘুঘুটিয়া, সাতারখালী, আকালিয়া, জলবুরঙ্গা, চৌকা মরানদী, রাংসা নদী ইত্যাদি। বিল ও প্রধান প্লাবনভূমির সংখ্যা ১১৪০টি, আয়তন ৩০৭৬২.০০ হেক্টর। বনভূমি ৩৮৮৬০.৭৩ একর। বালু মহল ১৫টি, আয়তন ৮৭৪.৫০ একর। সাদামাটিমহল ১টি, আয়তন ২৪.৩৩ একর ইত্যাদি।

Matrix BCS Series

শিক্ষার হার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

জেলার শিক্ষার হার ৬৮% (পুরষ ৪১.০৯%, মহিলা ৫৪%)। প্রাথমিক বিদ্যালয় মোট ২৬৮৯টি (তন্মধ্যে সরকারী ১২৪৯টি, বেসরকারী রেজিষ্টার্ড ৬২১টি, আন রেজিষ্টার্ড ২৭টি, উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন ৫৬টি, কিন্ডার গার্ডেন ১২৬টি, পরীক্ষণ ১টি, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা ২৩৪টি, উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন ২৪৩টি, কমিউনিটি ১১৪টি, এনজিও ১৮টি)। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০৫টি, ৯ম শ্রেণীর অনুমতি প্রাপ্ত বিদ্যালয় ৭২টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪০৪টি, স্কুল এন্ড কলেজ ১৩টি, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩১টি, ডিগ্রীকলেজ ২৭টি (সরকারী ৩টি, বেসরকারী ২৪টি), বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ২টি (সরকারী), বিশ্ববিদ্যালয় ২টি (সরকারী), মেডিক্যাল কলেজ ২টি (সরকারী ১টি, বেসরকারী ১টি), ক্যাডেট কলেজ ১টি, চারুকলা ইনষ্টিটিউট ১টি, হোমিওপ্যাথিক কলেজ ১টি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ১টি, কারিগরি শারীরিক মহাবিদ্যালয় ১টি, ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউট ২টি, শিক্ষা মহাবিদ্যালয় ১টি, কামিল মাদ্রাসা ৪টি, ফাযিল মাদ্রাসা ৪৭টি, আলিম মাদ্রাসা ৪২টি, দাখিল মাদ্রাসা ২৯৫টি, আর্ট স্কুল ১টি।

শিল্প ও কল কারখানা

বৃহৎ শিল্প ৩টি। উল্লেখযোগ্য মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্প ও কল-কারখানা প্রায় ১৪১টি, তন্মধ্যে ৯০টি বিসিক শিল্প নগরী ময়মনসিংহে এবং বাকী প্রায় ৫০টি ভালুকায় অবস্থিত।

কৃষি

মোট জমি ৪,৩৬,৩৪৮ হেক্টর, নীট ফসলী জমি ৩,৭২,৭০৭ হেক্টর। এক ফসলী জমি ৪০,১৭২ হেক্টর, দুই ফসলী জমি ২৪৮৩৩৫ হেক্টর, তিন ফসলী জমি ৮৩,৩৫০ হেক্টর, চার ফসলী জমি ৮৫০ হেক্টর। মোট ফসলী জমি ৭,৯০,২৯২ হেক্টর, ফসলের নিবিড়তা ২১২.০০%। কৃষি ব্লকের সংখ্যা ৫২৫টি। কৃষি বিষয়ক পরামর্শ কেন্দ্র ২৯০টি, সয়েল মিনিল্যাব ৫৯টি, বিএডিসি বীজ ডিলার ৩১৬ জন, বিসিআইসি সার ডিলার ১৪০ জন, কোল্ড ষ্টোর ১টি।

সেচসুবিধা

সেচাধীন জমি ২৫০৩৭০ হেক্টর। গভীর নলকূপ মোট ৩৪৫৪টি (বিদ্যুৎচালিত ২৬৬৬টি, ডিজেল চালিত ৭৮৮টি), অগভীর নলকূপ মোট ৪৯৬২৭টি (বিদ্যুৎ চালিত ৮৩৩০টি, ডিজেল চালিত ৪১২৯৭টি), পাওয়ার পাম্প মোট ৪৪৭৮টি (বিদ্যুৎ চালিত ২০৯টি, ডিজেল চালিত ৪২৬৯টি)।

খাদ্যশস্য পরিস্থিতি

খাদ্যশস্যের বাৎসরিক চাহিদা ৮,২৬,৭২৫ মেট্রিক টন, উৎপাদন ১৭,৯২,২৫৮ মেট্রিক টন, উদ্বৃত্ত ৭,৮৬,৩০৮ মেট্রিক টন। প্রধানতঃ ধান, পাট, গম, আলু, মসুর, ভুট্টা, সরিষা, চীনাবাদাম, পান, কলা, আনারস, কাঁঠাল ও শীতকালীন শাকসবজি উৎপন্ন হয়।

মৎস্যসম্পদ

নদী ২২টি, আয়তন ১১৪৪৫.২০ হেক্টর; বিল ও প্রধান প্রধান প্লাবন ভূমি ১১৪০টি, আয়তন ৩০৭৬২.০০ হেক্টর; পুকুর ১৪০৩৩৪টি, আয়তন ২৬০৩৮.৬৫ হেক্টর (সরকারী পুকুর ৩৬৬টি, আয়তন ১৩০.২০ হেক্টর; বেসরকারী পুকুর ১৩৯৯৬৮টি, আয়তন ২৫৯০৮.০৫ হেক্টর)। নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষের আওতায় খামার (বেসরকারী বানিজ্যিক খামার) ৩২৫৯টি, আয়তন ৪৪৩০.৫৫

হেক্টর ও উৎপাদন ৭৯৬৭৪.৮৬ মেট্রিক টন। সনাতন/উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে মাছ চাষের আওতায় পুকুর ১৩৬২৪৭টি, আয়তন ২১৬০৮.১০ হেক্টর ও উৎপাদন ৬৮৫১৭.৫৭ মেট্রিক টন। বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারী ৭৭টি, বেসরকারী মৎস্য নার্সারী ২১১০টি, মৎস্য খাদ্যের দোকান/কারখানা ১১০টি, মৎস্য আড়তের সংখ্যা ৮২টি, বরফ কলের সংখ্যা ৫৩টি। জেলায় বার্ষিক মাছ উৎপাদন ১৬০৪০৪.০০০ মেট্রিক টন, বার্ষিক মাছের চাহিদা ৬৮০৩১.০০০ মেট্রিক টন, বার্ষিক মাছ উদ্বৃত্ত ৯২৩৭৩.০০০ মেট্রিক টন। মৎস্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট এনজিও ৬টি (নামঃ সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস, পদক্ষেপ, কারিতাস,ভিশন, সোসিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন।

পশু সম্পদ

জেলা পশু হাসপাতাল ১টি, পশু চিকিৎসালয় ১২টি, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ১টি, কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র ১৩টি, কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট ১৮টি, এফডিআইএল ১টি, হাঁস প্রতিপালন ইউনিট ১টি। গবাদি পশুর খামার ১৮৫৫টি, ছাগলের খামার ১৮০৩টি, ভেড়ার খামার ১৫টি, মুরগী খামার ১৬৯৯টি (লেয়ার ৫৩১টি, ব্রয়লার ১১৬৮ টি),হাঁস খামার ১১৭৭টি, ব্রিডার খামার ৪টি। গর ১৯,৭৭,৬৫১টি, মহিষ ৩১০৭৯টি, ছাগল ৭৩৮৯১০টি,ভেড়া ২০১০০টি, ঘোড়া ১১২১টি, শুকর ১১০৯টি, হাঁস ১১৪১৫৭৪টি, মুরগী ৭৭০৫৯৮০টি।বাৎসরিক উৎপাদন- দুধ ১.৭৮০ লক্ষ মেট্রিক টন, ডিম ২৮,৪৫,০৫,০০০টি, মাংস ২.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন। পশু সম্পদ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট এনজিও- ওয়ার্ল্ড ভিশন, সোসিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ২টি (সরকারী ১টি, বেসরকারী ১টি), সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ১টি (১৪১ শয্যাবিশিষ্ট), বক্ষ ব্যাধি ক্লিনিক ১টি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে- ক্স ১১টি (৬টি ৫০ শয্যাবিশিষ্ট, ৫টি ৩১ শয্যাবিশিষ্ট), পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৮৬টি, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ৪৩টি, কমিউনিটি ক্লিনিক ৪১২টি (বর্তমানে চালু ৩৫৪টি), বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১টি, হোমিও হাসপাতাল ১টি, বেসরকারী ক্লিনিক ৭২টি, মিশনারি হাসপাতাল ১টি সরকারী অ্যাম্বুলেন্স ১৬টি (চালু ৯টি)। স্বাস্থ্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট এনজিও ১৬টি।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

উন্নত। পাকা সড়ক প্রায় ৯৬৪ কিলোমিটার, কাঁচা সড়ক ৭৮৫৮ কিলোমিটার, রেলপথ ১৫৯ কিলোমিটার ও নদী পথ ২২৩ কিলোমিটার। ঢাকাসহ পার্শ্ববর্তী জেলা শহর টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা কিশোরগঞ্জ, জামালপুর ও গাজীপুরের সাথে পাকা সড়ক ও রেলপথের যোগাযোগ রয়েছে। রাজধানী ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ জেলার দূরত্ব সড়ক পথে ১২১ কিমি এবং রেলপথে ১২৩ কিমি। জেলা সদর থেকে পাকা সড়ক পথে উপজেলার এবং ইউনিয়ন পরিষদের প্রায় সারাবছরই মোটরযান চলাচলের উপযোগী পাকা/কাঁচা রাস্ড়া রয়েছে। তবে জেলায় প্রবাহিত নদীসমূহের তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় নদীগুলো নাব্যতা হারিয়েছে।

পোষ্টাল সুবিধা

ডাকঘর ২৯৮টি, পোষ্টাল কোড- ঈশ্বরগঞ্জ ২২৮০-২২৮২, গফরগাঁও ২২৩০-২২৩৪, গৌরীপুর ২২৭০-২২৭১, ত্রিশাল ২২২০-২২২৩, নান্দাইল ২২৯০-২২৯১, ফুলপুর ২২৫০-২২৫২, ফুলবাড়ীয়া ২২১৬, ভালুকা ২২৪০, ময়মনসিংহ সদর ২২০০-২২০৫, মুক্তাগাছা ২২১০, হালুয়াঘাট ২২৬০-২২৬২।

Matrix BCS Series

টেলিযোগাযোগ

ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ১২টি, টেলিফোন কোড- ঈশ্বরগঞ্জ ০৯০২৭, গফরগাঁও ০৯০২৫, গৌরীপুর ০৯০২৪, ত্রিশাল ০৯০৩২, ধোবাউড়া ০৯০৩৪, নান্দাইল ০৯০২৯, ফুলপুর ০৯০৩৩, ফুলবাড়ীয়া ০৯০২৩, ভালুকা ০৯০২২, ময়মনসিংহ সদর ০৯১, মুক্তাগাছা ০৯০২৮, হালুয়াঘাট ০৯০২৬।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: মসজিদ ১০,৪৯০টি, মাজার ২১৭টি, মন্দির ৪১৫টি, গীর্জা ৭৯টি।

সরকারী/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

উপজেলা ভূমি অফিস ১৩টি, পৌর/ইউনিয়ন ভূমি অফিস ১৪৪টি, ভেটেরিনারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ১টি, প্রাইমারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ১টি, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ১টি, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ২টি, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব প্রাইমারী এডুকেশন ১টি, সিডিউল বাণিজ্যিক ব্যাংক ৮০টি, ডাকবাংলো/রেষ্ট হাউজ ১৯টি, ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন ৫টি, খাদ্য গুদাম ১৮টি, হাট-বাজার ৫৭১টি, যাদুঘর ২টি, সিনেমা হল ৩২টি, পার্ক ৩টি, স্টেডিয়াম ৩টি, খেলার মাঠ ১১৮টি।

নির্বাচন সংক্রান্ত

নির্বাচনী এলাকা ১৪৬-১৫৬, ভোটার সংখ্যা পুরষ ১৪৪২৬৯৮ জন, মহিলা ১৪৭৪০১৩ জন, মোট ২৯১৬৭১১ জন।

জেলার পটভূমি

হাওর জঙ্গল মইষের শিং, এই তিনে ময়মনসিং' প্রবাদ-প্রবচনে এভাবেই পরিচয় করানো হতো এক সময় ভারতবর্ষের বৃহত্তম জেলা ময়মনসিংহকে। ভারতবর্ষের সেই বৃহত্তম জেলা সময়ের বিবর্তনে ছয় জেলায় রূপান্তরিত হলেও জেলা সদরের গুরুত্ব তুলনামূলক বিচারে কমে যায় নি। বাংলাদেশের মানচিত্রে যে জেলাটি আজ ময়মনসিংহ জেলা হিসাবে চিহ্নিত তা বাংলাদেশের মধ্য-উত্তরাঞ্চলের ২৪০°২'৩১" থেকে ২৫°২৫'৫৬" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৩৯'০০" থেকে ৯১°১৫'৩৫" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র বিধৌত বাংলাদেশের এই উর্বর ভূমি শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতির এক বিপুল আধার।

ময়মনসিংহের ইতিহাস অতিশয় সমৃদ্ধ। উত্তরে গারো পাহাড়, দক্ষিণে ভাওয়াল মধুপুরের বনাঞ্চল, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে উৎসারিত মেঘনার জল বেষ্টনী এবং পূর্বে সোমেশ্বরী তিতাস, সুরমা ও মেঘনা নদীর অববাহিকা অঞ্চল, প্রাকৃতিক প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এই অঞ্চলকে বরাবরই একটি দুর্জেয় অঞ্চল হিসেবে দেখতে পাওয়া যেত। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ একমত পোষণ করেন যে, বৃহত্তর ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে গঠিত ছিল প্রাচীন বংগরাজ্য। গোড়ার দিকে ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর গড়সহ লালমাটির অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল প্রাচীন বংগরাজ্য। হিন্দু রাজাগণের মৌর্য শাসন এর প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তী সময় গুপ্ত ও পাল শাসকদের ইতিহাস ময়মনসিংহকে ঘিরে রেখেছে। শেষের দিকে সেন বংশীয় রাজাদের প্রশাসনিক দৌর্বল্যে মুসলমান বাদশাহগণ বাংলায় রাজত্ব কায়েমের প্রভাব ময়মনসিংহেও পড়ে। সিকান্দর শাহ-এর আমল থেকে মোঘল সাম্রাজ্য পেরিয়ে নবাবী আমল, কোম্পানী আমল এবং শেষে পাকিস্তানি শাসন-শোষণে ময়মনসিংহও প্রভাবান্বিত হয়। বিভিন্ন সূত্রে ময়মনসিংহ অঞ্চলে ৩৯টি পরগনার নাম পাওয়া যায়- ময়মনসিংহ, আলাপসিংহ, জাফরশাহী, বনভাওয়াল, পুখুরিয়া, কাগমারী, আন্টীয়া, বড় বাজু, সেরপুর, হাজবাদি, খালিয়াজুরী, জয়নশাহী,

Matrix BCS Series

কুড়ি খাই, নছরৎশাহী, লতিফপুর, মকিমাবাদ, আটগাও, ব্দলরামপুর, বরিকান্দি, বাউ খন্দ, চন্দ্রপ্রতাপ, ঈদগা, ইছকাবাদ, বায় দোম, সিংধা দরজিবাজ, কাসেমপুর, নিক্লী, সাসরদি, হাউলী, জকুজিয়াল, ইছাপুর, বরদাখতি, পাতিলা দহ, তুলন্দর, ইছপসাহী, হোসেন শাহী, হোসেনপুর, সুসঙ্গ ও নাসিরুর্জিয়াল।

জেলার নাম ময়মনসিংহ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মাঝে ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। আর ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার স্বাধীন সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তাঁর পুত্র সৈয়দ নাসির উদ্দিন নসরত শাহ'র জন্য এ অঞ্চলে একটি নতুন রাজ্য গঠন করেছিলেন, সেই থেকেই নসরতশাহী বা নাসিরাবাদ নামের সৃষ্টি। সলিম যুগের উৎস হিসেবে নাসিরাবাদ, নামটিও আজও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কোথাও উল্লেখ করা হচ্ছে না। ১৭৭৯-তে প্রকাশিত রেনেল এর ম্যাপে মোমেসিং নামটি বর্তমান 'ময়মনসিংহ' অঞ্চলকেই নির্দেশ করে। তার আগে আইন-ই-আকবরীতে 'মিহমানশাহী' এবং 'মনমনিসিংহ' সরকার বাজুহার পরগনা হিসাবে লিখিত আছে; যা বর্তমান ময়মনসিংহকেই ধরা যায়। এসব বিবেচনায় বলা যায় সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালের পূর্ব থেকেই ময়মনসিংহ নামটি প্রচলিত ছিলো। জেলা পত্তন কালে ময়মনসিংহ অঞ্চলের সমৃদ্ধ জমিদারগণ সরকারের কাছে জেলার নাম ময়মনসিংহ রাখার আবেদন করলে সরকার তা গ্রহণ করে নেন।

ময়মনসিংহ নামের বিস্তীর্ণ এ জনপদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্রের লীলাভূমি। এককালে ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ জেলা হিসেবে খ্যাত ময়মনসিংহ পরবর্তীতে প্রশাসনিক প্রয়োজনে বেশ কিছুটা ছোট হয়ে আসে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলা পৃথক জেলার স্বীকৃতি পাবার পরও ময়মনসিংহ ছিল পাক-ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা। ময়মনসিংহের ভূ-প্রকৃতিতে একদিকে নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জের বিস্তীর্ণ জলাভূমি-হাওর অঞ্চল, মধুপুর ও ভাওয়ালের বিশাল বনাঞ্চল, ময়মনসিংহ-জামালপুরের সমতল অঞ্চল, শেরপুর-ময়মনসিংহের পাহাড়ি অঞ্চল, টাঙ্গাইলের বিস্তীর্ণ বিলাঞ্চল সহ উর্বর ভূমি- এ জনপদকে দিয়েছে বৈচিত্রের সমাহার। ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্রের কারণে এ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক জীবন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জীবিকা এবং সংস্কৃতি বৈচিত্রপূর্ণ। টাঙ্গাইলের পর পর্যায়ক্রমে জামালপুর (শেরপুরসহ), কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা পৃথক জেলার মর্যাদা পাবার পরও আয়তনের দিক থেকে বর্তমান ময়মনসিংহ জেলা বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে অন্যতম। এ জেলার উর্বর ভূমি ধান, পাট, সবজি ও রবিশস্য উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী।

জেলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেলাকে দিয়েছে শিক্ষা নগরীর মর্যাদা। দেশের একমাত্র মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারী এডুকেশন, প্রথম গার্লস ক্যাডেট কলেজ এবং কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় এ জেলায় অবস্থিত। এশিয়ার বৃহত্তম-বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ সদরে স্থাপিত। যেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীরা কৃষি ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসেন। আণবিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র এবং মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ সদরেই স্থাপিত। ময়মনসিংহ দেশের প্রাচীনতম শহরগুলোর অন্যতম। এখানে অসংখ্য প্রাচীন স্থাপত্য, পুকুর-দীঘি রয়েছে। জেলা সদরের বুক চিড়ে বয়ে গেছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ। বৃটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন, পাগলপন্থী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, টংক আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ৬৯-এর গণ আন্দোলন, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধসহ গণতান্ত্রিক প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে এ অঞ্চলের সাহসী মানুষের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার স্বীকৃতি রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে জলছত্র-মধুপুর, ভালুকা,

Matrix BCS Series

ফাতেমা নগর (কালির বাজার)-এর প্রতিরোধ যুদ্ধ যেমন গুরুত্বপূর্ণ একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ তেলিখালির যুদ্ধ এবং ধানুয়া কামালপুরের যুদ্ধও।

দীর্ঘকালের হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম শাসনের ঐতিহ্য ময়মনসিংহকে সাংস্কৃতিকভাবে ধনাঢ্য করে গেছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহের ঐতিহ্যে লালিত হয়ে আসছে এই ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক বন্ধন। যেসব ব্যক্তিত্ব ময়মনসিংহের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করে গেছেন তাঁরা হলেন এখানকার জমিদারবর্গ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমেদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক আবুল কালাম শামছুদ্দিন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন প্রমুখ। বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোক সংস্কৃতিও রূপান্তরিত হয়েছে ঐতিহ্যে। ময়মনসিংহ গীতিকা বিশ্ব দরবারে অলংকৃত করেছে ময়মনসিংহের নিজস্ব পরিচয়। স্বপ্নের নকশী কাঁথায় বোনা হয়েছে এখানকার বাস্তবচিত্রের কাহিনী। মহুয়া মলুয়া থেকে জয়নুল আবেদীনের চিত্র হয়ে উঠেছে বিশ্বময় ময়মনসিংহের গৌরব গাঁথা। ঈশাখাঁর যুদ্ধ বা সখিনা-সোনাভানের কাহিনী বাতাসে ছড়ায় বীরত্বের হৃদয় ছোঁয়া বিরলপ্রভা।

জেলার ঐতিহ্য

শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের সূতিকাগার বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ১৭৮৭ সালের ১মে জেলা হিসেবে জন্মের পর বর্তমান ময়মনসিংহের আদল পায় ১৯৮৪ সালে। উত্তরে গারো পাহাড় ও ভারতের মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিণে গাজীপুর জেলা, পূর্বে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমে শেরপুর, জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলা বেষ্টিত ময়মনসিংহ জেলার ভৌগোলিক পরিবেশ বিচিত্র হওয়ায় বলা হয়-"হাওর, জঙ্গল, মইষের শিং-এ নিয়ে ময়মনসিং"। ৪,৭৮৭ বর্গমাইলের রত্নগর্ভা এ জেলার প্রাণবন্ত মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় এর নামের মাঝেই- My-men-sing অর্থাৎ আমার লোকেরা গান গায়। মহুয়া-মলুয়ার দেশ ময়মনসিংহের পূর্ব নাম ছিল নাসিরাবাদ। মোঘল আমলে মোমেনশাহ নামে একজন সাধকের নামে অঞ্চলটির নাম হয় মোমেনশাহী- কালের বিবর্তনে যা ময়মনসিংহ নামে পরিচিতি লাভ করে। ময়মনসিংহ শহরের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্র নদ। এ নদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন বহু ছবি এঁকেছিলেন। এখানকার বহু স্থাপনায় প্রাচীন নির্মাণ শৈলীর ছোঁয়া রয়েছে। আছে কালের সাক্ষী স্বরূপ ভগ্ন জমিদার বাড়ী। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিও জড়িয়ে আছে এ জেলার ত্রিশাল উপজেলার সাথে। সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ আর বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠির এক জনপদ এ ময়মনসিংহ জেলা।

পুরাকীর্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

মাথা ভাঙ্গা মঠঃ ময়মনসিংহ সদরের অন্যতম প্রাচীন স্থাপনা কোতোয়ালী থানার পাশের শিব মন্দিরটি। থানা ঘাটের এই মন্দিরটি 'মাথাভাঙ্গা মঠ' নামেও পরিচিত। এর চূড়া ১৮৮৫ ও ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ভেঙ্গে যাবার কারণে এটি মাথা ভাঙ্গা মঠ নামে পরিচিতি লাভ করে। এটিকে অষ্টাদশ শতকের স্থাপত্য বলে কেউ কেউ ধারণা করলেও এর নির্মাণ কালের তথ্য জানা যায়নি।

ব্রাহ্ম উপাসনালয়ঃ ১৮৫৪-এর পর গাঙ্গিনার পাড়ে স্থাপিত হয় ব্রাহ্মদের উপাসনালয়। পরে সেখানে স্থাপিত হয় ময়মনসিংহ ল' কলেজ। বর্তমানে মূল স্থাপনাটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

শশীলজঃ মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজা সূর্যকান্তের বসতবাড়ি শশীলজ। নিজ পুত্র (ভাতিজা ও দত্তকপুত্র) শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীর নামে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এটি নির্মিত হয়। বাড়িটি ছিল দ্বিতল ভবন। ১৮৯৭-এর ভূমিকম্পে দ্বিতল ভবনটি ভেঙ্গে যাবার পর বর্তমান বাড়িটি

Matrix BCS Series

পুনঃনির্মাণ করা হয়। দ্বিতল ভবনের সিঁড়িতে বিশেষ বাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। সিঁড়িতে মানুষ চলাচল করলেই সুমধুর বাজনা বাজতো। জানা যায়, প্যারিস থেকে মহারাজা এক লক্ষ (মতান্তরে তিন লক্ষ) টাকা ব্যয়ে স্ফটিক সঙ্গীত বাক্সটি কিনে এনেছিলেন। দ্বিতল শশীলজ ধ্বসে যাবার পর মহারাজা তার এলাকায় দ্বিতল পাকা বাড়ি নির্মাণ নিষিদ্ধ করেন। বিশাল এ বাড়িটিতে আছে অসংখ্য দুর্লভ প্রাচীন বৃক্ষ। এটি ময়মনসিংহ শহরে অবস্থিত।

গৌরীপুর হাউজঃ গৌরীপুরের সংস্কৃতিমনা জমিদারের কাষ্ঠ নির্মিত দোতলা বাড়ি এটি। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে খান বাহাদুর ইসমাইল হোসেন সড়কে রাজরাজেশ্বরী ওয়াটার ওয়ার্কস-এর পাশে এর অবস্থান। শোনা যায় দ্বিতল পাকা বাড়ি নির্মাণ নিষিদ্ধ হবার কারণে গৌরীপুরের জমিদার চীন থেকে কারিগর এনে এই কাঠের দোতলা বাড়িটি তার জামাতার জন্য নির্মাণ করেন। বর্তমানে এটি সোনালী ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আলেকজান্ডার ক্যাসেলঃ ময়মনসিংহ শহরের এক উল্লেখযোগ্য স্থাপনা আলেকজান্ডার ক্যাসেল বা আলেকজান্দ্রা ক্যাসেল। মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী ময়মনসিংহ শহরের জুবলী উৎসব পালনের জন্য তৎকালীন ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড-পত্নী সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রার নামে এই দ্বিতল ভবনটি নির্মাণ করেন। অন্য মতে, ময়মনসিংহের তৎকালীন ইংরেজ কালেক্টর আলেকজান্ডার আই, সি, এস, -এর নামে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ভবনটি নির্মাণ করা হয়। এটি মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর বাগানবাড়ি হিসেবে খ্যাত। বর্তমানে এটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

Matrix BCS

(পুরষ)-এর লাইব্রেরী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

হাসান মঞ্জিলঃ ধনবাড়ির জমিদারদের সুদৃশ্য ভবন। রাজ রাজেশ্বরী ওয়াটার ওয়ার্কস- এর পেছনে এ বাড়িতে একসময় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা অফিস ছিল। বর্তমানে ব্যবহার অনুপোযোগী বলে পরিত্যক্ত।

ধলার জমিদারদের বাড়িঃ হাসান মঞ্জিলের বিপরীতে একই রাস্তায় অবস্থিত। বর্তমানে সরকারী কর্মচারীদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তালজাঙ্গা হাউজঃ কিশোরগঞ্জ জেলার তারাইল উপজেলার তালজাঙ্গার জমিদারদের বসতবাড়ি। সি কে ঘোষ রোড রেলক্রসিং এর পাশে। বর্তমানে আলমগীর মনসুর (মিন্টু) মেমোরিয়াল কলেজ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

চাকলাদার হাউজঃ সেহড়া। হোমিও মেডিকেল কলেজ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বর্তমানে।

রামগোপালপুর জমিদার বাড়িঃ কালিবাড়ি রোডের বাড়িটি বর্তমানে সরকারী কর্মচারীদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বুধা বাবুর দোতলাঃ মহারাজা রোডের সুদৃশ্য এ বাড়িতে বর্তমানে সরকারের কৃষি বিভাগের খামার বাড়ির উপপরিচালকের দপ্তর অবস্থিত।

অঘোর বন্ধু গুহের বাড়িঃ শহরের প্রধান সড়ক রামবাবু রোডের এ বাড়িটি বর্তমানে ময়মনসিংহ কলেজ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মদন বাবুর বাড়িঃ মদন বাবু রোডের এ বাড়িটি বর্তমানে সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে যাদুঘর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মসুয়ার জমিদার বাড়িঃ হরিকিশোর রায় রোডের এ বাড়িটি সত্যজিৎ রায়ের প্রপিতামহ হরিকিশোর রায়ের বাড়ি। বাড়ির আদি নাম 'পূণ্যলক্ষ্মী ভবন' বর্তমান পরিবর্তিত নাম 'দুর্লভ ভবন'। বাড়িটি বর্তমানে কমিউনিটি সেন্টার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এসব স্থাপনা ছাড়াও গৌরীপুরের মাওহা ইউনিয়নের কুমড়ি গ্রামে বীরঙ্গনা সখিনার মাজার নানান কারণে গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে পতিব্রতা সখিনার পিতা দেওয়ান উমর খাঁর বিরুদ্ধে তার স্বামী ফিরোজ খাঁকে (ঈশা খাঁর নাতি হিসেবে পরিচিত) উদ্ধার করার জন্য পুরুষের পোশাক পরে যুদ্ধ করেন বীরনারী সখিনা এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বামীর তালাক দেয়ার সংবাদ পেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া ১৮৬৭ তে প্রতিষ্ঠিত হয় দূর্গাবাড়ি মন্দির। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ আশ্রম। এছাড়াও আছে দূর্গাবাড়ি সংলগ্ন দশভূজা বাড়ি, জুবলি ঘাটের রঘুনাথ জিউর আখড়া, মহারাজা রোডের কানাই-বলাই মন্দির, কালিবাড়ির জগদ্বন্ধু আশ্রম, মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ির সংলগ্ন শিব মন্দির, আটানি পুকুর পাড়, জোড়া মন্দির, ঈশ্বরগঞ্জ বাজার মন্দির ইত্যাদি।
খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের গীর্জার মধ্যে ময়মনসিংহ আঞ্জুমান ঈদগাহ মাঠের বিপরীতে স্থাপিত ব্যাপ্টিস্ট গীর্জা, ব্রহ্মপুত্র কূল ঘেঁষে সার্কিট হাউসের পাশে অ্যাংলিকন গীর্জা এবং ভাটিকাশর সাধু প্যাট্রিক ক্যাথলিক মিশন শতবর্ষেরও প্রাচীন; হালুয়াঘাট বিরইডাকুনি ক্যাথলিক মিশন (১৯২৮), হালুয়াঘাট উত্তর বাজার অক্সফোর্ড চার্চ (এ্যাংলিকন চার্চ), রাংরাপাড়া গারো ব্যপ্টিস্ট কনভেনশন মিশন, বেতকুড়ি ব্যাথেল চার্চ; ধোবাউড়ার ঘোষগাঁও ভালুকা পাড়া ক্যাথলিক মিশন প্রাচীন স্থাপনার অন্যতম। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ময়মনসিংহ জেলা সদরের উল্লেখযোগ্য স্থাপনার মধ্যে ময়মনসিংহ পৌরসভা ভবন (পুরাতন), মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের বিপরীতে নাটোর জমিদারদের বাসাবাড়ি, ব্রহ্মপুত্র তীরে খানবাহাদুর ইসমাইল রোডে করোটিয়া, আমবাড়িয়া, গৌরীপুর, কালীপুর, গোলকপুর, সুসং-দুর্গাপুর, নারায়নডহর প্রভৃতি জমিদারদের বড় বড় বাসাবাড়ি। ধনবাড়ি, ধলা, গাঙ্গাটিয়া, আঠারবাড়ি, ডোহাখোলার জমিদারদের বাসাবাড়ি। বৈলর, তালজাঙ্গা, রামগোপালপুর, কিষ্টপুর, ধিতপুর জমিদারদের বাড়ি, সেহড়ায় চাকলাদার বাড়ি ইত্যাদি অসংখ্য প্রাচীন স্থাপনা। বেশ কিছু সময়ের বিবর্তনে আজ অনুপস্থিত, কিছু কিছু সংস্কারের কারণে বেশ কিছুটা পরিবর্তিত এবং বাকিগুলো বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

Matrix BCS Series

জেলার ঐতিহ্য বিবেচনায় মুক্তাগাছার গোপাল পালের মন্ডা ও ময়মনসিংহের মালাই কারীর খ্যাতি দেশে এবং এদেশের বাইরেও। গফরগাঁও ও বরুকা-ফুলবাড়িয়ার বেগুন, ফুলবাড়িয়ার হলুদ, বিরুই চাল ও আনারস, ভালুকার কাঁঠাল ইত্যাদির খ্যাতি আছে দেশ জুড়ে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা: শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের একটি শাখা। সংগ্রহশালাটি ময়মনসিংহ জেলাধীন সদর উপজেলার কাশর মৌজাস্থ সাহেব কোয়ার্টার এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদ তীরবর্তী অত্যন্ত নৈসর্গিক ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশে ০৩.১৯৫ একর জমির উপর অবস্থিত। সাধারণের শিল্প ভাবনাকে উৎসাহিত করতে এবং চিত্রকলার আন্দোলনকে বিকেন্দ্রীকরণ অর্থ্যাৎ ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে জয়নুলের শৈশবের স্মৃতি ঘেরা শহর ময়মনসিংহে শিল্পাচার্যসহ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, গুণীজন, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ এবং ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন সম্মিলিতভাবে সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণের ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তৎকালীন মহামান্য উপ-রাষ্ট্রপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম ০১ বৈশাখ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ (১৫ এপ্রিল ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ) শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার শুভ উদ্বোধন করেন। ৩১-০৮-১৯৯৯খ্রি. থেকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের একটি শাখা হিসাবে সংগ্রহশালাটি পরিচালিত হচ্ছে। সংগ্রহশালায় মোট ০৩টি গ্যালারিতে জয়নুলের শিল্পকর্ম, ব্যক্তিগত স্মৃতি নিদর্শন ও স্থির আলোকচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। মূল ভবনের দ্বিতীয় তলায় গ্যালারিগুলো অবস্থিত। বিভিন্ন মাধ্যমে কাগজ, বোর্ড ও ক্যানভাসে আঁকা শিল্পাচার্যের ৬১টি মূল শিল্পকর্ম ও ০১টি শিল্পকর্মের ডিজিটাল অনুকৃতিসহ মোট ৬২টি শিল্পকর্ম, শিল্পাচার্যের ব্যবহৃত ৮২টি নিদর্শন, শিল্পাচার্যের ৫৩টি স্থির আলোকচিত্র, ০৪টি বোর্ডে জয়নুলের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত, ০১টি সংগ্রহশালার কি-লেবেল এবং জয়নুলের ০১টি পোর্ট্রেইট প্রদর্শিত হচ্ছে।

শিল্পাচার্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: শিল্প সংস্কৃতির পরিমন্ডলে বাংলাদেশ তথা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমকালীন শিল্পকলার একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, প্রকৃতি ও মানবতাবাদের শিল্পী, বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পধারার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। তিনি বাংলাদেশের শিল্পচর্চা ও শিল্পকলা আন্দোলনের পথিকৃৎ। তিনি তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার মাধ্যমে বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পকলাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মে ৬২ বছর বয়সে ঢাকার তৎকালীন পোস্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতাল, শাহবাগে (বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত চারুকলা ইন্সটিটিউটের

পাশে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। মহান শিল্পীর শৈশব কৈশোরের স্মৃতি বিজড়িত ব্রহ্মপুত্র নদ তীরবর্তী নৈসর্গিক দৃশ্য পরিবেষ্টিত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা। শিল্পী তাঁর জীবদ্দশায় এ স্থানটিতে প্রায়ই আসতেন এবং ছবি আঁকতেন।

প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্রের লীলাভূমি মনোময় ময়মনসিংহ। এ জনপদের আছে দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য। সমাজ সংস্কার-শিল্প-সাহিত্য-সাংবাদিকতা-শিক্ষা-রাজনীতি-চিকিৎসাসহ নানা অঙ্গনে কালপরিক্রমায় যুগে যুগে মানুষের অংশগ্রহণ যেমন অনিবার্য ছিলো একইভাবে অংশগ্রহণকারী বিপুল জনগোষ্ঠী থেকে কেউ কেউ হয়ে উঠেছেন অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'জন

ব্যক্তিত্বের পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলোঃ

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলামঃ জন্ম ১৯২৫, মৃত্যু ৩ নভেম্বর ১৯৭৫। শিক্ষাবিদ-আইনজীবী ও রাজনীতিক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরোধা পুরুষ। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ১৯৭১-এ তিনি নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশের বিপ- বী সরকারকে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সকল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শহীদ হবার পর ৩রা নভেম্বর কারা অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন জাতীয় চার নেতার একজন সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

আনন্দ মোহন বসুঃ জন্ম ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৪৭, মৃত্যু ২০ আগস্ট ১৯০৬। জন্মস্থান জয়সিদ্ধি, ইটনা, কিশোরগঞ্জ। পিতা- পদ্মলোচন বসু। শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, সমাজসেবক, রাজনীতিক ও সংগঠক।

আব্দুল ওয়াহেদ বোকাইনগরীঃ জন্ম উনবিংশ শতকের শেষার্ধ। জন্মস্থান বোকাইনগর, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। রাজনীতিক ও সুবক্তা।

আব্দুল জব্বারঃ জন্ম ১৯১৯, মৃত্যু ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। জন্মস্থান পাঁচুয়া, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ। ভাষা আন্দোলনে শহীদ আব্দুল জববার ১৯৫২ এর ২১ ফেব্রয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মুত্যুবরণ করেন। ২০০০ সালে তাকে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

আব্দুল জব্বার শেখঃ জন্ম ১৮৮১, মৃত্যু ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮। জন্মস্থান বনগ্রাম, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ। সাহিত্যিক ও সমাজসেবী। অসংখ্য ধর্মীয় গ্রন্থের রচয়িতা।

আব্দুল হাই মাশরেকীঃ জন্ম ১ এপ্রিল ১৯১৯, মৃত্যু ১৯৯২। জন্মস্থান দত্তপাড়া, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। পিতা- উছমান গনি সরকার। কবি, গীতিকার, নাট্যকার ও গল্পকার।

খান সাহেব আব্দুল্লাহঃ জন্ম ১৮৯৮, মৃত্যু ১৯৮৩। জন্মস্থান নাওরা, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। পিতা- আলী নেওয়াজ আহম্মদ। লেখক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংগঠক। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-শুক্রবাসরীয় সাহিত্য সংসদ। 'মোমেনশাহীর নতুন ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা।

আবুল কালাম শামসুদ্দিনঃ জন্ম ৩ নভেম্বর ১৮৯৭, মৃত্যু ৪ মার্চ ১৯৭৮। জন্মস্থান ধানিখোলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ। সাংবাদিক, রাজনীতিক ও সাহিত্যিক।

আবুল মনসুর আহমদঃ জন্ম ৩ নভেম্বর ১৮৯৮, মৃত্যু ১৮ মার্চ ১৯৭৯। জন্মস্থান ধানিখোলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ। পিতা- আব্দুর রহিম ফরাজী। পৈতৃক নাম আহমদ আলী ফরাজী। আইনজীবী, সাংবাদিক ও রাজনীতিক। বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যঙ্গ সাহিত্যিক। পাকিস্তানের মন্ত্রী ছিলেন।

মোঃ আলতাব আলীঃ জন্ম ১৯০৭, মৃত্যু ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০। জন্মস্থান সেহড়া ময়মনসিংহ। পিতা- ডেঙ্গু ব্যাপারী। প্রগতিশীল রাজনীতিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

কলম আলী উকিলঃ জন্ম ১৯০২, মৃত্যু ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৩। জন্মস্থান ঈশ্বরগ্রাম, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। পিতা মোঃ আলিম উদ্দিন মীর্জা। আইনজীবী সমাজসেবী ও রাজনীতিক। প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য (১৯৫৪)।

কেদার নাথ মজুমদারঃ জন্ম ২৬ জৈষ্ঠ ১২৭৭, মৃত্যু ৬ জৈষ্ঠ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ। পিতা লোকনাথ মজুমদার। লেখক, সংস্কৃতি সংগঠক, সাংবাদিক, ঐতিহ্য অনুসন্ধানী। মৈমনসিংহ গীতিকা'র সংগ্রাহক।

গোলাম সামদানী কোরায়শীঃ জন্ম ৬ এপ্রিল ১৯২৯, মৃত্যু ১১ অক্টোবর ১৯৯১। শিক্ষাবিদ-চিন্তাবিদ-পন্ডিত ও লেখক। শিক্ষক নেতা। প্রগতিশীল চিন্তার পুরোধা ব্যক্তিত্ব। অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা।

রাজা জগৎ কিশোর আচার্য চৌধুরীঃ জন্ম ১২৬৯, মৃত্যু ২২ চৈত্র ১৩৪৫। মুক্তাগাছার মহৎপ্রাণ জমিদার। তাঁর দানশীলতা কিংবদন্তীতুল্য।

শিল্পাচার্যজয়নুল আবেদিনঃ জন্ম ২৯ ডিসেম্বর ১৯১৪, মৃত্যু ২৮ মে ১৯৭৬। ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলার মন্বন্তরের আঁকা তার স্কেচসমূহ বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে তিনি আধুনিক চিত্রকলার পথিকৃৎ। চারকলা ইনস্টিটিউট, সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারশিল্প ফাউন্ডেশন এবং

Matrix BCS Series

ময়মনসিংহ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিত্রকর। সর্বভারতীয় চারকলা প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক (১৯৩৮), রকফেলার ফাউন্ডেশন ফেলোশীপ (১৯৫৬-৫৭), পাকিস্তানের সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাইড অফ পারফরমেন্স (১৯৫৯), মরণোত্তর স্বাধীনতা দিবস পদক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্মানসূচক ডক্টরেটে ভূষিত হন।

ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাঃ জন্ম ১০ জুলাই ১৯২০, মৃত্যু ২৭মার্চ ১৯৭১। জন্মস্থান ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ। শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল শিক্ষক ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের আবাসিক ভবনে থাকাকালে গুলিবিদ্ধ হন এবং ২৭ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

নলিনীরঞ্জন সরকারঃ জন্ম ১৮৮২, মৃত্যু ২৫ জানুয়ারি ১৯৫৩। পিতা- চন্দ্রনাথ সরকার। ১৯৫৩-এ যুক্তফ্রন্টে ফজলুল হক মন্ত্রী সভায় অর্থমন্ত্রী, ১৯৪১-এ শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও ভূমিমন্ত্রী এবং ১৯৪৩-এ বাণিজ্য ও খাদ্য মন্ত্রী। ১৯৪৮-এ পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী এবং ১৯৪৯-এ অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ব্রহ্মপুত্র তীরে তার বাসভবনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালা।

মনোরঞ্জন ধরঃ জন্ম ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪, মৃত্যু ১৯৮৬। পিতা- জগৎচন্দ্র ধর। আইনজীবী ও রাজনীতিক। কংগ্রেসের রাজনীতি করতেন। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রীসভার আইনমন্ত্রী হিসেবে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

মুজিবুর রহমান খান ফুলপুরীঃ জন্ম ১৮৮৯, মৃত্যু ৫ জানুয়ারি ১৯৬৯। জন্মস্থান পাগলা, ফুলপুর, ময়মনসিংহ। পিতা- সরল খাঁ। সাংবাদিক-রাজনীতিক ও সুবক্তা। সাপ্তাহিক চাষী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক।

মোস্তফা এম এ মতিনঃ জন্ম ১ আগস্ট ১৯৩৪, মৃত্যু ২০০৪। জন্মস্থান সাতেঙ্গা, ভালুকা, ময়মনসিংহ। আইনজীবী-রাজনীতিক ও সমাজসেবী। ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় পরিষদ সদস্য।

রফিক উদ্দিন ভূঞাঃ জন্ম ২৫ জানুয়ারি ১৯২৬, মৃত্যু ১৯৯৪। পিতা- ওয়াফিজ ভূঞা। জন্মস্থান মেরেঙ্গা, নান্দাইল, ময়মনসিংহ। রাজনীতিক-সংগঠক ও সমাজসেবী। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটি আন্দোলনে ময়মনসিংহে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহের অবিসংবাদিত নেতা। একাধিক বার জাতীয় সংসদ সদস্য।

শামসুল হুদা পাঁচবাগীঃ জন্ম ১৮৬৯, মৃত্যু ৮ আক্টোবর ১৯৮৮। জন্মস্থান পাচবাগ, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ। পিতা- মওলানা রিয়াজ উদ্দিন আহম্মদ। ধর্মীয় আলেম, পীর, রাজনীতিক ও সমাজসেবী। বিজ্ঞানমনস্ক আলেম হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়।
উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও নানান বিবেচনায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের নাম ময়মনসিংহের ইতিহাসে গুরত্বপূর্ণ এবং অবশ্যই গুরত্বপূর্ণ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেইসব বীর সন্তানেরা, যারা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন অথবা সাহসিকতার সাথে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেশমাতৃকার জন্য লড়াই করেছেন।
ময়মনসিংহ জেলার সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের তালিকা বেশ দীর্ঘ। নিচে বিভিন্নক্ষেত্রে সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করা হলো।

Matrix BCS Series

শিক্ষাক্ষেত্রেঃ মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী, সৈয়দ বদরদ্দিন হোসাইন, গোপীনাথ দত্ত, সোফিয়া খান, আশুতোষ পাল, আ আ ম আবদুশ শাকুর, অধ্যক্ষ আবদুল হাই, আজিমুদ্দিন মাস্টার, ব্রজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত প্রমুখ।

সাহিত্যক্ষেত্রেঃ হেলেনা খান, গোলাম সামদানী কোরায়শী, যতীন সরকার, আবদুল হাই আল হাদী, শহীদ আখন্দ, হারুন অর রশিদ, নীলু দাস, স্বপন ধর, আমজাদ হোসেন প্রমুখ।

সঙ্গীত ক্ষেত্রেঃ বজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, উপেন্দ্র রায়, বিপিন দাস, গৌরাঙ্গ আদিত্য, করুণাময় গোস্বামী, আলোকময় নাহা, বদরুল হুদা, মিথুন দে, বাদল চন্দ, ইমদাদুল হক, ধীরেশ আচার্য, বিশ্বদেব ভট্টাচার্য, কেনুরায়, কেশব বন্দোপাধ্যায়, নাজিরুল ইসলাম মনি, সুমিতা নাহা, সমীর চন্দ কটন, আবদুল নঈম, মোতাহার হোসেন বাচ্চু, নূরুল আনোয়ার, আবদুর রশীদ মিয়া, বিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, সুনীল ধর, সুনীল কর্মকার, সারোয়ার চৌধুরী, পবিত্র দে, মিতালী মুখার্জী, শাহাবুদ্দিন আহম্মদ খান, আফজালুর রহমান জিতু প্রমুখ।

নৃত্যক্ষেত্রেঃ পীযূষ কিরণ পাল, যোগেশ চন্দ্র দাস, ইউনুস আহমেদ বাবলু প্রমুখ।

নাট্যক্ষেত্রেঃ ওসমান গনী মহারাজ, সুধীর দাস, এ এফ এম আব্দুল আলী লালু, সিরাজুল হক মন্টু, এম এম ফেরদৌসী, আশীষকুমার লৌহ, এম এন আলম তোতা, রুস্তম আলী মাস্টার, মোয়াজ্জেম হোসেন, এম এ করিম, ছাদেকুর রহমান ছাদু, আউলাদ হোসেন তারা, ফজর আলী, আকরাম আলী, এ এফ এম বদরজামান, মাহমুদ সাজ্জাদ, প্রদ্যুত সেন, অরবিন্দ সরকার জীবন, গোলাম রফিক প্রমুখ।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেঃ মাখনলাল লাহিড়ী, মোমতাজ উদ্দিন, সৈয়দ আহমেদ, এ জেড এম হাবিবুল্লাহ প্রমুখ।

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেঃ হযরত বোরহান উদ্দীন (রঃ) (বুড়াপীর), মওলানা মো: আশরাফ আলী (জামিয়া ইসলামিয়ার সাবেক অধ্যক্ষ), মওলানা নূরুল ইসলাম (জামিয়া আশরাফিয়ার অধ্যক্ষ), মওলানা মুজিবুর রহমান (জামিয়া ইসলামিয়ার প্রাক্তন অধ্যক্ষ) প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাজার কেন্দ্রিক আউলিয়া দরবেশগণ বিভিন্ন মহলে ভক্তদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ এবং গ্রহণীয়। ময়মনসিংহ জেলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মাজার এবং কয়েকজন উল্লেখযোগ্য আধ্যাত্মিক

সাধকের কথা তুলে ধরা হলোঃ

হযরত ছমির উদ্দিন মীর (রঃ) ও হযরত খমির উদ্দিন মীর (রঃ)- দুজন পিতা-পুত্র। দুজনের মাজার শম্ভুগঞ্জ বাজার পেরিয়ে নেত্রকোনা সড়কের পাশে শতবর্ষী বিশাল বকুল তলায়। প্রতিবছর ৩০শে ফাল্গুন থেকে ২ দিন ব্যাপি ওরশ অনুষ্ঠিত হয় এখানে। দিন রাত ধরে চলে ধর্মীয় আলোচনা, জিকির, বাউল ও মুর্শিদী গান।

চুপশাহ (রঃ)- চিশতিয়া তারিকার পীর চুপশাহ (র:)-এর মাজার পুলিশলাইনে, ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল সড়কের পাশে।

হযরত খাজা সাইফুদ্দিন মুজাদ্দেদিয়া (রঃ)- শম্ভুগঞ্জে লালকুঠির পীর হযরত খাজা ইফসুফ আলী এনায়েতপুরীর পুত্র হযরত খাজা সাইফদ্দিন (র:) ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জে এসে খানকা চালু করেন গত শতকের মাঝামাঝি।

Matrix BCS Series

হযরত কেরামত আলী শাহ্ (রঃ)- শানকিপাড়া মাজার রোডে রয়েছে কেরামত আলী শাহ্ মাজার।
হযরত বসরত উল্লাহ (মেদিনীপুরী)- নওমহল এলাকায় শরিয়ত পন্থি পীর বসরত উল্লাহ ভক্তদের মাঝে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হন।

মেছেন ফকিরঃ শম্ভুগঞ্জ বাজারের আগে তিতুমীরের বাঁশের কিল্লার আদলে মেছেন ফকিরের মাজার। এছাড়া ফুলবাড়িয়া উপজেলার দেওখলার মাওলানা আব্বাস আলী বিশিষ্ট আলেম হিসাবে খুবই সমাদৃত ছিলেন।

সমাজসেবা ক্ষেত্রেঃ খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল, ডাঃ কে জামান, সোফিয়া করিম, এডভোকেট এম জোবেদ আলী, এডভোকেট আনিসুর রহমান খান প্রমুখ।

রাজনীতি ক্ষেত্রেঃ মাওলানা আলতাব হোসেন, জ্যোতিষ বসু, মনোরঞ্জন ধর, মহাদেব সান্যাল, সৈয়দ আবদুস সুলতান, মোঃ শামছুল হক, মোক্ষদাচরণ দাস, শামসুল হুদা চৌধুরী, মীর কফিল উদ্দিন লাল মিয়া, এডভোকেট ঈমান আলী প্রমুখ।

অন্যান্য ক্ষেত্রেঃ বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরী (সাবেক রাষ্ট্রপতি), বিচারপতি আবদুর রউফ (সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার), প্রশাসনে নুরুল কাদের খান ও ড. শাহ্ মোহাম্মদ ফরিদ, ম হামিদ (সংস্কৃতি), সৈয়দ লুৎফুল হক (চিত্রশিল্পী), অধ্যাপক শাহতাব উদ্দিন আহমেদ (চিত্রশিল্পী), দেবীনাস সাংমা (বিশিষ্ট ফুটবলার), শহীদ শাহেদ আলী (ক্রীড়াবিদ), অধ্যাপক তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (ফুটবলার ও সংগঠক), নাইব উদ্দীন আহমেদ (আলোকচিত্রী), শহীদ আনোয়ার হোসেন সুরজ (ক্রীড়াবিদ), এল রহমান মাখন (ক্রীড়াবিদ) প্রমুখ।

Facebook Page: Matrix BCS Series

Matrix BCS Series

মুন্সিগঞ্জ জেলা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর নং: ২

সেক্টর কমান্ডার:

- মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল- সেপ্টেম্বর);
- মেজর এ. টি. এম. হায়দার (সেপ্টেম্বর- ডিসেম্বর)

উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা:

- আব্দুল হালিম চৌধুরী বীরবিক্রম
- মো. ইদ্রিস আলী খান বীরবিক্রম

Matrix

কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি:

- শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর (বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ)
- জগদীশ চন্দ্র বসু
- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (একজন বাঙালী যিনি সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন)
- সরোজিনী নাইডু (ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী মহিলা নেতা ছিলেন)
- সত্যেন সেন ('বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী'র প্রতিষ্ঠাতা)
- জিতেন ঘোষ (ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পুরোধা ছিলেন)
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যিক)
- বুদ্ধদেব বসু (কবি)
- সমরেশ বসু (বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা ছোটগল্পকার ও ঔপন্যাসিক)
- শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (আজকের উভয় বাংলার নন্দিত ঔপন্যাসিক)

সংসদীয় আসন: ৩টি

১৭১	মুন্সিগঞ্জ-১	মাহী বদরুদ্দোজা চৌধুরী	বিকল্পধারা বাংলাদেশ
১৭২	মুন্সিগঞ্জ-২	বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৭৩	মুন্সিগঞ্জ-৩	মৃনাল কান্তি দাস	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

Matrix BCS Series

জেলার পুরাতন নাম: ইদ্রাকপুর/ বিক্রমপুর;

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৪

উপজেলা: ৬টি;

ইউনিয়ন: ৬৭টি

অবস্থানঃ মুন্সীগঞ্জ জেলাটি ২৩:২৯ থেকে ২৩:৪৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০:১০ থেকে ৯০:৪৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবিস্থিত।

আয়তনঃ ৯৫৪.৯৬ বর্গ কিঃ মিঃ

সীমানাঃ পূর্বে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও হোমনা উপজেলা, চাদঁপুর জেলার মতলব উপজেলা যা মুন্সীগঞ্জের সাথে প্রবাহিত মেঘনা নদীর দ্বারা বিভাজিত। পশ্চিমে শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলাকে পদ্মা নদী বিভাজিত করেছে। উত্তরে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ ও দোহার উপজেলা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলা। দক্ষিণে পদ্মা নদী যার অপর পার্শ্বে শরিয়তপুর জেলা।

উপজেলার আয়তন

গজারিয়া উপজেলার আয়তন	১৩০.৯২ বর্গ কিলোমিটার
লৌহজং উপজেলার আয়তন	১৩০.১২ বর্গ কিলোমিটার
মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার আয়তন	১৬০.৭৯ বর্গ কিলোমিটার
সিরাজদিখান উপজেলার আয়তন	১৮০.১৯ বর্গ কিলোমিটার
শ্রীনগর উপজেলার আয়তন	২০২.৯৮ বর্গ কিলোমিটার
টঙ্গীবাড়ী উপজেলার আয়তন	১৪৯.৯৬ বর্গ কিলোমিটার

সীমান্তবর্তী জেলা সমূহ : পূর্বে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও হোমনা উপজেলা, চাদপুর জেলার মতলব উপজেলা যা মুন্সীগঞ্জের সাথে প্রবাহিত মেঘনা নদীর দ্বারা বিভাজিত। পশ্চিমে শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলাকে পদ্মা নদী বিভাজিত করেছে। উত্তরে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ ও দোহার উপজেলা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলা। দক্ষিণে পদ্মা নদী যার অপর পার্শ্বে শরিয়তপুর জেলা।

ভূপ্রকৃতি : নুপ্রকৃতি মুন্সীগঞ্জ সমতল এলাকা নয়। জেলার কিছু কিছু অঞ্চল যথেষ্ট উঁচু যদিও জেলায় কোনো পাহাড় নেই। মুন্সীগঞ্জের বেশির ভাগ এলাকা নিম্নভূমি বলে বর্ষায় পানিতে অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়ে।

প্রধান নদ-নদী: মুন্সীগঞ্জ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদী: পদ্মা, মেঘনা, ছোট ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, ইছামতি, ইত্যাদি।

জলবায়ু: মুন্সীগঞ্জের জলবায়ু সমভাবাপন্ন আর্দ্রতাযুক্ত। এখানকার জলবায়ু ঋতু বিশেষে পরিবর্তশীল। মুন্সীগঞ্জ বর্ষাপ্রধান স্থান। গ্রীস্মকালে এলাকার অনেক স্থান পানি শূন্য হয়ে পড়ে। ঝড়বৃষ্টির প্রকোপও এই এলাকায় যথেষ্ট। শীতকালে শীতের তীব্রতা দেশের অন্যান্য স্থানের মতো তত প্রবল নয়। এলাকাটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলভুক্ত।

যে নদীর তীরে অবস্থিত: ধলেশ্বরী

জনসংখ্যাঃ ১৪,৪৫ ,৬৬০ জন(সুত্রঃ বিবিএস)

Matrix BCS Series

শিক্ষার হারঃ ৫৬.১% (সূত্রঃ বিবিএস)

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সঃ ০৬ টি

পৌরসভাঃ ০২ টি

আবাসন/আশ্রয়ন প্রকল্পঃ ২১ টি

আদর্শ গ্রামঃ ০৮ টি

স্কুলের সংখ্যা:

- **প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ** সরকারী ৫০৪টি, বেসরকারী রেজিঃকৃত ৩৪টি = মোট ৬১০ টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও সরকারী ৩টি, বেসরকারী ৮৫টি, বেসরকারী জুনিয়র ১১টি = মোট ৯৯টি
- **কলেজের সংখ্যাঃ** সরকারী ৪টি, বেসরকারী ৯টি = মোট ১৩টি
- **জেনারেল হাসপাতালের সংখ্যাঃ** ০১ টি

দর্শনীয় স্থান:

- ইদ্রাকপুর দুর্গ
- পদ্মা রিসোর্ট
- মাওয়া রিসোর্ট
- হযরত বাবা আদম শহীদ (র.) এর মসজিদ
- বার আউলিয়ার মাজার
- অতীশ দীপঙ্করের পন্ডিত ভিটা
- রাজা বল্লাল সেনের দিঘী বা রামপালের দিঘী।

জেলার ঐতিহ্য: নৌকাবাইচ, প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির, মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর তথা রামপালের কলা

Matrix BCS Series

জেলার পটভূমি

জেলার সৃষ্টির ইতিহাস:

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। এই দেওয়ানীকে প্রথম রাজস্ব প্রশাসন হিসেবে অভিহিত করা যায়। সে সময় মুন্সিগঞ্জ ঢাকা জেলার অংশ ছিলো। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে মিঃ মিডেলটন স্বাধীনভাবে রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি সর্বোচ্চ জমিদারি ডাককারীদের অনুকুলে মহালগুলো লিজ দিয়ে ছিলেন। এদিকে লিজ প্রাপ্ত জমিদারগণ আবার সাব লিজ দিতে থাকলেন। স্বাভাবিকভাবেই রাজস্ব প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ১৭৭৬ থেকে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাদেশিক কাউন্সিল কাজ করে।

ঢাকা কালেক্টটের আওতায় ১৯৪৭ সালে মুন্সিগঞ্জ মহকুমা সৃস্টি হয়,জনাব কে এস এইচ চৌধুরি ই পি সি এস মুন্সিগঞ্জের প্রথম এস ডি ও ছিলেন। জনাব চৌধুরী ২২-০৮-১৯৪৭ থেকে ১৭-০৭-১৯৪৯ পর্যন্ত এস ডি ও পদে দায়িত্ত পালন করেন। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে মুনশিগঞ্জ জেলা ঘোষণা করা হয়। এর আগে জেলার প্রশাসনিক কাজ নিয়ন্ত্রিত হতো ঢাকা থেকে। মুন্সীগঞ্জের প্রথম জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম তিনি এ জেলায় ০১-০৩-১৯৮৪ থেকে ১৯-০৬-১৯৮৪ পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের দায়িত্ত পালন করেন।

জেলা প্রশাসনের প্রধান হলেন জেলা প্রশাসক। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টরও। তাঁকে সহায়তা করার জন্যে রয়েছেন তিনজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, একজন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপ পরিচালক স্থানীয় সরকার, রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, নেজারত ডেপুটি কালেক্টরসহ বেশ ক'জন সহকারী কমিশনার ও বিভিন্ন কর্মকর্তা। তিনি সাধারণ প্রশাসন, রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বিচার ক্ষমতাও তাঁর রয়েছে। জেলার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও জেলা রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যাস্ত ।

জেলা প্রশাসনের অধঃস্তন প্রশাসন হচ্ছে উপজেলা প্রশাসন। এই প্রশাসনের প্রধান হচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। তাঁকে সহায়তা করার জন্যে রয়েছেন সহকারী কমিশনার (ভূমি)সহ অন্য কর্মকর্তাগণ। সময়ের বিবর্তনে মানুষের প্রয়োজনে ভিন্ন মাত্রা যোগ হলেও কেন্দ্রিয় সরকারের প্রতিভু হিসেবে জনগনকে সেবাপ্রদানের কাজটিই জেলা প্রশাসনের প্রধান কাজ হিসেবে রয়ে গেছে।

মানচিত্রে জেলা

পূর্বে- কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও হোমনা উপজেলা, চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলা যা মুন্সীগঞ্জের সাথে প্রবাহিত মেঘনা নদীর দ্বারা বিভাজিত।

পশ্চিমে-শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলাকে পদ্মা নদী বিভাজিত করেছে।

উত্তরে-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ ও দোহার উপজেলা এবং নারাণগঞ্জ জেলার বন্দও উপজেলা।

দক্ষিণে-পদ্মা নদী যার অপর পাশে শরিয়তপুর জেলা।

Matrix BCS Series

ভৌগলিক পরিচিতি

আজকের মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রাচীন বাংলার গৌরবময় স্থান বিক্রমপুরের অংশ। মুন্সিগঞ্জ সে সময়ে একটি গ্রাম ছিল ইদ্রাকপুর। কথিত আছে, মোঘল শাসন আমলে এই ইদ্রাকপুর গ্রামে মুন্সী হায়দার হোসেন নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মোঘল শাসকদের দ্বারা ফৌজদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। অত্যন্ত সজ্জন ও জনহিতৈষী মুন্সী হায়দার হোসেনের নামে ইদ্রাকপুরের নাম হয় মুন্সিগঞ্জ। ১৯৪৫ সালে বৃটিশ ভারতের প্রশাসনিক সুবিধার্থে মুন্সিগঞ্জ থানা ও মহকুমা হিসেবে উন্নীত হয়। ১৯৮৪ সালে ১ মার্চ মুন্সিগঞ্জ জেলায় রূপান্তরিত হয়।

ভূমির আকৃতিঃ মুন্সিগঞ্জ সমতল এলাকা নয়। জেলার কিছু কিছু অঞ্চল যথেষ্ট উচু যদিও জেলায় কোনো পাহাড় নেই। মুন্সিগঞ্জের বেশির ভাগ এলাকা নিম্নভূমি বলে বর্ষায় পানিতে অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়ে।

অবস্থানঃ মুন্সিগঞ্জ জেলাটি ২৩.২৯ থেকে ২৩.৪৫ উত্তর অক্ষাংশ ৯০.১০ থেকে ৯০.৪৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবিস্থিত।

ভৌগলিক সীমারেখাঃ পূর্বে-কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও হোমনা উপজেলা, চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলা যা মুন্সিগঞ্জের সাথে প্রবাহিত মেঘনা নদীর দ্বারা বিভাজিত।

জলবায়ুঃ মুন্সিগঞ্জের জলবায়ু সমভাবাপন্ন। তবে আর্দ্রতা ও দূষনযুক্ত এলাকার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এখানকার জলবায়ু ঋতু বিশেষে পরিবর্তনশীল। শীতকালে শীতের তীব্রতা দেশের অন্যান্য স্থানের মতো তত প্রবল নয়। এলাকাটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলভূক্ত।

আয়তনঃ মোট আয়তন ২৩৫৯৭৪ একর যার মধ্যে ১৩৮৪৭২ একর চাষযোগ্য এবং ৫৬০৯ একর নিচু জমি।

নামকরণঃ

আজকের মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রাচীন বাংলার গৌরবময় স্থান বিক্রমপুরের অংশ। মুন্সীগঞ্জ সে সময়ে একটি গ্রাম ছিল ইদ্রাকপুর। কথিত আছে, মোঘল শাসন আমলে এই ইদ্রাকপুর গ্রামে মুন্সী হায়দার হোসেন নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মোঘল শাসকদের দ্বারা ফৌজদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। অত্যন্ত সজ্জন ও জনহিতৈষী মুন্সী হায়দার হোসেনের নাম অনুসারে ইদ্রাকপুরের নাম হয় মুন্সীগঞ্জ। ১৯৪৫ সালে বৃটিশ ভারতের প্রশাসনিক সুবিধার্থে মুন্সীগঞ্জ থানা ও মহকুমা হিসেবে উন্নীত হয়। ১৯৮৪ সালে ১ মার্চ মুন্সীগঞ্জ জেলায় রূপান্তরিত হয়।

দর্শনীয় স্থানসমূহঃ

ইদ্রাকপুর কেল্লা - মুন্সীগঞ্জ শহরের প্রান কেন্দ্রস্থলে ইদ্রাকপুর কেল্লা অবস্থিত।
ডিসি পার্ক - জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঐতিহ্যবাহী ইদ্রাকপুর কেল্লার পূর্ব দিকে প্রতিষ্ঠিত 'ডিসি পার্ক' বর্তমান প্রকৃতিপ্রেমী মানুষদের বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।
পদ্মা রিসোর্ট - লৌহজং উপজেলায়।
মাওয়া রিসোর্ট - মাওয়া ঘাট।

Matrix BCS Series

মুন্সীগঞ্জ জেলার পুরাকীর্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

অতীশ দীপঙ্করের পন্ডিত ভিটা

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান হলেন একজন প্রখ্যাত পন্ডিত যিনি পাল সাম্রাজ্যের আমলে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৌদ্ধধর্মপ্রচারক ছিলেন।

জন্ম

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতানুসারে পালযুগে মগধের পূর্ব সীমান্তবর্তী প্রদেশ অঙ্গদেশের পূর্ব প্রান্তের সামন্তরাজ্য সহোর, যা অধুনা ভাগলপুর নামে পরিচিত, তার রাজধানী বিক্রমপুরীতে সামন্ত রাজা কল্যাণশ্রীর ঔরসে রাণী প্রভাবতী দেবীর গর্ভে ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে অতীশ দীপঙ্করের জন্ম হয়। কিন্তু কিছু ঐতিহাসিকের মতে তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশব

ছোটবেলায় তাঁর নাম ছিল আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। তিন ভাইয়ের মধ্যে অতীশ ছিলেন দ্বিতীয়। তার অপর দুই ভাইয়ের নাম ছিল পদ্মগর্ভ ও শ্রীগর্ভ। অতীশ খুব অল্প বয়সে বিয়ে করেন। কথিত আছে তার পাঁচ স্ত্রীর গর্ভে মোট ৯টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তবে পুন্যশ্রী নামে একটি পুত্রের নামই শুধু জানা যায়।

শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন মায়ের কাছে। তিন বছর বয়সে সংস্কৃত ভাষায় পড়তে শেখা ও ১০ বছর নাগাদ বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ শাস্ত্রের পার্থক্য বুঝতে পারার বিরল প্রতিভা প্রদর্শন করেন তিনি। মহাবৈয়াকরণ বৌদ্ধ পন্ডিত জেত্রির পরামর্শ অনুযায়ী তিনি নালন্দায় শাস্ত্র শিক্ষা করতে যান। ১২ বছর বয়সে নালন্দায় আচার্য বোধিভদ্র তাঁকে শ্রমণ রূপে দীক্ষা দেন এবং তখন থেকে তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ১২ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বোধিভদ্রের

Matrix BCS

গুরুদেব অবধূতিপাদের নিকট সর্ব শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন। ১৮ থেকে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বিক্রমশীলা বিহারের উত্তর দ্বারের দ্বারপন্ডিত নাঙপাদের নিকট তন্ত্র শিক্ষা করেন। এরপর মগধের ওদন্তপুরী বিহারে মহা সাংঘিক আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে উপসম্পদা দীক্ষা গ্রহণ করেন। ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি পশ্চিম ভারতের কৃষ্ণগিরি বিহারে গমন করেন এবং সেখানে প্রখ্যাত পন্ডিত রাহুল গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক গুহ্যাবিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করে 'গুহ্যজ্ঞানবজ্র' উপাধিতে ভূষিত হন। দীপঙ্কর ১০১১ খ্রিস্টাব্দে শতাধিক শিষ্যসহ মালয়দেশের সুবর্ণদ্বীপে (বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ) গমন করেন এবং আচার্য ধর্মপালের কাছে দীর্ঘ ১২ বছর বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অধ্যয়ন করে স্বদেশে ফিরে আসার পর তিনি বিক্রমশীলা বিহারে অধ্যাপনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

তিব্বত যাত্রা

তিব্বতের সম্রাট ল্‌হ-লামা-য়েশো কয়েক জন দূতের হাতে প্রচুর স্বর্ণ উপঢৌকন দিয়ে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বত ভ্রমনের আমন্ত্রন জানালে দীপঙ্কর সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে নিরাশ না হয়ে সম্রাট সীমান্ত অঞ্চলে সোনা সংগ্রহের জন্য গেলে গরলোগ অঞ্চলের অধিপতি তাঁকে বন্দী করেন ও প্রচুর সোনা মুক্তিপণ হিসেবে দাবী করেন। সম্রাট তাঁর পুত্র লহা-লামা-চং-ছুপ-ও কে মুক্তিপণ দিতে বারণ করেন এবং ঐ অর্থ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে আনানোর জন্য ব্যয় করতে বলেন। লহা-লামা-চং-ছুপ-ও সম্রাট হয়ে গুং-থং-পা নামে এক বৌদ্ধ উপাসককে ও আরো কয়েক জন অনুগামীকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে আনানোর দায়িত্ব দেন। এরা নেপালের পথে বিক্রমশীলা বিহারে উপস্থিত হন এবং দীপঙ্করের সাথে সাক্ষাৎ করে সমস্ত সোনা নিবেদন করে ভূতপূর্ব সম্রাট ল্‌হ-লামা-য়েশোর বন্দী হওয়ার কাহিনী ও তাঁর শেষ ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অভিভূত হন। আঠারো মাস পরে ১০৪০ খৃস্টাব্দে বিহারের সমস্ত দায়িত্বভার লাঘব করে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। তিনি দোভাষী সহ বারো জন সহযাত্রী নিয়ে প্রথমে বুদ্ধগয়া হয়ে নেপালের রাজধানীতে উপস্থিত হন এবং নেপালরাজের আগ্রহে এক বছর সেখানে কাটান। এরপর নেপাল অতিক্রম করে থুঙ বিহারে এলে তাঁর দোভাষী ভিক্ষু গ্য-চোন-সেঙ অসুস্থ হয়ে মারা যান। ১০৪২ খৃস্টাব্দে তিব্বতে র পশ্চিম প্রান্তের ডংরী প্রদেশে পৌছন। সেখানে পৌছলে লহা-লামা-চং-ছুপ-ও এক রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন করে তাঁকে থোলিং বিহারে নিয়ে যান। এখানে দীপঙ্কর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ বোধিপথপ্রদীপ রচনা করেন। ১০৪৪ খৃস্টাব্দে তিনি পুরঙে, ১০৪৭ খৃস্টাব্দে সম-য়ে বৌদ্ধ বিহার ও ১০৫০ খৃস্টাব্দে বে-এ-বাতে উপস্থিত হন।

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার

দীপঙ্কর তিব্বতের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। তিনি তিব্বতী বৌদ্ধধর্মে প্রবিষ্ট তান্ত্রিক পন্থার অপসারণের চেষ্টা করে বিশুদ্ধ মহাযান মতবাদের প্রচার করেন। তিনি তিব্বতে কদম-পা নামে এক লামা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন।

Matrix BCS Series

রচনা

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। তিব্বতের ধর্ম, রাজনীতি, জীবনী, স্তোত্রনামাসহ তাঞ্জুর নামে বিশাল এক শাস্ত্রগ্রন্থ সংকলন করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা এবং কারিগরি বিদ্যা বিষয়ে তিব্বতী ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন বলে তিব্বতীরা তাকে অতীশ উপাধীতে ভূষিত করে। অতীশ দীপঙ্কর অনেক সংস্কৃত এবং পালি বই তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। দীপঙ্করের রচিত গ্রন্থগলির মধ্যে বোধিপথপ্রদীপ, চর্যা-সংগ্রহপ্রদীপ, সত্যদ্বয়াবতার, মধ্যমোপদেশ, সংগ্রহগর্ভ, হৃদয়-নিশ্চিন্ত, বোধিসত্ত্ব-মণ্যাবলী, বোধিসত্ত্ব-কর্মাদিমার্গাবতার, শরণাগতাদেশ, মহযান-পথ-সাধন-বর্ণ-সংগ্রহ, শুভার্থ-সমুচ্চয়োপদেশ, দশ-কুশল-কর্মোপদেশ, কর্ম-বিভঙ্গ, সমাধি-সম্ভব-পরিবর্ত, লোকোত্তর-সপ্তকবিধি, গুহ্য-ক্রিয়া-কর্ম, চিত্তোৎপাদ-সম্বর-বিধি-কর্ম, শিক্ষাসমুচ্চয়-অভিসময় ও বিমল-রত্ন-লেখনা উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং ইতালির বিখ্যাত গবেষক টাকি দীপঙ্করের অনেকগুলো বই আবিস্কার করেন।

মৃত্যু

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মে সংস্কারের মতো শ্রমসাধ্য কাজ করতে করতে দীপঙ্করের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে ১০54 খৃস্টাব্দে ৭৩ বছর বয়সে তিব্বতের লাসা নগরের কাছে চে-থঙের দ্রোলমা লাখাং তারা মন্দিরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইদ্রাকপুর কেল্লা (Idrakpur Fort)

মুন্সীগঞ্জ জেলা সদরে অবস্থিত মোঘল স্থাপত্যের একটি ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন। ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালিন বাংলার সুবাদার ও সেনাপতি মীর জুমলা ইছামতি নদীর তীরে ইদ্রাকপুর নামক স্থানে এই কেল্লাটি নির্মাণ করেন। ৮২ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ৭২ মিটার প্রস্থের ইটের তৈরি ইদ্রাকপুর কেল্লাটি মগ জলদস্যু এবং পর্তুগিজদের হাত থেকে রক্ষার জন্য নির্মাণ করা হয়। লোকমুখে প্রচলিত আছে ঢাকার লালবাগ কেল্লা থেকে ইদ্রাকপুর কেল্লা পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ

MATRIX BCS Series

ছিল। সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই কেল্লার প্রত্যেক কোণে বৃত্তাকার বেষ্টনী রয়েছে এবং দুর্গের একমাত্র খিলানাকার দরজা স্থাপন করা হয়েছে কেল্লার উত্তর দিকে। শত্রুর উদ্দেশ্যে গোলা নিক্ষেপের জন্য প্রাচীরের গায়ে অসংখ্য ফোঁকর রয়েছে। পূর্ব দিকের মূল প্রাচীর দেয়ালের মাঝামাঝি একটি গোলাকার মঞ্চ রয়েছে। প্রায় প্রতিটি দুর্গেই দূর থেকে শত্রুর চলাচল পর্যবেক্ষণের জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইদ্রাকপুর কেল্লার ৩ কিলোমিটারের মধ্যে চারটি (ধলেশ্বরী, ইছামতী, মেঘনা এবং শীতলক্ষা) নদীর অবস্থান। ১৯০৯ সালে মোঘল স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন ইদ্রাকপুর কেল্লাকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তির মর্যাদা দেয়া হয়। প্রাচীর ঘেরা এই গোলাকার দূর্গটি এলাকায় এস.ডি.ও কুঠি হিসাবে পরিচিত।

শুলপুর গির্জা

মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের শুলপুর গ্রামে খ্রিস্ট ধর্মানুসারীরা একটি পবিত্র তীর্থস্থান। ১৭০০ সালের কাছাকাছি সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলের প্রথম দিকে পদ্মা নদীর ভাঙ্গনের ফলে ঢাকা জেলার পার্শ্ববর্তী কিছু গ্রাম থেকে কয়েকজন ক্যাথলিক খ্রিস্ট ভক্ত শুলপুরে এসে বসবাস শুরু করে। পরবর্তীতে ১৮৬২ খ্রীঃ ইট সুরকির গাথনি দিয়ে ও ছনের চাল যুক্ত ১ম গীর্জাটি স্থাপন করা হয়। এরপর ১৯২২ খ্রীঃ টিনসেড গীর্জা নির্মান হয়। এরপর ১৯৬২ খ্রীঃ গীর্জাটির পুনঃ সংস্কার করা হয়। পরবর্তীতে ১১ই এপ্রিল ১৯৯৭ খ্রীঃ আর্চবিশপ মাইকেল ডি রোজারিও বর্তমানের নব নির্মিত গীর্জাটি তৈরি করেন।

পোলঘাটা সেতু

প্রাচীন বাংলার গৌরবোজ্জ্বল স্থান শ্রীবিক্রমপুর মহানগরের একাংশ বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক সমৃদ্ধ অঞ্চল। সমগ্র জেলা জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন গৌরবময় উপাখ্যানের সাক্ষী অসংখ্য প্রাচীন নিদর্শন। এদের মধ্যে মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার রামপাল ইউনিয়নের পানাম পোলঘাটা গ্রামে অবস্থিত ইট ও সুরকি ব্যবহারে তৈরি মোগল আমলের পোলঘাটা সেতু এক অনন্য পুরার্কীতি। মুন্সীগঞ্জ জেলা শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে নির্মিত এই সেতু টঙ্গীবাড়ি উপজেলার সাথে জেলা সদরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। বিক্রমপুর মহানগরের সীমানা পরিখা মির কাদিম খালের উপর তৈরি হওয়ার কারণে স্থানীয়দের নিকট এটি মীরকাদিম সেতু হিসাবেও পরিচিত। ৫২.৪২ মিটার দৈর্ঘ্যের ধনুকাকৃতি/অর্ধবৃত্ত গড়নের পোলঘাটা সেতুর নিচে খিলান দিয়ে নৌযান চলাচলের জন্য ৩টি স্থান রাখা হয়েছে। দুইপাশের নৌযান চলাচলের পথ মাঝখানের ফাঁকা স্থানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট। পোলঘাটার ইটের পুলটি বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

Matrix BCS Series

রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায়ের বাড়ি

মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার শেখের নগর গ্রামে প্রায় দুইশত বছরের পুরনো রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায়ের বাড়ি অবস্থিত। ইছামতি নদীর কোল ঘেঁষা শেখেরনগর রায় বাহাদুর ইনস্টিটিউশনে কাছে ছায়া সুনিবির গ্রামে কালের সাক্ষী হয়ে রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায়ের বাড়িটি যেন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিভিন্ন অজানা কথা জানান দিয়ে যাচ্ছে। বর্গাকৃতির নকশার রায়ের বাড়ির দ্বিতল দালান ঘরের দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট এবং প্রস্থ ২০ ফুট। দ্বিতল ভবনের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ পাশে ২০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৫ ফুট প্রস্থের একতলা বিশিষ্ট আরও ৩টি ভবন রয়েছে। রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায়ের বাড়ির পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে আছে দুইটি শানবাধানো ঘাটের পুকুর।

Matrix BCS Se

পদ্মহেম ধাম

মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার দোসরপাড়া গ্রামে অবস্থিত পদ্মহেম ধাম ফকির লালন শাহের একটি আশ্রম। বাউল বাড়ি হিসেবে পরিচিত নৈসর্গিক এই স্থানে লালনের পদার্পণ না ঘটলেও প্রথম আলো পত্রিকার ফটো সাংবাদিক কবির হোসেন লালনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনপূর্বক এই আশ্রমটি গড়ে তুলেছেন। ছায়া সুনিবিড় স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পাখ-পাখালির কলকাকলিতে পরিপূর্ণ পদ্মহেম ধামে প্রবেশ করতেই নজরে পড়বে লালনের অন্যতম নিদর্শন পাথরের তৈরি বিশাল একটি একতারা। মায়াময় প্রকৃতির মাঝে আরো নজরে পড়বে মুন্সীগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী কাঠের দোতলা ঘর, বৈঠকখানা ও লালনগীতি বিদ্যালয়। আশ্রমের পাশ দিয়ে তিনদিকে বাক নিয়ে চমৎকার মোহনার সৃষ্টি হওয়া ইছামতী নদী বহমান। আর তাই আশ্রম থেকে নদীর পাড়ে দাড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার দৃশ্য অনেক বেশী উপভোগ্য। ইছামতী নদী দিয়ে অধিকাংশ সময় নৌকায় সংসার গড়ে তোলা বেদেদের দল যেতে দেখা যায়। পদ্মহেম ধামে ক্যাম্পিং করে রাত্রিযাপন করা যায়।

শ্যামসিদ্ধির মঠ

শ্যামসিদ্ধির মঠ বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার শ্যামসিদ্ধি গ্রামে অবস্থিত একটি মঠ। আনুমানিক ২৪৭ বছরের পুরনো এই মঠটি ভারত উপমহাদেশের সর্বোচ্চ মঠ এবং সর্বোচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ বলে বিবেচিত। ভারতের দিল্লিতে অবস্থিত কুতুব মিনারের উচ্চতা ২৩৬ ফুট। আর শ্যামসিদ্ধির এই মঠটির উচ্চতা ২৪১ ফুট। অষ্টভুজ আকৃতির এই মঠের আয়তন দৈর্ঘ্যে ২১ ফুট ও প্রস্থে ২১ ফুট। তবে কুতুব মিনারের এর মত এটি সংরক্ষিত নয়, শ্যামসিদ্ধির মঠের এখন কেবল ধ্বংসাবশেষই অবশিষ্ট রয়েছে। মঠের গায়ের মূল্যবান পাথর এবং পিতলের কলসির এখন আর অস্তিত্ব নেই, এর মূল কাঠামো নকশা করা দরজা জানালা অনেক আগেই চুরি হয়ে গেছে। মঠের ভিতরে ৩ ফুট উচ্চতার কষ্টি পাথরের একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। বিক্রমপুরের ধর্নাঢ্য ব্যক্তি সম্ভুনাথ মজুমদার এই মঠটি নির্মাণ করেন। কথিত আছে সম্ভুনাথ স্বপ্নে তার পিতার চিতার উপরে মঠ নির্মাণের নির্দেশ পেলে তিনি এই মঠটি নির্মাণ করেন।

সোনারং জোড়া মঠ

মুন্সিগঞ্জ জেলা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে টঙ্গীবাড়ি উপজেলার সোনারং গ্রামে রয়েছে বাংলাদেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন এক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সোনারং জোড়া মঠ। মঠ হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও এটি মূলত একটি জোড়া মন্দির। মন্দিরের প্রস্থরলিপি অনুসারে, রুপচন্দ্র নামের এক হিন্দু বণিক ১৮৪৩ সালে বড় কালীমন্দির ও ১৮৮৬ সালে ছোট শিবমন্দিরটি নির্মাণ করেন এবং ১৮৩৬ সালে শম্ভুনাথ নামের এক ব্যাক্তি এই মঠ স্থাপন করেন। কথিত আছে, এই মন্দিরেই শ্রী রুপচন্দ্রের শেষকৃত্য সম্পূন্ন হয়েছিল। প্রায় ২৪৬ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট সোনারং জোড়া মঠভারত উপমহাদেশের সর্বোচ্চ মঠ হিসাবে খ্যাত। চুন সুরকি নির্মিত পুরো দেয়াল বিশিষ্ট এই মঠের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ২১ ফুট এবং বড় মন্দিরের উচ্চতা ১৫ মিটার। মন্দিরের গোলাকার গম্বুজাকৃতি ছাদের শিখরে রয়েছে একটি ত্রিশূল। আর প্রত্যেক মূল উপাসনালয় ঘরের সাথে আছে একটি করে বারান্দা।

ভাগ্যকুল জমিদার বাড়ি

জমিদার যদুনাথ সাহা আনুমানিক ১৯০০ শতকে মুন্সীগঞ্জ শ্রীনগর উপজেলার ভাগ্যকুল গ্রামে ভাগ্যকুল জমিদার বাড়ি নির্মাণ করেন। যদুনাথ সাহা মূলত ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তিনি বরিশাল থেকে লবণ, সুপারি, শাড়ি ইত্যাদি পণ্য আমদানি করে মুর্শিদাবাদে রপ্তানি করতেন। মানিকগঞ্জের বালিয়াটি জমিদার বাড়ির সাথে দুই তলা ভাগ্যকুল জমিদার বাড়ির বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। ভবনের সামনে রয়েছে ৮ টি থাম, যা মূলত গ্রীক স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট

নির্দেশ করে। মূল ভবনের ভেতরের দেয়ালে ময়ূর, সাপ ও বিভিন্ন ফুল-পাখির নকশা অঙ্কিত রয়েছে।

জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘর

রাজধানী ঢাকা থেকে মাত্র ৩২ কিলোমিটার দূরে মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলায় জগদীশ চন্দ্র বসুর পৈতৃক বসতবাড়িকে ঘিরে জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘর কমপ্লেক্সটিকে সাজানো হয়েছে। প্রায় ৩০ একর আয়তনের এই বাড়িতে অসংখ্য বৃক্ষরাজির ছায়াময় প্রকৃতির মাঝে বিভিন্ন পশুপাখির ম্যুরাল, কৃত্রিম পাহাড়-ঝরনা, শান বাঁধানো পুকুর ঘাট এবং দর্শনার্থীদের বিশ্রামের জন্য ত্রিকোণাকৃতির ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘরে জগদীশ চন্দ্র বসুর পোর্ট্রেট, বিভিন্ন গবেষণাপত্র, হাতে লেখা পান্ডুলিপি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তিতে লেখা চিঠি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঠানো চিঠি এবং ১৭টি দুর্লভ ছবি প্রদর্শনের জন্য রাখা আছে।

নাটেশ্বরের হারানো নগরী

মুন্সীগঞ্জের দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে নাটেশ্বর প্রত্নতাত্তিক খননকৃত বৌদ্ধ মন্দির ও স্তুপ অন্যতম। টংগিবাড়ী উপজেলার সোনারং টংগিবাড়ী ইউনিয়নের নাটেশ্বর গ্রামে ২০১৩ এবং ২০১৪ সালের প্রত্নতাত্তিক খননে আবিস্কৃত হয় মন্দির এবং স্তুপ স্থাপত্যের অংশবিশেষ। সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে- অসাধারণ বৌদ্ধ মন্দির, তিনটি অষ্টোকোণাকৃতির স্তুপ, পিরামিড আকৃতির বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ স্তুপ, কেন্দ্রীয় মন্দির, হাজার বছর আগের রাস্তা, নালা প্রভৃতি।

Matrix Series

রাজা বল্লাল সেনের দিঘী বা রামপালের দিঘী

বল্লাল সেন ধার্মিক (প্রচুর মন্দির গড়েন) এবং মাতৃভক্ত ছিলেন। প্রজাদের পানীয় জলের কষ্ট দুর করতে চাইলেন। পরামর্শদাতার নাম রামপাল (রামপাল, পঞ্চবটি এই সব ঐতিহাসিক গ্রামগুলো এখনো টিকে আছে)। রাজা বল্লাল সেন ঘোষনা দিলেন একরাতের মাঝে তার মা যতোটা রাস্তা পায়ে হাটতে পারবেন উনি ততোবড় দীঘি খনন করবেন। রাজা ভেবেছেন বৃদ্ধা মা কতোটুকু আর হাটতে পারবে। রাতে রাজমাতার হাটা দেখে বল্লাল সেনের চক্ষু চরকগাছ। উনি হন হন করে হাটা শুরু করে বিশাল এলাকা ক্রস করে ফেললেন। ছলনার মাধ্যমে বল্লাল সেন মায়ের পথরোধ করলেন। পরে বিশাল এলাকা খনন করলেন। কিন্তু মায়ের সাথে ছলনার ফলে দিঘিতে পানি আসে না। বল্লাল সেনের সন্মানহানি হল প্রজাদের সামনে। মন্ত্রি রামপাল জানালেন দিঘিতে প্রান বিসর্জন দিলে পানি আসবে (দিনাজপুরের রাম সাগরের গল্পটাও অবিকল)। রাম সাগরের রাজা রাম নিজের প্রান বিসর্জন দিয়েছিলেন। বল্লাল সেনও তাই করতে গেলেন। কিন্তু রামপাল তার বন্ধুকে খুব ভালোবাসতেন। তাই বন্ধুকে ফাঁকি দিয়ে নিজের প্রান বিসর্জন দিলেন।

Matrix BCS Series

বাবা আদমের মসজিদ

মুন্সীগঞ্জ জেলার রামপালের অন্তর্গত রেকাবি বাজার ইউনিয়নের কাজী কসবা গ্রামে অবস্থিত। মসজিদটি বহু গম্বুজবিশিষ্ট এবং ভূমি পরিকল্পনায় আয়তাকৃতির। এ মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ ১০.৩৫ মিটার × ৬.৭৫ মিটার এবং বহির্ভাগের পরিমাপ ১৪.৩০ মিটার × ১১.৪৫ মিটার। মসজিদটির দেয়াল ২ মিটার পুরু। মসজিদটিতে তিনটি 'বে' ও দুটি 'আইল' আছে। পশ্চিম দেয়ালের পশ্চাৎভাগ বাইরের দিকে তিন স্তরে বর্ধিত। পেছনের বর্ধিতাংশটি অতীব সুন্দর টেরাকোটা অলংকরণে নকশাকৃত। মিহরাবের মাঝখানে এবং পূর্ব ফাসাদে ঝুলন্ত শিকল ঘণ্টা ও ঝুলন্ত তক্তীর নকশা রয়েছে। তাছাড়া কুলুঙ্গির মাঝখানে বহু খাঁজ বিশিষ্ট খিলান, জ্যামিতিক নকশা ও খিলান শীর্ষে 'রোজেট' নকশা লক্ষণীয়।

নদনদী

মুন্সীগঞ্জ জেলার চারপাশকে ঘিরে রয়েছে তিনটি নদী এবং মুন্সিগঞ্জ জেলায় অবস্থান করছে একটি নদী। নামঃ পদ্মা,মেঘনা,ইছামতি,ধলেশ্বরী। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এই নদীগুলো তাদের গতিপথ পরিবর্তন করেছে। তবে নদীর গতিপথ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মাথায় আসবে ১৫৫০ সালে প্রণীত "জাও দ্য ব্যারোস", ১৬৬০ সালে প্রণীত "ফন ডেন ব্রোক", ১৭৬৪-৭৬ সালে প্রণীত "রেনেলে" এর মানচিত্র। প্রাচীনকালের নদী ব্যবস্থা জানার জন্য এর চেয়ে নির্ভুল কোনো মানচিত্র খুব একটা নেই।

পদ্মা নদীঃ

পদ্মা বাংলাদেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। পদ্মার অপর নাম কীর্তিনাশা। মুন্সিগঞ্জ জেলার দক্ষিণসীমায় পদ্মার অবস্থা। তবে প্রাচীন কালে পদ্মা বিশাল বিক্রমপুরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছিলো। ভারতের গঙ্গার যে শাখাটি রাজশাহী দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, সেটিই পদ্মা নামে অভিহিত। রাজশাহী থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পদ্মা প্রবাহিত হয়ে রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দে এসে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সেখান

থেকে আবার পূর্ব দিকে প্রাচীন বিক্রমপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ থেকে পদ্মার পাশে ঘেরা বিভিন্ন জেলা গুলোতে যাবার জন্য ব্যবহৃত হয় মাওয়া ঘাট ,যা মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় অবস্থিত। এ এলাকা দিয়েই প্রস্তাবিত পদ্মা সেতু নির্মিত হচ্ছে।

তবে মেজর রেনেলের অঙ্কিত ১৭৮১ সালের মানচিত্রে দেখা যায়, পূর্বের পদ্মা নদী প্রবাহিত হয়েছিলো বিক্রমপুরে পশ্চিম দিক দিয়ে। বিক্রমপুরের রাজনগর ও ভাদ্রেশ গ্রামের মধ্যে একটি অপ্রশস্ত জলপ্রণালি ছিলো। তবে ১৮১৮ সালে এ পদ্মার প্রধান স্রোত রেনেলের কালীগঙ্গার খাতে প্রবাহিত হতো। এ পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে ঘটেছিল। এমনকি ১৮৪০ সাল পর্যন্ত পদ্মা দক্ষিণ বিক্রমপুরের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হতো। এ নদী তখনো পদ্মা নামে এবং নতুন নদীটি কীর্তিনাশা নামে পরিচিত ছিল।

১৭৬৪ সালে মেজর রেনেল ঢাকার উত্তর অংশেই ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার সম্মিলন দর্শন করেছিলেন। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ১৬ শতকে এটিই ব্রহ্মপুত্রের মূল স্রোত ছিল। এ স্রোত ঢাকার পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জাফরগঞ্জের কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। এ সম্মিলিত প্রবাহ রেনেলের উল্লিখিত নালা ও ফরিদপুরের অন্তর্গত পাঁচ্চরের মধ্যস্থিত পদ্মার প্রাচীন খাত পরিত্যাগ করে ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজবাড়ী মঠের কিঞ্চিত্ দক্ষিণে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। ১৭৮৭ সালের বন্যার ফলেই যে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার প্রাচীন প্রবাহের পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই সব থেকে বুঝা যায়,পদ্মার গতি পরিবর্তন আসলেই অতি বিচিত্র।

ধলেশ্বরী নদীঃ

বিক্রমপুরের উত্তরসীমায় ধলেশ্বরী নদী অবস্থিত। এ নদীটি যমুনার একটি শাখা নদী হিসেবে বিবেচিত। টাঙ্গাইল জেলার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে যমুনা নদীর থেকেই ধলেশ্বরীর সূচনা। এটি এর পর দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় - উত্তরের অংশটি ধলেশ্বরী আর দক্ষিণের অংশটি কালীগঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়। এই দুইটি শাখা নদী মানিকগঞ্জ জেলার কাছে মিলিত হয়, এবং সম্মিলিত এই ধারাটি মুন্সীগঞ্জ জেলার উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ধলেশ্বরী নামে নারায়নগঞ্জ জেলার

কাছে শীতলক্ষ্যা নদীর সাথে মিলিত হয়ে পরবর্তীকালে মেঘনা নদীতে পতিত হয়। ধলেশ্বরী বর্তমানে যমুনার শাখা হলেও প্রাচীন কালে এটি সম্ভবত পদ্মা নদীর মূল ধারা ছিলো। ১৬০০ হতে ২০০০ সালের মধ্যে পদ্মার গতিপথ ব্যাপকভাবে পাল্টে গেছে। ধারণা করা হয়, কোনো সময়ে পদ্মার মূল ধারাটি রামপুর-বোয়ালিয়া এলাকা ও চলন বিল এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, পরে ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর মাধ্যমে মেঘনায় গিয়ে পড়তো। ১৮শ শতকে পদ্মার নিম্ন প্রবাহটি ছিলো আরো দক্ষিণে। ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মূল প্রবাহ ধলেশ্বরী হতে দক্ষিণের প্রবাহে, তথা কীর্তিনাশা নদীতে সরে যায়, যা বর্তমানে পদ্মার মূল গতিপথ। বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ জেলার দিকে প্রবাহিত ধলেশ্বরী নদীর উপরেই অবস্থান করছে ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু, যার নাম হচ্ছে,মুক্তারপুর সেতু।

মেঘনা নদীঃ

মেঘনা নদীর আরেক নাম মেঘনা আপার নদী। এই নদী বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর একটি। এই নদী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, মুন্সিগঞ্জ, চাঁদপুর এবং লক্ষ্মীপুর জেলার একটি নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ১৫৬ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৩৪০০ মিটার। মেঘনা একটি সর্পিলাকার প্রকৃতির নদী। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা "পাউবো" কর্তৃক মেঘনা আপার নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নদী নং ১৭।

মুন্সিগঞ্জ জেলার পূর্ব দিকেও মেঘনা নদীর একটি অংশ অবস্থান করছে। যা মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলা এবং গজারিয়া উপজেলাকে বিভক্ত করেছে। মেঘনা নদীর ধার ঘেষেই গড়ে উঠেছে গজারিয়া উপজেলা। মূলত নদীটি কিশোরগঞ্জ জেলার পূর্ব পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরব বাজারের কাছে ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং ভৈরব বাজার থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে কলাগাছিয়ায় শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী নদী একত্র হয়ে বিক্রমপুরের পূর্ব পাশ দিয়ে চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

ইছামতি নদীঃ

ইছামতী নদীর আরেক নাম হচ্ছে, ইচ্ছামতি বা ইছামতি-কালিন্দি নদী। এটি বাংলাদেশ-ভারতের একটি আন্তঃসীমান্ত নদী। এই নদীটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা "পাউবো" কর্তৃক এই নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর হচ্ছে, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী হিসেবে ৭ নং এবং উত্তর কেন্দ্রীয় নদী হিসেবে ৪ নং।

সর্পিলাকার আকৃতির এই নদীর একটি বাঁক মুন্সিগঞ্জ জেলার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদীটি মূলত বাংলাদেশের উত্তর-কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মানিকগঞ্জ থেকে ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জ জেলার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। উত্তর কেন্দ্রীয় এই নদীটির দৈর্ঘ্য ১২৯ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৭২ মিটার।

এই নদীটি উৎপত্তি লাভ করেছে মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলার বাঘুটিয়া ইউনিয়নে প্রবহমান যমুনা নদী হতে। এবং এর জলধারা ঢাকা জেলার, নবাবগঞ্জ উপজেলার মধ্য দিয়ে মুন্সিগঞ্জ জেলার, লৌহজং উপজেলার ,লোহাজং টেওটিয়া ইউনিয়ন পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে পদ্মা নদীতে নিপতিত হয়েছে।

Matrix BCS Series

ঐতিহ্যবাহী মুন্সীগঞ্জ

আড়িয়াল বিল

বর্ষাকালে অথৈ জলরাশি আর শীতকালে বিস্তীর্ণ সবুজ শস্যক্ষেতে পূর্ণ দেশের মধ্যাঞ্চলের সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন বিলের নাম আড়িয়াল বিল । ঢাকার দোহার, নবাবগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর ও সিরাজদিখান উপজেলার প্রায় ১৩৬ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই বিলের অধিকাংশ অংশ মুন্সীগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত। ধারণা করা হয়, প্রাচীনকালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলনস্থল নদীর প্রবাহের ফলে শুষ্ক হয়ে যাওয়ার কারণে মুন্সীগঞ্জ জেলার পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীর মাঝে আড়িয়াল বিলের উৎপত্তি।

প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে সাজানো আড়িয়াল বিলে ঋতুভেদে নতুন নতুন বৈচিত্রের প্রকাশ ঘটে। বর্ষাকালে সবুজে ঘেরা বিলের স্বচ্ছ পানিতে শাপলা, কচুরি পানার ফুল এবং নানা জাতের পাখির উপস্থিতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনন্য মাত্রা যুক্ত করে। আর শীতকালে বিলের স্থলভাগে নানা ধরনের শীতকালীন সবজির চাষ করা হয়। শাপলা তোলা, নৌকায় চড়ে মাছ ধরা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য ভ্রমণকারী সময় কাটাতে ছুটে আসেন আপন রুপে অনন্য আড়িয়াল বিলে।

মুন্সীগঞ্জের নৌকা বাইচ

দেশজ সংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহ্য নৌকা বাইচ। বিশাল উৎসব মুখর পরিবেশে মুন্সীগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীতে ঐতিহ্যবাহী এ নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে লাখো মানুষের ঢল নামে। বন্দর নগরী মিরকাদিম থেকে মুন্সীগঞ্জ লঞ্চঘাট পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার এলাকায় নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহ্যবাহী এ নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে বিভিন্ন অঞ্চলের লোক আসে। প্রতিবছর অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগীতায় ৬০ মাল্লা, ৫০ মাল্লা এবং ২৫ মাল্লার নৌকা অংশগ্রহণ করে থাকে।

Matrix Series

মুন্সীগঞ্জে হাজার বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার রামপাল ইউনিয়নের রঘুরামপুর গ্রামে মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা হাজার বছরের পুরনো বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান মিলেছে। প্রত্নসম্পদ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন উদ্ধারে চালানো খনন কাজের মাধ্যমে এ বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়। একেকটি ভিক্ষু কক্ষের পরিমাপ আনুমানিক ৩ দশমিক ৫ মিটার (দৈর্ঘ্য) ও ৩ দশমিক ৫ মিটার (প্রস্থ)। ধারণা করা হচ্ছে, বৌদ্ধ ধর্মের জ্ঞান তাপস অতীশ দীপঙ্করের সঙ্গে এ বৌদ্ধ বিহারের সম্পর্ক রয়েছে।

আবিষ্কৃত বৌদ্ধ বিহারের নকশা অনুযায়ী এর একটি প্রাচীর দেয়াল উত্তর দিকেও অপর আরেকটি দেয়াল পশ্চিম দিকে ধাবমান বলে নিশ্চিত হয়েছেন খননকারীরা। যেসব ভিক্ষু কক্ষ উন্মোচিত হয়েছে তা বৌদ্ধ বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্মের পন্ডিত ও বিশ্বের দ্বিতীয় বুদ্ধ অতীশ দীপঙ্করের বাস্তুভিটার কাছে সদর উপজেলার বজ্রযোগিনী ও রামপাল অঞ্চলে প্রাচীন নিদর্শন ও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ উদ্ধারে ২০১১ সাল থেকে প্রত্নতত্ত্ব জরিপ ও খনন কাজ হাতে নেয়া হয়। অগ্রসর বিক্রমপুর নামে একটি সংগঠনের উদ্যোগে বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণা প্রকল্প এখন কাজ করে আসছে। প্রত্নতত্ত্ব খনন কাজের গবেষণা পরিচালক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে একদল প্রত্ন-খননকারী এ খনন কাজ করে আসছেন।

বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কারের ফলে বিক্রমপুর অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিশ্বের দরবারে আরো একধাপ এগিয়ে গেল বলে মনে করা হয়েছে। কেবল বাংলাদেশ নয়, বিশ্বে জায়গা করে নেবে আবিষ্কৃত এ বৌদ্ধ বিহার এমনটাই জানিয়েছেন অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের সদস্যরা।

Matrix BCS Series

ভাগ্যকুলের মিষ্টি

মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার ভাগ্যকুল বাজার সুস্বাদু মিষ্টি ও ঘোলের জন্য সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে সুপরিচিত। আদি ও আসল স্বাদের সন্দেশ, ছানা, চমচমের মত বিভিন্ন মিষ্টান্ন খেতে চাইলে ভাগ্যকুল এক স্বর্গীয় স্থান। রকমারি মিষ্টির বাহার নিয়ে ভাগ্যকুলের বিভিন্ন মিষ্টান্ন ভান্ডারগুলো যেন আপ্যায়নের পসরা সাজিয়ে বসে আছে। এদের মধ্যে গোবিন্দ মিষ্টান্ন ভান্ডার এবং চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভান্ডার অতুলনীয় স্বাদের মিষ্টি ও ঘোলের জন্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। যদিও ভাগ্যকুলের সকল দোকানেরই রয়েছে সমান সুনাম।

মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরের কলা

একদা মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর তথা রামপালের কলার প্রচুর খ্যাতি ছিল দেশ-বিদেশে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে রামপালের ওই কলা যেতো মধ্য প্রাচ্য, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায়। সেই কলা এতই সুস্বাদু ছিল যে, একবার খেলে মুখে লেগে লাগতো অনেকটা সময় ধরে।

রামপাল সারা বিশ্ব জুড়ে পরিচিত হয়ে উঠে এ কলার কারনেই। মুন্সীগঞ্জ শহরের পূর্বাংশের এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে দেওভোগ, শিলমন্দি, বৈখর। বল্লাল রাজার, রামপালের প্রতিটি বাড়িই ছিল এক একটি কলার বাগান। এক চিলতে ফাঁকা জায়গা পেলেই কলা চাষীরা সেটাকে কাজে লাগাতো ওই কলাচাষ করে। খাওয়ার মধ্যে বেশ মজাদার ছিল রামপালের কলা। এর ভেতরে এক সুঘ্রান পাওয়া যেতো যা মানুষের আহারের তৃপ্তি মেটাতো।

ষোলআনী সৈকত

ঢাকা থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানায় মেঘনা নদীর পাড় ঘেঁষা ষোলআনী প্রজেক্ট বর্তমানে ষোলআনী সৈকত নামে পরিচিত। এই স্থানটি আগে দৌলতপুর নামে পরিচিত ছিল। নদী ভাঙ্গন রোধ করতে মেঘনা নদীর পাড়ে সিসি ব- ক দিয়ে বাধ নির্মাণের ফলে এই স্থানটির সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায় এবং তা প্রকৃতিপ্রেমীদের আকর্ষণ করে। ঢাকা থেকে দূরত্ব কম হওয়ার কারণে বাইকারদের কাছে এই স্থান অতি অল্প সময়ে অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রায় ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ষোলআনী সৈকতের মনোরম পরিবেশে মেঘনা নদীর বুকে নৌযানের বিচরণ, অসীম নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেসে বেড়ানো, অপূর্ব সূর্যাস্তের সৌন্দর্য কিংবা ভরা জোছনার মোহনীয় রূপ উপভোগ করতে পারবেন। এছাড়া এখানে নৌকা ভাড়া করে মেঘনার বুকে ভেসে বেড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

মাওয়া ফেরি ঘাট

মাওয়া ফেরি ঘাট পর্যটকদের জন্যে নদী ভ্রমণ এবং ইলিশ ভোজন এর জন্যে জনপ্রিয় একটি জায়গা। মাওয়া ফেরি ঘাটের পাড়ে রয়েছে বেশকিছু খাবার হোটেল। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ইলিশ খাওয়ার জন্য অনেকেই মাওয়া ঘাটে ছুটে আসেন। এখানকার মাছের বাজারে ইলিশ ছাড়াও অনেক বাহারি প্রজাতির তাজা মাছ পাওয়া যায়।

MATRIX BCS Series

ইলিশের টানে মাওয়া ফেরি ঘাটের পানে

ঢাকা থেকে প্রায় ৩৬ কিলোমিটার দূরত্বে পদ্মা, ইলিশ আর মিষ্টির জন্য বিখ্যাত মাওয়া। ঢাকা থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ইলিশ খেতে যেত ঢাকাবাসীর প্রথম পছন্দ মাওয়া ফেরি ঘাট। প্রাচীন কাল থেকেই ইলিশের চাহিদা সর্বত্র বর্তমানে এর চাহিদা দেশ চাড়িয়ে বিদেশেও পৌছে গেছে, আর সেই ইলিশ যদি হয় মাওয়া ঘাটের পদ্মার রুপালী ইলিশ তাহলে তো জ্বিবে পানি আসার ই তো কথা । আর সে জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখানে ইলিশ খেতে আসেন ভোজন রসিকরা। এই বিশাল চাহিদা পূরণে মাওয়া ঘাটের পাড়ে গড়ে ওঠেছে ছোট-বড় হোটেল। রয়েছে মৌসুমি ফলসহ অন্যান্য পণ্যের বিশাল সমারোহের দোকান। এছাড়াও রয়েছে খন্ড-খন্ড মাছের বাজার। এ মাছের বাজার গুলোতে বিক্রি হচ্ছে পদ্মা নদীর তাজা ইলিশ সহ ছোট-বড় মাছ। দর্শনার্থী কিংবা ভোজন রশিক যাই বলেন তাদের কাছে নদীর তাজা মাছের চাহিদা ব্যাপক,আর এখানোও তার ব্যতিক্রম নয়।

মাওয়া রিসোর্ট মুন্সীগঞ্জের বেড়ানোর জায়গা

নাটেশ্বরের হারানো নগরী: মুন্সীগঞ্জের দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে নাটেশ্বর প্রত্নতাত্তিক খননকৃত বৌদ্ধ মন্দির ও স্তুপ অন্যতম। টংগিবাড়ী উপজেলার সোনারং টংগিবাড়ী ইউনিয়নের নাটেশ্বর গ্রামে ২০১৩ এবং ২০১৪ সালের প্রত্নতাত্তিক খননে আবিষ্কৃত হয় মন্দির এবং স্তুপ স্থাপত্যের অংশবিশেষ।

সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে- অসাধারণ বৌদ্ধ মন্দির, তিনটি অষ্টোকোণাকৃতির স্তুপ, পিরামিড আকৃতির বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ স্তুপ, কেন্দ্রীয় মন্দির, হাজার বছর আগের রাস্তা, নালা প্রভৃতি।

ঐতিহ্যবাহী কাঠ ও টিনের বাড়ি-ঘর:

কাঠের বাড়ির জন্য জনপ্রিয় জেলা হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ। মুন্সিগঞ্জ কাঠের দোচালা,চৌচালা বাড়ির জন্য অনেক বিখ্যাত। এখানে আসলেই চোখে পরবে বিভিন্ন উপজেলায় সারি সারি কাঠের দোচালা, চৌচালা। মুন্সিগঞ্জ জেলার একটা অংশ প্রতিবছরেই সর্বনাশা পদ্মা নদীর কবলে পরেন। সে নদী ভাঙনে হারিয়ে যায় মানুষের বসত বাড়ি। মূলত সেখান থেকে উঠে এসেছে কাঠের বাড়ি তৈরির প্রচলন। এই বাড়ি গুলোর বিশেষত্ব হচ্ছে খুব সহজেই জোড়ায় জোড়ায় খুলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা যায়। ফলে নদী ভাঙ্গনের সময় সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায় বাড়িগুলো। মাটি, খড়,বাঁশ, বিভিন্ন জাতের কাঠ, পে- নশিট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি কারুকাজ মিশ্রিত এই বাড়িগুলো যেনো রুচিশীল তারই প্রকাশ ঘটায়।

Matrix BCS Series

মাওয়া রিসোর্ট

ঢাকার খুব কাছেই বেড়ানোর জায়গা কিংবা আবকাশ কেন্দ্র যারা খুঁজছেন তাদের জন্য পদ্মার পাড়ের মাওয়া রিসোর্ট হতে পারে প্রথম পছন্দ। রিসোর্ট দেখলেই মনে হবে যেন নিজের ছিমছাম ঘর, অথচ একটু সামনেই প্রমত্তা নদী পদ্মা। ঢাকা থেকে ৩৮ কিলোমিটার দক্ষিণে বিক্রমপুরের লৌহজং উপজেলার মাওয়া ১ নম্বর ফেরিঘাট থেকে একটু দক্ষিণে মাওয়া-ভাগ্যকুল রাস্তার কান্দিপাড়া গ্রামে নির্মিত এ রিসোর্টি জেনো প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্যমন্ডিত একটি অন্য রকম পর্যটন কেন্দ্র।

ভাষা ও সংস্কৃতি

বাংলাদেশের মানচিত্রে মুন্সীগঞ্জের অবস্থান দেখতে অনেকটা কেন্দ্রীয় দ্বীপের মত। দক্ষিণে পদ্মা, পূর্বে মেঘনা , উত্তরে ধলেশ্বরী শীতলক্ষ্যা ও পশ্চিমে কালিগঙ্গা এবং আড়িয়াল বিল এ জেলাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কারনে এখানে পৃথক এক উপভাষা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য , শিক্ষা সংস্কৃতি, এবং পেশাগত প্রয়োজনে অন্যান্য উপভাষী অঞ্চলের মানুষের যাতায়াত এবং বসবাসের কারনে ভাষাগত আদান প্রদান ও ভাষারীতির গ্রহন বর্জনের মাধ্যমে আজ উপভাষা হয়ে উঠেছে মিশ্র ভাষা । মুন্সীগঞ্জ জেলা রাজধানী ঢাকার নিকটবর্তী হওয়ার কারনে ঢাকায় প্রচলিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষার সঙ্গে বিনিময় হয়েছে খুব বেশী। মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া পূর্বে কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত ছিল বলে তা কুমিল্লা অঞ্চলের ভাষা দ্বারা প্রভাবিত।

ভৌগলিক ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়ের বিবেচনায় মুন্সীগঞ্জ(বিক্রমপুর) একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল। এক সময়ে বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই নিরংকুশ প্রভাব রেখেছিল সমগ্র বঙ্গের উপর। অতীতকাল থেকেই মূলত ব্যকসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করলেও সংগীত , নাটক, নৃত্য , সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে কর্মচঞ্চল মুন্সীগঞ্জের সংস্কৃতিমনা প্রতিটি মানুষের জীবন। এখানকার পদ্মা ,মেঘনা, ধলেশ্বরীর বাঁকে বাঁকে গড়ে ওঠা জনপদের মানুষ , তাদের জীবন ও জীবিকা, সুখ-দুঃখ , হাসি -কান্না এসব

নিয়ে গড়ে উঠেছে মুন্সীগঞ্জের সংস্কৃতিক পরিমন্ডল। এক সময় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় , যাযাবর , মানিক বন্দোপাধ্যায়, সত্যেন সেন এর মত বড় মানের সাহিত্যিকদের পদচারনা ও বর্তমান সময়ে ড. হুমায়ুন আজাদ, রাবেয়া খাতুন ও ইমদাদুল হক মিলন শুধু মুন্সীগঞ্জকেই নয় বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যকে করেছেন সমৃদ্ধ। পঞ্চাশ হতে ষাট দশকে যারা একক প্রচেষ্টায় সংগীতের ক্ষীণ ধারাটি ধরে রেখেছিলেন তারা হলেন বদরে আলম ও সদানন্দ বারুলী। প্রাক স্বাধীনতা যুগে মুন্সীগঞ্জের সংগীত চর্চা ছিল গুটি কয়েক পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্বাধীনতা উত্তরকালে শহরের হরিন কুটিরের দোতলায় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মুন্সীগঞ্জের প্রথম সংগীত স্কুল "বাঁশরী সংগীত বিদ্যালয়" । এটি প্রতিষ্ঠার পেছনে অবদান রেখেছেন অধ্যাপক সুনির্মল চক্রবর্তী , জয়ন্ত কুমার স্যানাল, মতিউল ইসলাম হিরু, এ. ওয়াই. এম মহসীন, কৃষ্ণচন্দ্র পাল , সর্দার নিসার আহমেদ , শহীদুল্লাহ শহীদ ও প্রয়াত হাসান আলী। এই বিদ্যালয়েই প্রথম পদ্ধতিগত ভাবে সংগীত শিক্ষা দেয়া হয়। বাঁশরীর পথ ধরে প্রতিষ্ঠিত হয় মুন্সীগঞ্জ সংগীত একাডেমী ,সোফিয়া সংগীত বিদ্যালয়। তৈরী হতে থাকে শিল্পী ও প্রশিক্ষক।

নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে শহরের জগধাত্রী মন্দির সংলগ্ন নাট্য মঞ্চ অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। পঞ্চাশ দশকের আগে থেকেই বেশ কিছু নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মুন্সীগঞ্জের নাট্যাঙ্গণে সুনিপুনভাবে নাট্য চর্চায় ব্রত দলটির নাম প্রবাহ নাট্যগোষ্ঠী। তাছাড়া ঘাস-ফুলুনদী ও সৌখিন নাট্যচক্র মুন্সীগঞ্জের নাট্যাঙ্গনের পথিকৃত। এদের পথ ধরেই মুন্সীগঞ্জে গড়ে উঠে অনিয়মিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিকগোষ্ঠী, মুন্সীগঞ্জ থিয়েটার, থিয়েটার সার্কেল সহ অনেক নাট্য সংগঠন। মুন্সীগঞ্জের নৃত্য সংগীত ও নাটকের মতই সমৃদ্ধ।

যেসব সাংস্কৃতিক সংগঠন মুন্সীগঞ্জজেলায় বিভিন্ন সময়ে সংস্কৃতির বিকাশ ও লালনে অবদান রেখেছে সে সমস্ত সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ-

(১) জেলা শিল্পকলা একাডেমী , (২) প্রবাহ নাট্যগোষ্ঠী, (৩) ঘাস ফুল নদী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিকগোষ্ঠী, (৪) অনিয়মিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী , (৫)সৌখিন নাট্যচক্র, (৬) মুন্সীগঞ্জ সংগীত একাডেমী, (৭) মুন্সীগঞ্জ থিয়েটার, (৮) মুন্সীগঞ্জ থিয়েটার সার্কেল, (৯) চিত্রাংকন বিদ্যালয় , (১০)সোফিয়া সংগীত বিদ্যালয়, (১১) জয় জয়মন্তী জলসা সংগীত একাডেমী, (১২) মুন্সীগঞ্জ সিটি অংকন বিদ্যালয় (১৩) নাট্যবিন্দু , বালিগাও।

মুন্সীগঞ্জ তথা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন এমন কয়েকজন মুন্সীগঞ্জের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের নামঃ

চাষী নজরুল ইসলাম(চলচ্চিত্রকার), আবদুল জব্বার খান(বাংলা চলচ্চিত্রের জনক), টেলি সামাদ(চলচ্চিত্র অভিনেতা), আবদুল কাদের(বিশিষ্ট অভিনেতা), গওহর জামিল(নৃত্য শিল্পী ও নৃত্য পরিচালক), মোহাম্মদ আবু তাহের(কথা সাহিত্যিক ও নাট্যকার), আবদুর রহমান বয়াতী(বাউল শিল্পী), সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়(চলচ্চিত্র অভিনেত্রী), লায়লা হাসান (নৃত্য শিল্পী ও অভিনেত্রী), নাজমা আনোয়ার (অভিনেত্রী), ফেরদৌস ওয়াহিদ (জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী), হাবিব(সংগীত পরিচালক ও গায়ক), বালাম(সংগীত পরিচালক ও গায়ক), শিরীন বকুল(অভিনেত্রী), রিয়া(নৃত্য শিল্পী ও মডেল),শিল্পী আব্দুল হাই(সংগীত , চিত্র,

নাটক), শ্রী জিতেন চক্রবর্তী(নাটক), সরবিন্দু সেন(নাটক, আবৃতি), শ্রী মন্মথ মুখার্জি(সংগীত , তবলা), গিয়াস উদ্দিন আহমেদ(নাটক), মিজানুর রহমান (সংগীত, নাটক)।

প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব

শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর

বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ অতীশ দীপঙ্কর মুন্সীগঞ্জের অহংকার। ৯৮২ সালে মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৩১ বছর বয়সে তিনি শ্রীলংকায় গমন করেন ও পরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাচার্য পদে আসীন হন। ১০৪১ সালে হিমালয় অতিক্রম করে তিনি তিব্বতে যান। তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্যের কারণে তিববতীরা তাঁকে অত্যন্ত সম্মানজনক 'অতীশ' উপাধিতে ভূষিত করে। ১০৫৪ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

জগদীশ চন্দ্র বসু

মুন্সীগঞ্জকে আলোকিত করা মনীষীদের আরেকজন শ্রেষ্ঠ মানুষ জগদীশ চন্দ্র বসু। তিনি ১৮৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভগবান চন্দ্র বসু। পৈত্রিক নিবাস শ্রীনগর উপজেলার রাঢ়ীখাল গ্রামে। জগদীশ চন্দ্র বসু প্রমাণ করেছিলেন যে, মানুষের মতো গাছেরও প্রাণ আছে। ১৯১৫ সালে তিনি 'নাইট' বা স্যার উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৯৫ সালে তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি এবং কোন তার ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তা প্রেরণে সফলতা পান। ১৮৮৭ সালে বিজ্ঞনী হের্ৎস প্রত্যক্ষভাবে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এ নিয়ে আরও গবেষণা করার জন্য তিনি চেষ্টা করছিলেন যদিও শেষ করার আগেই তিনি মারা যান। জগদীশচন্দ্র তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে সর্বপ্রথম প্রায় ৫ মিলিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ তৈরি করেন। এ ধরনের তরঙ্গকেই বলা হয়ে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভ। আধুনিক রাডার, টেলিভিশন এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই তরঙ্গের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মূলত এর মাধ্যমেই বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান প্রদান ঘটে থাকে। ১৯১৭ সালে তিনি বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (৫ নভেম্বর ১৮৭০ - ১৬ জুন ১৯২৫) হলেন একজন বাঙালি আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী, কবি ও লেখক। তিনি স্বরাজ্য পার্টি-র প্রতিষ্ঠাতা। তার সময়ের অন্যতম বৃহৎ অঙ্কের আয় অর্জনকারী উকিল হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার সম্পদ অকাতরে সাহায্যপ্রার্থীদের কাছে বিলিয়ে দিয়ে বাংলার ইতিহাসে দানবীর হিসাবে সুপরিচিত হয়ে আছেন। তিনি "দেশবন্ধু" নামেতে জগৎ বিখ্যাত হয়ে আছেন। একজন বাঙালী যিনি সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। ১৮৭০ সালে টঙ্গীবাড়ী উপজেলার তেলীরবাগ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার যে ক'জন সুস্থ চিন্তাধারার রাজনীতিবিদ জাতীয় উন্নতি বিধানে ভূমিকা পালন করেন চিত্তরঞ্জন দাস তাদের অন্যতম।

Matrix BCS Series

সরোজিনী নাইডু

ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী মহিলা নেতা ছিলেন সরোজিনী নাইডু। তাঁর পৈত্রিক বাড়ী ছিল মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার কনকসার গ্রামে। ১৮৭৯ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সর্বভারতীয় রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা ও এক সময়ের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি বাগ্মী ও ইংরেজী ভাষার যশস্বী কবি ছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরোজিনী যোগ দেন স্বাধীনতা আন্দোলনে। ১৯০৩ সাল থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, অ্যানি বেসান্ত, সি. পি. রামস্বামী আইয়ার, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন।

সত্যেন সেন

জন্ম ১৯০৭ সাল, মৃত্যু ১৯৮১ সাল। টঙ্গীবাড়ী উপজেলার সোনারং গ্রাম তাঁর পৈতৃক ভিটা। সত্যেন সেন ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক। এই প্রগতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে বহুবার কারাবরণ করেছেন। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক সংগঠন 'বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

জিতেন ঘোষ

লৌহজং থানার কুমার ভোগ গ্রামের অধিবাসী জিতেন ঘোষ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পুরোধা ছিলেন। চিরকুমার জিতেন ঘোষ সারা জীবন কৃষক ও মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। জেল খেটেছেন যুগের পর যুগ। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৮৮ সালের ১৯ মে সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস মুন্সীগঞ্জের মালপদিয়া গ্রামে। বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী এই ঔপন্যাসিক 'পদ্মানদীর মাঝি' পুতুল নাচের ইতিকথাসহ অনেকগুলি উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে অমর হয়ে আছেন। তার রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ইত্যাদি। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যা তার রচনায় ফুটে উঠেছে। জীবনের অতি ক্ষুদ্র পরিসরে তিনি রচনা করেন চল্লিশটি উপন্যাস ও তিনশত ছোটোগল্প। তার রচিত পুতুলনাচের ইতিকথা, দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মা নদীর মাঝি ইত্যাদি উপন্যাস ও অতসীমামী, প্রাগৈতিহাসিক, ছোটবকুলপুরের যাত্রী ইত্যাদি গল্পসংকলন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। ইংরেজি ছাড়াও তার রচনাসমূহ বহু বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর, মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শক্তিশালী এই কথাসাহিত্যিকের জীবনাবসান ঘটে।

Matrix BCS Series

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু জন্ম : নভেম্বর ৩০, ১৯০৮ - মৃত্যু : মার্চ ১৮, ১৯৭৪ একজন খ্যাতনামা বাঙালি সাহিত্যিক।

কবি বুদ্ধদেব বসুর পৈত্রিক নিবাস মুন্সীগঞ্জের মালখানগরে। একজন বাঙালি কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, গল্পকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকের নতুন কাব্যরীতির সূচনাকারী অন্যতম কবি হিসেবে তিনি সমাদৃত। তবে সাহিত্য সমালোচনা ও কবিতা পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনার জন্য তিনি বিশেষভাবে সম্মাননীয়।

সমরেশ বসু

সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) ছিলেন একজন প্রখ্যাত ভারতীয় বাঙালি লেখক। তাঁর জন্মনাম সুরথনাথ বসু, কিন্তু সমরেশ বসু নামেই লেখক পরিচিতি সমধিক। তিনি কালকূট ও ভ্রমর ছদ্মনামে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় রাজনৈতিক কর্মকান্ড, শ্রমজীবী মানুষের জীবন এবং যৌনতাসহ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সুনিপুণ বর্ণনা ফুটে উঠেছে। তিনি ১৯৮০ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর মুন্সীগঞ্জের রাজানগরে জন্মগ্রহণ করেন।

খেলাধুলা ও বিনোদন

জাতীয় / আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুন্সীগঞ্জের যারা অংশগ্রহন করেছেন

ফুটবল: প্রতাপ সংকর হাজেরা, নওশের উজ্জামান, শরীফ, স্বপন কুমার দাস, ডন কাঞ্চন, মিলন, মো: সাইফুল ইসলাম খোকন।

সাঁতার: ব্রজেন দাস (ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী), মো:মোশারফ হোসেন.মো: শাহজাহান মিজি, ধনরঞ্জন

দাস।

সাইক্লিং: মো: ইসহাক দেওয়ান (ইস্ট পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন)।

ভলিবল: শুভাস, বিমল চন্দ্রঘোষ, অজিত, ভুলু, কৃষ্ণা।

Matrix BCS Series

Facebook Page: Matrix BCS Series

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

১ম ধাপের মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলা পরিচিতি

Facebook Page: Matrix BCS Series

নোয়াখালী জেলা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর নং: ২

সেক্টর কমান্ডার:

- মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল- সেপ্টেম্বর);
- মেজর এ. টি. এম. হায়দার (সেপ্টেম্বর- ডিসেম্বর)

উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা:

- বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন
- আবুল হাসেম বীরবিক্রম

কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি:

- বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন
- আবদুল মালেক উকিল
- ব্যারিষ্টার বদরুল হায়দার চৌধুরী (সাবেক প্রধান বিচারপতি)
- মুনীর চৌধুরী (শহীদ বুদ্ধিজীবি)
- শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক

জেলার পুরাতন নাম: **সুধারাম, ভুলুয়া**

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৮২১

উপজেলা: ৯টি

ইউনিয়ন: ৯২ টি

যে নদীর তীরে অবস্থিত: মেঘনা

দর্শনীয় স্থান: ফকির ছারু মিজি (রহ.) সাহেবের দরগাহ, নোয়াখালী পাবলিক লাইব্রেরী

জেলার ঐতিহ্য: **মৃৎশিল্প**

Matrix BCS Series

সংসদীয় আসন: ৬টি

২৬৮	নোয়াখালী-১	এইচ এম ইব্রাহিম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৬৯	নোয়াখালী-২	মোরশেদ আলম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৭০	নোয়াখালী-৩	মোঃ মামুনুর রশীদ কিরন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৭১	নোয়াখালী-৪	মোহাম্মদ একরামুল করিম চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৭২	নোয়াখালী-৫	ওবায়দুল কাদের	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৭৩	নোয়াখালী-৬	বেগম আয়েশা ফেরদাউস	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

১. আয়তন ও অবস্থান:

নোয়খালী জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত চট্টগ্রাম বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। নোয়খালী জেলার মোট আয়তন ৪২০২.৭০ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ২২০০৭' থেকে ২৩০০৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০০৫৩' থেকে ৯১০২৭' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ জুড়ে নোয়খালী জেলার অবস্থান। রাজধানী ঢাকা থেকে এ জেলার দূরত্ব প্রায় ১৭১ কিলোমিটার এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় সদর থেকে প্রায় ১৩৬ কিলোমিটার। এ জেলার পূর্বে চট্টগ্রাম জেলা ও ফেনী জেলা, উত্তরে কুমিল্লা জেলা, পশ্চিমে লক্ষ্মীপুর জেলা ও ভোলা জেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।

২. ইতিহাস

২.১) প্রতিষ্ঠাকাল:

- ✓ বর্তমান নোয়খালী জেলা আগে ফেনী, লক্ষ্মীপুর এবং নোয়খালী জেলা নিয়ে একটি বৃহত্তর অঞ্চল ছিল, যা এখনও বৃহত্তর নোয়খালী নামে পরিচিত।
- ✓ **১৭৭২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল ওয়রেন হেস্টিংস** এদেশে প্রথম আধুনিক জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা নেন। তিনি সমগ্র বাংলাদেশকে ১৯টি জেলায় বিভক্ত করে প্রতি জেলায় একজন করে কালেক্টর নিয়োগ করেন।
- ✓ এ ১৯টি জেলার একটি ছিল কলিন্দা। এ জেলাটি গঠিত হয়েছিল মূলতঃ নোয়খালী অঞ্চল নিয়ে। কিন্ত ১৭৭৩ সালে জেলা প্রথা প্রত্যাহার করা হয় এবং প্রদেশ প্রথা প্রবর্তন করে জেলাগুলোকে করা হয় প্রদেশের অধীনস্থ অফিস।
- ✓ ১৭৮৭ সালে পুনরায় জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং এবার সমগ্র বাংলাদেশকে ১৪টি জেলায় ভাগ করা হয়। এ ১৪টির মধ্যেও ভুলুয়া নামে নোয়খালী অঞ্চলে একটি জেলা ছিল।
- ✓ পরে ১৭৯২ সালে ত্রিপুরা নামে একটি নতুন জেলা সৃষ্টি করে ভুলুয়াকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- ✓ তৎকালে শাহবাজপুর, হাতিয়া, নোয়খালীর মূল ভূখন্ড, লক্ষীপুর, ফেনী, ত্রিপুরার কিছু অংশ, চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ ও মীরসরাই নিয়ে ছিল ভুলুয়া পরগনা।
- ✓ ১৮২১ সালে ভুলুয়া নামে স্বতন্ত্র জেলা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চল ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৮ সালে ভুলুয়া জেলাকে নোয়খালী জেলা নামকরণ করা হয়।

Matrix BCS Series

২.২) নামকরণঃ

নোয়াখালী জেলার প্রাচীন নাম ছিল ভুলুয়। নোয়াখালী সদর থানার আদি নাম সুধারাম। ইতিহাসবিদদের মতে একবার ত্রিপুরার পাহাড় থেকে প্রবাহিত ডাকাতিয় নদীর পানিতে ভুলুয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভয়াবহভাবে প্লাবিত হয় ও ফসলি জমির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে ১৬৬০ সালে একটি বিশাল খাল খনন করা হয়, যা পানির প্রবাহকে ডাকাতিয়া নদী হতে রামগঞ্জ, সোনাইমুড়ি ও চৌমুহনী হয়ে মেঘনা এবং ফেনী নদীর দিকে প্রবাহিত করে। এই বিশাল নতুন খালকে নোয়খালীর আঞ্চলিক ভাষায় নোয়া (নতুন) খাল বলা হত, এর ফলে অঞ্চলটি একসময়ে লোকের মুখেমুখে পরিবর্তিত হয়ে নোয়খালী হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে।

২.৩) সাধারণ ইতিহাসঃ

১৮৩০ সালে নোয়খালীর জনগণের **ওয়াহিবী আন্দোলন** ও ১৯২০ সালের **খিলাফত আন্দোলনে** সক্রিয় অংশগ্রহণ নোয়খালীর ইতিহাসের অন্যতম ঘটনা। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়। এরই প্রেক্ষিতে নোয়খালীর হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর মর্মান্তিক নিপীড়ন, গণহত্যা শুরু হয়, যা নোয়খালী দাঙ্গা নামে পরিচিত। এই সময় মহাত্মা গান্ধী দাঙ্গা পরবর্তী পরিস্থিতি সরজমিনে দেখার জন্য নোয়খালী জেলা ভ্রমণ করেন। বর্তমানে সোনাইমুড়ি উপজেলার জয়াগ নামক স্থানে গান্ধীজির নামে একটি আশ্রম রয়েছে, যা **গান্ধী আশ্রম** নামে পরিচিত। নোয়খালী, লক্ষীপুর ও ফেনী মহকুমা নিয়ে নোয়খালী জেলা চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশাল জেলা হিসেবে পরিচালনা হয়ে আসছিল। ১৯৮৪ সালে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করা হলে লক্ষীপুর ও ফেনী জেলা আলাদা হয়ে যায়। শুধুমাত্র নোয়খালী মহকুমা নিয়ে নোয়খালী জেলা পুনর্গঠিত হয়। তখন এ জেলায় উপজেলা ছিল ছয়টি। পরবর্তীতে আরো তিনটি উপজেলার সৃষ্টি করা হয়। হাতিয়া উপজেলার কিছু অংশ জেলার মূল ভূখন্ডের সাথে সংযুক্ত থাকলেও বৃহত্তর অংশ (মূল হাতিয়া) এর চতুর্দিকে মেঘনা নদী দ্বারা বেষ্টিত একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ উপজেলা।

Matrix BCS Series

২.৪) নোয়াখালীর শহর:

- ✓ **নোয়াখালী বাংলাদেশের একমাত্র জেলা যার নিজ নামে কোন শহর নেই।**
- ✓ নোয়াখালী জেলা শহর মাইজদী নামে পরিচিত।
- ✓ ১৯৪৮ সালে যখন উপজেলা সদর দপ্তর মেঘনা গর্ভে বিলীন হয়ে যায়, তখন তা ৮ কিলোমিটার উত্তরে সরিয়ে ১৯৫০ সালে জেলার সদর দপ্তর অস্থায়ীভাবে মাইজদীতে স্থানান্তর করা হয়।
- ✓ ব্রিটিশদের পরিকল্পনায় নতুন করে এ শহরের পত্তন হয়।
- ✓ নোয়াখালী শহর যখন ভেঙ্গে যাচ্ছিল তখন মাইজদী মৌজায় ধান ক্ষেত আর খোলা প্রান্তরে পুরাতন শহরের ভাঙ্গা অফিস আদালতগুলো এখানে এনে স্থাপন করা হয় এবং ১৯৫৩ সালে শহরের পুরনো এলাকা কালিতারা, সোনাপুর ও মাইজদীসহ কাদির হানিফ ইউনিয়নের কয়েকটি মৌজা নিয়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে নোয়াখালী পৌর এলাকা ঘোষণা করা হয়।
- ✓ শহরের প্রাণ কেন্দ্রে প্রায় ষোল একর জুড়ে কাটা হয় এক বিশাল দীঘি। লোক মুখে প্রচলিত হয় **বড় দীঘি** নামে। সে দীঘির চতুর্দিকে চক্রাকারে বানানো হয় ইট সুরকীর রাস্তা। সে রাস্তাকে ঘিরে বাংলো আকৃতিতে তৈরী হয় সরকারি সব দপ্তর। এই দীঘিটি ব্যবহৃত হত মূলতঃ শহরের জলাধার হিসেবে, দীঘিতে পাম্প লাগিয়ে বিভিন্ন সরকারি অফিস-আদালত এবং আবাসিক এলাকায় পানি সরবরাহ করা হত।
- ✓ মাইজদী শহর স্থানান্তর করলেও সুদীর্ঘ প্রায় একযুগ পর্যন্ত মাইজদীকে নোয়াখালী জেলার সদরদপ্তর হিসেবে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়র বিষয়টি বিতর্কিত অবস্থায় ছিল। অবশেষে ১৯৬২ সালে মাইজদীকে নোয়াখালী জেলার স্থায়ী সদর দপ্তর হিসাবে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেয় হয়।
- ✓ চৌমুহনী নোয়াখালীর আরেকটি ব্যস্ত শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র, যা একসময়ে মুদ্রণ ও প্রকাশনা ব্যবসার জন্য বিখ্যাত ছিল।

Matrix BCS Series

২.৫) মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি:

- ✓ ১৯৭১ সালের ২২ এপ্রিল পাকবাহিনী নোয়াখালী সদর উপজেলায় প্রবেশ করে।
- ✓ ১১ মে পাকবাহিনী হাতিয়া শহর আক্রমণ করে। তারা এ উপজেলার আফাজিয়া বাজারে ৬ জনকে এবং ওছখালি বাজারে ২ জনকে গুলি করে হত্যা করে।
- ✓ ১৫ জুন জেলার সোনাপুর আহমদিয়া মডেল হাইস্কুল প্রাঙ্গণে পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াইয়ে ৭০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।
- ✓ ১৮ জুন পাকবাহিনী সদর উপজেলার সোনাপুর এলাকার শ্রীপুর গ্রামে ৭০ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে।
- ✓ ২ জুলাই মুক্তিযোদ্ধারা বেগমগঞ্জ উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে।
- ✓ ১৯ আগস্ট পাকবাহিনী বেগমগঞ্জের গোপালপুর ইউনিয়নের নয়াহাট বাজারে মুক্তিযোদ্ধাসহ প্রায় অর্ধশতাধিক লোককে হত্যা করে।
- ✓ ৪ সেপ্টেম্বর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বাঞ্ছারাম রোডের সুইসগেটের পূর্বপাশে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের এক লড়াইয়ে ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।
- ✓ পরবর্তীতে এ উপজেলায় পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি খন্ড লড়াইয়ে সদর বিএলএফ কমান্ডার অহিদুর রহমান অদুদসহ ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।
- ✓ ১৭ অক্টোবর মুক্তিযোদ্ধারা কবিরহাট উপজেলার রাজাকার জলিলের বাড়িতে হামলা করলে জলিলসহ তার কয়েকজন সহযোগী নিহত হয়। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা সেনবাগ উপজেলার ডোমনাকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থিত পাকবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ করে। উক্ত লড়াইয়ে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।
- ✓ **নোয়াখালী জেলা স্বাধীন হয় ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর।**

Matrix BCS Series

বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন (১৯৩৫ - ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১):

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা।
- তিনি সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ এর মধ্যে একজন।
- বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে চরম সাহসিকতা আর অসামান্য বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ যে সাতজন বীরকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান "বীরশ্রেষ্ঠ" উপাধিতে ভূষিত করা হয় তিনি তাদের অন্যতম।
- মোহাম্মদ রুহুল আমিন ১৯৩৫ সালে নোয়খালী জেলার সোনাইমুড়ি উপজেলার বাঘপাঁচড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯৭১ সালের মার্চে রুহুল আমিন চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন।
- একদিন সবার অলক্ষ্যে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে পড়েন নৌঘাঁটি থেকে।
- পালিয়ে সীমান্ত পার হয়ে তিনি চলে যান ত্রিপুরা। যোগ দেন ২ নং সেক্টরে।
- মেজর শফিউল্লাহের নেতৃত্বে ২ নং সেক্টরে তিনি সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন-

গণকবর: ১টি (কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ১৪নং সুইসগেট সংলগ্ন এলাকা)

স্মৃতিস্তম্ভ: ৩টি (বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী, সোনাইমুড়ি উপজেলার সোনাপুর এবং নোয়খালী জেলা সদরের পিটিআই প্রাঙ্গণ)

বধ্যভূমি: ১টি (কবিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্ব পাশের ডোবা)

Matrix BCS Series

৩. প্রশাসনিক এলাকাসমূহ:

নোয়খালী জেলা ৯টি উপজেলা, ৯টি থানা, ৮টি পৌরসভা, ৯৩টি ইউনিয়ন, ৮৮২টি মৌজা, ৯৬৭টি গ্রাম ও ৬টি সংসদীয় আসন নিয়ে গঠিত।

৩.১) উপজেলা: নোয়খালী জেলায় মোট ৯টি উপজেলা রয়েছে। উপজেলাগুলো হলো-

১. উপজেলা: কবিরহাট

আয়তন (বর্গ কি.মি): ১৮৯.৯৪

প্রশাসনিক থানা: কবিরহাট

আওতাধীন এলাকাসমূহ:

পৌরসভা (১টি): কবিরহাট

ইউনিয়ন (৭টি): নরোত্তমপুর, সুন্দলপুর, ধানসিঁড়ি, ঘোষবাগ, চাপরাশিরহাট, ধানশালিক এবং বাটইয়া

২. উপজেলা: কোম্পানীগঞ্জ

আয়তন (বর্গ কি.মি): ৩০৫.৩৩

প্রশাসনিক থানা: কোম্পানীগঞ্জ

আওতাধীন এলাকাসমূহ:

- পৌরসভা (১টি): বসুরহাট
- ইউনিয়ন (৮টি): সিরাজপুর, চর পার্বতী, চর হাজারী, চরকাঁকড়া, চর ফকিরা, রামপুর, মুছাপুর এবং চরএলাহী।

৩. উপজেলা: চাটখিল

আয়তন (বর্গ কি.মি): ১৩৩.৮৯

প্রশাসনিক থানা: চাটখিল

আওতাধীন এলাকাসমূহ:

- পৌরসভা (১টি): চাটখিল

Matrix BCS Series

- ইউনিয়ন (৯টি): সাহাপুর, রামনারায়ণপুর, পরকোট, বদলকোট, মোহাম্মদপুর, পাঁচগাঁও, হাটপুকুরিয় ঘাটলাবাগ, নোয়খলা এবং খিলপাড়া

৪. উপজেলা: নোয়খালী সদর

আয়তন (বর্গ কি.মি): ৫৫২.৪৬

প্রশাসনিক থানা: সুধারাম

আওতাধীন এলাকাসমূহ:

পৌরসভা (১টি): নোয়খালী

ইউনিয়ন (১৩টি): চরমটুয়া, দাদপ্রু, নোয়ান্নই, কাদিরহানিফ, বিনোদপুর, নোয়খালী, ধর্মপুর, এওজবালিয়া, কালাদরপ, অশ্বদিয়া, নিয়াজপুর, পূর্ব চর মটুয় এবং আন্ডারচর।

৫. উপজেলা: বেগমগঞ্জ

আয়তন (বর্গ কি.মি): ৪২৬.০৫

প্রশাসনিক থানা: বেগমগঞ্জ

আওতাধীন এলাকাসমূহ:

পৌরসভা (১টি): চৌমুহনী

ইউনিয়ন (১৬টি): আমানউল্যাপুর, গোপালপুর, জিরতলী, আলাইয়ারপুর, ছয়নী, রাজগঞ্জ, একলাশপুর, বেগমগঞ্জ, মিরওয়ারিশপুর, নরোত্তমপুর, দুর্গাপুর, কুতুবপুর, রসুলপুর, হাজীপুর, শরীফপুর এবং কাদিরপুর।

৬. উপজেলা: সুবর্ণচর

আয়তন (বর্গ কি.মি): ৩২৯.২৬

প্রশাসনিক থানা: সুবর্ণচর

আওতাধীন এলাকাসমূহ:

ইউনিয়ন (৮টি): চর জব্বর, চর বাটা, চর ক্লার্ক, চর ওয়পদা, চরজুবলী, চর আমানউল্যা, পূর্ব চর বাটা এবং মোহাম্মদপুর।

Matrix BCS Series

৭. উপজেলা: সেনবাগ

আয়তন (বর্গ কি.মি): **১৫৫.৮৩**

প্রশাসনিক থানা: সেনবাগ

আওতাধীন এলাকাসমূহ:

পৌরসভা (১টি): সেনবাগ

ইউনিয়ন (৯টি): ছাতারপাইয়া, কেশারপাড়, ডুমুরুয়া, কাদরা, অর্জুনতলা, কাবিলপুর, মোহাম্মদপুর, বিজবাগ এবং নবীপুর।

৮. উপজেলা: সোনাইমুড়ি

আয়তন (বর্গ কি.মি): **১৭০.৪২**

প্রশাসনিক থানা: সোনাইমুড়ি

আওতাধীন এলাকাসমূহ:

পৌরসভা (১টি): সোনাইমুড়ি

ইউনিয়ন (১০টি): জয়গা, নদনা, চাষীরহাট, বারগাঁও, অম্বরনগর, নাটেশ্বর, বজরা, সোনাপুর, দেওটি এবং আমিশাপাড়া।

৯. উপজেলা: হাতিয়া

আয়তন (বর্গ কি.মি): **১৫০৮.২৩**

প্রশাসনিক থানা: হাতিয়া

আওতাধীন এলাকাসমূহ:

পৌরসভা (১টি): হাতিয়া

ইউনিয়ন (১১টি): হরণী, চানন্দী, সুখচর, নলচিরা, চর ঈশ্বর (ভাসানচর ব্যতীত), চরকিং, তমরদ্দি, সোনাদিয়, বুড়িরচর, জাহাজমারা এবং নিঝুমদ্বীপ।

প্রশাসনিক থানা: ভাসানচর

আওতাধীন এলাকাসমূহ:

ইউনিয়ন (১টির অংশ): চর ঈশ্বর ইউনিয়ন এর ভাসানচর

Matrix BCS Series

৩.১) প্রশাসনিক কাঠামো (সংক্ষিপ্ত):

নোয়াখালী জেলার সৃষ্টি: ১৮২১ খ্রিঃ

ভৌগলিক অবস্থান: ২২০ ০৬/ থেকে ২২০ ১৭/ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০০ ৩৮/ থেকে ৯১০ ৩৫/ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ

আয়তন: ৪২০২.৭০ বর্গকিমি

জনসংখ্যা: ৩৩,৭০,২৫১ জন

জনসংখ্যার ঘনত্ব: ৮০১.৯৩ জন প্রতি বর্গ কিমি

মোট পরিবার: ৫,০৪,৫৫২ টি

উপজেলা: ০৯ টি

ভোটার সংখ্যা মোট:
১৬,৩২,৭৬১ জন (পুরুষ: ৭,৭৯,৯০৭ জন, মহিলা: ৮,৫২,৮৫৪ জন)

পুলিশ থানা: ০৯ টি ; তদন্ত কেন্দ্র -০২ টি, ফাঁড়ি- ০৮ টি

ইউনিয়ন: ৯১ টি
গ্রাম: ৭৮৬ টি
মৌজা: ৯৪৬ টি
ইউনিয়ন ভূমি অফিস: ৬৫ টি
পৌরসভা: ০৮ টি (বসুরহাট, কবিরহাট, সেনবাগ, চৌমুহনী, নোয়াখালী, চাটখিল, সোনাইমুড়ী, হাতিয়া)

শিক্ষার হার: ৬৯.৫০%

Matrix BCS Series

৪. জনসংখ্যা:

- ২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী নোয়াখালী জেলার মোট জনসংখ্যা ৩৩,৭০,২৫১ জন।
- এর মধ্যে পুরুষ ১৬,১০,৪৪৪ জন এবং মহিলা ১৭,৫৯,৮০৭ জন।
- পুরুষ এবং মহিলার অনুপাত ৯২ : ১০০।
- এখানে বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৮৪৩ জন এবং জন্মহার ১.৮৩%।
- প্রধান শহর মাইজদীর জনসংখ্যা ৭৪,৫৮৫ জন; যার মধ্যে পুরুষ ৫১.৫০% ও মহিলা ৪৮.৫০%। এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৫৯১৫/ বর্গ কিলোমিটার।
- ধর্মবিশ্বাস অনুসারে এ জেলার মোট জনসংখ্যার ৯৫.৪২% মুসলিম, ৪.৫২% হিন্দু এবং ০.০৬% বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারী।

৫. শিক্ষা ব্যবস্থা:

বিশ্ববিদ্যালয়:

০১ টি; পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)

মেডিক্যাল কলেজ:

০১ টি; (নোয়াখালী আবদুল মালেক উকিল সরকারি মেডিক্যাল কলেজ)

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ: ০১ টি

পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার: ০১ টি

মহাবিদ্যালয়: ৩৫টি সরকারি-০৮টি বেসরকারি-২৭টি

মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ২৮৭টি সরকারি-১২টি বেসরকারি-২৭৫টি

প্রাথমিক বিদ্যালয়: ১২৪৩টি সরকারি-৭৭৬টি বেসরকারি-৩২৯টি

Matrix BCS Series

স্যাটেলাইট-৬২ টি কমিউনিটি- ৭৬ টি

মাদ্রাসা: ১৬১টি সিনিয়র-৩০ টি দাখিল ও আলিম -১৩১ টি

কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: ০২ টি টি টি কলেজ-০১ টি আইন কলেজ-০১ টি

কারিগরি প্রতিষ্ঠান: ০৫ টি (যুব প্রশিক্ষণ ০২টি, পিটিআই-০১টি, টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ -০২টি)

উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো:
নোয়খালী সরকারি কলেজ
নোয়াখালী জিলা স্কুল
নোয়াখালী সরকারী মহিলা কলেজ
নোয়খালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়রিং কলেজ
নোয়াখালী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৬. স্বাস্থ্য ব্যবস্থা:

জেনারেল হাসপাতাল: ০১ টি
মেডিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার: ০১ টি
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স: ০৭ টি
স্কুল হেলথ ক্লিনিক: ০২ টি
টিবি ক্লিনিক: ০১ টি
ইলেকট্রো-মেডিক্যাল ওয়ার্কসপ: ০১ টি
সেবা ইনস্টিটিউট: ০১ টি
উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র: ৩১ টি

Matrix BCS Series

৭. অর্থনীতি:

- ✓ নোয়াখালী জেলার অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর।
- ✓ আঞ্চলিক জিডিপির প্রায় ৪০% কৃষি খাত থেকে আসে এবং জেলার ৮০ ভাগ লোক এই পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট।
- ✓ কৃষির মধ্যে মূলত মৎস্য চাষ ও মৎস্য আহরণের সাথে সবচেয়ে বেশি মানুষ জড়িত।
- ✓ বছর জুড়ে নৌকা তৈরি ও মেরামত, মাছ ধরা, প্রক্রিয়জাতকরণ, পরিবহন, শুটকি উৎপাদন, জাল মেরামত এর সাথে প্রায় ৬০-৭০ ভাগ শ্রমজীবী জড়িত থাকে।
- ✓ নিম্নভূমি অঞ্চল হওয়তে এই জেলায় প্রচুর মৎস্য চাষ হয়ে থাকে, যা এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে বিশাল ভূমিকা পালন করে।
- ✓ ফসল উৎপাদন মূলত বছরে একবারই হয়। শীত মৌসুমে জেলার সর্বত্র বিশেষ করে দক্ষিণের বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে রকমারি ফসলের চাষ হয়।
- ✓ এছাড়াও বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে ও দ্বীপগুলোতে গরু, মহিষ, ছাগল এবং ভেড়া পালন ব্যাপকতা লাভ করেছে।

নোয়খালী জেলায় শিল্প কারখানা তেমনভাবে গড়ে উঠেনি, কিন্ত নোয়খালী জেলার অনেক ব্যক্তি দেশের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। তারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বড় বড় শিল্প কারখানা গড়ে তুলেছেন। নোয়খালীর মানুষ মূলত কাজের জন্য দেশে এবং বিদেশে ব্যাপকভাবে গমন করেন। জেলার বিপুল সংখ্যক মানুষ মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছেন। বাংলাদেশের শীর্ষ রেমিট্যান্স পাঠানো জেলাগুলোর মধ্যে নোয়খালী জেলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে।

জেলার মোট আয়ের অন্যান্য খাতে আয়ের উৎসগুলোর মধ্যে অ-কৃষি শ্রম ৩.৪৩%, শিল্প ০.৮৪%, বাণিজ্য ১৪.৭৪%, পরিবহন খাত ৩.৮৩%, চাকুরি ১৬.১১%, নির্মাণখাত ১.৪৯%, রেমিট্যান্স ৭.৯৭% এবং অন্যান্য ১০.৫৮% অবদান রাখছে।

Matrix BCS Series

প্রধান প্রধান কৃষিজাত ফসলঃ

ধান, খেসারি, ইক্ষু, মুগ, আলু, মরিচ, সয়াবিন, চিনাবাদাম, তরমুজ, শাকসবজি ও বিভিন্ন ধরনের ডাল।

বিলুপত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলঃ

তিল, তিসি, পাট, সহানীয় জাতের ধান, মুগ ডাল ইত্যাদি।

প্রধান ফল-ফলাদিঃ

আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, নারিকেল, পেঁপে, তাল, সুপারি ইত্যাদি।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত প্রায় সনাতন বাহনঃ

পাল্কি, ঘোড়া, গরত ও মহিষের গাড়ি। প্রধান রপ্তানি দ্রব্যঃ নারিকেল, সুপারি, ধান, হুগলি পাতার মাদুর, শুটকি মাছ।

৮. যোগাযোগ ব্যবস্থা:

নোয়খালী জেলায় যোগাযোগের প্রধান সড়ক ঢাকা-নোয়খালী মহাসড়ক এবং চট্টগ্রাম-নোয়খালী মহাসড়ক। সব ধরনের যানবাহনে যোগাযোগ করা যায়। এছাড়া এ জেলায় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাও রয়েছে।

৯. ধর্মীয় উপাসনালয়:

নোয়খালী জেলায় ৪১৫৯টি মসজিদ, ৪৯৭টি ঈদগাহ, ২৩৯টি মন্দির, ২টি বিহার এবং ১টি ক্যাথলিক খ্রিস্টান গির্জা রয়েছে।

১০. জলবায়ু ও প্রকৃতি:

বছরব্যাপী সর্বোচ্চ তাপমাত্রার গড় ৩৪.৩ ডিগ্রী সেলসিয়স এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় ১৪.৪ ডিগ্রী সেলসিয়স। বছরে গড় বৃষ্টিপাত ৩৩০২ মিলিমিটার।

১১. নদ-নদী:

নোয়খালী জেলার প্রধান নদী মেঘনা। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য নদীর মধ্যে ডাকাতিয়া ও ছোট ফেনী নদী অন্যতম।

Matrix BCS Series

১২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ:

১৭৯০ সালের পর থেকে নোয়খালী জেলা বহুবার ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, টর্নেডো, সাইক্লোন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হয়। ১৯৭০ সালের ভয়বহ ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে, যার মধ্যে নোয়খালী জেলার অনেকে ছিলেন।

১৩. দর্শনীয় স্থান:

- নিঝুম দ্বীপ, হাতিয়া।
- মাইজদী কোর্ট বিল্ডিং দীঘি
- নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান
- শহীদ ভুলু স্টেডিয়ম
- নোয়খালী জেলা জামে মসজিদ
- বজরা শাহী মসজিদ
- পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, নোয়খালী
- বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোহাম্মদ রুহুল আমিন গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর, সোনাইমুড়ি
- নোয়খালী পাবলিক লাইব্রেরী, মাইজদী
- গান্ধি আশ্রম, সোনাইমুড়ী
- ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, চর জব্বর
- মহাত্মা গান্ধী জাদুঘর
- ঠাকুর রামচন্দ্র দেবের সমাধি আশ্রম,চৌমুহনী
- মুছাপুর ক্লোজার
- কল্যান্দি জমিদার বাড়ি
- চেয়রম্যানঘাট
- কল্যান্দী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির
- স্বর্ণ দ্বীপ
- এয়াকুব আলী ব্যাপারী জামে মসজিদ, সোনাপুর
- কমলা রাণীর দীঘি
- রমজান মিয় জামে মসজিদ

Matrix BCS Series

- ফকির ছাড়ু মিজি (রহ.) সাহেবের দরগাহ, মাইজদী
- চরবাটা স্টীমার ঘাট, নোয়াখালী।
- গাংচিল স্লুইস, কোম্পানীগঞ্জ
- রামনারায়নপুর মিয়া বাড়ী
- ক্যাথলিক গীর্জা, নোয়াখালী সদর।

১৪. কৃতি ব্যক্তিত্ব:

১) মোহাম্মদ রুহুল আমিন - বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা।
২) এ টি এম শামসুজ্জামান - অভিনেতা।
৩) মুনীর চৌধুরী - শহীদ বুদ্ধিজীবী।
৪) ফেরদৌসী মজুমদার - টিভি অভিনেত্রী।
৫) জহুরুল হক - আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম শহীদ।
৬) মোস্তফা সরওয়র ফারুকী - চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার এবং নাট্য নির্মাতা।
৭) আবদুল মালেক উকিল - আইনজীবি এবং রাজনীতিবিদ।
৮) শবনম বুবলি - চলচ্চিত্র অভিনেত্রী।
৯) ওবায়দুল কাদের - রাজনীতিবিদ।
১০) আবদুল হাকিম - মধ্যযুগীয় কবি।
১১) শিরীন শারমিন চৌধুরী - দেশের প্রথম নারী স্পিকার।
১২) চিত্তরঞ্জন সাহা - প্রকাশক এবং বাংলা একাডেমী বই মেলার উদ্যোক্তা।
১৩) কবীর চৌধুরী - শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক এবং অনুবাদক।
১৪) প্রণব ভট্ট - গীতিকার এবং ঔপন্যাসিক।
১৫) মোতাহের হোসেন চৌধুরী - শিক্ষাবিদ এবং লেখক।
১৬) মাহফুজ উল্লাহ - লেখক, সাংবাদিক, টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব এবং পরিবেশবিদ।
১৭) ফারাহ মাহবুব - বিচারপতি।
১৮) এ এইচ এম তৌহিদুল আনোয়র চৌধুরী - স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্ত চিকিৎসক।
১৯) বদরুল হায়দার চৌধুরী - আইনবিদ এবং প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি।
২০) তবারক হুসাইন - কূটনীতিবিদ।
২১) আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক - প্রাক্তন সেনাপ্রধান।

Matrix BCS Series

২২) সিরাজুর রহমান - ব্রিটিশ সাংবাদিক।
২৩) মঈন উদ্দিন আহমেদ - প্রাক্তন সেনাপ্রধান।
২৪) হেমপ্রভা মজুমদার - ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যক্তিত্ব।
২৫) শাহাদাত হোসেন চৌধুরী - অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের কমিশনার।

২৬) আনিসুল হক - রাজনীতিবিদ।
২৭) সা'দত হুসেন - বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর প্রাক্তন চেয়রম্যান এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা।
২৮) আর্জুমান্দ বানু - রাজনীতিবিদ।
২৯) কামরুল আহসান - বর্তমানে রাশিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত।। সরকারের একজন সচিব। পূর্বে কানাডা ও সিংগাপুরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।
৩০) আয়েশা ফেরদাউস - রাজনীতিবিদ।
৩১) মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী - শহীদ বুদ্ধিজীবী।
৩২) মোহাম্মদ একরামুল করিম চৌধুরী - রাজনীতিবিদ।
৩৩) মোহাম্মদ শরীফ - বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা।
৩৪) এইচ এম ইব্রাহিম - রাজনীতিবিদ।
৩৫) মোহাম্মদ আবুল বাশার - বীর বিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা।
৩৬) মামুনুর রশীদ কিরন - রাজনীতিবিদ।
৩৭) আবুল কালাম আজাদ - বীর বিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা।
৩৮) মাহবুবুর রহমান - রাজনীতিবিদ।
৩৯) এ এস এম শাহজাহান - প্রাক্তন পুলিশ মহাপরিদর্শক এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা।
৪০) মোরশেদ আলম - রাজনীতিবিদ।
৪১) আতাউর রহমান - টিভি অভিনেতা।
৪২) সিরাজুল আলম খান - রাজনীতিবিদ।

Matrix BCS Series

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

১ম ধাপের মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলা পরিচিতি

Facebook Page: Matrix BCS Series

নরসিংদী জেলা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর নং: ৩

সেক্টর কমান্ডার:

- মেজর এ. কে. এম. শফিউল্লাহ (এপ্রিল- সেপ্টেম্বর);
- মেজর এ. এন. এম. নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর)

উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা:

- বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান
- আবদুর রউফ বীরবিক্রম

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব:

- সুন্দর আলী গান্ধী
- সতিশ পাকরাশী
- কবিরাজ ললিত মোহন দাস
- কামিনী কিশোর মল্লিক
- বিজয় চ্যাটার্জী।

Matrix B

সিভিল সার্ভেন্ট:

- আই সি এস স্যার কে,জি,গুপ্ত,
- সাবেক সচিব মোহাম্মদ আলী
- সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান মো: নূরউদ্দিন খান প্রমূখ।

শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক:

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আ.আ. ম স আরেফিন সিদ্দিক (শিক্ষাবিদ)
- শামসুর রহমান (সাহিত্যিক)
- আলাউদ্দিন আল আজাদ(কবি)

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব:

- চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ

সংসদীয় আসন: ৫টি

১৯৯	নরসিংদী-১	মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২০০	নরসিংদী-২	আনোয়ারুল আশরাফ খান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২০১	নরসিংদী-৩	জহিরুল হক ভুঞা মোহন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২০২	নরসিংদী-৪	নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২০৩	নরসিংদী-৫	রাজি উদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৪

উপজেলা: ৬টি

অবস্থান: নরসিংদী জেলা ২৩°৪৬' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪°১৪' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৩৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯০°৬০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

আয়তন: ১১১৪ বর্গ কি:মি:

পৌরসভা: ০৬ (ছয়) টি

ইউনিয়ন পরিষদ: ৭১ (একাত্তর) টি

মানচিত্রে লক্ষ্মীপুর জেলা

নরসিংদী জেলার উত্তরে কিশোরগঞ্জ, পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দক্ষিণে নারায়নগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং পশ্চিমে গাজীপুর জেলা অবস্থিত।

নামকরণঃ

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা নরসিংহ কর্তৃক প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চলে নরসিংহপুর নগর স্থাপিত হয়। নরসিংহ নামের সাথে 'দী' যুক্ত হয়ে নরসিংহদী নামের উৎপত্তি ঘটে। নরসিংহদী নামের পরিবর্তিতরূপে বর্তমান 'নরসিংদী' জেলার নামকরণ করা হয়

নদ-নদী

এই জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়া নদ-নদী গুলোর মধ্যে মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়াল খাঁ, হাঁড়িধোয়া এবং পাহারিয়া প্রধান।

জেলার ঐতিহ্য

নরসিংদী সদর, শিবপুর, পলাশ, মনোহরদী , রায়পুরা ও বেলাব উপজেলা এই ৬টি উপজেলা নিয়ে নরসিংদী জেলা। ১৯৭৮ সালে নরসিংদী মহকুমা এবং ১৯৮৪ সালে নরসিংদীকে একটি পূর্ণাঙ্গ জেলায় পরিণত করা হয়। দক্ষিন পূর্বাঞ্চল মেঘনা বিধৌত নিম্নভূমি, পশ্চিমাঞ্চল উচ্চ সমতল ভূমি, উত্তরাঞ্চলে ছোট ছোট পাহাড়, টিলা, টেক নয়নাভিরাম অরণ্য আবরণে আবৃত। এ জেলার উত্তরাঞ্চলে পাহাড়ি ভূমি বাংলাদেশের আদি ভুমির অন্তর্গত।

সীমান্তবর্তী জেলা সমূহ: কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়নগঞ্জ এবং গাজীপুর।

ভূপ্রকৃতি: নরসিংদী জেলা মূলত মেঘনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র বিধৌত প্লাবন সমভূমির অংশ। তবে কিছু কিছু অঞ্চলে মধুপুর গড়ের সমবৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্লাইস্টোসিন যুগের সোপান পরিলক্ষিত হয়।

প্রধান নদ-নদী: মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, আড়িয়াল খাঁ, হাড়িধোয়া, পাহাড়িয়া নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ।

জলবায়ু: নরসিংদী জেলার জলবায়ু সমভাবাপন্ন ও নাতিশীতোষ্ণ। ঋতুভেদে আর্দ্রতার পরিবর্তনের সাথে সাথে জেলার আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়।

জীববৈচিত্র্য: নরসিংদী জেলায় কোন প্রাকৃতিক বনভূমি না থাকায় বন্যপ্রাণির সংখ্যাও কম। তবে গৃহপালিত প্রাণির পাশাপাশি বানর, শেয়াল, ময়ূর, বনমোরগসহ নানা ধরণের পাখ-পাখালির বিচরণ লক্ষ্য করা যায়।

জনসংখ্যা : ২২,২৪,৯৪৪ জন (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)

শিক্ষার হার : ৭৫% (ব্যানবেইস ২০১৭ এর তথ্যানুযায়ী)

আদর্শ গ্রাম: ১১ টি (২৩২ টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে)

আবাসন/ আশ্রয়ণ প্রকল্প: ০৫ টি (২৮০ টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে)

স্কুলের সংখ্যা: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা: ৭৭৩ টি, **মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা:** ২৪১ টি, **কলেজের সংখ্যা:** ৬৩ টি

জেনারেল হাসপাতালের সংখ্যা: সরকারি হাসপাতাল ৭ টি (৫ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ)।

দর্শনীয় স্থান: উয়ারী-বটেশ্বর, ঘোড়াশাল সার কারখানা

জেলার ঐতিহ্য: তাঁত শিল্প

জেলার পটভূমি

পূর্বে এই অঞ্চলটি নরসিংহ নামক রাজার শাসনাধীন ছিল। ধারণা করা হয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে রাজা নরসিংহ নরসিংহপুর নামে একটি ছোট নগর স্থাপন করেছিলেন। নরসিংদী নামটি রাজা নরসিংহের নাম অনুসারে উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন ইতিহাসবিদরা। এক সময়ে নরসিংদী অঞ্চলটি মহেশ্বরদী পরগনার অন্তর্ভূক্ত ছিল। এ পরগনার জমিদার ছিলেন দেওয়ান ঈশা খাঁ। তারপরে জমিদার ছিলেন দেওয়ান শরীফ খাঁ ও আয়শা আক্তার খাতুন। জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির পর একসময় নরসিংদী ছিল প্রশাসনিকভাবে ঢাকা জেলাধীন নারায়ণগঞ্জ মহকুমার একটি থানা। ১৯৭৭ সালে ঢাকা জেলার একটি মহকুমায় উন্নীত করা হয়। ১৯৮৪ সালে নরসিংদী সদর, পলাশ, শিবপুর, মনোহরদী, বেলাব এবং রায়পুরা এ ০৬ টি উপজেলা এবং নরসিংদী পৌরসভা নিয়ে নরসিংদীকে জেলা ঘোষণা করে সরকার।

Matrix BCS Series

মসলিনের উত্তরসুরী বেনারশীপল্লী রসুলপুর, নরসিংদী।

দর্শনীয় স্থানসমূহঃ

উয়ারী - বটেশ্বর: নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার উয়ারী ও বটেশ্বর গ্রামে নিবিড় অনুসন্ধান ও প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গনগরী। নরসিংদী শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার উত্তরে বেলাব উপজেলার মরজাল বাজার থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পশ্চিমে উয়ারী-বটেশ্বর এর অবস্থান।

চিনাদী বিল: শিবপুর উপজেলার দুলালপুর ইউনিয়নের মানিকদী, শিমুলিয়া, দুলালপুর, ভিটি চিনাদী ও দরগারবন্দ- এ পাঁচটি গ্রামের মিলনস্থলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমন্ডিত চিনাদী বিলের অবস্থান। প্রায় ৫৫০ (পাঁচশত পঞ্চাশ) বিঘা আয়তনের স্বচ্ছ পানির এ বিলটি শিবপুর উপজেলা হেডকোয়ার্টার থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য ও নীল আকাশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের আধার চিনাদী বিল জুড়ে রয়েছে বক, চিল, মাছরাঙা, পানকৌড়ি, বালিহাঁসসহ অসংখ্য পাখ-পাখালির বিচরণ।

সোনাইমুড়ি টেক: শিবপুর উপজেলার বাঘাব ইউনিয়নের কুন্দারপাড়া বাজারের পাশেই সোনাইমুড়ি টেক অবস্থিত। প্লাইস্টোসিন যুগের সোপান অঞ্চলের অন্তর্গত লাল মাটির টিলা এবং তাঁর পাদদেশে অবস্থিত সবুজঘেরা প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভাই গিরীশ চন্দ্র সেনের বাড়ি: পবিত্র কোরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদক ভাই গিরীশ চন্দ্র সেনের বাড়ি নরসিংদী সদর উপজেলার পাঁচদোনা ইউনিয়নে অবস্থিত। বাড়িটি বর্তমানে একটি সংগ্রহশালা হিসেবে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

বালাপুর জমিদার বাড়ি: নরসিংদী সদর উপজেলার পাইকারচর ইউনিয়নে জমিদার নবীনচন্দ্র সাহার বাড়িটি বালাপুর জমিদার বাড়ি নামে খ্যাত। মেঘনা নদীর তীরবর্তী এলাকায় প্রায়

Matrix BCS Series

এ জেলার আদি ভূমিতে অবস্থিত বেলাব উপজেলার 'ওয়ারী বটেশ্বর' গ্রামে পরিত্যক্ত ভিটা ও অসমরাজার গড়' আবিস্কৃত হয়েছে, যা নব্য প্রস্তর যুগীয় সভ্যতার নিদর্শন । ওয়ারীতে খৃষ্টপূর্বকালের ছাপাঙ্কিত পর্যাপ্ত রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে। এসব মুদ্রা নরসিংদী অঞ্চলের আদি সভ্যতার স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার 'জয়মঙ্গল' নামে পাহাড়ী গ্রামে আবিস্কৃত হয়েছে গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা। একই উপজেলার আশ্রাফপুরে আবিস্কৃত হয়েছে সপ্তম শতাব্দীর মহারাজা দেব খড়গের তাম্রলিপি এবং অষ্টধাতুর নির্মিত বৌদ্ধ নিবেদন স্তুপ। এই আশ্রাফপুরেই আবিস্কৃত হয়েছে গৌড়ের স্বাধীন নরপতি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিন নসরৎ শাহের রাজত্বকালে নির্মিত একটি অতি প্রাচীন মসজিদ। পলাশ উপজেলার পারুলিয়া গ্রামে আনুমানিক ১৭১৬ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ান শরীফ ও তার স্ত্রী জয়নব বিবি নির্মিত মোগল স্থাপত্যরীতির একটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। এ অঞ্চলের জনসাধারণের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনে যাঁদের প্রভাব আলোকবর্তিকারূপে কাজ করেছে সে সব পীর আউলিয়াদের পবিত্র মাজার শরীফ রয়েছে। নরসিংদী রেলওয়ে স্টেশনের অনতিদুরে পশ্চিমদিকে তরোয়া গ্রামে হযরত কাবুল শাহের মাজার, কুমরাদী গ্রামে হযরত শাহ মনসুরের মাজার, পাটুলী ইউনিয়নের হযরত শাহ ইরানী মাজার, ওয়ারী গ্রামে হযরত সোলায়মানের মাজার, এবং পারুলিয়া দেওয়ান সাহেবের মাজার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নরসিংদী জেলার একটি বিশেষ এবং উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য হচ্ছে তাঁত শিল্প। 'প্রাচ্যের ম্যানচেষ্টার' বলে খ্যাত শেখেরচর (বাবুরহাট) এ জেলায় অবস্থিত। বাংলাদেশের তাঁত বস্ত্রের চাহিদার প্রায় সিংহভাগ পূরণ করছে এ জেলার তাঁত শিল্প। শিক্ষা-সাহিত্য, ও সংস্কৃতি জগতে যারা আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করে নরসিংদীকে ঐতিহ্যমন্ডিত করেছেন তাঁরা হলেন উপমহাদেশের প্রথম বাঙালি আই সি এস স্যার কে, জি, গুপ্ত, পবিত্র কোরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদক ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন। অন্যদের মাঝে যাঁরা চিরকস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন বিখ্যাত কবিয়াল হরিচরণ আচার্য, যিনি 'কবিগুণাকর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন, মৌলভী সেকান্দর আলী, কবি দ্বিজদাস, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল-আজাদ এ জেলার গর্ব। আব্দুল মোমেন খান(প্রাক্তন খাদ্য মন্ত্রী) আহমদুল কবির মনু মিয়া(সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ) প্রমূখ নরসিংদী জেলারই কৃতি সন্তান।

মহান মুক্তিযুদ্ধেও গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টিতেও নরসিংদীর ঐতিহ্য রয়েছে। যাঁর বুকের তাজা রক্ত মুক্তি পাগল জনতার মিছিলকে বেগবান করে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়েছিল সেই উনসত্তরের গণ আন্দোলনের শহীদ 'আসাদ' এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বীরশ্রেষ্ট ফ্লাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান এ জেলারই সন্তান। কলা, কাঁকরোল, শশা, সিম,বেগুন ,ধান, পাট, আলু ও লটকন উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য নরসিংদী বাংলাদেশের একটি অন্যতম কৃষি সমৃদ্ধ জেলা হিসেবে পরিচিত হয়েছে।

Matrix BCS Series

৩২০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত এই জমিদার বাড়িটি একটি একতলা, একটি দো-তলা এবং একটি তিনতলা ভবনবিশিষ্ট।

ড্রিম হলিডে পার্ক: নরসিংদী সদর উপজেলার পাঁচদোনা ইউনিয়নের চৈতাবতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে ১৮.২১১৯ একর জমির উপর ড্রিম হলিডে পার্ক গড়ে উঠেছে। পার্কটি ঢাকাসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনসাধারণের নিকট শিশু বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত।

বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্মৃতি পাঠাগার: নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার রাধানগর ইউনিয়নের রামনগর (বর্তমানে মতিউরনগর) গ্রামে বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্মৃতি পাঠাগার অবস্থিত। মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী এই বীরের জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও সকলের জন্য উন্মুক্ত।

পুরাকীর্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ওয়ারী বটেশ্বরঃ ঢাকা শহর থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও আড়িয়ালখাঁ নদীর মিলনস্থলের তিন কিলোমিটার পশ্চিমে কয়রা নামক একটি প্রাচীন নদীখাতের দক্ষিনতীরে উয়ারী-বটেশ্বরের অবস্থান। রাস্তার দু'পাশে ফসল আর ফসলবিহীন ক্ষেতের প্রাসত্মর টিলাময় লাল মাটির এক অঞ্চল।

ব্রিটিশ আমলে নরসিংদী ছিল নারায়নগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত এলাকা। বাংলাদেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৭-এ নরসিংদী মাহকুমায় উন্নীত হয়। বর্তমানে ছয়টি থানা নিয়ে (নরসিংদী সদর, বেলাব, মনোহরদী পলাশ, রায়পুরা ও শিবপুর) নরসিংদী জেলা ঠিত হয়। নরসিদী জেলার বেলাব উপজেলার আমলাব ইউনিয়নের উয়ারী বটেশ্বর গ্রাম সেই প্রাচীন পত্মতাত্ত্বিক জায়গা।

হানিফ পাঠান উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্মতাত্ত্বিক নিদর্শনসংগ্রহের সূচনা করে গেছেন। সেই পথ ধরেই বর্তমানে তাঁর বংশধর সকল প্রত্মতাত্ত্বিক উপকরণ সংরক্ষন করেছেন। সে জন্য প্রত্মতাত্ত্বিক নিদর্শনের কথা বললেই ঠিকানা বলা হয় '' হানিফ পাঠানের বাড়ি''। বেলাব সদর উপজেলা থেকে উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্মস্থলটি ৪ কিলোমিটার দূরে। প্রথমে হানিফ পাঠান এই গ্রামগুলোতে কিছু প্রাচীন ছাপাংকিত রৌপ্য মুদ্রা খুজে পান এবং সন্দেহ করেন তা মৌর্য সভ্যতার সময়কার খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত। হানিফ পাঠান ও হাবিবুল্লা পাঠান এই কাজ এগিয়ে নিচ্ছেন বছরের পর বছর ধরে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি মিউজিয়াম গড়ে তুলেছেন। বশত বাড়ীর একটি ঘরের এক পাশে কাচ দিয়ে ঘেরা কতগুলো প্রত্মতাত্ত্বিক নির্দশন রয়েছে যথাক্রমেঃ ছাপাংকিত রৌপ্য মুদ্রা, ১৯৯৭ সালে প্রাপ্ত ১৫-১৬ শতক আগের ব্রেঞ্জ মূর্তি, ১৯৯৭ সালের পুকুর খননকালে প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব ১-২ শক আগের প্রাচীন মৃৎপাত্র, ১৯৮৮ সালের প্রাপ্ত ১৯ শতক আগের ব্রোঞ্জের ১০০০ শতকের লৌহ-কুঠার ও প্রসত্মরীভূত কাঠ ইত্যাদি, ১৭ শতকের মনসা মঙ্গল কাব্য, ১৯ শতকের হস্ত লিখিত সবচেয়ে ক্ষুদ্র কোরআন শরীফ, মিশরের প্যাপিরাস (সংযুক্ত প্যাপিরাস শিল্পকর্মটি প্রাচীন

Matrix BCS Series

মিশরীয়গন যে পদ্ধতিতে প্যাপিরাস তৈরি করতো সেই পদ্ধতিতে তৈরি)। ২/১ টি ছড়া বেশিরভাগ প্রত্নতত্ত্বই, এই উয়ারী-বটেশ্বর থেকে প্রাপ্ত। এছাড়া ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাকালী কিছু ডকুমেন্টস তাঁদের সংগ্রহে রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে গ্রিক রোমান লেখকদের বিবরণে আলোক্সজান্ডারের সমসায়মিক উপমহাদেশের সর্বপূর্বে যে অঞ্চলের শক্তিশালী গঙ্গাবাড়িই রাজ্য ও তাঁর রাজধানী গাঙ্গে বন্দর হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। পাঠানের দাবী হলো উয়ারী-বটেশ্বর সেই অঞ্চল।

মূলত ২০০ সালের এপ্রিল মাসেই প্রথমবারের মতো খনন কাজ করা হয়। তখন থেকেই নগর বৈশিষ্ট্যের ধারণাটি নিশ্চিত হতে থাকে। নেদারল্যান্ডে কার্ব-১৪ টেষ্টে তারিখ নির্ধারণের মাধ্যমে উয়ারী-বটেশ্বর গ্রাম দুটি দেশের সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীনস্থান। এতে যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সেগুলো ২৪৫০ বছর আগের অর্থাৎ খিস্টের জন্মের ৪৫০ বছর আগের বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তখন ছিল মৌর্যবংশের রাজত্বকাল। এরপর ২০০২ সালের জুন মাসে দ্বিতীয়বারের মতো খনন কাজ করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ছাড়াই এ অঞ্চল থেকে ভূ-পৃষ্ঠ সংগ্রহ হিসেবে উয়ারী বটেশ্বর অঞ্চল থেকে এক হাজার লৌহ নিদর্শন, কয়েক হাজার ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা এবং প্রচুর সংখ্য স্বল্পমূল্যবান প্রসত্মরের পূজি সংগৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যকোন অঞ্চল থেকে এত লৌহ নির্দশন, ছাপাংকিত রৌপ্য ও প্রসত্মরের মূর্তি সংগ্রহ করা যায়নি। এছাড়াও পাওয়া গেছে নব্যপ্রসত্মর যুগের বৈশিষ্টযুক্ত প্রসত্মর ও অশ্মীভূত কাঠের হাতিয়ার, নকশাঙ্কিত রক্ষাকবচ, হাই-টিন ব্রোঞ্জ নির্মিত নবযুক্ত পাত্র, কাচের পুতি, ব্ল্যাক স্লিপড ওয়্যার এবং পোড়ামাটি ও পাথরের বিবিধ নিদর্শন। মধ্যযুগের প্রথম দিকে দীর্ঘ আকার বিশিষ্ট অসম রাজার গড় নামে একটি দূর্গ পাওয়া গেছে। এই ধরনের প্রত্নবসত্ব উয়ারী-বটেশ্বর সংলগ্ন রাইঙ্গারটেক, কান্দুয়া এবং সোনরুতলায় লক্ষনীয় মাত্রায় পাওয়া গেছে। আসলে বেলাব থানা জুড়েই এই প্রত্নবস্তর ক্ষেত্রস্থল।

হাবিবুল্লা পাঠানের মতে এখানে নব্যপ্রস্তর যুগ ও মৌর্য যুগের নির্দশন পাওয়া গেলেও একটা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের পর শুধু পাল সময়কার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু মাঝামাঝি সময়টাতে আসলে কি ঘটেছিল, সে ব্যাপারে এখনও কিছু জানতে পারা যায় নি। তরে তাঁর

মতে এই এলাকার সাথে রোম কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারও তখন জলপথে যোগাযোগ ছিল। কারণ বর্তমানে গ্রামের পাশের যে শুকিয়ে যাওয়া কয়ড়া নদীটি আছে, এটা একসময় ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত ছিল। আর অতীতেই শুধু নয় এখনও নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বাণিজ্য এলাকা গড়ে উঠে। উয়ারী-বটেশ্বরের ক্ষেত্রেও হয়তো তাই ঘটেছিল।

ভাষা ও সংস্কৃতি

নরসিংদী নব প্রতিষ্ঠিত হলেও ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। নরসিংদীর পূর্বনাম মহেশ্বরদী এবং তার ও অনেক পূর্বে সমতটের একটি অংশ। নরসিংদীর ওয়ারী বটেশ্বর প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারের পর নরসিংদীর প্রতি মানুষের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও ভাষা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। নরসিংদীর মৌল সম্পদ তার ভাষা । আমাদের ভাষার মধ্যে যে কথ্যরূপ তা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। নরসিংদী এক সময় ঢাকার জেলা এবং নারায়নগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভূক্ত ছিল। নরসিংদীর ছয়টি উপজেলার শব্দ ও উচ্চারণের মধ্যে পার্থক্য আছে।

নরসিংদীর বেশির ভাগ মানুষই নরসিংদীকে নসোন্দি উচ্চারণ করে থাকে। ভাষা এক বিচিত্র বিষয়। এক এক পেশার এক এক ভাষার শব্দ বিদ্যমান। বাসের ড্রাইভার, কন্ট্রাকটর, হেলপারদের ভাষার সাথে অন্যদের পাথক্য রয়েছে। বাজারের ভাষার সাথে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ভাষা মিলবে না, আদালতের ভাষা, তাছাড়া ধর্মীয় ভাষা, অশিক্ষিত কামার কুমারদের ভাষাদের মধ্যেও পাথক্য আছে। ড. মনিরুজ্জামান তাঁর নরসিংদীর ভাষা ও লোকজীবন বইয়ে উল্লেখ করেছেন এক এক বিষয়ের শব্দগুলি হলো এক এক ডোমেনগত বিষয়িক শব্দ। বিভিন্ন ডোমেন এ বিভক্ত শব্দ হলো যেমন-শিক্ষা, খেলাধূলা, শিল্প সংস্কৃতি, আত্মীয়তা ইত্যাদি বিষয়ের বা ধারা গত শব্দ তার বইয়ে আরও উল্লেখ করেছেন।

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার বলেন- ক্রোশে ক্রোশে ভাষা ভিন্ন হয় কিন্তু তা নিতান্তই ভঙ্গি। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় গেলেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, স্বরাগত, পার্থক্য, ধ্বনিতে শব্দে-বাক্যে বিশিষ্টার্থক প্রয়োগে এই সত্য প্রতিপদে উপলব্ধি করা যায়। এই পার্থক্যই প্রতিটি উপভাষা যার যার সীমান্ত রক্ষায় ব্যস্ত, যদিও তার সাধারণ শব্দরেখা মন্ডল ভিন্ন রেখেও এই পার্থক্যের সাধারণ গড় নির্ণয় সম্ভব। এক সময় শিবপুর, বেলাব দুটিই রায়পুরা থানায় থাকলেও রায়পুরার কিছু অংশে বাঞ্চারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রভাব রয়েছে। কিন্তু শিবপুর ও বেলাবতে কিশোরগঞ্জ, কাপাসিয়া ও গাজীপুর এর প্রভাব রয়েছে। নরসিংদী এক সময় নারায়ণগঞ্জর অধীনে ছিল বিধায় নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ ভাষাও প্রায় একই রকম।

বর্তমান পলাশ উপজেলাটি শীতলক্ষ্যার পশ্চিম পার্শ্বে কালীগঞ্জ উপজেলার সাথে যুক্ত ছিল । পলাশে 'গ' এর আধিক্য আছে 'মিয়াগ'। মনোহরদীর ভাষার মধ্যে আলাদা একটা টান রয়েছে। গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ জেলার ভাষা ও সংস্কৃতি এলাকাটিকে কিছুটা হলেও প্রভাবিত করেছে। খাইচুন, গেছুইন ইত্যাদি টান আছে। তাছাড়া কোথাও কোথাও 'দো' শব্দ প্রচলিত আছে যেমন- গেছুইন দো। বাড়তি দো শব্দ ব্যবহার করা হয়।

নরসিংদী সদরে 'ক' এর উচ্চারণ 'হ', কাকা এর উচ্চারণ কাহা, ঢাকা এর উচ্চারণ ঢাহা, দেখা এর উচ্চারণ দেহা ইত্যাদি।

নরসিংদীতে ড় এর ধ্বনি 'র' রূপে উচ্চারিত হয়। 'ঘ' এর ধ্বনি 'গ' রূপে উচ্চারিত। 'ছ' এর ধ্বনি 'চ' রূপে উচ্চারিত।

বেলাব উপজেলায় 'হ' এর উচ্চারণ 'অ' এবং 'স' এর উচ্চারণ 'হ' করা হয়। যেমন-হাতি উচ্চারণ করে আতি এবং সুতা উচ্চারণ করে হোতা ইত্যাদি।

নরসিংদীতে মহাপ্রাণ ধ্বনি স্থলে অল্প প্রাণ ধ্বনি উচ্চারণ করে থাকে যেমন- 'ঘুম' উচ্চারণ করে থাকে 'গুম'। নরসিংদীর রায়পুরার ভাষার মধ্যে অন্য উপজেলা হতে পাথক্য রয়েছে। যেমন রায়পুরার সাধারণ মানুষ অনেকে রায়পুরাকে লাইপুরা, রবিবারকে লববার, রেললাইনকে লেললাইন, রাতকে লাত, ভালোকে বালা, কালোকে কাইল্লা ইত্যাদি উচ্চারণ করে থাকে।

শিবপুরের ভাষার মধ্যে অন্য থানা হতে পার্থক্য আছে। শিবপুর শব্দটি শিববুর উচ্চারণ করে। যোশর শব্দটি যোয়র উচ্চারণ করে। কুন্দার পাড়া এর উচ্চারণ করে কুন্দরপারা; খৈনকুট এর উচ্চারণ করে খৈনপুট, পুটিয়ার বাজার উচ্চারণ করে পুইট্টার বাজার, লালখারটেক উচ্চারণ করে লালহারটেক, ইটাখোলা এর উচ্চারণ করে ইটখলা, টাকা উচ্চারণ করে টাহা/ টেহা, সিএনবি উচ্চারণ করে সিনবি।' বড়' , 'জেরে' বাড়তি উচ্চারণ ।

মাইগ্রেটেডদের ভাষা অর্থাৎ কুমিল্লা, নোয়াখালি, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, দিনাজপুর, রংপুর, বরিশাল অঞ্চলের লোকজন কর্মসংস্থানের জন্য অর্থাৎ চাকরী অথবা কাজের সন্ধানে এসে এখানেই বসতি স্থাপন করে অথবা স্থায়ীভাবে বসবাস করছে তাদের ভাষার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ

দেশের ভেজা ভূত্বকের নিচে আছে জ্বালানী গ্যাস যা বাংলাদেশের সেরা সম্পদে পরিগনিত হয়েছে। অত্যন্ত গৌরবেরবিষয় নরসিংদী জেলা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদেও সমৃদ্ধ। নরসিংদী জেলার গ্যাস ক্ষেত্রটি ১৯৯০ সালে আবিষ্কৃত হয়। পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনায় ও আর্থিক সহায়তায় কূপটি খনন করা হয়। গ্যাস ক্ষেত্রটি বাংলাদেশের প্রথম স্ট্রটিগ্রাফিক আধার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। খনন করার সময় বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদন সক্ষম ২টি গ্যাস জোনের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাটির ৯৫০৬ ফুট ও দ্বিতীয়টি ১০৩৩৩ ফুট গভীরে অবস্থিত। এ দুটি প্রধান গ্যাস জোন ছাড়াও আরও ৪টি ছোট জোনের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্যাস ক্ষেত্রটির (প্রামত্ম) খনন করা হলে উপরিউক্ত ৪টি জোনও বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করতে পারবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্তমানে এই গ্যাসক্ষেত্র থেকে প্রায় ২৭ মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস প্রতিদিন জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রীডে সঞ্চালন করা হচ্ছে।

Matrix BCS Series

নরসিংদী জেলার প্রাচীনতম এলাকা বর্তমান শিবপুর উপজেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে কামারটেক নামক স্থানে গ্যাস ফিল্ডটি অবস্থিত। উক্ত গ্যাসকূপ থেকে প্রতিদিন গ্যাস সরবরাহ ছাড়াও অশোধিত জ্বালানি তেল নিয়মিত উত্তোলন করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে উক্ত ক্ষেত্রটি ৯ নং ব্লকের অন্তর্ভূক্ত। এ ব্লকটি খুবই সম্ভাবনাময়, যার ফলে এ ব্লকটি উন্নয়নের জন্য বিশেষ বড় বড় তেল কোম্পানীগুলি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সরকার এ বিষয়ে বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে একটি সম্ভাবনাময় প্রকল্প হিসেবে এটি আত্মপ্রকাশ করে।

Facebook Page: Matrix BCS Series
Matrix Series

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

১ম ধাপের মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলা পরিচিতি

Facebook Page: Matrix BCS Series

যশোর জেলা

Matrix B

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর নং: ৮

সেক্টর কমান্ডার:

- মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (জুলাই পর্যন্ত)
- মেজর আবুল মঞ্জুর (আগস্ট-ডিসেম্বর)

উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা:

- মতিউর রহমান বীরবিক্রম
- নূরুল হক বীরবিক্রম

সংসদীয় আসন: ৬টি

৮৫	যশোর-১	শেখ আফিল উদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৮৫	যশোর-২	মোঃ নাসির উদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৮৫	যশোর-৩	কাজী নাবিল আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৮৫	যশোর-৪	রণজিত কুমার রায়	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৮৫	যশোর-৫	স্বপন ভট্টাচার্য্য	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৮৫	যশোর-৬	মোঃ শাহীন চাকলাদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

- **আধুনিকসদর হাসপাতালঃ** ১ টি (২৫০ শয্যা বিশিষ্ট)
- মেডিকেল কলেজ: ১ টি
- খাবার স্যালাইন উৎপাদন ওবিতরন সেল ১ টি
- জেলা ইলেক্ট্রো মেডিকেল ওয়ার্কশপ- ১ টি
- রোগীর চিকিৎসার হার-১৪২.৪১% (গড় প্রতিদিন)
- মঞ্জুরীকৃত ডাক্তারের পদ-৩৬৬, কর্মরত-২২৪জন
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সঃ ৮টি
- বক্ষ ব্যাধি (টি বি) ক্লিনিকঃ ১ টি
- বক্ষ ব্যাধি হাসপাতাল: ১ টি
- বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ক্লিনিক: ১ টি
- উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ ২২ টি
- বেসরকারী হাসাপাতাল (ক্লিনিক) ১২২টি

ভৌগলিক পরিচিতি

বৃহত্তর যশোর জেলা ৮৮°৪০' হতে ৮৯°৫০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২২°৪৭' হতে ২৩°৪৭' উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। যশোর একটি মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ, পদ্মা ও হুগলী নদীর মধ্যবর্তী সুবৃহৎ ব-দ্বীপটির একটি অংশ হচ্ছে যশোর। অল্পকথায় গংগা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্য ভাগে ব-আকৃতির জায়গাকে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর সমান তিনভাগে ভাগ করলে মধ্য ভাগের পশ্চিম-উত্তর ও দক্ষিণপূর্ব অংশ ছাড়া অবশিষ্ট অংশ যশোর। তৎকালে জেলার দৈর্ঘ্য ছিল ২৪৪ কিলোমিটার বা ১৪০ মাইল এবং প্রস্থ ৭৬.৮ কিলোমিটার বা ৪৮ মাইল। সেমোতাবেক আদি যশোরের আয়তন ছিল ১৪৫৬০ বর্গ কিলোমিটার বা ৫৬০০ বর্গমাইল। যার মধ্যে ৪৪৬১.৬ বর্গ কিলোমিটার বা ১৭৬০ বর্গমাইল সুন্দরবন অংশ। এ কালপূর্ব থেকে প্রাক-পাকিস্তান পূর্বে যশোর জেলার আয়তন ছিল ৭৬৫০ বর্গ কিলোমিটার বা ২৫২৫ বর্গমাইল। বর্তমানে এ জেলায় কোন বনভূমি নেই। যশোর জেলায় অবস্থিত নদী সমূহের মধ্যে ভৈরব, চিত্রা, কপোতাক্ষ, হরিহর, দাদরা, বেত্রাবতী, কোদলা ও ইছামতি অন্যতম।

জেলার পটভূমি

বাংলাদেশ নামের ভূখন্ডটি প্রাচীনকালে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইতিহাসে এসব রাজ্য ভাংগা, পান্ড্রু, সমতট, তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ ইত্যাদি নামে পরিচিত। উক্ত সময়ে যশোর সম্ভবত তাম্রলিপ্ত ও ভাংগা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়। পরবর্তীকালে যশোর সহ সন্নিহিত অঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগলিক ও বৈপ্লবিক ইতিহাস বহু উত্থান-পতন আর বিচিত্রতায় পূর্ণ।

গংগা নদীর পলল অবক্ষেপণে সৃষ্ট যশোর জেলার সবচেয়ে পুরাতন বিবরণ পাওয়া যায় টলেমির মানচিত্রে। মহাভারত, পুরান, বেদ ও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এ অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ জেলার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এক সময় এই অঞ্চল

Matrix BCS Series

জেলার পুরাতন নাম: খলিফাতাবাদ

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৭৮১

উপজেলা: ৮টি

ইউনিয়ন: ৯১টি

যে নদীর তীরে অবস্থিত: কপোতাক্ষ নদ

এক নজরে যশোর

প্রাসনিক কাঠামোর দিক থেকে যশোর বাংলাদেশের ১৩তম বৃহত্তম জেলা। খুলনা বিভাগের অধীন ৮টি উপজেলা নিয়ে এ জেলা গঠিত। জেলার মোট আয়তন ২৫৯৪.৯৫ বর্গমাইল এর মধ্যে ৬০ বর্গমাইল নদী এলাকা। ২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী যশোর জেলার মোট লোকসংখ্যা ২৭,৬৪,৫৪৭ জন। রাজধানী ঢাকা থেকে সড়ক পথে এ জেলার দূরত্ব প্রায় ২৭০ কিলোমিটার।

সাধারণ তথ্যাবলীঃ

- **জনসংখ্যা:** মোট-২৭,৬৪,৫৪৭ জন **(২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)**
    - পুরষ-১৩,৮৬,২৯৩ জন
    - মহিলা-১৩,৭৮,২৫৪ জন
- ভোটার সংখ্যা: মোট-১৯,৬০,১৭৩
    - পুরষ-৯,৮৯,১৬২
    - মহিলা-৯,৭১,০১১
- জনসংখ্যারঘনত্ব: ৯৪ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটার
- আয়তন: ৬৬৭৪ বর্গ কিলো মিটার
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.১১%
- শিক্ষার হার: ৫৬.৫২% (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী সাতবছর এবং তার বেশী বয়সের মানুষের শিক্ষার হার)
- উপজেলা: ৮ টি
- পৌরসভা: ৮ টি
- ইউনিয়ন: ৯৩ টি
- গ্রাম: ১৪৭৭ টি
- থানা: ৯ টি
- মোট সীমান্তের দৈর্ঘ্য: ১৪২ কিলোমিটার

শিক্ষাঃ

- সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ৬৭৬ টি
- সম্প্রতি সরকারিকরনঃ ৬০৯টি
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হারঃ ১০০%
- প্রাথমিক শিক্ষা হতে ঝড়ে পড়া শিশু হারঃ ৮.১৫%
- প্রাথমিক উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাঃ ১,৭৭,৪৪৬

Matrix BCS Series

গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। অনার্য জাতিবলে পরিচিত এক শ্রেণীর আদিম মানুষ জংগল পরিষ্কার করে সর্ব প্রথম এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

যশোর জেলার নামকরণ অনুসন্ধানে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। যশোর নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বহু কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। ঐতিহাসিকগণের মধ্যেও এ জেলার নামকরণ সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা যায়। সেহেতু এ বিষয়ে কোন একক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। প্রতিষ্ঠাকালের দিক থেকে যশোর বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন জেলা। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য এ জেলাটির সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে ১৭৮৬ সালে। পাক-ভারত উপ-মহাদেশে বৃটিশের আগ্রসী রাজত্ব শুরু হওয়ার ফলে যশোরসহ সমগ্র বঙ্গ ইংরেজ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। চিরকালের আপোসহীন সংগ্রামী যশোরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে অপারগ হলে ইংরেজ শাসকগণ তাদের শাসন কাজের সুবিধার জন্য যশোরকে একটি ভূখন্ডে নির্দিষ্ট করে তাকে স্বতন্ত্র জেলায় রূপান্তরিত করে। প্রথম প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন যশোর জেলার সীমানা-খুলনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর এবং আজকের চুরাশিপূর্ব অবিভক্ত যশোরসহ ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বিশাল অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল।

যশোর জেলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুইশত বছর আগে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় চারশ বছর পূর্বে ১৬৭৪ থেকে পরবর্তীকালের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যশোর একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং স্বাধীন নৃপতিগণ কর্তৃক শাসিত হত। এক সময়ের ভাটির দেশ বলে পরিচিত তৎকালীন স্বাধীন যশোর রাজ্যের সীমানা-পূর্বে মধুমতি নদী, উত্তরে হরিণঘাটা, পশ্চিমে ভারতের কুশদ্বীপ ও প্রাচীন ভাগীরথী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর বিস্তৃত ছিল।

স্বাধীন যশোর রাজ্যের যারা শাসক ছিলেন তাঁদের মধ্যে মহারাজ বিক্রমমাদিত্য, রাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা সীতারাম রায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেউ কেউ মনে করেন বিখ্যাত সাধক ও ইসলাম প্রচারক খাঁন জাহান আলী যশোরের স্বাধীন শাসনকর্তা ছিলেন। আবার কেউ বলেন খাজা খাঁন জাহান আলী ছিলেন দিল্লীর সুলতান মামুদ শাহ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে দিল্লীর সম্রাটগণ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি কিংবা স্থানীয় শাসকগণ যশোরের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, কিন্তু বার বার সে বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছে। ১৮৬০ সালের কৃষক ও নীল বিদ্রোহের সময় ইংরেজ শাসকদের পক্ষে বিশাল যশোরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা পুনরায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন ইংরেজগণ খুলনা, ঝিনেদা, মাগুরা এবং নড়াইলকে উপ-বিভাগ (মহাকুমা) রূপান্তরিত করে (১৮৬১-৬২)। ১৮৬৩ সালে জেলার দক্ষিণাংশ সাতক্ষীরাকে চব্বিশ পরগণা জেলার সংগে যুক্ত করা হয়। এর দীর্ঘ বিশ বছর পর ১৮৮১ সালে পুনরায় যশোরকে ভেংগে এ জেলার মহকুমা খুলনাকে জেলায় উন্নীত করা হয়। এই একই সময়ে আবার সাতক্ষীরাকে চবিবশ পরগণা থেকে আলাদা করে নব গঠিত খুলনা জেলার সংগে যুক্ত করে মহকুমায় উন্নীত করা হয়। ১৮৬৩ সালের শেষভাগে পশ্চিম বাংলার বনগ্রাম মহকুমাকে যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Matrix BCS Series

প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে যশোরসহ সমগ্র বঙ্গ একটি স্বাধীন এবং শক্তিশালী রাজ্য ছিল। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর টলেমীর মানচিত্রে তার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্তও যশোর বঙ্গের অধীন ছিল বলে অনুমান করা হয়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে উত্তর ভারতের গুপ্ত সম্রাজ্যের সমুদ্র গুপ্ত তার সম্রাজ্য বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করলে যশোরসহ সন্নিহিত অঞ্চল তার সম্রাজ্যভুক্ত হয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্ত সম্রাজ্যের পতন ঘটলে যশোর পুনরায় ভাংগা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়ের সম্রাট শশাংক কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হলে যশোর তার সম্রাজ্যভুক্ত হয়। শশাংকের কাছ থেকে সম্রাট হর্ষবর্ধন এ অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে সংক্ষিপ্তকালের জন্য যশোর বৌদ্ধ রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পর নিজ নিজ কর্মফলের উপর মানুষের ভবিষ্যত নির্ভরশীল বৌদ্ধধর্মের এ মূলনীতি এ ধ্বংসস্তুপ তাদের স্মৃতি বহন করে।

রাজা যশোরমণি নামে একজন রাজা বৌদ্ধদের কাছ থেকে এ অঞ্চলের শাসন ভার অধিকার করেন। যশোরমণির পরে পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পাল রাজাগণ ১০৮০ সাল পর্যন্ত যশোরসহ সন্নিহিত অঞ্চল তাদের শাসনক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্ত রাখেন। পাল রাজত্বের পর বর্মন রাজাগণ ১১৫০ সালে পর্যন্ত যশোর শাসন করে বলে জানা যায়। এরপর এখানে সেন রাজাগণ তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। সেন রাজাগণ ১২০৪ সাল পর্যন্ত যশোর তাঁদের শাসনকাল অব্যাহত রাখে। লক্ষ্মণসেন এই বংশের শেষ রাজা।

১২০৪ সালে ইখতিয়ারুদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী নামে দিল্লীর সম্রাট শিহাবুদ্দীনের একজন মুসলিম সেনাপতি বংগদেশে সেন রাজ বংশের পতন ঘটিয়ে বংগদেশ অধিকার করেন এবং এই উপমহাদেশে প্রথম মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয় সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়।

চতুর্দশ শতাব্দীর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যশোর ছিল দিল্লীর সম্রাটগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নামক একজন স্বাধীন নৃপতি বংগদেশ জয় করলে যশোর তাঁর শাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর থেকে এ অঞ্চল পর্যায়ক্রমে স্বাধীন নৃপতিদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে।

১৪৮৭ সালে ইলিয়াস শাহী বংশের পতন ঘটিয়ে দাস বংশ তাদের রাজত্ব শুরু করে। দাসরাজগণ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে তাঁদের অধিকার টিকিয়ে রাখেন। দাস বংশের পতনের পর যশোর সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের শাসনাধীন চলে যায়। ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত হুসেনশাহী বংশ এ অঞ্চলের তাঁর শাসনকাল অব্যাহত রাখেন।

পরবর্তীকালের ইতিহাসের অন্যতম প্রসিদ্ধ পাঠান সম্রাট শেরশাহ বঙ্গদেশাধিকার করলে যশোর তাঁর সম্রাজ্যভুক্ত হয়। পাঠান রাজত্বের পর বিখ্যাত মোগল রাজবংশ পাক-ভারত উপমহাদেশের বিশাল অঞ্চল জুড়ে তাদের স্মরণীয় শাসনকালের সূচনা করে। এ সময় বিখ্যাত মোগল সম্রাট আকবর প্রথম এই অঞ্চলে ফৌজদার নিযুক্ত করে শাসনের ব্যবস্থা করেন। যশোরের প্রথম ফৌজদার ছিলেন ইনায়েত খাঁ। এরপর সরফরাজ খাঁ, নুরুল্লা খাঁ পর্যায়ক্রমে যশোরের ফৌজদার নিযুক্ত হয়ে আসেন।

নবাবী শাসনামলে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনকালে সীতারাম রায় নামক একজন স্থানীয় রাজা কর্তৃক যশোর শাসিত হত। সীতারাম ছিলেন উত্তর রাঢ় বংশীয় কায়স্থ। তার পিতা উদয় নারায়ণ ভূষণার ফৌজদারের অধিনে একজন তহশীলদার ছিলেন। রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী ছিল মহম্মদপুর।

রাজা সীতারাম রায় মুর্শিদকুলী খাঁকে অমান্য করলে নবাব তার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধে সীতারাম রায় পরাজিত হন। সীতারামের পতনের পর যশোর কয়েকটি জমিদারীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নাটোরের জমিদার জেলার পূর্বাংশ, চাঁচড়ার জমিদার জেলার দক্ষিণাংশ এবং নলডাংগার জমিদার উত্তরাংশ তাদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে গৌড়ের শাসনকর্তা দাউদের একজন বিশ্বস্ত সহযোগী শ্রীহরি ১৫৭৪ সালের যশোরের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসে এই শ্রীহরিই মহারাজ বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত। বিক্রমাদিত্য গৌড়ের রাজা দাউদ কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ঈশ্বরপুর এবং তেকাটিয়া ছিল বলে জানা যায়। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্য মৃত্যুবরণ করেন। বিক্রমাদিত্যের শাসনকালে তার বিশস্ত সহযোগী ও জ্ঞাতিভ্রাতা বসন্ত রায়ই যশোরের প্রকৃত শাসক ছিলেন। গৌড় থেকে লুট-করা অঢেল ধন-সম্পদ দ্বারা যশোরকে বসন্ত রায়ই ঐশ্বর্যমন্ডিত করে গড়ে তোলেন।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর কয়েক বছর পর ১৫৮৭ সালে তদীয় পুত্র প্রতাপাদিত্যকে বসন্ত রায় যশোরের রাজা বলে ঘোষণা করেন। প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত নাম গোপীনাথ। ১৫৬০ সালে তিনি গৌড়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতাপাদিত্য তার প্রাপ্ত উপাধি। সুন্দরবন অঞ্চলের ধুমঘাট ছিল প্রতাপের রাজধানী। ১৪০০ সালের দিল্লীর সম্রাট নাসির শাহ অথবা মাবুদ শাহ খাজা জাহান বা খাঁন জাহান আলী নামক একজন উচ্চপদস্থ সহযোগীকে জায়গীর প্রদান করে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। খাজা জাহান বা খাঁন জাহান আলী সম্রাট মামুদ শাহ কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি। তাঁর প্রকৃত নাম উলুঘ খাঁন। বংগদেশে এসে খাঁন জাহান আলী যশোর অঞ্চলের শাসনভার প্রাপ্ত হন এবং দেশ শাসন এবং ইসলাম প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। পরবর্তীকালে তিনি একজন বিখ্যাত ইসলামী সাধক ও ধর্ম প্রচারক হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই খাঁন জাহান আলীকে জৌনপুর রাজ্যের অধিবাসী ও প্রতিষ্ঠাতা এবং সেখান থেকে তিনি এদেশে আগমন করেন বলে অনুমান করেন। যশোর শহরে সমাধিস্থ হযরত গরীব শাহ ছিলেন খাঁন জাহানের অন্যতম প্রধান সহযোগী। যশোরের

Matrix BCS Series

পয়গ্রাম কসবা খাঁন জাহান আলীর রাজধানী ছিল। প্রাচীন যশোরের বাগেরহাটে খাঁন জাহান আলীর সমাধি এবং তাঁর বহু কীর্তি চিহ্ন আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে।
১৭৫৭ সালে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দৌলার পতন ঘটলে এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা ইংরেজদের হাতে অস্থায়ীভাবে বন্দী হয়। শুরু হয় ইংরেজ রাজত্ব-চলে বর্ণ বৈষম্যবাদী শাসন। প্রায় দুইশত বছর ইংরেজগণ উপমহাদেশে তাদের শোষণ ও নির্যাতনের শাসনকাল অব্যাহত রাখে।

১৮৫৭ সাথে ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে পরবর্তী কালের নীল বিদ্রোহ, কৃষক সংগ্রাম ও স্বদেশ আন্দোলনসহ অসংখ্য বিপ্লব একের পর এক ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে থাকে। অতঃপর ১৯৪৭ সালে ইংরেজগণ এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়।

১৯৪৭ সনের সেই দেশ বিভাগের সময় যশোরকে তথাকথিত পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানীরা দীর্ঘ দুই যুগ এ অঞ্চলকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করে এবং অগ্রাসী রাজত্বের নজীর বিহীন শোষণ ও অপশাসন চালিয়ে যায়।

১৯৪৭ সালে ইংরেজগণ উপমহাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়। যাবার আগে তারা এদেশে তাদের অপকৌশলের বীজ প্রোথিত করে যায়। এতে সৃষ্ট হয় দেশ বিভাগের। ফলে অভিভক্ত বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করে জন্ম দেওয়া হয় দুটি দেশ-ভারত ও পাকিস্তান। এর মধ্যে পাকিস্তান নামক তথাকথিত দেশটির গঠন ছিল একান্তই অসচেতন ও অবাস্তব চিন্তা চেতনার ফসল যা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে।

সাতচল্লিশের সেই দেশ বিভক্তির ফলে অভিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলকে করা হল অস্থায়ী পাকিস্তানের অংশ এবং পশ্চিমাঞ্চলকে ভারতে। এর মধ্যে সীমানারেখা নির্ধারণের ফলে আবার পরিবর্তন হল জেলা যশোরের ভৌগলিক অবস্থানের। এতে যশোরের বনগ্রাম মহকুমাকে পুনরায় ভারতের সংগে যুক্ত করা হয়।

১৮৭৬ থেকে ১৯৮৪ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে যশোরের গঠন ও পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া। ১৯৬০ সালে জেলার মাগুরা মহকুমার মহম্মদপুর থানার অংশ এবং নড়াইলের আলফাডাংগা থানাকে ফরিদপুর জেলার সংগে যুক্ত করা হয়। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রশাসনিক উন্নয়নকল্পে আজকের যশোরকে ভেংগে পুনর্গঠন করেছে। ফলে জেলার চার মহকুমা নড়াইল, মাগুরা,ঝিনেদা এবং সদর স্বতন্ত্র চারটি জেলায় রূপান্ড়রিত হয়েছে। অর্থাৎ আবার এ জেলার সীমানা ও প্রশাসনিক বিভক্তি ঘটেছে। এভাবেই ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হতে হতে বাংলাদেশের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী ও সুপ্রাচীন যশোর জেলা আজ শুধুমাত্র তার একটি খন্ডিত অংশ নিয়ে টিকে আছে। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যশোরসহ সন্নিহিত অঞ্চল বহু উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শাসক ও শাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত থেকেছে।

Matrix BCS Series

১৯৭১ সালে বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও মানবতাবাদী নেতা বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংঙ্গালীরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ্য নিরপরাধী মানুষকে পাকিস্ড়ানী হায়েনারা নৃশংসভাবে হত্যা করে ইতিহাসের সর্ব বৃহৎ ও ভয়াবহ গণহত্যার দৃষ্টান্ড় স্থাপন করে যা মাইলাই হত্যাকান্ডের চেয়েও ভয়ঙ্কর ছিল। সেই সংঙ্গে তাদের নারী নির্যাতনের পৈশাচিকতাও অতীতের সকল নারকীয়তাকে হার মানায়।

বাংলাদেশের ইতিহাস ইংরেজ বিতাড়ন, পাকিস্ড়ানী উচ্ছেদ, নীল বিদ্রোহ, তে-ভাগা আন্দোলন, কৃষক সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রণী যশোরের সংগ্রামী মানুষ ন্যায়ের স্বপক্ষে অধিকার আদায়ের বিপ্লবে তাদের বলিষ্ট উচ্চারণ রেখেছে বার বার। স্বভাবতই সংস্কৃতির পীঠস্থান এই যশোরের রয়েছে গৌরবময় অতীত যা ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আবহমানকাল ধরেই যশোরের জনগণ বীর ও স্বাধীনচেতা। দেশ ও জাতির যে-কোন দুর্যোগময় মুহূর্তে যশোরের মানুষ জীবন বিপন্ন করে ঝাপিয়ে পড়েছে চেতনার উদ্বুদ্ধতায়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে যশোর বাসীর অবদান অবিস্মরণীয়। বাংলাদেশের স্বাধীন পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয় যশোর থেকেই।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে আজকের যশোর তারই একটি সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং তার প্রকৃত অস্ড়িত্ব লাভ করে।

তথ্য সূত্র

১। যশোরের ইতিহাস-মনোরঞ্জন বিশ্বাস
২। যশোরের ইতিহাস-আসাদুজ্জামান আসাদ

জেলার ঐতিহ্য

যশোরের ঐহিত্য সাতক্ষীরা হাউজ-জেলা প্রশাসকের বাংলো, যশোর্যকালেক্টরেট ভবন, দড়াটানা, যশোর্যযশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, উপশহর, যশোর্যমারকাজ মসজিদ, উপশহর, যশোর্যশতাব্দী প্রাচীন যশোর পৌরসভা, লালদীঘি পুকুর পাড়্যরামনারায়ন পাবলিক লাইব্রেরী, নক্সী কাঁথা ও যশোর স্টীচ্যযশোর ইন্সটিটিউট পাবলিক লাইব্রেরী, টাউন হল ময়দান সংলগ্ন্য খেজুরের গুড়সহ রসের পিঠা, পায়েশ এ জনপদের মিষ্ঠান্ন ঐতিহ্যযশোরের কই মাছ মাইকেল মধুসূদন দত্তঅনুভূতি ও চিন্তার অপূর্ব বাস্তবায়নের নবরূপকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বাংলা সাহিত্য ও যেন একই বৃত্তে ফুটে থাকা দু'টি ফুল। সাহিত্যের গতানুগতিক আদর্শ ভৎখাত করে নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবাবে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন কাইকেল। নাতিদীর্ঘ জীবনের ভেতর সাইকেল যে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মদ্রোহের ছাপ বাংলা সাহিত্যে রেখে গেছেন তা অসাধারন এবং অবিস্মরনীয়। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার আলোকবর্তিকা মাইকেল ১৮২৮

খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি শনিবার যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাড়ী গ্রামে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। ছন্দের নানা মাত্রিক পরীক্ষা মিল-বিন্যাস অমিলতা ও যতি স্বাধীনতা দিয়ে মাইকেল বাংলা কবিতার সীমানাকে বহুদূর প্রসারিত করেছে। বাংলা সাহিত্যকে এতদিন যে লোহার বেড়ীর মত পয়ার শিকল পরিয়ে রাখা হয়েছিল-সোনার কাঠির স্পর্শে মধুসূদন নিদ্রিত রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গালেন। সাহিত্যে শামিষ্ঠা, পদ্মাবতী, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা, তিলোত্তমা সম্ভব, মেঘনাদ বধকাব্য, ব্রজাঙ্গঁনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য তাঁর অনবদ্য অবদান। তাঁর লেখা বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে আলাদা রূপমাধুর্য্য যা বাঙ্গালীকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। বাংলাসাহিত্যের এ ক্ষণজন্মা পুরুষ মৃত্যু বরণ করেন ১৮৭৩ সালের ২৯, জুন রবিবার। কালেক্টরেট ভবন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে যশোর কালেক্টরেটের নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। যশোর কালেক্টরেট স্থাপিত হয় ১৭৮৬ সালে। ১৭৮১ সালে জেলা ঘোষনার পর প্রথম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করেন Mr. Tilman Henckell (১৭৮১-১৭৮৯) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টরেটের দায়িত্ব পান। যশোর কালেক্টরেট নিজস্ব ভবন তৈরী হয় ১৮০১ সালে। কালেক্টরেট ভবনটি দড়াটানা, যশোর এ অবস্থিত। এটি শহরের প্রাচীনতম স্থাপনারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি। এই ভবনের সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের ২০০ বছরের ইতিকথা। ভবনটি বর্তমানে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়। বর্তমান ভবনের একতলা স্থাপিত হয় ১৮৮৫ সালে এবং দোতলা নির্মিত হয় ১৯৮২ সালে। গবেষকরা রেকর্ড রুমে পেতে পারেন সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহের নথি ও নজির তূল্য মামলা। শিক্ষায় যশোরমানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম উপাদান হচ্ছে শিক্ষা। যশোরে শিক্ষার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই শুরু হয়েছে। দেড়শত বছরের ও বেশী সময় ধরে এ উন্নয়নের ধারা প্রবাহমান। তার পূর্বে সুলতানী ও মোঘল আমলে এ অঙ্এলে মুসলমান ও হিন্দুদের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল যথাক্রমে মাদ্রাসা ও টোল। উচ্চ ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাই নিজ নিজ প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে পরিচালনা করতেন। মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। কিন্তু সরকারী চাকুরীর সুবিধার্থে হিন্দু ছাত্ররা ও মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহন করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৃটিশ পরিবর্তিত সামাজিক ব্যবস্থায় এ শিক্ষা ব্যবস্থা অচল বলে প্রতিয়মান হয়, ফলে গড়ে ওঠে পাশ্চাত্য ভাবধারায় আধুনিক স্কুল কলেজ। এ উপমহাদেশে যে প্রথম চারটি স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় তার মধ্যে যশোর জেলা স্কুল অন্যতম, এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৮ সালে। ১৩২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে স্থানীয় জমিদার পত্নী ক্যাত্যারিনীর কাছারীতে এর কার্যক্রম শুরু হয়। তখন এর নাম ছিল "যশোর সরকারী মডেল স্কুল"। এছাড়া রয়েছে সম্মিলনী ইন্সটিটিউট, মুনসী মেহেরুল্লাহ একাডেমী, বসুনদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জংগল বাধাল মাধ্যমিক বিদ্যালয় (মোমেন গালার্স স্কুল), মধুসূদন তারা প্রসন্ন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, দাউদ পাবলিক স্কুল, ছাতিয়ানতলা চুড়ামনকাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আরো অনেক। এ সকল বিদ্যালয়ে একই শিক্ষাক্রম চালুর প্রয়োজনে বৃহত্তর যশোর জেলায় ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সালের এক সরকারী আদেশের মাধ্যমে ১৯৬৩ সালে অক্টোবর মাসে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য যশোরে রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, সিটি কলেজ, সরকারী এম,এম কলেজ, যশোর। নওয়াপাড়া কলেজ, শহীদ মসিউর রহমান ডিগ্রী

Matrix BCS Series

কলেজ, বি,এ,এফ শাহীন কলেজ উল্লোখযোগ্য। যশোরের শিক্ষা বিস্তারে যে সব মহামতির অবদান রয়েছে তাঁদের মধ্যে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সতীশ চন্দ্র নাথ, মোঃ আব্দুল রউফ, মোঃ মোবারক আলী, আনসারী, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আব্দুল হাই, অধ্যক্ষ মোঃ মোখলেসুর রহমান, মোলভী মোঃ আককাচ আলী, প্রবোধ কুমার মিত্র, মনোয়ার খাতুন, ক্যাপ্টেন করিম উল্লেখযোগ্য। খেজুরের রস ভান্ডার, যশোর ঋতু বৈচিত্রের বাংলাদেশে শীত যেন অসে খেজুরের রস আর শীতের পিঠার বার্তা নিয়ে। আর এই শীতকে উপভোগ করতে যশোরের খেজুরের রস ও গুড়ের বিকল্প নেই। খেজু এর রস ভান্ডার যশোরে রয়েছে ৪৬২৫২৫ টি খেজুর গাছ। যার প্রতিটিতে গাছি শীতের শুরুতেই বাড় ঝুলিয়ে দেয়। শীত কালীন এ চিত্র যেন গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যকে আরো সমৃদ্ধ করে। ৪৮৬.২০ হেক্টর জমির খেজুর গাছে আনুমানিক ২৩১২৬২৫০ কেজি রস অহোরিত হয় যা থেকে উৎপাদিত গুড়ের পরিমান ৩৭,০০,২০০ কেজি। যশোররের রসের স্বাদ যেমন সুমিষ্টি তেমনি এর তৈরী গুড় ও স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। তাই যশোর যেন খেজুরের রস ভান্ডার হিসেবেই সর্বাধিক পরিচিত। সবজি ও ফুলের যশোর নাতিশীতষ্ণ আবহাওয়া আর মিষ্টি পানির জন্য যশোরে সবজি ও ফুল ভালো জন্মে। এ কারনে এ জেলাতে বানিৎজিক ভাবে সবজি ও ফুলের চাষ ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। জেলার ১৪৩৫০ হেঃ জমিতে সবজির মোট ফলন হয় ৩,২১,৯০৩ মেঃ টন। এসব সবজির মধ্যে আছে ফুল কপি, বাধাকপি পালংশাক, লালশাক, সবুজ মাক, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, বেগুন, চাল কুমড়া, টমেটো, মুলা, বরবটী, ডাটা, পুঁইশাক, ঢেঁড়শ, শিম, চিচিংগা, ঝিংগা, করলা, উচ্ছে, গাজর, শালগম, ওলকটি, বাটিশাক, ক্ষিরাই, পেঁপে, কাচকলা, বিচিকলা, মানকচু, মেটে আলু, লতিরাজ, পানিকচু, ও বাংশী। এছাড়া ৫৪২.৫ হেক্টর জমিতে মোট উৎপাদিত ফুলের সংখ্যা ১২০,২১,৪৭,৯৫৪ এর মধ্যে আছে রজনীগন্ধা, গোলাপ, গ্লাডিউলাস, গাঁদা, জারবেরা, ডালিয়া, কচমচ, খোজা ইত্যাদি। যশোরের এই সবজি ও ফুলের উৎপাদন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানী হচ্ছে।

পুরাকীর্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জেলা প্রশাসক মহোদয়ের বাসভবন ১৯২১ সাল থেকে সাতক্ষীরা হাউজ নামে পরিচিত ভবনটি যশোর জেলা প্রশাসকের বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভবনটির মূল মালিক তৎকালীন জমিদার জনৈক শৈলজানন্দ চৌধুরী। ১৮৯৫ সালের শেষের দিকে নির্মিত সাতক্ষীরা হাউজ স্থাপত্য নিদর্শনের এক উজ্জ্বল ঐতিহ্য। দোতলা এ ভবন সংলগ্ন মোট জমির পরিমান ২৪.৭৫ একর। তৎকালীন ভারত সম্রাট ১৯২১ সাল থেকে দু দফায় ২৫ বৎসরের জন্য লীজ নেন। সে সময় সম্পত্তিটি যশোর লোন কোম্পানীর নিকট বন্ধক রাখেন। পরবর্তীতে কোম্পানীটি খরিদ সূত্রে ব্যাংক অব ক্যালকাটা এর অধিকার গ্রহণ করে।

Matrix BCS S

প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব:

১। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত
২। কর্মবীর মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ
৩। রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার (১৮৫৯-১৯৩২)
৪। জ্যোতিস্ক বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ চন্দ (১৮৭৮-১৯৭৫)
৫। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শিশির কুমার ঘোষ
৬। এ্যাডভোকেট শহীদ মশিউর রহমান
৭। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যয় (বাঘা যতীন, ১৮৭৯-১৯১৫)
৮। প্রফেসর শরীফ হোসেন (১৯৩৬-২০০৭)
৯। সংগ্রামী মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন (১৯১৬-১৯৯৭)
১০। বেগম আয়েশা সরদার (নারী আন্দোলনের নেত্রী, ১৯২৭-১৯৮৮)
১১। শিক্ষাবিদ আব্দুর রউফ (১৯০২-১৯৭১)
১২। ওয়াহেদ আলী আনসারী
১৩। বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ এ্যাডভোকেট রওশন আলী
১৪। কে পি বসু (কালিপদ বসু, ১৮৬৫-১৯১৪)
১৫। আলোক চিত্রকর মোঃ সফি
১৬। মোশাররফ হোসেন

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭)

ভাব মন দমে দম, রাহা দূর বেলা কম
ভুখ বেশী অতি কম খানা।
ছামনে দেখিতে পাই পানি তোর তরে নাই
কিন্তু রে পিয়াসা ষোল আনা !
দেখিয়া পরের বাড়ী জামা জোড়া ঘোড়া গাড়ি
ঘড়ি ঘড়ি কত সাধ মনে,
ভুলেছ কালের তালি, ভুলেছ বাঁশের চালি,
ভুলিয়াছ কবর সামনে।

পরিচিতি:

কবিতাটিতে মানবদেহের পরিণাম এবং সংসারের ধন-জন ও বংশ মর্যাদা কিভাবে কবরে বিলীন হয়ে যায়, কবি এই ভাবার্থটি প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন।

এই কবিতাটির রচয়িতা-আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনার সাধক, বঙ্গের খ্যাতিমান বাগ্মী, সমাজসেবক, সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক ও ধর্ম প্রচারক মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর ১৮৬১ সালের ২৬ ডিসেম্বর জেলার ঝিনাইদহ মহাকুমার কালীগঞ্জ থানাধীন বার বাজারের নিকটবর্তী ঘোপ নামক গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছাতিয়ানতলা গ্রামে। এই গ্রামে তাঁর পূর্ব পুরুষরাই সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্‌শী মোহাম্মদ ওয়ারেস উদ্দীন।

শিক্ষাজীবন:

সংসারের নিদারুন দরিদ্রতা ও পিতার অকাল মৃত্যুর কারণে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিঘ্নিত হয়। এ সময় তিনি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পন্ন করে দুর্দ্দমনীয় জ্ঞান তৃষ্ণার তাড়নায় গৃহত্যাগ করে কয়ালখালি গ্রাম নিবাসী মোঃ মোস্‌হাব উদ্দীনের নিকট তিন বৎসর এবং পরবর্তীতে করচিয়া নিবাসী মোহাম্মদ ইসমাইলের নিকট তিন বৎসর আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। বিশ্ব বরেণ্য কবি শেখ সাদীর পান্দেনামা, গুলিস্থা ও বুস্তা তাঁর জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তৎকালীন সময়ে উক্ত ২টি পুস্তকের ওপর জ্ঞান ও হৃদয়ঙ্গমতা কোন ব্যক্তির জ্ঞান ও শিক্ষার মাপ কাঠি বিবেচিত হত। তিনি বিভিন্ন সভায় তাঁর বক্তৃতার মধ্যে এই সমস্ত গ্রন্থ থেকে অতি মধুর সুরে ফরাসী বয়াত আবৃত্তি করে মর্মস্পর্শী ভাষায় শ্রোতাকুলকে আপ্লুত করতেন।

উর্দু ভাষায় ও তাঁর ব্যাপক ব্যুৎপত্তি ছিল। বিভিন্ন উর্দু পুস্তক ও সাময়িক পত্র পত্রিকাদি তিনি নিয়মিত পড়াশোনা করতেন।

জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি জীবিকার অন্বেষণে তিনি খোজার হাটের এক দর্জির দোকানে সেলাইয়ের কাজ শেখা শুরু করেন। এ সময়ও তিনি মুন্‌শী তাজ মাহমুদের নিকট উর্দু ও ফারসী সাহিত্যের উপর জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন।

Matrix BCS Series

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ দর্জি বিদ্যায় উন্নত শিক্ষা গ্রহণের জন্যে খড়কী গ্রামের 'সাহেব বাড়ীর দর্জি' জাহা বকস্‌ মীর্জার নিকট দর্জির কাজ শেখা আরম্ভ করেন। এখানে তিনি দীর্ঘ ৫/৬ বৎসর অবস্থান করে দর্জি পেশায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভিন্নধর্মী কাজের মাঝেও তিনি জ্ঞান অর্জনে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। যশোর শহরের দড়াটানায়ও তিনি এক উন্নত মানের দর্জির দোকান চালু করেন।

ইসলাম ধর্মের প্রচারক:

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এদেশের মুসলমানদেরও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। বাংলাদেশের সমস্ত গ্রাম-গঞ্জ শহর বাজারের খ্রীস্টান পাদ্রীদের খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের প্রবল প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়। পাদ্রীদের নানা কুহেলিকাপূর্ণ কূট তর্কজাল সমাচ্ছন্ন বক্তৃতা শুনতে শুনতে অল্প বয়স্ক সত্যানুসন্ধিৎসু মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ বিচলিত হয়ে পড়েন। এরূপ এক সংকটকালীন মুহূর্তে প্রসিদ্ধ বক্তা ও ইসলাম প্রচারক হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ কর্তৃক লিখিত 'খ্রীস্টান ধর্মের ভ্রষ্টতা' নামক এবং প্রথম জীবনে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারক ও পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম প্রচারক পাদ্রী ঈশান চন্দ্র মন্ডল ওরফে মুন্‌শী মোহাম্মদ এহসানুল্লাহর 'ইনজিলে হযরত মোহাম্মদের খবর আছে' গ্রন্থ দু'খানি অধ্যয়নের পর তিনি নতুন আলোর সন্ধান পান।

ইসলামের নতুন তেজে নতুন শক্তিতে পূর্ণ হয়ে দীপ্ত মিহিরের ন্যায় নিত্য পরিপূর্ণ ও প্রতিভাত হতে লাগলেন। মুসলিম বীর মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ পাদ্রীদের অনুকরণে হাটে মাঠে ঘাটে তাঁদের বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ শুরু করলেন। হাটের একদিকে পাদ্রীদের বক্তৃতা অন্য প্রান্তে মুন্‌শীর বক্তৃতা। অতি অল্প সময়ে তরুণ মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর ধর্ম প্রচারের ঘটনা গ্রামে, শহরে এবং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

মুন্‌শী সুদূর দার্জিলিং শহরেও দর্জির দোকান খুলেছিলেন এবং সেখানেও পাদ্রীদের একই অনাচার ও কার্যকলাপ দেখে তাঁর মন প্রাণ ব্যাকুল ও ব্যথিত হয়ে উঠলো। তিনি সেখানেও ধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ করেন। ধর্ম-জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভের জন্যে তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন শুরু করেন। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ মহীশুর থেকে প্রকাশিত 'মনসুরে মোহাম্মদী' এবং হযরত সোলায়মান ওয়ার্সির লেখা কেন আমি আমার পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করেছিলাম', 'কেন আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়েছিলাম' ও 'প্রকৃত সত্য কোথায়' গ্রন্থগুলি পাঠ করে ব্যাপক উৎসাহিত ও উপকৃত হয়েছিলেন।

মেহেরুল্লাহ দার্জিলিং থেকে যশোরে ফিরে এসে আবার যশোরের বিভিন্ন এলাকায় ধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এসময় তাঁর সহযোগী হিসেবে খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে ধর্ম প্রচারে অবতীর্ণ হতেন যশোরের ঘোপ এলাকার বাসিন্দা মুন্‌শী গোলাম রব্বানী ও ঘুরুলিয়ার মুন্‌শী মোহাম্মদ আব্দুল কাশেম।

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ইসলাম ধর্ম প্রচারের এবং খ্রীস্টানদের মিথ্যা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জেহাদ ঘোষণা করেন এবং জেহাদকে সার্থক ও সফল করার লক্ষ্যে তিনি কলকাতার মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা মুন্‌শী রিয়াজ উদ্দিন আহাম্মদ ও মুন্‌শী আব্দুর রহিম প্রমুখ ধর্মপ্রাণ, মুসলিম হিতৈষী নেতাদের সাথে আলোচনা করেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও খ্রীস্টান পাদ্রিদের অপপ্রচারের হাত থেকে ইসলাম ধর্ম তথা মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে

কলকাতার 'না-খোদা' মসজিদে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি নামে এক সমিতি গঠন করা হয়। এই সমিতি কর্তৃক বাংলা ও আসামে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্যে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি বঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্দীপ্তময় যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদের ভাঙ্গা বুক আবার সতেজ করে তোলেন। খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার মিশনের অন্যতম কর্তা রেভাঃ জন জমিরুদ্দিন ইসলাম ধর্ম প্রচারে এক সময় মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর সঙ্গী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক বিরোধিতা করেন।

সাহিত্য কর্ম:

১৮৯২ সালে জুন মাসে 'খ্রীস্টীয় বান্ধব' নামক মাসিক পত্রিকায় জন জমিরুদ্দিন 'আসল কোরান কোথায়' শীর্ষক এক বিভ্রান্তিমূলক প্রবন্ধ লেখেন। এই বিভ্রান্তিকর প্রবন্ধের জবাবে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ তৎকালীন প্রচলিত বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'সুধাকর' পত্রিকায় (১৮৯২ সালের জুন মাসের ২০ ও ২৭ তারিখে) 'ঈসায়ী বা খ্রীস্টানী ধোকা ভঞ্জন' নামক সুদীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে জন জমিরুদ্দিন কর্তৃক লিখিত ছয়টি প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন। মেহেরুল্লাহর প্রবন্ধের উত্তরে জমিরুদ্দিন 'সুধাকর' পত্রিকাতেই ক্ষুদ্র আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এর উত্তরে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ 'আসল কোরান সর্বত্র' নামক আর একটি দীর্ঘ ও তথ্য যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

জন জমিরুদ্দিন প্রবন্ধটি পড়ে নীরব হয়ে পড়েন। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর সহযোগী হবার আশা ব্যক্ত করে খ্রীস্টান হতে পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জন জমিরুদ্দিন হতে শেখ মুন্‌শী জমিরুদ্দিন নাম ধারণ করেন।

খ্যাতিমান ইসলাম প্রচারক মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর ধর্ম প্রচারের ইতিহাসে এটি এক বিষ্ময়কর ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জমিরুদ্দিন কর্তৃক লিখিত 'মেহের চরিত' নামক গ্রন্থে তিনি মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর ধর্ম প্রচার সম্পর্কে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন।

মুসলিম জাতির উন্নয়নে সাহিত্য ও সংবাদ পত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।

এ উদ্দ্যেশে তিনি চব্বিশ পরগণা নিবাসী শেখ আব্দুল রহিমের সাথে যোগাযোগ করেন। তখনকার দিনে মুন্‌শী আবদুর রহিমের সম্পাদনায় ও মুন্‌শী শেখ রিয়াজউদ্দীনের প্রকাশনায় কলকাতা থেকে মুসলিম ঐতিহ্যবাহী 'সুধাকার' পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। 'মিহির' ও 'সুধাকার' পত্রিকা দুটির উন্নতি ও প্রচারের জন্যে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর বিশেষভাবে চেষ্টা চালান। 'মিহির' ও 'সুধাকার' নামক মাসিক পত্রিকারও তিনি পৃষ্ঠপোষকতা ও এই পত্রিকাগুলির নিয়মিত লেখক ছিলেন।

বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্যে ও জাতীয়তা গঠনের মূলে এই মনীষীসহ শেখ ফজলুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মৌলভী রেয়াজুদ্দিন আহাম্মদ, কবি মোজাম্মেল হক ও সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী'র নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

১৮৮৬ খৃঃ মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ প্রথম প্রকাশিত বই 'খ্রীস্ট ধর্মের অসারতা' প্রকাশিত হয়। এই বইটি খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ও খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেল সম্পের্কে সমালোচনা করে লেখা।

তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মেহেরুল এসলাম'। গ্রন্থখানির ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল, সাধারণ পাঠকের বোঝার উপযোগ্য। গ্রন্থটি পুঁথি আকারে লিখিত। এই গ্রন্থে একেশ্বরবাদের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে।

বিখ্যাত পারস্য কবি শেখ সাদির পান্দেনামা পুস্তকটি অনুবাদ করে তিনি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ লিখিত 'রদ্দে খ্রীস্টান' এবং 'খ্রীস্টান ধর্মের অসারতা' নামক পুস্তক দু'খানি তাঁর বক্তৃতা অপেক্ষা অনেক কার্য উপযোগী। এই পুস্তক দু'খানি যেন সারা দেশ ব্যাপি খ্রীস্টান পাদ্রীদের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। 'রদ্দে খ্রীস্টান' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড 'দলিলুল ইসলাম' প্রকাশের পূর্বেই মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ইন্তেকাল করেন।

মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল 'বিধায় গঞ্জনা' ও 'হিন্দু ধর্ম রহস্য'। হিন্দু বিধবাদের জীবনের করুণ চিত্র মর্মস্পর্শী ভাষায় সমালোচনাকারে গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে 'বিধবা গঞ্জনা' গ্রন্থটি মুন্শী মেহেরুল্লাহর এক অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি।

"দেবলীলা বা হিন্দু ধর্ম রহস্য' নামক গ্রন্থটিতে পৌরাণিক দেবদেবীগণের লীলা খেলার কাহিনী নিয়ে রচিত। গ্রন্থটির ভিত্তি হচ্ছে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র। গ্রন্থ দু'খানিতে হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতা ও বিধবাদের মনঃপীড়ার করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

মুন্শী মেহেরুল্লাহর মৃত্যুর পর কতিপয় স্বার্থান্বেষী হিন্দু সমাজপতির প্রচেষ্টায় ইংরেজ সরকার উক্ত পুস্তক দু'খানি বাজেয়াপ্ত করে এবং প্রকাশকের বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বঙ্গেরখ্যাতিমান বাগ্মী, সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক ও ধর্ম প্রচারক মুসী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ-এর পৈত্রিক বাড়ী যশোর সদর উপজেলার ছাতিয়ানতলাগ্রামে। তিনি পান্দানামা নামক সেখ সাদির সুবিখ্যাত কাব্যের অনুবাদ সহ "রদ্দে খৃষ্টান"ও "দলিদোল ইসলাম"নামক দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মেহেরুল্লাহ'র রচনাবলীর মুল উদ্দেশ্য ধর্ম বিষয়ক তর্কে ইসলামের মহত্ব প্রতিষ্ঠা করা। খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের তীব্র সমালোচনার যৌক্তিক জবাব উপস্থাপন করে সাধারণ মানুষকে ধমান্তরের হাত থেকে রক্ষা করেন।

পরলোকগমন:

বঙ্গের অদ্বিতীয় বাগ্মী, ইসলাম ধর্ম প্রচারক মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ১৯০৭ সালের ৭ জুন শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় পরলোকগমন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস

অবিভক্ত ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী জেলা যশোর অনেক কিছুর জন্যেই বিখ্যাত। ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠর মধ্যে ২-জনই বৃহত্তর যশোর জেলার কৃতি সন্তান। এ আমাদের পরম অহংকার। স্বাধীনতা যুদ্ধেও যশোরের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চুড়ান্তভাবে শেষ হবার কয়েকদিন আগেই স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণপন লড়াইয়ে দেশের সর্বপ্রথম শত্রু মুক্ত হয় আমাদের এই যশোর জেলা। সেই গৌরবমন্ডিত তারিখটি ছিল ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর। তাই আমরা চিরকাল মাথা উচুঁ করে বলতে পারি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যশোরই হল প্রথম শত্রু মুক্ত জেলা।

Matrix BCS Series

যশোরের প্রথম শহীদ হন চারুবালা, জননেতা শহীদ মশিউর রহমান, এ্যাডভোকেট শ্রী সুনীর কুমার রায়, ব্যবসায়ী নারায়ন চন্দ্র সাহা, সমাজসেবী সুধীর কুমার ঘোষসহ অনেকে।

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ (১৯৩৬-১৯৭১)

বর্তমান নড়াইল জেলার মহেষখালী গ্রামে ১৯৩৬ সালের ২৬ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মরহুম আমানত শেখ ও মাতা-বেগম জেন্নাতা খানম। ৮ম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় তিনি ১৯৫৬ সালে ইপিআর-এ ভর্তি হন। ১৯৭১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর যশোর জেলার ঝিকরগাছা-শার্শা সীমান্তে গোয়ালহাটী গ্রামে হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ করে শহীদ হন।

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সেপাহী হামিদুর রহমান (১৯৫৩-১৯৭১)

বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার খোরদা-খালিশপুর গ্রামে ১৯৫৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জনাব আক্কাছ আলী মন্ডল, মাতা-বেগম কায়েদুন্নেছা। সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গলের ধলই সীমান্তে ২৮ অক্টোবর ১৯৭১ পাক বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন। আমবাসা গ্রামে তাঁকে সমাধি করা হয়।

যশোর জেলার খেতাবপ্রাপ্ত বীরমুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাঃ

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ
জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, বীর উত্তম
জনাব মোঃ শফিয়ার রহমান, বীরপ্রতিক
জনাব এ কে এম ইসাহক, বীর প্রতিক
জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, বীর প্রতিক
জনাব হাজারী লাল তরফদার, বীর প্রতিক
মৃত মোহাম্মদ উল্লাহ, বীর প্রতিক
জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম, বীর প্রতিক

এছাড়াও শহীদ আব্দুল বারেক (১৯৪৪-১৯৭১), শহীদ নজিবর রহমান (১৯৪৪-১৯৭১), শহীদ আব্দুল খালেক (১৯৫৮-১৯৭১), শহীদ মোহাম্মদ দৌলত আলী বিশ্বাস, শহীদ মোঃ চাঁদতুল্যা গাজী, কাজী মোঃ শামছুল আবেদীন ওলিদ, শহীদ আব্দুস সামাদ, শহীদ তবিবর রহমান, শহীদ সামছুল ইসলাম শান্তি, শহীদ এস এম নজরুল ইসলাম, শহীদ কাজী আব্দুল আজিম, শহীদ আলতাফ হোসেন, শহীদ সাজেদুর করিম সাজু, শহীদ মোঃ জিন্দার আলী, শহীদ শেখ ইদ্রিস আলী, শহীদ আসাদুজ্জামান, শহীদ হোসেন আলী সিকদার, শহীদ মোঃ এলাহী বক্স, শহীদ মোঃ ওমর আলী মোড়ল, শহীদ গোলাম মোস্তফা, শহীদ মোহাম্মদ আলী মন্ডল, শহীদ মোঃ মোজাম্মেল হক, শহীদ মোঃ লুৎফর রহমান, শহীদ মোঃ আকসেদ আলী উল্লেখযোগ্য।

Matrix BCS Series

নদ-নদী

নদ-নদী যেমন ভূ-গঠনের মুখ্য ভূমিকা পালন করছে, তেমনি মানব সভ্যতার ক্রম-বিকাশেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যশোর জেলার উল্লেখযোগ্য নদী সমূহ হল- কপোতাক্ষ, ভৈরব, চিত্রা, মুক্তেশ্বরী ও হরিহর নদী ইত্যাদি।

কপোতাক্ষ নদ: চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার মাথাভাঙ্গা নদীর শাখা দুইটি গড়াই ও কপোতাক্ষ। কপোতাক্ষ নদী কুষ্ঠিয়া জেলা থেকে ঝিনাইদহ জেলা হয়ে যশোরের চৌগাছা, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলার উপর দিয়ে খুলনার পাইকগাছা উপজেলা হয়ে শিবসা নদীতে পড়েছে।চিত্রা নদীঃ চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার মাথাভাঙ্গা নদী থেকে উৎপত্তি। এটি ঝিনাইদহ জেলা হয়ে যশোর জেলার বাঘাপাড়া উপজেলার জহুরপুর ইউনিয়নের ছুটুয়াকান্ডি ভায়া খাজুরা নারিকেল বাড়িয়া ইউনিয়ন হয়ে নড়াইল জেলার মাইজপাড়া, গোবর সিংগাসলপুর পেরুলীর হয়ে নবগঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। ভৈরব নদী: সুন্দরবনের শিবসা নদীতে এ নদী মিলিত হয়েছে। শিবসা নদীর উজানে খুলনা-নওয়াপাড়া (অভয়নগর উপজেলা) ভায়া যশোর সদর উপজেলার বসুন্দিয়া ইউনিয়নের আফ্রা এসে এটির একটি অংশ নড়াইল জেলায় এবং আরেকটি অংশ যশোর সদর উপজেলার বসুন্দিয়া, কচুয়া-নরেন্দ্রপুর, যশোর পৌরসভার মধ্য দিয়ে উপ-শহর, নওয়াপাড়া, চুড়ামনকাঠি ও হৈবৎপুর ইউনিয়ন দিয়ে ঝিনাইদহ জেলায় প্রবেশ করেছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

যশোর জেলায় রাসত্মাঘাট বা যোগাযোগ ব্যবস্থার উনড়বয়নের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৫শ শতাব্দীতে ভৈরবের তীওে যশোর জেলার প্রথম সড়কটি নির্মিত হয়। খান জাহান আলী এটি নির্মাণ করেন তার অনুসারীদের নিয়ে সুন্দরবনের দক্ষিণে যাবার পথে। ১৮০২ সালে L.S.O Malley লেখেন "জেলায় ২০ মাইল রাসত্মা রয়েছে এবং কোন নদীতেই সেতু নেই"। মূলত ১৮-শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জনৈক কালী প্রসাদ রায় ওরফে কালী পোদ্দার-এর উদ্যোগে জেলায় কয়টি সেতু নির্মিত হয়। তিনি রাসত্মা ও সেতু নির্মাণে সম্পত্তি ও অর্থ অনুদান প্রদান করেন। এর পরে যশোরের রাসত্মাঘাটের উনড়বয়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই W.W Hunter-এর একটি হিসেব পত্রে। তিনি দেখান ১৮৭৫ সাল পর্যমত্ম জেলায় মোট ২৬৪ মাইল দীর্ঘ আঞ্চলিক রাসত্মা তৈরি হয়। তবে যশোর পৌরসভার রাসত্মা উপবিভাগীয় শহরের রাসত্মার মোট পরিমাণ এই হিসেবের বাইরে ছিল। এতে ১৯২৪ সালে জেলার ঢালাই ও ঢালাই বিহীন রাসত্মার মোট মাইলেজ দাঁড়ায় ১৫৪৫-তে, অর্থাৎ সেই সময়েই জেলার রাসত্মার ঘনত্ব ছিল অনেক বেশি। স্বাধীনতাত্তোর কালে জেলার রাসত্মাঘাটের ব্যাপক উনড়বয়ন ঘটে। সড়ক পথে সারাদেশ ও পার্শববর্তী ভারতের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এর পরও গ্রামাঞ্চলে রাসত্মাঘাটের দশা ভাল নয়। অতি বর্ষণ বা স্বাভাবিক মৌসুমী বৃষ্টিতেই গ্রামের রাসত্মাগুলো চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে জনসাধারণের স্বাভাবিক চলাচল, স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ, ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া, কৃষিসহ অন্যান্য পণ্য সরবরাহ এবং বাজারজাত করতে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন ঘটলে প্রত্যন্ড় এলাকার মানুষ যোগাযোগ সুবিধার মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নত করার সুবিধা পাবে। এ ছাড়া শহরাঞ্চলে

Matrix BCS Series

বর্ষা মৌসুমে রাসত্মা খোঁড়াখুঁড়ি ও সংস্কার কাজের অভাবে কোন কোন রাসত্মা চলাচলের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

নৌ-পথঃ

বৃহত্তর যশোর জেলার নদী-নালার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে মোট ৮৯ নটিক্যাল মাইল নৌপথ আছে এবং এখানকার নৌ পরিবহনের সুপ্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যশোরের নদীপথে স্টিমার সার্ভিস চালু ছিল। সময়ের ধারায় নদীগুলোর গভীরতা হ্রাস পাওয়ায় স্টিমার সার্ভিসও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। মূলত নদীপথগুলোর নাব্যতার উপর সমস্ত নৌপরিবহন ব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে পশ্চিমের নদীগুলো অগভীর হয়ে পড়ায় কেবলমাত্র বর্ষাকালেই ছোট ছোট নৌকায় যাতায়াত সম্ভব। কপোতাক্ষ নদী বাঘা থেকে ঝিকরগাছা পর্যন্ত অংশে বর্ষায় নাব্য থাকে। তাই ঝিকরগাছা থেকে উত্তরে চৌগাছা পর্যমত্ম ছোট ছোট নৌকা চলাচল করলেও শীতকালে চৌগাছার পরে আর নৌকা চলে না। কেশবপুরের পশ্চিমে ভদ্রা শুকিয়ে গেলেও আলতোপোল থেকে ভাটি এলাকায় সুন্দরবনের ভিতর আকাঁ বাঁকা পথে দেশী বা যন্ত্রচালিত নৌকা সারা বছর ধরে চলাচল করে। এতে হাটবারে খুলনা থেকে ধান বোঝাই নৌকা কেশবপুরে আসে এই নৌপথে। তবে পূর্বের নদীগুলো সারা বছর নাব্য থাকে। মধুমতি নদী নৌপরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জেলার পূর্ব সীমানা দিয়ে প্রবাহিত মধুমতি নদী মোটামুটিভাবে বছরব্যাপী নাব্য থাকার কারণে সুন্দরবনে যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রধান নদী পথ। ভৈরব নদীর দক্ষিণে আফ্রাঘাট পর্যমত্ম ৬ ফুট গভীর খোল সম্পনড়ব নৌকা চলাচলে সক্ষম। নবগঙ্গা ও মধুমতি নদীর মধ্যে সংযোগ খাল খনন করায় নবগঙ্গা নদীতে পূর্বাঞ্চলের সাথে নৌপরিবহন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েছে।

রেল-পথঃ

বৃহত্তর যশোর জেলায় রেলপথের দৈর্ঘ্য ১০৫.০৫ কি.মি.। জেলার সর্বপ্রথম রেল সংযোগ স্থাপিত হয় ১৮৮৪ সালে, অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে একটি ব্যক্তিখাতভিত্তিক সংস্থা The Bengal Central Railway কলকাতা-যশোর রেল লাইন স্থাপন করে। শুরুতে এই রেলপথ কলকাতা থেকে যশোর হয়ে তালতলাহাট পর্যন্ত ছিল। এই রুটে কয়টি উল্লেখযোগ্য রেলওয়ে স্টেশন হল ঝিকরগাছা, ঘাট, গোদখালি, নাভারন এবং বেনাপোল ইত্যাদি সবগুলো ব্রডগেজ রেল লাইন। বর্তমানের কয়টি উল্লেখযোগ্য রেলওয়ে স্টেশন হল নওয়াপাড়া, চেংগুটিয়া, সিংগিয়া, রূপদিয়া, যশোর, মেহির ল্লানগর, বড় বাজার, মুবারকগঞ্জ, সুন্দরপুর এবং কোটচাঁদপুর ইত্যাদি। জেলার চারটি উপজেলার মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া রেলপথের দৈর্ঘ্য সারণীতে দেখান হল।

Matrix BCS Series

বিমানবন্দরঃ

জেলা সদরে যশোর সেনানিবাসের পাশে বিমানবন্দরটি অবস্থিত। আকাশপথে যশোর-ঢাকা রুটের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা খুলনা ও আশপাশের জেলার যাত্রীদের বিমানে ভ্রমণের সুবিধা দিয়েছে এই যশোর বিমানবন্দর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যশোরে যশোর বেঙ্গল এয়ারযোনচ-এর সদর দফতর স্থাপিত হয়। ফলে সেসময় থেকেই শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্ব পেতে শুরু করে। এই ধারাবাহিকতায় একসময় যশোর বিমানবন্দর স্থাপিত হয়।

দর্শনীয় স্থান

১. ঝাপা বাওড়
২. দমদম পীরের ডিবি
৩. তুলা বীজ বর্ধন খামার
৪. খড়িঞ্চা বাওড়
৫. গদাধরপুর বাওড়
৬. মহাকবি মাইকেল মধু সূদন দত্তের বাড়ি
৭. মধুপল্লী
৮. মীর্জানগর হাম্মামখানা
৯. ধীরাজ ভট্টাচার্যের বাড়ি
১০. কালুডাংগা মন্দির
১১. চাঁচড়ার মৎস উৎপাদন কেন্দ্র
১২. বেনাপোল স্থল বন্দর
১৩. বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদের মাজার।
১৪. চাঁচড়া রাজবাড়ী
১৫. যশোর বোট ক্লাব
১৬. বিনোদিয়া ফ্যামিলি পার্ক ।

Matrix BCS Series

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

১ম ধাপের মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলা পরিচিতি

Facebook Page: Matrix BCS Series

সিরাজগঞ্জ

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর নং: ৭

সেক্টর কমান্ডার:

- মেজর নাজমুল হক (এপ্রিল- সেপ্টেম্বর)
- মেজর কাজী নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর)

উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা:

- আব্দুল মোমিন
- আব্দুল লতিফ মির্জা

কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি:

- মজলুম জননেতা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
- মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ

Matrix

সংসদীয় আসন: **৬টি**

০১	সিরাজগঞ্জ-১	তানভীর শাকিল জয়	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
০২	সিরাজগঞ্জ-২	মোঃ হাবিবে মিল্লাত	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
০৩	সিরাজগঞ্জ-৩	মোঃ আব্দুল আজিজ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
০৪	সিরাজগঞ্জ-৪	তানভীর ইমাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
০৫	সিরাজগঞ্জ-৫	আব্দুল মমিন মন্ডল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
০৬	সিরাজগঞ্জ-৬	মেরিনা জাহান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৪
উপজেলা: ৯টি
ইউনিয়ন: ৮৩টি
যে নদীর তীরে অবস্থিত: যমুনা
দর্শনীয় স্থান:

- নবরত্ন মন্দরি
- হযরত মখদুম শাহদৌলা (রহঃ) এর মাজার ও মসজদি
- বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র
- কবি রজনী কান্ত সেন এবং ছায়া ছবির কংবিদন্তী নায়িকা সুচত্রা সনেরে জন্ম স্থান
- সেন ভাঙ্গাবাড়ী গ্রাম
- কান্ত কবি রজনীকান্ত সনেরে পরত্যিক্ত বসত ভিটা
- জয়সাগর দিঘি
- ইলয়িট ব্রীজ
- সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাধ
- ইকো র্পাক
- মুক্তির সোপান
- যাদব চক্রর্বতীর বাড়ী
- সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বাড়ী
- মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানীর বাড়ী
- ভোলা দেওয়ানের মাজার
- ধুবিল কাটার মহল জমিদার বাড়ী
- আটঘরিয়া জমিদার বাড়ী
- সান্যাল জমিদার বাড়ীর শিব র্দুগা মন্দির
- মকিমপুর জমিদার বাড়ীর মন্দির

Matrix BCS Series

ভৌগলিক পরিচিতি

সিরাজগঞ্জ জেলা ২৪°০০' - ২৪°৪০' পশ্চিম অক্ষাংশে এবং ৮৯°২০' - ৮৯°৫০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ জেলার দক্ষিণে পাবনা, উত্তরে বগুড়া, পূর্বে টাঙ্গাইল ও জামালপুর, পশ্চিমে পাবনা, নাটোর ও বগুড়া জেলা অবস্থিত। এ জেলার আয়তন ২৪৯৭.৯২ ব: কি.মি.।

আয়তন: সিরাজগঞ্জ জেলার মোট আয়তন ২৪৯৭.৯২ বর্গ কিলোমিটার। উপজেলাগুলোর আয়তন যথাক্রমে সিরাজগঞ্জ সদর ৩২৫.৭৭ বর্গ কি. মি, উল্লাপাড়া ৪১৪.৪৩ বর্গ কি.মি, রায়গঞ্জ ২৬৭.৮৩ বর্গ কি.মি, বেলকুচি ১৬৪.৩১ বর্গ কি.মি, কাজিপুর ৩৬৮.৬৩ বর্গ কি.মি, শাহজাদপুর ৩২৪.৪৭ বর্গ কি.মি, কামারখন্দ ৯১.৬১ বর্গ কি.মি, চৌহালী ২৪৩.৫৭ বর্গ কি. মি এবং তাড়াশ ২৯৭.২০ বর্গ কি.মি।

সীমানা: সিরাজগঞ্জ জেলার দক্ষিণে পাবনা, উত্তরে বগুড়া, পূর্বে টাঙ্গাইল ও জামালপুর, পশ্চিমে পাবনা, নাটোর ও বগুড়া জেলা অবস্থিত।

ভূমিরূপ: সিরাজগঞ্জের ভূমি সমতল। এই জেলায় কিছু নিচু জমি ও জলাভূমি রয়েছে। জেলার বেশিরভাগ এলাকা বর্ষা মৌসুমে পানির নিচে তলিয়ে যায়। চলন বিলের ১০ভাগ এলাকা এই জেলার তাড়াশ উপজেলায় পড়েছে। মোট আবাদী জমির পরিমাণ ১৭৯৯৬৪.০২ হেক্টর, পতিত জমির পরিমাণ ১৫৭০১.৬৪ হেক্টর, বনভূমি ৫০.৪৮ হেক্টর। এছাড়া এক ফসলী জমি ১৯.৫৪%, দো-ফসলী জমি ৫৯.১৮%, তিন ফসলী জমি ২১.২৮% এবং সেচের আওতাধীন আবাদী জমির পরিমাণ ৭৪.৩৪%।

অবস্থান: সিরাজগঞ্জ জেলা অক্ষাংশ ২৪° ০০' পশ্চিম থেকে ২৪° ৪০' পশ্চিমে ও দ্রাঘিমাংশ ৮৯° ২০' পূর্ব থেকে ৮৯° ৫০' পূর্বে অবস্থিত।

জলবায়ু: বার্ষিক গড় তাপমাত্রা- সর্বোচ্চ ৩৪.৬০ সে, সর্বনিম্ন ১১.৯০ সে.। বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত ১৬১০ মি.মি.।

নদ-নদী : যমুনা, বড়াল, ইছামতি, করতোয়া, হুরাসাগর, গোহালা, বাঙ্গালী, গুমনী এবং ফুলঝুড়ি এ জেলার প্রধান নদ-নদী।

Matrix BCS Series

মানচিত্রে জেলা

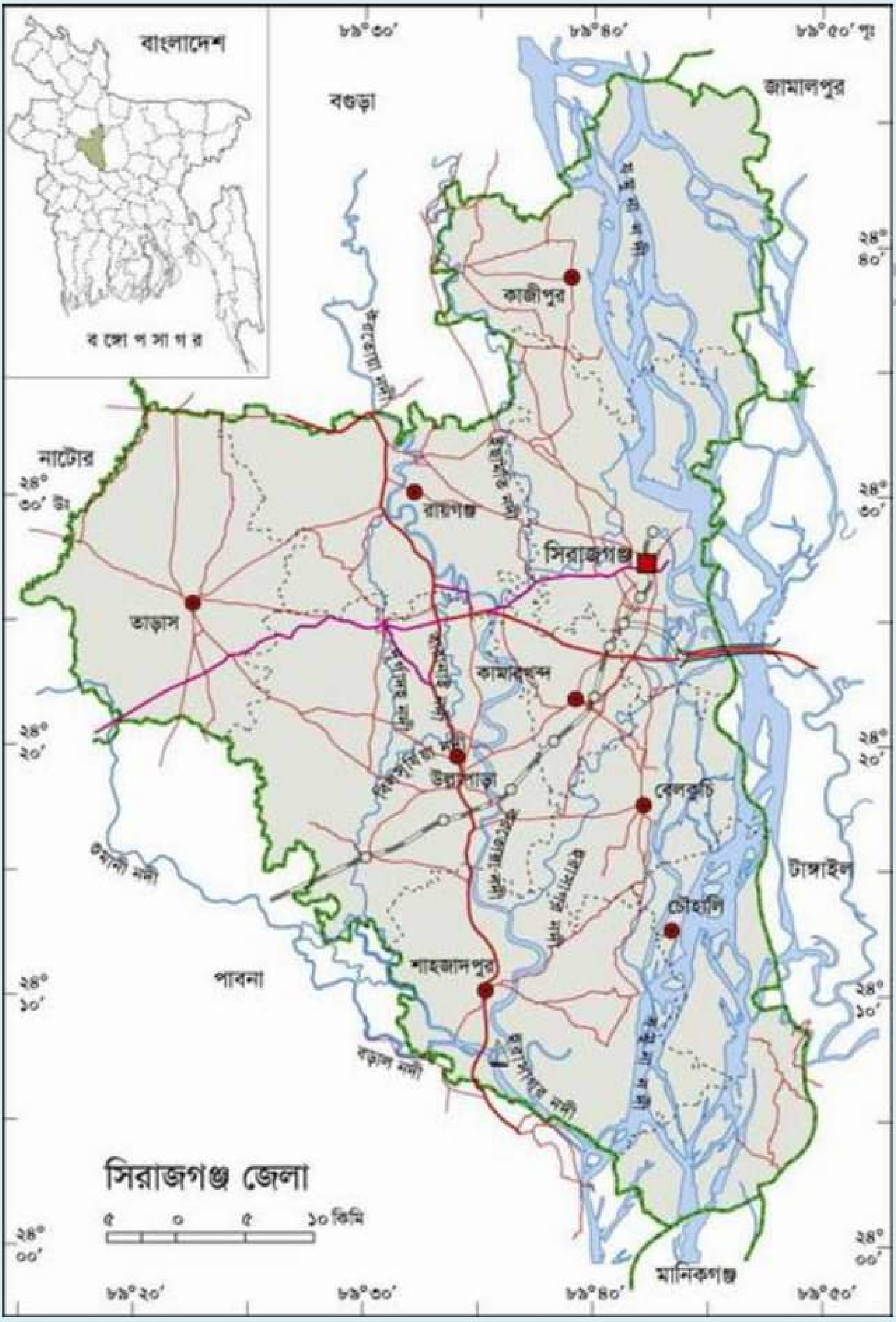
বাংলাদেশ
বঙ্গোপসাগর
বগুড়া
জামালপুর
কাজীপুর
নাটোর
রায়গঞ্জ
সিরাজগঞ্জ
তাড়াশ
কামারখন্দ
উল্লাপাড়া
বেলকুচি
টাঙ্গাইল
চৌহালি
পাবনা
শাহজাদপুর
মানিকগঞ্জ
সিরাজগঞ্জ জেলা
৫ ০ ৫ ১০ কিমি
৮৯°২০'
৮৯°৩০'
৮৯°৪০'
৮৯°৫০'
৮৯°৫০' পূঃ
২৪° ৪০'
২৪° ৩০' উঃ
২৪° ২০'
২৪° ১০'
২৪° ০০'

জেলার পটভূমি

প্রাচীন কাল:

সপ্তম শতাব্দীর পর থেকেই ময়মনসিংহের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল অর্থাৎ সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ফরিদপুর বছরের প্রায় আট/নয় মাস পানির নিচে থাকতো। ফলে জনবসতি ছিল কম। এ অঞ্চল থেকে পানি সাগরের দিকে নেমে গেলে বছরের চার পাঁচ মাস সময়ে পাশ্ববর্তী কায়েম অঞ্চল থেকে লোকজন আবাদ বসত চালু রাখার জন্য ভীড় জমাতো। সেই শুকনো মৌসুমে কতিপয় মেহনতি মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে পরবর্তী বছরে প- াবনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য জাংগাল (বাঁধ) তৈরী করত। ফলে জাংগালের মধ্যকার জলাভূমি কিছুকালের মধ্যেই কায়েমী অঞ্চলের আকার ধারণ করত। ধারণা করা হড সমুদ্রতট থেকে সমতট শব্দটির উৎপত্তি। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর সঙ্গে প্রায়ই ঐক্যমতে ডাঃ কালিদাস নাগ, পিএইচডি তদানিন্তন বঙ্গের পূর্বের নিম্নাঞ্চলকে অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গের প্রায় অংশকেই সমতট বলে আখ্যা দিয়েছেন। ময়মনসিংহের অধিকাংশ এলাকাই এই সমতটের অন্তর্গত সমতল ভূমি। শশাঙ্ক ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন, জ্ঞান সমগ্র আর্য্যবর্তে বাঙ্গালীদের সম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেন এবং আংশিক সে স্বপ্নকে সফল করেন (R.C. Mojuccedu Bangladesher Itihash-P-31)। পরবর্তী যুগে বাঙ্গালী বংশোদ্ভুত শেরশাহের পুত্র সলিম শাহ শের শাহের মৃত্যুর পর জালাল উদ্দিন খাঁ সলিম শাহ নাম ধারণ পূর্বক দিল্লীর মসনদে আরোহন করেন। তিনিই একমাত্র বাঙালী যিনি দিল্লির মসনদে শেরশাহের পুত্র রূপে আরোহণ করে আট বৎসর রাজত্ব করেন (১৫৪৫-১৫৫৩ খৃঃ)। তিনি পাবনা জেলার চাইমোহর থানার অনর্ন্তগত সমাজ নামক গ্রামে জন্মলাভ করেন ও প্রতিপালিত হন এবং পরে দিল্লী গমন করে পিতার সহিত মিলিত হন ও শাহী মসনদে আরোহন করেন। পাল রাজাগণের সময় এ অঞ্চলের শাসকদের লাট, চাট, ভাট ইত্যাদি পদ দেয়া হত। সম্ভবত এই ভাট হইতেই বঙ্গদেশের যমুনা নদীর ও রাজমহলের নিম্নেদেশ - পাবনা ও ফরিদপুর অঞ্চল ভাটের দেশ বলে পরিচিত। পাবনা জেলা ও তৎকালে সিরাজগঞ্জ মহকুমায় যে বিরাট চলনবিলের অস্তিত্ব বর্তমান তা দৃষ্টে ও পাবনা জেলার ইতিহাস (রাধা রমন সাহা-১-৩ খন্ড), অধ্যাপক আব্দুল হামিদ এর চলনবিলের ইতিকথা ও প্রমথবিশীর চলনবিল গ্রন্থে যে ঐতিহাসিক বর্ণনা বিভিন্ন ভাবে পাওয়া যায়, তৎসঙ্গে হজরত শাহ জালাল (রঃ) জীবনী গ্রন্থ (কৃত চৌধুরী গোলাম আকবর) এর খন্দকার আব্দুর রহিম সাহেবের টাঙ্গাইলের ইতিহাস এবং করটিয়া খান পন্নী সাহেবের নিজস্ব ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে রাজমহল পাহাড় হতে টাঙ্গাইলের দক্ষিণে আটিয়া গ্রামের পশ্চিম পাশের লৌহজং নদী পর্যন্ত বিশাল জলধিতল ছিল (আটিয়া শাহী মসজিদ লৌহজং নদীর পূর্বতীরে প্রতিষ্ঠাকাল ১৬০৯)। সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে কাগমারীর দরবেশ হযরত শাহ জালাল (রঃ) এবং তার মামা শাহানশাহ হযরত বাবা আদম (রঃ) কাশ্মিরী এ অঞ্চলে আগমন ও ইসলাম প্রচার করেন। তাঁদের জীবনীতেই বিশাল জলধির মধ্যে চর জাতীয় প্রাচীন ভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে শাহজাদপুরে হযরত শাহদৌলা মখদুম (রঃ) সিরাজগঞ্জে হযরত শাহ সিরাজউদ্দিন, নওগাঁতে দাদাপীর, রাজশাহী জেলার বাঘাতে শাহাদৌলা জামী দানেশমন্দ (রঃ) এবং চর মধ্যাহ্ন দ্বীপে বারুহাস ইমামবাড়ী পীর সাহেবের আগমন ঘটে।

মধ্য যুগ

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কুতুব উদ্দিন আইবেক দিল্লী জয় করেন। কুতুব উদ্দিন তার অনুচর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজিকে বাংলা ও বিহার জয় করার জন্য প্রেরণ করেন। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা জয় করেন ও এ অঞ্চল মুসলিম শাসকদের অধীনে আসে। এদেশে মুসলিম বিজয়ের ১৪০ বছর পর ইবনে বতুতার সফর নামা এবং ২০০ বছর পর মাহুয়ানের বিবরণ এই দুটো মিলিয়ে দেখলে আমরা খুব সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মুসলিম বিজয়ের ১৫০ বছরের মধ্যেই সিরাজগঞ্জের অধিবাসীদের জীবনে ইসলাম একটা অপ্রতিরোধ্য ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে এবং ২০০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ যখন চৈনিক দূত মাহুয়ান এদেশে সফর করেন, তখন সিরাজগঞ্জের জনসাধারণের অধিকাংশ ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিল। মাহুয়ানের সফরের সময় সিরাজগঞ্জ তথা ভাটি অঞ্চলের জনসাধারণ তখন কেবল মুসলমান হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তাই নয়, বরং স্বাধীন গোষ্ঠি হিসেবে সারা বিশ্বে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। এ অঞ্চলের জনসাধারণ তখন মিথ্যা ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে জানত না। এভাবেই তারা ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত স্বাধীনভাবেই বসবাস করছিল। ১৫৩৮ সালে মোঘল বাদশা হুমায়ুন গৌড় দখল করেন (সেপ্টেম্বর ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ)। গৌড়ের সুরম্য প্রাসাদাবলী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে বাদশা হুমায়ুন খুবই মুগ্ধ হন এবং তিনি এর নাম রাখেন জান্নাতাবাদ।

মুঘল আমল

মুঘল আমলে (১৫৩৮-১৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) সুবা বাংলাকে প্রশাসনিক সুবিধার্থে ১৯টি সরকারে এবং ৬৮২টি পরগণায় বিভক্ত করা হয়েছিল। সেই সরকার গুলির মধ্যে 'সরকার বাজুহা' আকার আয়তনে ছিল অনেক বড়। তৎকালে সরকার বাজুহাকে প্রশাসনিক সুবিধার্থে ৩২ টি মহলে বিভক্ত করে। সে সময় সরকার বাজুহা মোট রাজস্ব ছিল ৩৫,১৬,৮৭১ দাম যা টাকার হিসেবে ৯,৮৭,৯২১ টাকা (১ টাকা = ৪০ দাম)। সিরাজগঞ্জ জেলাটি সেই সরকার বাজুহার অন্তর্গত হলেও ৩২টি মহলের কোনটির মধ্যে অবস্থিত সেটা ধারণা করা কঠিন। "সরকার বাজুহার" মধ্যে আমাদের অতি পরিচিত মোমেনশাহী, ভাওয়াল বাজু ও ঢাকা বাজু উল্লেখ আছে। কিন্তু সিরাজগঞ্জ নামে আমরা কোন মহলের নাম দেখি না। সিরাজগঞ্জ যে সরকার বাজুহার মধ্যকার একটি এলাকা এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ঢাকার কিছু এলাকা এবং ভাওয়ালগড় সহ বৃহত্তর মোমেনশাহী জেলার সমগ্র এলাকাই ছিল সরকার বাজুহার অন্তর্গত। ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, ১৮৪৫ সনের পূর্ব পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ ছিল মোমেনশাহী জেলার অন্তর্গত। ঈশা খানের আমলে সাগরের মতো যমুনা নদীর অথৈ পানি ছুটে চলতো এপার থেকে ওপার দশ বার মাইল জুড়ে। সিরাজগঞ্জ শহরটি যেখানে এখন অবস্থিত, সেখানটিতে জনমানুষের বসতি ছিল না সে আমলে। যমুনা নদীর মাঝি মাল্লারা সেখানে কখনো নৌকা ভিড়াতো না। সে এলাকাটি তখন লোকে বলতো ভুতের দিয়ার। এ নিয়ে রয়েছে বহু জনশ্রুতি। রাত্রি হলেই নাকি হাজারে হাজারে লাখে লাখে ভুত সেই দিয়ারে হাজির হত। যদি কোন নৌকা বিপাকে পড়ে সেই ভুতের দিয়ারের ধার কাছ দিয়ে রাত্রিকালে উজান ভাটি চলতো, তাহলে দেখা যেত নৌকার মাঝি মাল্লা চরনদারদের ঘাড় মটকিয়ে রেখেছে ভুতেরা। তবে এখনো সিরাজগঞ্জ আদি শহরটি যে মৌজাতে অবস্থিত, তার নাম

Matrix BCS Series

বহাল তবিয়তে ভুতের দিয়ার রূপেই টিকে আছে। বর্তমান জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন এলাকা এবং সদর ভূমি অফিস, পৌরসভা কার্যালয় ভুতের দিয়ার মৌজায় অবস্থিত।

বৃটিশ আমল

বৃটিশ আমলের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের ৬৮২টি পরগনাকে জেলা হিসাবে গণ্য করা হয়নি। প্রথমে মুসলিম আমলের প্রশাসনিক কাঠামোকে পরিবর্তন করা হয়েছে। তারপর বাংলাদেশের প্রশাসনিক তাগিদ পূরণের উদ্দেশ্যে সারা দেশের মধ্যে মাত্র ৪/৫জন জেলা কালেক্টর নিয়োগ করা হয়েছে। বৃটিশ আমলের প্রথম দিকে নোয়াখালী, রংপুর, ঢাকা, ও মোমেনশাহী এই চারটি জেলা কালেক্টরেটের সাহায্যে বাংলাদেশের মতো একটি বিশাল দেশ শাসন করা হতো। ১৭৮৬ থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে সিরাজ আলী চৌধুরী নামে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন সোহাগপুরে। ১৭৮৭ সালে মোমেনশাহী জেলা স্থাপিত হয়। এই একই বছরে লর্ড কর্ণওয়ালিসের কাছ থেকে বড় বাজু পরগনার সাত আনা হিস্যা সিরাজ আলী চৌধুরী 'সিরাজগঞ্জ জমিদারী' নামে পত্তনী লাভ করেন। কিন্তু বৃটিশ আমলের প্রথম দিকে জমিদারের হাতে যেহেতু প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়নি, সেহেতু সিরাজগঞ্জ ছিল মোমেনশাহী জেলার প্রশাসনিক আওতায়; তখন জামালপুর, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতিও মোমেনশাহী জেলার আওতাধীন ছিল। ১৭৯০ সালে মোমেনশাহী জেলার কালেক্টর সাহেব বিশাল মোমেনশাহী জেলার স্থানে স্থানে থানা স্থাপনের তাগিদে ঢাকা রেভিনিউ বোর্ডের কাছে পরানগঞ্জ, কটিয়াদী, চাঁদগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, জগনাথগঞ্জ, শের মদন, শের দিবার দিয়া, শের মাচরা প্রভৃতি স্থানের প্রস্তাব পেশ করেন। ১৭৯২ সালের মধ্যে সিরাজগঞ্জসহ ঐসব এলাকায় প্রথম বিলেতি প্যাটার্নের থানা স্থাপিত হয়। ১৮৪৫ সালে মোমেনশাহী জেলায় ধরমচান্দ ঘোষ প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়ে আসেন। ম্যাজিস্ট্রেট মোমেনশাহী জেলার পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুইটি মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব করেন। শেরপুর, সিরাজগঞ্জ, হাজীপুর ও পিংনাসহ ৪ থানা নিয়ে ১৮৪৫ সালে জামালপুর মহকুমা এবং নিকলী, বাজিতপুর, ফতেপুর ও মাদারগঞ্জ এই ৪ থানা নিয়ে হুসেনপুর বা নিকলী মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। ১৮৪৫ সালের এপ্রিল মাসে সরকার সিরাজগঞ্জ ও জামালপুর মহকুমা দুইটি স্থাপনের অনুমতি দেন। ফলে ১৮৪৫ সালে বিশাল মোমেনশাহী জেলার অধীনে জামালপুর ও সিরাজগঞ্জ নামে দুইটি মহকুমার সৃষ্টি করা হয়। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা যায়, পরবর্তীকালে মোমেনশাহী জেলাকে বিভক্ত করে ১৮৬৫ সালে কিশোরগঞ্জ, ১৮৬৯ সালে টাংগাইল এবং ১৮৮২ সনে নেত্রকোণা মহকুমা সৃষ্টি করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে ১৮২৮ সালে রাজশাহীর একাংশ নিয়ে পাবনা জেলার পত্তন হয়েছিল। সিরাজগঞ্জবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে ১৮৫৫ সালে যমুনা নদীর গতি পরিবর্তনের কারণে সিরাজগঞ্জ থানাকে পাবনা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয় (পাবনা গেজেট পৃষ্ঠা নং ৪৩)। ১৮৭৫ সালে রায়গঞ্জ থানাকে সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত করে সিরাজগঞ্জের প্রশাসনিক বিস্তৃতি ঘটানো হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে সিরাজগঞ্জ জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

Matrix BCS Series

জেলার ঐতিহ্য

সিরাজগঞ্জ জেলায় বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমূখী সেতু, হার্ডপয়েন্ট, রাণীগ্রাম গ্রোয়েন, কাঁটাখাল, ইলিয়ট ব্রীজ জেলার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমূখী সেতুর (বাংলাদেশের বৃহত্তম সড়ক ও রেলসেতু) পাশাপাশি সয়দাবাদ ইউনিয়নে বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমূখী সেতুসংলগ্ন একটি 'ইকোপার্ক' প্রতিষ্ঠা করা হলেও জনগণের চাহিদানুযায়ী এখনও গড়ে উঠেনি। পরিপূর্ণভাবে গড়ে উঠলে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের ব্যাপক সমাগম ঘটবে মর্মে আশা করা যায়। এছাড়া পৌর এলাকার হার্ডপয়েন্টে একটি পার্ক তৈরী করা হয়েছে। আবাসনের জন্য ইতোমধ্যেই শহর এলাকায় গড়ে উঠেছে দু'তিনটি উন্নতমানের আবাসিক হোটেল। উল্লাপাড়ার ঘাটিনা ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন বিকেলে আনন্দ ভ্রমণের জন্য লোকজন জড়ো হয়। এছাড়া বর্ষাকালে চলনবিল বেষ্টিত মোহনপুর, উধুনিয়া, বড়পাঙ্গাসী ও বাঙ্গালা ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নয়নাভিরাম শোভা ধারণ করে। সুফি সাধক শাহ কামাল (রহঃ) ধর্ম প্রচারের জন্য কামারখন্দে আসেন এবং তিনি ভদ্রঘাট ইউনিয়নের নান্দিনা কামালিয়া গ্রামে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর কবরকে ঘিরে তৈরী হয়েছে মাজার শরীফ। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এ মাজার দর্শনে আসেন।

উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থানগুলো হলোঃ

রবীন্দ্র-কাছারী বাড়ী

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের একটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় পুরাকীর্তি হচ্ছে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শাহজাদপুরের কাচারিবাড়ী। এটি রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক জমিদারি তত্ত্বাবধানের কাচারি ছিল। তারও পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটি নীলকরদের নীলকুঠি ছিল। সে কারনে এখনও অনেকে একে কুঠিবাড়ী বলে। পরে রবীন্দ্রনাথের দাদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এটি নিলামে

কিনে নেন। এখানে রয়েছে জমিদারির খাজনা আদায়ের কাচারির একটি ধ্বংসাবশেষ, একটি বেশ বড় দ্বিতল ভবন। বর্তমানে এখানে নির্মিত হয়েছে একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম। দ্বিতল ভবনটি বর্তমানে রবীন্দ্র জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং আঙ্গিনার বিস্তৃত জায়গা জুড়ে তৈরী করা হয়েছে সুদৃশ্য একটি ফুলবাগান। রবীন্দ্রনাথ পিতার আদেশে ঊনত্রিশ বছর বয়সে ১৮৯০ সালে জমিদারি তত্ত্বাবধানের জন্য প্রথম শাহজদাপুর আসেন। রবীন্দ্রনাথ এখানকার প্রকৃতি ও মানুষের বিচিত্র জীবন প্রবাহের সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হন।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ থেকে ১৮৯৬ মোট ৭ বছর জমিদারির কাজে শাহজাদপুরে আসা-যাওয়া এবং অবস্থান করেছেন। তার এই শাহজাদপুরে আসা-যাওয়া শুধু জমিদারি তত্ত্বধানের বস্তুনিষ্ঠ প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং এই জমিদারির প্রয়োজনকে ছাপিয়ে প্রাধান্য পেয়েছে কবির সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা ও সৃজনশীলতা। এই সময়ের মধ্যে এখানে তিনি তাঁর অনেক অসাধারণ কালজয়ী সাহিত্য রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'সোনার তরী' কাব্যের 'ভরা ভাদরে', 'দুইপাখি' 'আকাশের চাঁদ', 'হৃদয় যমুনা', 'প্রত্যাখ্যান', 'বৈষ্ণব কবিতা', 'পুরস্কার' ইত্যাদি অসাধারণ কবিতা রচনা করেছেন। 'চৈতালী' কাব্যের 'নদীযাত্রা', 'শুশ্রূষা','ইছামতি নদী', 'বিদায়', 'আশিস-গ্রহণ' ইত্যাদি কবিতা এবং 'কল্পনা' কাব্যের 'যাচনা', , 'বিদায়', 'নরবিরহ', 'মানস-প্রতিমা', 'লজ্জিতা', 'সংকোচ', ইত্যাদি বিখ্যাত গান রচনা করেছেন। তাঁর শাহজাদপুরে রচিত ছোটগল্পের মধ্যে 'পোষ্টমাস্টার', 'ছুটি', 'সমাপ্তি', 'অতিথি' ইত্যাদি বিখ্যাত। আর প্রবন্ধের মধ্যে 'ছেলে ভুলানো ছড়া', 'পঞ্চভূত', এর অংশবিশেষ এবং 'ছিন্নপত্র' ও ছিন্নপত্রাবলীর আটত্রিশটি পত্র রচনা করেছেন। এছাড়া তার 'বিসর্জন' নাটকও এখানে রচিত। সবচেয়ে বড় কথা, তার পরবর্তী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শাহজাদপুরের প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান।

ঠাকুর পরিবারে জমিদারি ভাগাভাগির ফলে শাহজাদপুরের জমিদারি চলে যায় রবীন্দ্রনাথের অন্য শরীকদের হাতে। তাই ১৮৯৬ সালে তিনি শেষ বারের মতো শাহজাদপুর থেকে চলে যান। এর পরে তিনি আর শাহজাদপুরে আসেননি।শাহজাদপুর ছিল রবীন্দ্রনাথের অত্যান্ত প্রিয় এবং ভালোবাসার একটি স্থান। তাঁর ভালোবাসার কথা তিনি বিভিন্ন লেখায় বিশেষ করে 'ছিন্নপত্র' ও 'ছিন্নপত্রাবলী'তে গভীর আবেগ এবং আন্তরিকতার সাথে উল্লেখ করেছেন। ১৮৯৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর শাহজাদপুর থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "এখানে (শাহজাদপুরে) যেমন আমার মনে লেখার ভাব ও ইচ্ছা আসে এমন কোথাও না।" (ছিন্নপত্র-পত্র সংখ্যা-১১৯) এছাড়াও অন্যান্য লেখাতেও শাহজাদপুর সম্পর্কে তাঁর আবেগময় ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে ১৯৪০ সালে শাহজাদপুরের তৎকালীন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হরিদাস বসাকের চিঠির জবাবে তিনি লিখেছেন,'শাহজাদপুরের সাথে আমার বাহিরের যোগসূত্র যদিও বিচ্ছিন্ন তবুও অন্তরের যোগ নিবিড়ভাবে আমার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। আমার প্রতি সেখানকার অধিবাসীদের শ্রদ্ধা এখনো যদি অক্ষুন্ন থাকে তবে আমি পুরস্কার বলে গণ্য করব" (শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ-মোহাম্মদ আনসারুজ্জামান)। শাহজাদপুরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই ভালবাসা একে দিয়েছে মর্যাদা ও গৌরবের এক ভিন্ন

Matrix BCS Series

মাত্রা। শাহজাদপুরও রবীন্দ্রনাথকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে হৃদয়ে লালন করছে। প্রতিদিন দেশ বিদেশ থেকে বহু দর্শনার্থী কবির স্মৃতিধন্য এই স্থানটি দর্শনে আসেন।

এছাড়া প্রতি বছর সরকারি উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের আয়োজনে তিন দিন ব্যাপী ব্যাপক অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। এই জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। রবীন্দ্র-কাচারিবাড়ীর মিলনায়তনে কোনভাবেই স্থান সংকুলান হয় না। তাই একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে একটি রবীন্দ্র মুক্ত মঞ্চের। কাচারিবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে একটি মুক্তমঞ্চ নির্মাণের মতো যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। কাচারিবাড়ীর প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তা জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করার পরামর্শ সুধী মহলের। সাম্প্রতিককালে শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী দলমত নির্বিশেষে এখানকার সব মানুষের প্রাণের দাবীতে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য, আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নামে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান আছে বলে জানা নেই।

বঙ্গবন্ধু সেতু

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার দীর্ঘতম এবং বিশ্বের ১১তম দীর্ঘ সেতু এটি। ১৯৯৮ সালের জুন মাসে এটি উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশের ৩টি বড় নদীর মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম এবং পানি নির্গমনের দিক থেকে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম নদী যমুনার উপর এটি নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর নামানুসারে সেতুটির নামকরণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু সেতু বাংলাদেশের পুর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে দুই অংশকে একত্রিত করেছে। এই সেতু নির্মাণের ফলে জনগণ বহুভাবে লাভবান হচ্ছে এবং এটি আন্তঃআঞ্চলিক ব্যবসায় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সড়ক ও রেলপথে দ্রুত যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ছাড়াও এই সেতু বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন এবং টেলিযোগাযোগ সমন্বিত করার অপুর্ব সুযোগ করে দিয়েছে।

Matrix BCS Series

টাঙ্গাইল থেকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত এই সেতু এশীয় মহাসড়ক ও আন্তঃএশীয় রেলপথের উপর অবস্থিত। এ দুটি সংযোগপথের কাজ শেষ হওয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন আর্ন্তজাতিক সড়ক ও রেলসংযোগ স্থাপিত হয়। সেতুটি নির্মাণে মোট খরচ হয় ৯৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আইডিএ, জাপানের ওইসিএফ প্রত্যেকে ২২ শতাংশ পরিমাণ তহবিল সরবরাহ করে এবং বাকি ৩৪ শতাংশ ব্যয় বহন করে বাংলাদেশ। সেতুটির দৈর্ঘ্য ৪.৮ কিঃ মিঃ এবং প্রস্থ ১৮.৫ মিঃ।

যমুনা নদীর প্রধান চ্যানেলের প্রস্থ ৩.৫ কিলোমিটারের বেশি নয়। এই বিষয়টি মাথায় রেখে এবং বন্যাজনিত কারণের জন্য আরও কিছুটা প্রশ্বস্ততা বাড়িয়ে ৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি সেতু যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হয়। ভৌত অবকাঠামোর কাজ শুরু করার এক বছর পর ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসে সেতুটির মূল অংশ ৪.৮ কিলোমিটার ধরে চূড়ান্ত প্রকল্প অনুমোদিত হয়। যদিও বন্যায় নদী ১৪ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে থাকে, সার্বিক প্রকল্প ব্যয় অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক অবস্থায় রাখার জন্য উক্ত সংকোচন অত্যাবশক বিবেচনা করা হয়। এ জন্য অবশ্য নদীর প্রবাহ সেতুর নিচ দিয়ে সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে নদী শাসনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

সম্ভাব্য দৈব দুর্বিপাক ও ভুমিকম্প যাতে সহ্য করতে পারে সেজন্য সেতুটিকে ৮০-৮৫ মিটার লম্বা এবং ২.৫ ও ৩.১৫ মিটার ব্যাসের ১২১টি ইস্পাতের খুঁটির উপর বসানো হয়েছে। এই খুঁটিগুলি খুবই শক্তিশালী (২৪০টন) হাইড্রোলিক হাতুড়ি দ্বারা বসানো হয়। সেতুটিতে স্প্যানের সংখ্যা ৪৯ এবং ডেক খন্ডের সংখ্যা ১,২৬৩। সেতুটির উপর দিয়ে ৪ লেনের সড়ক এবং ২টি রেলট্র্যাক নেওয়া হয়েছে। সেতুটির উপরিকাঠামো ঢালাই করা খন্ডাংশ দিয়ে তৈরি এবং এগুলি সুস্থিত খিলান পদ্ধতিতে বসানো হয়েছে। সেতুটি নির্মাণে সর্বমোট যে ব্যয় হয় মিলিয়ন ডলারে তার বিভাজন হচ্ছে: সেতু এবং তার উপরে তৈরি পথসমূহ-২৬৯, নদীশাসন-৩২৩, রাস্তা ও বাঁধসমূহ-৭১, উপদেষ্টা- ৩৩, ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ -৬৭, সংস্থাপন-১৩, এবং অন্যান্য ১৮৬।

উপমহাদেশের এই অংশের জনগণ সর্বদাই বিশাল যমুনা নদীর উপর দিয়ে সেতু স্থাপনের মাধ্যমে গোটা দেশের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সমন্বয়ের আকাঙ্খা পোষণ করে এসেছে। ১৯৪৯ সালে জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রথম রাজনৈতিক পর্যায়ে যমুনা সেতু নির্মাণের দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহারে এই সেতু নির্মাণের কথা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৬৪ সালের ৬ জানুয়ারী রংপুর থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাইফুর রহমান যমুনা নদীর উপর সরকারের সেতু নির্মাণের কোন ইচ্ছা আছে কি-না জানতে চেয়ে প্রাদেশিক পরিষদে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ১৯৬৬ সালের ১১ জুলাই রংপুর থেকে একই পরিষদের আরেকজন সদস্য শামসুল হক এই সেতু নির্মাণের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন এবং এটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাজ্যের ফ্রিমান ফক্স অ্যান্ড পার্টনার্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান সেতুটির প্রাথমিক সম্ভাব্যতা নিয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করে। তারা সিরাজগঞ্জের নিকট আনুমানিক ১৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে একটি রেল-কাম-সড়কসেতু নির্মাণের সুপারিশ করেন। এই সমীক্ষা ছিল প্রাথমিক ধরনের এবং তারা বিস্তারিত সমীক্ষা পরিচালনার সুপারিশ করেন। অন্যদিকে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে বেতার-টেলিভিশনে

Matrix BCS Series

জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান তাঁর দলের নির্বাচনী ওয়াদা হিসেবে যমুনা সেতু নির্মাণের কথা উত্থাপন করেন।

এ সকল প্রচেষ্টা তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং মুক্তিযুদ্ধের কারণে বাস্তবায়িত হতে পারে নি। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২ সালে যমুনা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেয় এবং ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে এজন্য বরাদ্দ রাখা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে জাপান আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা সংস্থা জাইকা ১৯৭৩ সালে যমুনা নদীর উপর একটি সড়ক-কাম-রেলসেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা-সমীক্ষা হাতে নেয়। ১৯৭৬ সালে জাপান তাদের সমীক্ষা শেষ করে। তারা বলে যে যমুনা প্রকল্পে ৬৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হবে এবং এর অর্থনৈতিক আগমের হার মাত্র ২.৬ শতাংশ। যেহেতু এটা প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক নয়, তৎকালীন সরকার প্রকল্পটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। ১৯৮২ সালে সরকার যমুনা সেতু প্রকল্প পুনরুজ্জীবিত করে। এ সময় সরকার যমুনার ওপারে পশ্চিমাঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি সমীক্ষা দল নিয়োগ করে। সমীক্ষার উপসংহারে বলা হয় যে, শুধু গ্যাস সংযোগ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে না। উপদেষ্টাগণ একটি সড়ক-কাম-গ্যাস পরিবাহক সেতুর প্রকৌশলগত সম্ভাব্যতা ও এর ব্যয় নির্ধারণ করেন। এভাবেই বহুমুখী সেতু নির্মাণের প্রাথমিক ধারণার উৎপত্তি হয়। তিন লেন বিশিষ্ট ১২ কিঃ মিঃ দীর্ঘ সেতুর প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৪২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মন্ত্রিসভা এই রিপোর্ট অনুমোদন করে এবং এই প্রকল্পের অনুকূলে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৫ সারের ৩ জুলাই রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যমুনা সেতু সারচার্জ ও লেভি আদায়ের জন্য আরেকটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। অধ্যাদেশটির বিলুপ্তি পর্যন্ড় এই প্রক্রিয়ায় ৫.০৮ বিলিয়ন টাকা সংগ্রহ করা হয়। ১৯৮৬ সালে এই সেতুর জন্য প্রথম পর্যায়ের সম্ভাব্যতা-সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এ সময় সিরাজগঞ্জ ও ভূয়াপুর (টাঙ্গাইল) মর্ধবর্তী স্থানকে সেতুর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান বলে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮৭ সালের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্ভাব্যতা-সমীক্ষা পরিচালিত হয়। এতে দেখা যায় যে একটি সড়ক-কাম-রেল-বিদ্যুৎ-গ্যাস লাইন পরিবাহী সেতু অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উভয় দিক থেকেই লাভজনক হবে। ১৯৯২ সালে আইডিএ, এডিবি ও জাপানের ওইসিএফ সেতুর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নে সম্মত হয়। নির্মাণ চুক্তির জন্য ১৯৯৩ সালে আন্তর্জাতিক বিডিং এর মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়। সেতু নির্মাণ, নদী শাসনের কাজ এবং দুটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজের চুক্তি ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে সম্পাদিত হয়। ১৯৯৪ সালের ১০ এপ্রিল সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯৯৪ সালের ১৫ অক্টোবর প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন শুরু হয় এবং গ্যাস সঞ্চালন লাইন ব্যতীত সকল কাজ ১৯৯৮ সালের জুনের মধ্যে শেষ হয়। ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন সেতুটি চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

Matrix BCS Series

ইলিয়ট ব্রিজ

১৮৯২ সালে সে সময়কার সিরাজগঞ্জের সাব ডিভিশনাল অফিসার মি. বিটসনবেল বড়াল নদীর উপর একটা ব্রীজ তৈরী করার কথা ভাবতে শুরু করেন। তৎকালীন সময়ের বড় বড় ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটা কমিটি গড়লেন তিনি। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে অনুদান আদায় করে নিলেন ১৫০০ টাকার। আর ব্যবসায়ীরা এগিয়ে আসলেন যার যার সাধ্যমতো। সিদ্ধান্ত হয়ে গেল খুব শিগগিরই একটা ব্রীজ তৈরীর কাজ শুরু হবে বড়াল নদীর উপর।তখনকার সময়ে বাংলা আর আসামের যে গভর্নর তাঁর নাম চার্লস ইলিয়ট। তিনিই এক শুভক্ষণে ১৮৮২ সালের ৬ আগষ্ট ফাউন্ডেশন কাজের শুভ উদ্বোধন করলেন সেই ব্রীজের, বড়াল নদীর উপর। তার নামেই এই ব্রীজের নামকরণ করা হল ইলিয়ট ব্রীজ।

১৮৮২ সালে নির্মিত এই ইলিয়ট ব্রীজ আজও তার প্রথম দিনের সমৃদ্ধি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিরাজগঞ্জ শহরে। ১৮০ ফুট লম্বা আর ১৬ ফুট চওড়া এই ইলিয়ট ব্রীজের প্রধানতম বৈশিষ্ট হলো এতে কোন পিলার নেই! ষ্টুয়ার্ট হার্টল্যান্ড নামের ব্রিটিশ বংশোদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারের তৈরী এই পিলারবিহীন একমাত্র আর্চ দিয়ে তৈরী ব্রীজটি তৈরীতে সেসময় পয়তালি- শ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল।

আজও এই ইলিয়ট ব্রীজ সিরাজগঞ্জ শহরের একটি আকর্ষনীয় এবং দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য। হাজারো মানুষ আজও ছুটে যায় আসে এই ব্রীজটির সৌন্দর্য দেখার জন্য।

Matrix BCS

দর্শনীয় স্থান

- বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমূখী সেতু
- মখদুম শাহের মাজার
- রবীন্দ্র কাচারী বাড়ী
- চলন বিল
- যাদব চক্রবর্তী নিবাস
- ইলিয়ট ব্রীজ
- শাহজাদপুর মসজিদ
- জয়সাগর দিঘী
- রত্ন মন্দির
- ছয়আনি পাড়া
- দুই গম্বুজ মসজিদ
- ভিক্টোরিয়া স্কুল
- হার্ড পয়েন্ট
- ইকো পার্ক
- মিল্ক ভিটা
- রাউতারা বাঁধ ও স্লুইচ গেট
- বাঘাবাড়ি নদী বন্দর

Matrix BCS Series

সিরাজগঞ্জের পর্যটন ও ঐতিহ্য

পর্যটন

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় যমুনা সেতু, হার্ডপয়েন্ট, রাণীগ্রাম গ্রোয়েন, কাঁটাখাল, ইলিয়ট ব্রীজ, যমুনা সেতুর (বাংলাদেশের বৃহত্তম সড়ক ও রেলসেতু) পাশাপাশি সয়দাবাদ ইউনিয়নে যমুনা ব্রীজ সংলগ্ন একটি 'ইকোপার্ক' প্রতিষ্ঠা করা হলেও জনগণেরচাহিদানুযায়ী এখনও গড়ে উঠেনি। পরিপূর্ণভাবে গড়ে উঠলে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের ব্যাপক সমাগম ঘটবে মর্মে আশা করা যায়। এছাড়া পৌর এলাকার হার্ডপয়েন্টে একটি পার্ক তৈরী করা হয়েছে। আবাসনের জন্য ইতোমধ্যেই শহর এলাকায় গড়ে উঠেছে দু'তিনটি উন্নতমানের আবাসিক হোটেল।উল্লাপাড়ারঘাটিনা ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন বিকেলে আনন্দ ভ্রমনের জন্য লোকজন জড়ো হয়। এছাড়া বর্ষাকালে চলনবিল বেষ্টিত মোহনপুর, উধুনিয়া, বড়পাঙ্গাসী ও বাঙ্গালা ইউনিয়নের বিস্তির্ণ অঞ্চল নয়নাভিরাম শোভা ধারণ করে। সুফি সাধক শাহ কামাল (রহঃ) ধর্ম প্রচারের জন্য কামারখন্দে আসেন এবং তিনি ভদ্রঘাট ইউনিয়নের নান্দিনা

কামালিয়া গ্রামে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর কবরকে ঘিরে তৈরী হয়েছে মাজার শরীফ। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এ মাজার দর্শনে আসেন।সিরাজগঞ্জের উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থানগুলো হলোঃ

হার্ডপয়েন্ট:

সিরাজগঞ্জ জেলা যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। প্রতি বছর যমুনার অব্যহত ভাঙ্গনের ফলে শহরটি ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে স্থানান্তরিত হয়। প্রতি বছরের ভাঙ্গনের ফলে সরকার ১৯৯৬ সালে ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ কিলোমিটার শহর রক্ষা বাধ নির্মাণ করেন। ফলে বর্তমানে শহর যমুনা নদীর ভাঙ্গনের হাত থেকে অনেকটা নিরাপদ হয়েছে। সেই সাথে অভাবিত ভাবে এই হার্ডপয়েন্টটি একটি পর্যটনের স্থান হিসেবে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে।

প্রতি দিন দূর-দূরান্ত থেকে বহু ভ্রমণ পিপাসু মানুষ এই স্থানটি ভ্রমণ করে থাকেন। বর্ষামৌসুমে এই স্থানটি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এখানে দাঁড়ালে যমুনা নদীর পূর্ণরূপ পর্যবেক্ষণ করা যায়। তাছাড়া এখান থেকে যমুনা বহুমূখী সেতুর নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমূখী সেতুঃ

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার দীর্ঘতম এবং বিশ্বের ১১তম দীর্ঘ সেতু এটি। ১৯৯৮ সালের জুন মাসে এটি উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশের ৩টি বড় নদীর মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম এবং পানি নির্গমনের দিক থেকে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম নদী যমুনার উপর এটি নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর নামানুসারে সেতুটির নামকরণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু সেতু বাংলাদেশের পুর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে দুই অংশকে একত্রিত করেছে। এই সেতু নির্মাণের ফলে জনগণ বহুভাবে লাভবান হচ্ছে এবং এটি আন্তঃআঞ্চলিক ব্যবসায় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সড়ক ও রেলপথে দ্রুত যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ছাড়াও এই সেতু বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন এবং টেলিযোগাযোগ সমন্বিত করার অপুর্ব সুযোগ করে দিয়েছে। টাঙ্গাইল থেকে সিরাজগঞ্জ

পর্যন্ত বিস্তৃত এই সেতু এশীয় মহাসড়ক ও আন্তঃএশীয় রেলপথের উপর অবস্থিত। এ দুটি সংযোগপথের কাজ শেষ হওয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন আর্ন্তজাতিক সড়ক ও রেলসংযোগ স্থাপিত হয়।

সেতুটি নির্মাণে মোট খরচ হয় ৯৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আইডিএ, জাপানের ওইসিএফ প্রত্যেকে ২২ শতাংশ পরিমাণ তহবিল সরবরাহ করে এবং বাকি ৩৪ শতাংশ ব্যয় বহন করে বাংলাদেশ। সেতুটির দৈর্ঘ্য ৪.৮ কিঃ মিঃ এবং প্রস্থ ১৮.৫ মিঃ।

যমুনা নদীর প্রধান চ্যানেলের প্রস্থ ৩.৫ কিলোমিটারের বেশি নয়। এই বিষয়টি মাথায় রেখে এবং বন্যাজনিত কারণের জন্য আরও কিছুটা প্রশস্ততা বাড়িয়ে ৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি সেতু যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হয়। ভৌত অবকাঠামোর কাজ শুরু করার এক বছর পর ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসে সেতুটির মূল অংশ ৪.৮ কিরোমিটার ধরে চূড়ান্ত প্রকল্প অনুমোদিত হয়।
যদিও বন্যায় নদী ১৪ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে থাকে, সার্বিক প্রকল্প ব্যয় অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক অবস্থায় রাখার জন্য উক্ত সংকোচন অত্যাবশক বিবেচনা করা হয়। এ জন্য অবশ্য নদীর প্রবাহ সেতুর নিচ দিয়ে সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে নদী শাসনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

সম্ভাব্য দৈব দুর্বিপাক ও ভুমিকম্প যাতে সহ্য করতে পারে সেজন্য সেতুটিকে ৮০-৮৫ মিটার লম্বা এবং ২.৫ ও ৩.১৫ মিটার ব্যাসের ১২১টি ইস্পাতের খুঁটির উপর বসানো হয়েছে। এই খুঁটিগুলি খুবই শক্তিশালী (২৪০টন) হাইড্রোলিক হাতুড়ি দ্বারা বসানো হয়। সেতুটিতে স্প্যানের সংখ্যা ৪৯ এবং ডেক খন্ডের সংখ্যা ১,২৬৩। সেতুটির উপর দিয়ে ৪ লেনের সড়ক এবং ২টি রেলট্র্যাক নেওয়া হয়েছে। সেতুটির উপরিকাঠামো ঢালাই করা খন্ডাংশ দিয়ে তৈরি এবং এগুলি সুস্থিত খিলান পদ্ধতিতে বসানো হয়েছে। সেতুটি নির্মাণে সর্বমোট যে ব্যয় হয় মিলিয়ন ডলারে তার বিভাজন হচ্ছে: সেতু এবং তার উপরে তৈরি পথসমূহ-২৬৯, নদীশাসন-৩২৩, রাস্তা ও বাঁধসমূহ-৭১, উপদেষ্টা- ৩৩, ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ -৬৭, সংস্থাপন-১৩, এবং অন্যান্য ১৮৬।

উপমহাদেশের এই অংশের জনগণ সর্বদাই বিশাল যমুনা নদীর উপর দিয়ে সেতু স্থাপনের মাধ্যমে গোটা দেশের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সমন্বয়ের আকাঙ্খা পোষণ করে এসেছে। ১৯৪৯ সালে জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রথম রাজনৈতিকপর্যায়ে যমুনা সেতু নির্মাণের দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্ড়ানের প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহারে এই সেতু নির্মাণের কথা অন্‌র্ড়ভুক্ত ছিল। ১৯৬৪ সালের ৬ জানুয়ারী রংপুর থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাইফুর রহমান যমুনা নদীর উপর সরকারের সেতু নির্মাণের কোন ইচ্ছা আছে কি-না জানতে চেয়ে প্রাদেশিক পরিষদে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ১৯৬৬ সালের ১১ জুলাই রংপুর থেকে একই পরিষদের আরেকজন সদস্য শামসুল হক এই সেতু নির্মাণের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন এবং এটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

Matrix BCS Series

১৯৬৯ সালে যুক্তরাজ্যের ফ্রিমান ফক্স অ্যান্ড পার্টনার্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান সেতুটির প্রাথমিক সম্ভাব্যতা নিয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করে। তারা সিরাজগঞ্জের নিকট আনুমানিক ১৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে একটি রেল-কাম-সড়কসেতু নির্মাণের সুপারিশ করেন। এই সমীক্ষা ছিল প্রাথমিক ধরনের এবং তারা বিস্তারিত সমীক্ষা পরিচালনার সুপারিশ করেন। অন্যদিকে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে বেতার-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান তাঁর দলের নির্বাচনী ওয়াদা হিসেবে যমুনা সেতু নির্মাণের কথা উত্থাপন করেন। এ সকল প্রচেষ্টা তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং মুক্তিযুদ্ধের কারণে বাস্তবায়িত হতে পারে নি। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২ সালে যমুনা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেয় এবং ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে এজন্য বরাদ্দ রাখা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে জাপান আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা সংস্থা জাইকা ১৯৭৩ সালে যমুনা নদীর উপর একটি সড়ক-কাম-রেলসেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা-সমীক্ষা হাতে নেয়। ১৯৭৬ সালে জাপান তাদের সমীক্ষা শেষ করে। তারা বলে যে যমুনা প্রকল্পে ৬৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হবে এবং এর অর্থনৈতিক আগমের হার মাত্র ২.৬ শতাংশ। যেহেতু এটা প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক নয়, তৎকালীন সরকার প্রকল্পটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। ১৯৮২ সালে সরকার যমুনা সেতু প্রকল্প পুনরুজ্জীবিত করে। এ সময় সরকার যমুনার ওপারে পশ্চিমাঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালনের সম্ভাব্যতাযাচাইয়ের জন্য একটি সমীক্ষা দল নিয়োগ করে। সমীক্ষার উপসংহারে বলা হয় যে, শুধু গ্যাস সংযোগ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে না। উপদেষ্টাগণ একটি সড়ক-কাম-গ্যাস পরিবাহক সেতুর প্রকৌশলগত সম্ভাব্যতা ও এর ব্যয় নির্ধারণ করেন। এভাবেই বহুমুখী সেতু নির্মাণের প্রাথমিক ধারণার উৎপত্তি হয়। তিন লেন বিশিষ্ট ১২ কিঃ মিঃ দীর্ঘ সেতুর প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৪২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মন্ত্রিসভা এই রিপোর্ট অনুমোদন করে এবং এই প্রকল্পের অনুকূলে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৫ সারের ৩ জুলাইরাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যমুনা সেতু সারচার্জ ও লেভি আদায়ের জন্য আরেকটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। অধ্যাদেশটির বিলুপ্তি পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ায় ৫.০৮ বিলিয়ন টাকা সংগ্রহ করা হয়। ১৯৮৬ সালে এই সেতুর জন্য প্রথম পর্যায়ের সম্ভাব্যতা-সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এ সময় সিরাজগঞ্জ ও ভূয়াপুর (টাঙ্গাইল) মর্ধবর্তী স্থানকে সেতুর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান বলে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮৭ সালের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্ভাব্যতা-সমীক্ষা পরিচালিত হয়। এতে দেখা যায় যে একটি সড়ক-কাম-রেল-বিদ্যুৎ-গ্যাস লাইন পরিবাহী সেতু অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উভয় দিক থেকেই লাভজনক হবে। ১৯৯২ সালে আইডিএ, এডিবি ও জাপানের ওইসিএফ সেতুর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নে সম্মত হয়। নির্মাণ চুক্তির জন্য ১৯৯৩ সালে আন্তর্জাতিক বিডিং এর মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়। সেতু নির্মাণ, নদী শাসনের কাজ এবং দুটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজের চুক্তি ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে সম্পাদিত হয়। ১৯৯৪ সালের ১০ এপ্রিল সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯৯৪ সারের ১৫ অক্টোবর প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন শুরু হয় এবং

Matrix BCS Series

গ্যাস সঞ্চালন লাইন ব্যতীত সকল কাজ ১৯৯৮ সালের জুনের মধ্যে শেষ হয়। ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন সেতুটি চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

মখদুম শাহের মাজারঃ

বাংলার আউলিয়া-দরবেশের মধ্যে মখদুম শাহ খুবই পরিচিতি ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরে পুরানো শাহী মসজিদের পার্শ্ববর্তী কবরস্থানে তিনি শায়িতআছেন। স্থাপত্য রীতির বিবেচনায় বলা যায় যে, শাহজাদপুর মসজিদটি মুঘলপূর্ব যুগে নির্মিত। মসজিদটির গাত্রে কোন অভিলেখ না থাকায় এর নির্মাণ তারিখ নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। এ কারণে এবং লিখিত সাক্ষ্যের অনুপস্থিতিতে দরবেশ মখদুম শাহ এর পরিচিতি ও ইতিহাস সঠিক ভিত্তিরউপর দাঁড় করানো সম্ভব নয়। এতদঞ্চলে প্রচলিত জনশ্রুতিই মখদুম শাহ সমন্ধে জানার একমাত্র উৎস। প্রায় একশত বছর পূর্বে এ কাহিনী সংগ্রহ করে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী ইয়েমেনের জনৈক রাজা মুয়াজ বিন জবলের এক কন্যা ও দুই পুত্রের একজন ছিলেন মখদুম শাহ দৌলাহ। পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি নিজে এবং আরও বারোজন আউলিয়াসহ বিধর্মীদের দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বের হন। এছাড়া স্বীয় বোন এবং খাজা কালাম দানিশমন্দ, খাজা নুর ও খাজা আনোয়ার নামে তাঁর তিন ভাগনে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। পথিমধ্যে বোখারাত শেক জালালুদ্দীন বোখারীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ তিনি মখদুম শাহকে ধুসর রঙের এক জোড়া কবুতর উপহার দেন। বোখারা থেকে দলটি বাংলা অভিমুখে যাত্রা করে। তিনি দলবলসহ বাংলায় এসে জনৈক হিন্দু রাজার শাসনাধীন শাহজাদপুর নামক লোকালয়ে বসবাস শুরু করেন। ঐ রাজার রাজ্য বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মখদুম শাহ ও তাঁর অনুসারীদের উৎখাত করার জন্য রাজা আদেশ দেন। ফলে দু'দলের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে খাজা নুর ব্যতীত মখদুম শাহ ও তাঁর অন্যান্য সাথী শাহাদত বরণ করেন। এ বিষাদময় ঘটনা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে পরবর্তী সময়ে খাজা নুর সোনারগাঁও এর এক

রাজকুমারীকে বিয়ে করেন। শাহজাদপুর পরিবার যারা মখদুম শাহ দৌলার বংশ বলে দাবি করে আসছে, তারা সম্ভবত খাজা নুর ও সোনাগাঁয়ের রাজকুমারীর বংশধর।

মখদুম শাহ দৌলাহ যে পরিবেষ্টিত প্রাঙ্গণে শায়িত আছেন ঠিক সেখানে শাহ ইউসুখের সামাধি সৌধ অবস্থিত। মখদুম শাহের অন্যান্য অনুসারীদের পাশে একটি আঙ্গিনায় কবর দেওয়া হয়। শামসুদ্দীন তাব্রিজিকে (প্রখ্যাত 'মসনভি' রচয়িতা মেশ জালালুদ্দীন রুমির শিক্ষক শামসুদ্দীন তাব্রিজি নন। তিনি কখনও বাংলায় এসেছেন বলে জানা যায় না) শাহ দৌলাহ শহীদের অনুসারী বলে ধরা হয়। পৃথক অন্য একটি আঙ্গিনায় শামসুদ্দীন তাব্রিজি শায়িত আছেন। অন্যান্যরা যাঁদেরকে মখদুম শাহীর অনুসারি ধরা হয় এবং যাঁদের সমাধি একই অঙ্গিনায় অবস্থিত তাঁরা হলেন শাহ খিনগার, শাহ আজমল, হাসিল পীর , শাহ বোদলা, শাহ আহমদ এবং শাহ মাহমুদ। তাঁর অন্যান্য কিছু সহচরদের গণকবর দেওয়া হয় এবং তা গঞ্জ-ই-শাহীদান নামে পরিচিত। মখদুম শাহের বোন নিকটবর্তী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন এবং ঐ জায়গাটি এখনও 'সতীবিবির ঘাট' নামে পরিচিত। যেহেতু মখদুম শাহ ইয়েমেনের রাজ্যের শাহজাদা নামে পরিচিত, তাই তাঁর নামানুসারে স্থানাটির নামকরণ করা হয় শাহজাদপুর। মুসলিম আমলে শাহজাদপুর পরগনা ইউসুফশাহীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইউসুফ শাহ এর নামানুসারে এ পরগনার নামকরণ করা হয়। ৭২২ বিঘা জমি নিয়ে একটি বিরাট এস্টেট শাহজাদপুর দরগাহ ও মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দান করা হয়। এ এস্টেট এখনও মখদুম শাহের ভাগনে খাজা নুরের বংশধরেরা ভোগ-দখল করছেন। মখদুম শাহ দৌলাহর বাংলায় আগমনের তারিখ নির্ণয় করা যায়নি। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, তুর্কি আক্রমনের পূর্বে দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি এবং তাঁর সহচরগণ বাংলায় আসেন বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অবশ্য আধুনিক পন্ডিতগণ এ ধারণার ব্যাপারে সন্দিহান। ইয়েমেনের সুলতান মুয়াজ বিন জবলকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। এক মুয়াজ বিন জবল নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সাহাবি ছিলেন। তিনি ১৭ বা ১৮ হিজরিতে মারা যান। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, লোককাহিনীর মুয়াজ এবং মুহম্মদ (সঃ)-এর সাহাবি মুয়াজ কোনক্রমেই অভিন্ন ব্যক্তি নন। জালালউদ্দিন বোখারী, যাঁর সঙ্গে মখদুম শাহের দেখা হয়েছিল বলা হয় তিনি ১২৯১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। অতএব, এ ব্যাপারে কালের পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করা হয় যে, মখদুম শাহ চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলায় আসেননি এবং নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বখতিয়ারের বাংলা বিজয়ের পর তিনি এদেশে আসেন। শাহজাদপুর দরগাহে প্রতি বছর চৈত্র মাসে (মধ্য-এপ্রিল) এক মাসব্যাপী মেলা হয়। মেলার সময় এখানে সকল সম্প্রদায়ের লোকের সমাগম হয়। দরগায় উৎসর্গীকৃত সামগ্রীর মধ্যে চাল, চিনি, মিষ্টি, মোরগ এবং চেরাগ (এক ধরণের ব্রতমূলক বাতি) প্রধান।

Matrix BCS Series

রবীন্দ্র-কাচারিবাড়ি

শাহজাদপুরের আর একটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় পুরাকীর্তি হচ্ছে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শাহজাদপুরের কাচারিবাড়ী। এটি রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক জমিদারি তত্ত্বাবধানের কাচারি ছিল। তারও পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটি নীলকরদের নীলকুঠি ছিল। সে কারনে এখনও অনেকে একে কুঠিবাড়ী বলে। পরে রবীন্দ্রনাথের দাদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এটি নিলামে কিনে নেন। এখানে রয়েছে জমিদারির খাজনা আদায়ের কাচারির একটি ধ্বংসাবশেষ, একটি বেশ বড় দ্বিতল ভবন। বর্তমানে এখানে নির্মিত হয়েছে একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম। দ্বিতল ভবনটি বর্তমানে রবীন্দ্র জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং আঙ্গিনার বিস্তৃত জায়গা জুড়ে তৈরী করা হয়েছে সুদৃশ্য একটি ফুলবাগান। রবীন্দ্রনাথ পিতার আদেশে ঊনত্রিশ বছর বয়সে ১৮৯০ সালে জমিদারি তত্ত্বাবধানের জন্য প্রথম শাহজদাপুর আসেন। রবীন্দ্রনাথ এখানকার প্রকৃতি ও মানুষের বিচিত্র জীবন প্রবাহের সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হন। এখানে এসে তার লেখা একটি কবিতায় তিনি বলেছেন,

"নদী ভরা কূলে কূলে, ক্ষেত ভরা ধান।
আমি ভাবিতেছি বসে কি গাহিব গান।
কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে,
নিরাকুল ফুলভারে বকুল-বাগান।
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরাণ"
(ভরা ভাদরে- সোনার তরী)

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ থেকে ১৮৯৬ মোট ৭ বছর জমিদারির কাজে শাহজাদপুরে আসা-যাওয়া এবং অবস্থান করেছেন।তার এই শাহজাদপুরে আসা-যাওয়া শুধু জমিদারি তত্ত্বাবধানের বস্তুনিষ্ঠ প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং এই জমিদারির প্রয়োজনকে ছাপিয়ে প্রাধান্য পেয়েছে কবির সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা ও সৃজনশীলতা। এই সময়ের মধ্যে এখানে তিনি তাঁর অনেক অসাধারণ কালজয়ী সাহিত্য রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'সোনার তরী' কাব্যের 'ভরা ভাদরে', 'দুইপাখি' 'আকাশের চাঁদ', 'হৃদয় যমুনা', 'প্রত্যাখ্যান', 'বৈষ্ণব কবিতা', 'পুরস্কার' ইত্যাদি অসাধারণ কবিতা রচনা করেছেন। 'চৈতালী' কাব্যের 'নদীযাত্রা', 'শুশ্রূষা','ইছামতি নদী', 'বিদায়', 'আশিস-গ্রহণ' ইত্যাদি কবিতা এবং 'কল্পনা' কাব্যের

Matrix BCS Series

'যাচনা', , 'বিদায়', 'নরবিরহ', 'মানস-প্রতিমা', 'লজ্জিতা', 'সংকোচ', ইত্যাদি বিখ্যাত গান রচনা করেছেন। তাঁর শাহজাদপুরে রচিত ছোটগল্পের মধ্যে 'পোষ্টমাস্টার', 'ছুটি', 'সমাপ্তি', 'অতিথি' ইত্যাদি বিখ্যাত। আর প্রবন্ধের মধ্যে 'ছেলে ভুলানো ছড়া', 'পঞ্চভূত', এর অংশবিশেষ এবং 'ছিন্নপত্র' ও ছিন্নপত্রাবলীর আটত্রিশটি পত্র রচনা করেছেন। এছাড়া তার 'বিসর্জন' নাটকও এখানে রচিত। সবচেয়েবড় কথা, তার পরবর্তী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শাহজাদপুরের প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান।

ঠাকুর পরিবারে জমিদারি ভাগাভাগির ফলে শাহজাদপুরের জমিদারি চলে যায় রবীন্দ্রনাথের অন্য শরীকদের হাতে। তাই ১৮৯৬ সালে তিনি শেষ বারের মতো শাহজাদপুর থেকে চলে যান। এর পরে তিনি আর শাহজাদপুরে আসেননি।শাহজাদপুর ছিল রবীন্দ্রনাথের অত্যান্ড় প্রিয় এবং ভালোবাসার একটি স্থান। তাঁর ভালোবাসার কথা তিনি বিভিন্ন লেখায় বিশেষ করে 'ছিন্নপত্র' ও 'ছিন্নপত্রাবলী'তে গভীর আবেগ এবং আন্ড়রিকতার সাথে উল্লেখ করেছেন। ১৮৯৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর শাহজাদপুর থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "এখানে (শাহজাদপুরে) যেমন আমার মনে লেখার ভাব ও ইচ্ছা আসে এমন কোথাও না।" (ছিন্নপত্র- পত্র সংখ্যা-১১৯) এছাড়াও অন্যান্য লেখাতেও শাহজাদপুর সম্পর্কে তাঁর আবেগময় ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে ১৯৪০ সালে শাহজাদপুরের তৎকালীন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হরিদাস বসাকের চিঠির জবাবে তিনি লিখেছেন,'শাহজাদপুরের সাথে আমার বাহিরের যোগসূত্র যদিও বিচ্ছিন্ন তবুও অন্ড়রের যোগ নিবিড়ভাবে আমার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। আমার প্রতি সেখানকার অধিবাসীদের শ্রদ্ধা এখনো যদি অক্ষুন্ন থাকে তবে আমি পুরস্কার বলে গণ্য করব" (শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ-মোহাম্মদ আনসারুজ্জামান)। শাহজাদপুরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই ভালবাসা একে দিয়েছে মর্যাদা ও গৌরবের এক ভিন্ন মাত্রা। শাহজাদপুরও রবীন্দ্রনাথকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে হৃদয়ে লালন করছে। প্রতিদিন দেশ বিদেশ থেকে বহু দর্শনার্থী কবির স্মৃতিধন্য এই স্থানটি দর্শনে আসেন।

এছাড়া প্রতি বছর সরকারি উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের আয়োজনে তিন দিন ব্যাপী ব্যাপক অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। এই জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। রবীন্দ্র-কাচারিবাড়ীর মিলনায়তনে কোনভাবেই স্থান সংকুলান হয় না। তাই একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে একটি রবীন্দ্র মুক্ত মঞ্চের। কাচারিবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে একটি মুক্তমঞ্চ নির্মাণের মতো যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। কাচারিবাড়ীর প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তা জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করার পরামর্শ সুধী মহলের। সাম্প্রতিককালে শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী দলমত নির্বিশেষে এখানকার সব মানুষের প্রাণের দাবীতে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য, আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নামে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান আছে বলে জানা নেই।

Matrix BCS Series

চলন বিল

চলন বিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল এবং সমৃদ্ধতম জলাভূমিগুলির একটি। দেশের সর্ববৃহৎ এই বিলটি বিভিন্ন খাল বা জলখাত দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত অনেকগুলি ছোট ছোট বিলের সমষ্টি। বর্ষাকালে এগুলি সব একসঙ্গে একাকার হয়ে প্রায় ৩৬৮.০০ বর্গ কিমি এলাকার একটি জলরাশিতে পরিণত হয়। বিলটি সংলগ্ন তিনটি জেলা নাটোর, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ এর অংশ বিশেষ জুড়ে অবস্থান করছে। চলন বিল সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ ও পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলা দুটির অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এছাড়া সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ থানার তিন চতুর্থাংশই এ বিলের মধ্যে অবস্থিত। বিলটির দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত পাবনা জেলার নুননগরের কাছে অষ্টমনীষা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ জেলায় চলন বিলের উত্তর সীমানা হচ্ছে সিংড়ার পূর্ব প্রান্ত থেকে ভদাই নদী পর্যন্ত টানা রেখাটি যা নাটোর, পাবনা ও বগুড়া জেলার মধ্যবর্তী সীমানা নির্দেশ করে। ভদাই নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত তাড়াশ উপজেলা ও পাবনা জেলা বরাবর উত্তর-দক্ষিণমুখী একটি রেখা টানলে তা হবে বিলটির মোটামুটি পূর্ব সীমানা। বিলটির প্রশস্ততম অংশ উত্তর-পূর্ব কোণে তাড়াশ থেকে গুমনী নদীর উত্তর পাড়ের নারায়ণপূর পর্যন্ত প্রায় ১৩ কিমি বিস্তৃত। সিংড়া থেকে গুমনী পাড়ের কচিকাটা পর্যন্ড় অংশে এটির দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি, ২৪ কিমি।

ব্রহ্মপুত্র নদ যখন তার প্রবাহপথ পরিবর্তন করে বর্তমান যমুনায় রূপ নেয়, সে সময়েই চলন বিলের সৃষ্টি। করতোয়া ও আত্রাই নদীর পরিত্যাক্ত গতিপথ অন্তভূক্তির মাধ্যমে একটি ব্যাপক বিস্তৃত হ্রদে পরিণত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি সম্ভবত একটি পশ্চাৎজলাভূমি ছিল। চলন বিলের গঠন ঐতিহাসিকভাবেই আত্রাই ও বড়াল নদীর সংকোচনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আত্রাই নদী ছিল চলন বিলের প্রধান যোগানদাকারী প্রণালী যা রাজশাহী জেলার উত্তরাংশ ও দিনাজপুর এলাকার জল নিষ্কাশন করত। বড়াল চলন বিল থেকে জল নির্গমন পথ হিসেবে কাজ করে এবং বিলের পানি বহন করে যমুনা নদীতে ফেলে। গঠিত হওয়ার সময় চলন বিলের আয়তন ছিল প্রায় ১,০৮৮ বর্গ কিমি।

চলন বিলের দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে রয়েছে গুমনী নদী যা বিলটির পানি বয়ে নিয়ে প্রথমে বড় বিলে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত যমুনায় পতিত হয়। যমুনা বন্যা প্লাবিত হয়ে পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে বড়াল সেই পানি কিছুটা ধরে রাখে এবং বিলের পানিও বেড়ে যায়; যমুনার পানি নেমে না যাওয়া পর্যন্ত পানির এই উচ্চতা কমে না। শুষ্ক মৌসুমে বিলের বৃহত্তর অংশ শুকিয়ে ২৫.৯ থেকে ৩১.০৮ বর্গ কিমি আয়তনের এক জল গহবরে পরিণত হয়, যাকে বিলের 'মুল অংশ' বলা যেতে পারে। এই মুল অংশ অবশ্য অব্যাহত পানি সরবরাহ থেকে বঞ্চিত, বরং কিছু সংখ্যক অগভীর জলাশয়ের সমষ্টি যা পরস্পর অত্যন্ত আঁকাবাঁকা কিছু খাল দ্বারা সংযুক্ত। এই মূল অংশকে ঘিরে দুটি এককেন্দ্রিক অসম ডিম্বাকার এলাকা আছে যেখানে আঞ্চলিকভাবে 'ভাসমান ধান' নামে পরিচিত সরু চালের ধান উৎপন্ন হয়।

বর্তমানে চলন বিল দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছর গঙ্গা থেকে পলি এসে পড়ার দরুন বিগত দেড়শ বছরে বিলটি দক্ষিণ দিক থেকে অন্ততপক্ষে ১৯.৩২ কিমি সরে এসেছে। বিলটিতে প্রবাহদানকারী নদীগুলি, যথা গুড়, বড়াল ইত্যাদিও এটির আয়তন সংকোচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। বিলটির পানি নিষ্কাশন প্রণালী এবং পলি সঞ্চলের বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখার জন্য গণপূর্ত বিভাগ ১৯০৯ সালে একটি জরিপ চালিয়ে দেখেছে যে, চলন বিল তার পূর্বেকার আয়তন ১,০৮৫.০০ বর্গ কিমি থেকে সংকুচিত হয়ে ৩৬৮.০০ বর্গ কিমি এ দাড়িয়েছে। অবশিষ্ট জমি ব্যবহৃত হয়েছে চাষাবাদ অথবা জনবসতির জন্য। এই হ্রাসপ্রাপ্ত এলাকার মাত্র ৮৫ বর্গ কিমি -এ সারা বছর ধরে পানি থাকে।

চলন বিল বেশ দ্রুত ভরাট হয়ে আসছে। জমি পুনরুদ্ধার হচ্ছে এবং বিলের ধার দিয়ে গড়ে উঠছে গ্রাম। কেবল কেন্দ্রের গভীরতম অংশটুকু ছাড়া শুকনো মৌসুমে সমস্ত ছোট-বড় বিল শুকিয়ে যায়। কেন্দ্রের বাইরে প্রান্তীয় এলাকাগুলিতে শুষ্ক মৌসুমে বোরো ওউচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করা হয়। বর্ষার সময় অগভীর প্রান্তীয় এলাকায় গভীর পানির আমন ধান চাষ করা হয়। উত্তরবঙ্গের মাছের চাহিদা পূরণে চলনবিল এখনও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

মিল্কভিটা

মিল্কভিটা Bangladesh Milk Producers Co-operative Union Limited (BMPCUL) নামক সংস্থার তৈরী দুগ্ধজাত সামগ্রীর ট্রেড-মার্কের নাম। সমবায়ের আওতায় প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দুধ সংগ্রহ করে শহরবাসীর দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর চাহিদা পূরণে সচেষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশের বৃহত্তম দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান মিল্কভিটার সবচেয়ে বড় কারখানাটি শাহজাদপুরের বাঘাবাড়িতে অবস্থিত। এই কারখানায় দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ছাড়াও দুগ্ধজাত ঘি, মাখন, দই, আইসক্রিমসহ নানা ধরনের পণ্যের উৎপাদন হচ্ছে। মিল্কভিটার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ দুধ শাহজাদপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের দুগ্ধ খামারথেকে সংগ্রহ করা হয়। এই দুগ্ধ খামারের সংখ্যা প্রায় ৮,৪৬৮টি। এসব খামারে উন্নত জাতের গাভী পালন করা হয় এবং কোন কোন গাভী থেকে দিনে প্রায় ৩০ লিটার দুধ পাওয়া যায়। এখানে প্রচুর দুধ পাওয়া যায় বলে দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাদ্য তৈরী শিল্প গড়ে উঠেছে ব্যাপক হারে। বর্তমানে ইগচঈটখদেশের ছয়টি দুধ উৎপাদক এলাকা টাঙ্গাইল, টেকেরহাট, বাঘাবাড়ি, রংপুর ও শ্রীনগরে কাজ করে। নিজেদের প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির প্রতিষ্ঠিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দুধ সংগৃহীত হয়। নগদ অর্থের বিনিময়ে সদস্যরা দিনে দুবার সমিতিকে দুধ যোগান দেয়, তবে স্থানীয় বাজার-বারে সাপ্তাহিক পাওনা পরিশোধই অধিকতর সুবিধাজনক। দুধে বিদ্যমান চর্বি ও অন্যান্য উপাদানের অনুপাতেই দুধের দাম নির্ধারিত হয়। সমিতিতে সংগৃহীত দুধ প্রাথমিক প্রসেসিংয়ের জন্য নিকটতম কারখানায় পৌছানো হয়। টাঙ্গাইল, টেকেরহাট ও শ্রীনগর অঞ্চলের দুধ ঢাকায় আসে এবং তাথেকে তরল দুধ, আইসক্রিম ও দই প্রস্তুত করা হয়। বাঘাবাড়ি ঘাটের দুধ থেকে বাঘাবাড়ি ঘাটের ডেইরি কারখানা গুঁড়াদুধ, মাখন, দই ও ঘি উৎপাদন করে। সংস্থার দুগ্ধজাত সামগ্রী 'মিল্ক ভিটা' ট্রেডমার্ক নামে বাজারজাত হয়।

বাঘাবাড়ি নদী বন্দর

সরকার নির্ধারিত দায়িত্বের অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতের উন্নয়ন তত্ত্বাবধানের ধারায় বিআইডাবি- উটিএ অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়নের প্রকল্প হাতে নেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল এবং খুলনায় পাঁচটি প্রধান অভ্যন্তরীণ বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার ১৯৬০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখের ৪৬২-এইচটিডি নং গেজেট নোটিফিকেশন দ্বারা ১৯০৮ সালের বন্দর আইনের প্রবিধানসমূহ এই পাঁচটি অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তী সময়ে আইডব্লিউটি খাতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে ছয়টি নতুন অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর প্রতিষ্ঠা করা হয়পটুয়াখালী (১৯৭৫), নগরবাড়ি (১৯৮৩), আরিচা (১৯৮৩), দৌলতদিয়া (১৯৮৩), বাঘাবাড়ি (১৯৮৩) এবং নরসিংদী (১৯৮৩)। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলায় বড়াল নদীর তীরে স্থাপিত হয়েছে বাঘাবাড়ি নদী বন্দর। বাঘাবাড়ি নদী বন্দরের পেট্রোলিয়াম ডিপো থেকে পেট্রোলিয়াম জাতীয় দ্রব্য এবং সার সরবরাহের মধ্য দিয়ে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়। এই বন্দরটি সিরাজগঞ্জের অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

হুড়াসাগর নদী

আত্রাই-বড়াল এবং ফুলজোড় (বাব্দালী-করতোয়া)-এর সম্মিলিত স্রোতধারা। চলন বিলের পূর্ব প্রান্তে চাঁচকইর নামক স্থানে গুমানী নদীর গুর নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে গুমানি নামে প্রবাহিত হয়। চাটমোহরের পূর্ব দিকে এসে এটি বড়ালের সঙ্গে মিলিত হয়ে বড়াল (আত্রাই-বড়াল) নামে প্রবাহিত হয়েছে। চাটমোহর থেকে ৪৮ কিঃ মিঃ পূর্ব-দক্ষিণে বাঘাবাড়ির কাছে এই আত্রাই-বড়াল নদী তার বাম তীরে ফুলঝোড় (বাঙ্গালী-করতোয়া) নদীকে ধারন করে এবং মিলিত প্রবাহ হুড়াসাগর নামধারণ করে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। বেড়া পুলিশ স্টেশনের কাছে হুড়াসাগর তার ডান তীরে ইছামতি নদীর প্রবাহকে ধারণ করে যমুনা নদীতে পতিত হয়েছে।

বাঘাবাড়ি থেকে কিছুটা ভাটিতে বেড়া বাজারের সামান্য উত্তর-পশ্চিমে একটি বিরাট বহুমূখী সেচ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলছে। এখানে একাধারে সেচ কাজের জন্য পানি হুড়াসাগর থেকে নিয়ে ইছামতি নদী বা খালে দেওয়া হবে যা এই সেচ প্রকল্পের প্রধান খাল হিসেবে ব্যবহার করা হবে। আবার বর্ষা মৌসুমে সেচ এলকায় অতিরিক্ত পানি নিস্কাষণ করে হুড়াসাগর নদীর মাধ্যমে যমুনায় প্রবাহিত করা হবে।

ইছামতি থেকে নৌ-যান গুলি সরাসরি হুড়াসাগর যাওয়ার কোন সুবিধা ছিল না বিধায় নেভিগেশন লক নির্মাণ করা হয়েছে, যার সাহায্যে দুই পার্শ্বের দুই নদীর পানির লেভেলের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ছোটখাটো দেশী নৌকা এপার-ওপার করা যায়। বর্তমানে এই নদীর প্রবাহ খুবই কমে গিয়েছে। শুকনো মৌসুমে পানি প্রায় একেবারেই থাকে না। এ অবস্থা ভবিষ্যতে বেড়া সেচ প্রকল্পের সফল পরিচালনার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মহকুমার হিন্দু তীর্থ ও দর্শনীয় স্থান

সিরাজগঞ্জ থানা ঃ

১) শহরের উত্তরে যমুনা নদীর তীরে শ্মাশানঘাট ও মন্দির।এটারোকনী পরিবারের পূর্বপুরুষ রাম রায়ের (প্রখ্যাত জমিদার) কীর্তি।

২) কালীবাড়ী রোডস্থিত প্রাচীন কালিবাড়ী। এখানে বিরাট কাষ্ঠ নির্মিত রথ ছিল। এখন জীর্ণদশা। এখান হতে রথযাত্রা ও উল্টোরথ পর্ব উদযাপিত হয়।

৩) দরগা রোডের মহাপ্রভুর আখড়া। জাকজমকপূর্ণভাবে এখনে বিভিন্ন পুজা উদযাপিত হয়।

কামারখন্দ থানাঃ

১) ঝাঐলের বিখ্যাত গোষ্ঠ যাত্রা ও মেলা। এখানে একটি মন্দির ও মন্ডপ আছে। অবশ্য পূর্বের মত প্রভাব নাই। ঝাঐলের পাল জমিদারগণ বিখ্যাত। এরা রাজপুত বংশধর।

উল্লাপাড়া থানাঃ

১) হাটীকুমরুল ইউনিয়নস্থিত হাটিকুমরুলের নবরত্ন, সোধও মন্দির, কালের করাল গ্রাসে নিস্পেষিত হয়ে এখন নিষ্প্রভ। ইতিহাস বিখ্যাত নবরত্ন মন্দির এখন উপেক্ষিত অথচ উৎকৃষ্ট স্থাপত্য শিল্পের নির্দশন। এটি ছিল লাহিড়ী জমিদারগণের বাসস্থান যা নাটোর রাজের সাথে সম্পর্কিত।

২) রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন মধ্যস্থ চৈত্রহাটি কালিবাড়ী ইতিহাস প্রসিদ্ধ। রাজা চৌচির সিংহের বাসস্থান ও কীর্তি। এটা এখন নামেই পর্যবসিত তবু তীর্থ স্থান রূপে গণ্য।

শাহজাদপুর থানাঃ

শাহজাদপুর থানার গাঁড়াদহ ইউনিয়নের তারা বাড়িয়ার নিকট পূণ্যতোয়া করতোয়া নদীতে চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথির পূর্বে অষ্টমী তিথিতে এখানে ‘গঙ্গা স্নানে’ ভীড় জমে।

Matrix BCS Series

তাড়াশ থানাঃ

১) নওগাঁ ও তাড়াশে হিন্দু কীর্তি থাকায় উভয় স্থান তীর্থ ক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হয়। তাড়াশে বহু দর্শনীয় স্থান, মন্দিরাদি এখনও বর্তমান। সবই প্রাচীন কীর্তি ও ঐশ্বর্য্যমন্ডিত।

২) বারুহাস গ্রামের ভদ্রাবতী নদীতে পূর্বে চৈত্র পূর্ণিমার দিন গঙ্গাস্নান হত ও মেলা বসত। এখন ঐ সময় খাল শুকিয়ে যাওয়ায় স্নান পর্ব হয় না। কিন্তু তিথি উপলক্ষে মেলা বসে। অবশ্য এখন তা ভিন্নরূপ ধারণ করেছে।

৩) তালম গ্রামে সুউচ্চ টিলায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, প্রাচীনতম কীর্তি। পূর্বে যতটা জন সমাগম হত, এখন তা হয় না তবুও বিখ্যাত।

ইলিয়ট ব্রীজঃ

ইলিয়ট ব্রিজ সিরাজগঞ্জ শহরের কাটা খালের উপরে লোহা ও সিমেন্টের সমন্বয়ে তৈরী। সিরাজগঞ্জ শহরকে দেখার জন্য কাঁটাখালের উপরে প্রায় ৩০ ফুট উঁচু করে ইংরেজ এসডিও মিঃ বিটসন বেল আই, সি, এস, সাহেব ১৮৯৫ সনে ৪৫,০০০ টাকা খরচ করে বাংলার তৎকালিন ছোট লাট স্যার আলফ্রেড ইলিয়ট সাহেবের নামানুসারে এই ব্রিজ তৈরী করেছিলেন।

সে আমলে সন্ধ্যার পর ইলিয়ট ব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে সিরাজগঞ্জ শহরের একটি ভিন্নতর রূপ নজরে পড়তো। বর্তমানে উজ্জল নিয়ন বাতির আলোকমালায় সিরাজগঞ্জের প্রতিটি সড়ক পথ শুধু উদ্ভাসিত নয়; সেই সাথে দোকানের রডলাইট ও হেড লাইটের আলোরাতের অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে রাখে। তখন ইলিয়ট ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকলে দেখা যেত ঘন অন্ধকারের মধ্যে আশপাশের কোনো অসিত্বই নাই। দিনের বেলায় দেখা গেছে, শহর থেকে অনেক দূরে অসংখ্য গ্রাম জনপদ গা-ঘেষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু রাত্রিবেলায় সেই ইলিয়ট ব্রিজের উপর সেই একই জায়গায় দাঁড়ালে মনে হতো, বিশ্বচরাচরে আর কোথাও কোন কিছুর অসিত্ব নাই। শুধু ইলিয়ট ব্রিজের দু'পাশে, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিমে এক মাইল পরিসর এলাকাতেই সমস্ত দেশটা এসে ভীড় জমিয়েছে।

শাহজাদপুর মসজিদঃ

সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শাহজাদপুর সদরের একেবারে শেষপ্রান্তস্থিত দরগাপাড়ায় হুড়াসাগর নদীর পারে অবস্থিত। বিশ্বাস করা হয় যে, ১৫ শতকে প্রখ্যাত সুফিসাধক মখদুম শাহ এ মসজিদ নির্মাণ করেন। কোন লিপি প্রমাণে এ তারিখ নির্নয় করা হয়নি। মসজিদের স্থাপত্যরীতি ও অলংকরণ শৈলী হিসেবে মসজিদটি ১৫ শতকে নির্মিত হয়েছিল। বহুগম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদের গোত্রভূক্ত। শাহজাদপুর মসজিদ তিন সারিতে পাঁচটি করে মোট পনেরটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। মসজিদটির উত্তর দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ১৯.১৩ মিটার এবং পূর্ব পশ্চিমে প্রস্থ ১২.৬০ মিটার। অভ্যন্তরভাগে এর দৈঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ১৫.৭৭মিটার ও ৯.৬০ মিটার এবং দেওয়াল ১.৫৭ মিটার পুরু। এ মসজিদটি কিবলা কোঠা দেওয়ালের লম্বে, পাঁচটি স্তম্ভপথে ('বে') এবং উত্তর-দক্ষিণে তিনটি স্তম্ভপথে আইল বিভক্ত হয়ে মোট পনেরটি চতুস্কোনাকার এলাকায় বিভক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের অবস্থিত অন্যতম প্রাচীন এ মসজিদে প্রাথমিক সুলাতানি আমলে বিকশিত মসজিদ স্থাপত্যরীতির সকল বৈষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয়

জয়সাগর দিঘী:

সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলাধীন সোনাখাড়া ইউনিয়নের নিমগাছি বাজার হতে প্রায় ১ কিঃ মিঃ পশ্চিমে এ বিশাল ও প্রখ্যাত দিঘীটির অবস্থান। ঢাকা- বগুড়া মহাসড়কের ভূইয়াগাঁতী নামক স্থান হতে তাড়াশ অভিমুখী রাস্তার পাশে অবস্থিত। এ দিঘী সংলগ্ন উদয় দিঘী/কাতলা দিঘীসহ আরও কয়েকটি দিঘী রয়েছে। জয়সাগর দিঘীর বিশাল জলাধার ছাড়াও পর্যটকদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার নিমিত্ত পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে। জনশ্রুতি আছে বিরাট রাজার আমলে প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণ ও রাজার নিজস্ব লক্ষাধিক গবাদি পশুর পানীয় জলের।

জন্য এই দিঘীগুলো খনন করা হয়। ঐতিহাসিকগণের মতে পাল সাম্রাজ্যের রাজা ২য় গোপালের শাসনামলে (৯৪০-৯৬০ খ্রিঃ) জয়সাগর দিঘী খনন করা হয় (ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার ইতিহাস ১ম খন্ড পৃঃ ৫৭)। বর্তমানে এ দিঘীসহ অনেকগুলো দিঘী নিয়েজয়সাগর মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের নিকট ২৫ বৎসর মেয়াদে এ দিঘীগুলো ইজারা বন্দোবস্ত দেয়া আছে। ইজারার মেয়াদ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

পোতাজিয়া নবরত্ন মন্দির

শাহজাদপুর সদর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার পশ্চিমে রয়েছে একটি প্রাচীন মন্দির। ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত এই মন্দিরটি 'নবরত্ন মন্দির' নামে পরিচিত। তিনস্তর বিশিষ্ট মন্দিরটি মধ্য যুগের হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। (শাহজাদপুরের ইতিহাস----- প্রাগুক্ত)। এই মন্দিরটির দিকে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নজর দেয়া খুবই জরুরি।

নবরত্ন মন্দির (উল্লাপাড়া)

উল্লাপাড়া উপজেলাধীন হাটিকুমরু ইউনিয়নের নবরত্নপাড়া গ্রামে নবরত্ন মন্দির নামে একটি পুরাকীর্তি আছে। এর আশপাশে আরো কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির রয়েছে। এ মন্দিরগুলো আনুমানিক ১৭০৪-১৭২০ সালের মধ্যে নবাব মুর্শিদকুলি খানের শাসনামলে তার জনৈক নায়েব দেওয়ান রামনাথ ভাদুরী নামক ব্যক্তি স্থাপন করেন। মূল মন্দিরটি তিনতলা বিশিষ্ট এবং অন্যান্য মন্দির সমূহ দোচালা এবং মঠাকৃতি আটকোনা বিশিষ্ট। এ মন্দির নির্মাণকালে প্রতিটি ইট ঘিয়ে ভেজে তৈরী করা হয়েছিল মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে। নবরত্ন মন্দিরটি ১৯৮৭ সালে সংরক্ষিত ইমারত হিসেবে সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ গ্রহণ করে কিছু সংস্কার সাধন করে। এ ছাড়াও সম্প্রতি ঐ স্থানের মন্দিরসমূহের সংস্কার সাধন করা হয়েছে। আলোচ্যনবরত্ন মন্দির ও আশপাশের অন্যান্য মন্দিরের প্রকৃত অবয়ব অনেকাংশে ধবংস প্রাপ্ত হলেও এর গঠন আকৃতি ও নির্মাণ শৈলী অভূতপূর্ব।

রাউতারা বাঁধ ও স্লুইচগেট

বাঘাবাড়ী মিল্কভিটা দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা থেকে নিমাইচরা পর্যন্ত যে বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধটি আছে সেটি 'নিমাইচরা বাঁধ' নামে পরিচিত। কিন্তু শাহজাদপুরের মানুষের কাছে এর নাম রাউতারা বাঁধ। এখানে উল্লেখ্য যে, নাটোরের বিখ্যাত সুবিশাল চলনবিলের দক্ষিণ পূর্বাংশ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার পশ্চিমাংশ পর্যন্ত চলে এসেছে। শাহজাদপুরের এই অংশটি বর্ষাকালে বন্যার পানিতে সাগরের মতো অকূল পাথারে পরিণত হয়। এ কারণে এটি এলাকার মানুষের কাছে 'পাথার' অঞ্চল নামে পরিচিত। বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে এ অঞ্চলে মাশকলাই এবং খেসারি ছিটিয়ে দেয়া হয়। এগুলো প্রধানত গো খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

শীতকালে কৃষকরা এই বাথানে গরু রেখে ঘাস খাওয়ায়। এই বিশাল গোচারণভূমিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জমিদারী থেকে দান করেছিলেন। এখন এসব সম্পত্তি নানাভাবে ভূমিদস্যুরা গ্রাস করে ফেলার কারণে রবীন্দ্রনাথের দান করা এই লাখেরাজ গোচারণ ক্ষেত্রটি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। বর্তমানে ইরিধান আবাদের প্রচলনের ফলে এখানে শুধু একটি মাত্র ফসল, ধানের আবাদ হচ্ছে। তাও অনেক সময় রাউতারা স্লুইচগেট সংলগ্ন বাঁধ ভেঙ্গে অকালে পানি এসে রাতারাতি কাঁচা পাকা সব ধান তলিয়ে যায়। ফলে কৃষকরা সর্বহারা হয়। চীনের হোয়াংহো নদীকে একসময় চীনের দুঃখ বলা হতো। এই বাঁধটিও এলাকার মানুষের সেই রকম দুঃখের কারণ হয়ে আছে। এর কারণ হিসেবে ভুক্তভোগীরা বলছেন, এখানে (রাউতারাতে) যে স্লুইচগেটটি আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই ছোট। এখন যে পরিসরে আছে তারচেয়ে ৮/১০ গুণ বড় এবং আধুনিক স্লুইচগেট প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পাবনা জেলার বেড়া উপজেলায় যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও স্লুইচগেটটি আছে সে রকম রাউতারাতেও একটি প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। রাউতারা বাঁধের এলাকাটি পোতাজিয়া ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। এই বাঁধ ও স্লুইচগেটটি নির্মাণ করা হলে পাবনা জেলার বিশাল একটি অংশসহ শাহজাদপুরের এই অঞ্চলের ২/৩ লক্ষ একর জমির ফসল রক্ষা পাবে। তখন কৃষকরা এই জমি থেকে বছরে দু'বার ধান এবং এক বার রবিশস্যের আবাদ করে মোট তিনটি মৌসুমেই ফসল পাবে।

Matrix BCS Se

অন্যান্য

সদর উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে চন্ডিদাসগাঁতী গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে 'দুর্জয়' নামে ১টি ভাস্কর্য রয়েছে। উল্লাপাড়ার ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মক্কাউলিয়া মসজিদ (দারোগাপাড়া পঞ্চদশ শতাব্দী), হযরত বাগদাদী (রঃ) এর মাজার শরীফ (গয়হাট্টা), পাঁচ পীরের মাজার (আঙ্গারু), চৈত্রহাটির প্রত্নতাত্তিক স্থাপনা। তাড়াশ উপজেলায় অবস্থিত বেহুলার বাড়ি ও কুয়া, হযরত শাহ শরীফ জিক্তদানী (রাঃ)-এর মাজার এবং শিব মন্দির উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থাপনা। তাড়াশ উপজেলার নওগাঁ ইউনিয়নে হযরত শাহ

শরীফ জিন্দানী (রঃ) এর মাজার শরীফ অবস্থিত। প্রতি বৎসর ৩দিন ব্যাপী বাৎসরিক ওরস শরীফে প্রায় ৩ লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়ে থাকে। তাড়াশ উপজেলার বারুহাস ইউনিয়নের বিনসারা গ্রামে কিংবদন্তী লোক কাহিনীর বেহুলার বাড়ী অবস্থিত। বর্তমানে বেহুলার কুপ নামে একটি ইন্দারা আছে। ইন্দারাটি ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

তাঁত শিল্প

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। হস্ত চালিত তাঁতে বছরে প্রায় ৭০ কোটি মিটার বস্ত্র উৎপাদিত হয় যা অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রায় ৪০ ভাগ মিটিয়ে থাকে। এ শিল্প থেকে মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ প্রায় ১৫০০.০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশের হস্ত চালিত তাঁত শিল্প এদেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প। সরকার কর্তৃক সম্পাদিত তাঁত শুমারী ২০০৩ অনুযায়ী দেশে বর্তমানে ৫ লক্ষাধিক হস্তচালিত তাঁত রয়েছে তন্মধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলাতে রয়েছে ১ লক্ষ ৩৫ হাজারের অধিক। মহিলাদের অংশগ্রহণ সহ গ্রামীণ কর্মসংস্থানের দিক থেকে এর স্থান কৃষির পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম। দেশের প্রায় ১৫ লক্ষ লোক পেশার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ শিল্পের সাথে জড়িত।

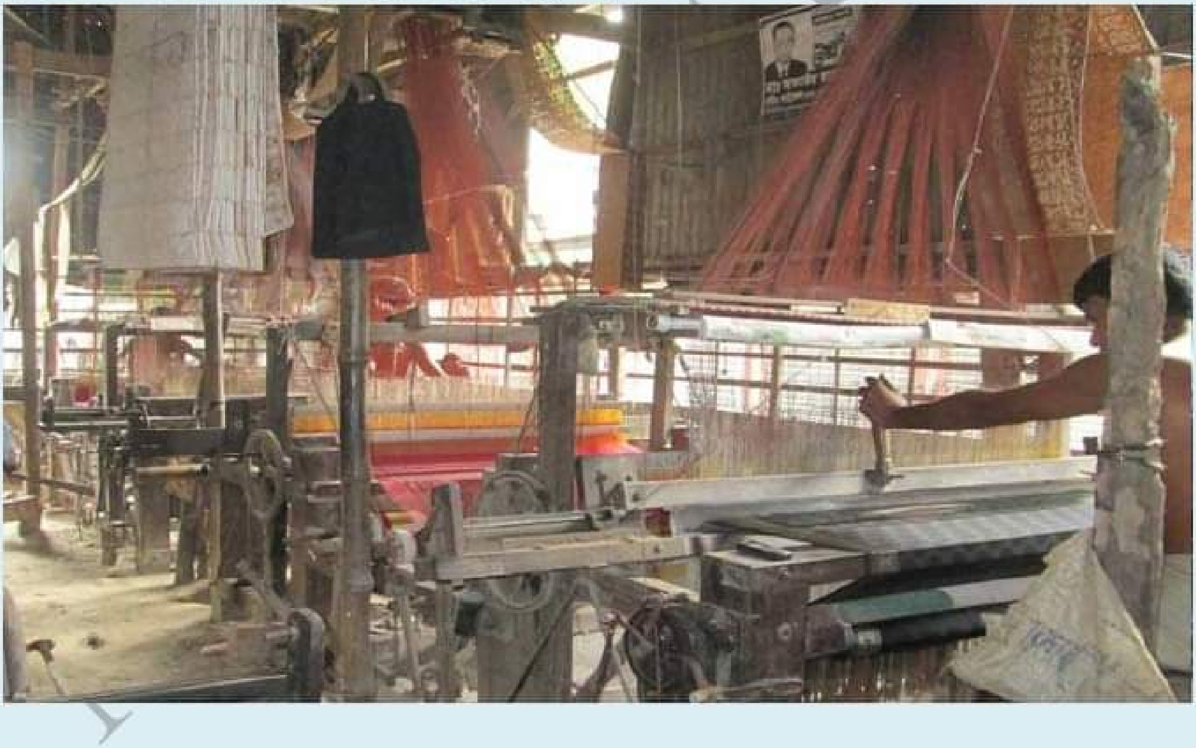

ছয় আনি পাড়া দুই গম্বুজ মসজিদ

শাহজাদপুরের ছয় আনি পাড়ায় রয়েছে পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত দুই গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ। 'স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে এর রয়েছে ভিন্ন মাত্রিক গৌরব। কারণ পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুই গম্বুজওয়ালা মসজিদ বাংলার আর কোথাও নির্মিত হয়েছে বলে জানাযায় না" (শাহজাদপুরের ইতিহাস---- প্রাগুক্ত)।তাই এই মসজিদটির সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সরকারের নজর দেয়া প্রয়োজন বলে এলাকাবাসীর দাবি।

পুরাকীর্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

রবীন্দ্র-কাচারিবাড়ি

শাহজাদপুরের আর একটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় পুরাকীর্তি হচ্ছে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শাহজাদপুরের কাচারিবাড়ী। এটি রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক জমিদারি তত্ত্বাবধানের কাচারি ছিল। তারও পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটি নীলকরদের নীলকুঠি ছিল। সে কারনে এখনও অনেকে একে কুঠিবাড়ী বলে। পরে রবীন্দ্রনাথের দাদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এটি নিলামে কিনে নেন। এখানে রয়েছে জমিদারির খাজনা আদায়ের কাচারির একটি ধ্বংসাবশেষ, একটি বেশ বড়সর দ্বিতল ভবন। বর্তমানে এখানে নির্মিত হয়েছে একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম। দ্বিতল ভবনটি বর্তমানে রবীন্দ্র জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং আঙ্গিনার বিস্তৃত জায়গা জুড়ে তৈরী করা হয়েছে সুদৃশ্য একটি ফুলবাগান। রবীন্দ্রনাথ পিতার আদেশে উনত্রিশ বছর বয়েসে ১৮৯০ সালে জমিদারি তত্ত্বাবধানের জন্য প্রথম শাহজদাপুর আসেন। রবীন্দ্রনাথ এখানকার প্রকৃতি ও মানুষের বিচিত্র জীবন প্রবাহের সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হন। এখানে এসে তার লেখা একটি কবিতায় তিনি বলেছেন,

"নদী ভরা কূলে কূলে, ক্ষেত ভরা ধান
আমি ভাবিতেছি বসে কি গাহিব গান।
কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে,
নিরাকুল ফুলভারে বকুল-বাগান।
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরাণ"

(ভরা ভাদরে- সোনার তরী)

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ থেকে ১৮৯৬ মোট ৭ বছর জমিদারির কাজে শাহজাদপুরে আসা-যাওয়া এবং অবস্থান করেছেন। কিন্তু তার এই শাহজাদপুরে আসা-যাওয়া শুধু জমিদারি তত্ত্বাবধানের বস্তুনিষ্ঠ প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং এই জমিদারির প্রয়োজনকে ছাপিয়ে প্রাধান্য পেয়েছে কবির সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা ও সৃজনশীলতা। এই সময়ের মধ্যে এখানে তিনি তার অনেক অসাধারন কালজয়ী সাহিত্য রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'সোনার তরী' কাব্যের 'ভরা ভাদরে', 'দুইপাখি' 'আকাশের চাঁদ', 'হৃদয় যমুনা', 'প্রত্যাখ্যান', 'বৈষ্ণব কবিতা', 'পুরস্কার' ইত্যাদি অসাধারণ কবিতা রচনা করেছেন। 'চৈতালী' কাব্যের 'নদীযাত্রা', 'শুশ্রূষা','ইছামতি নদী', 'বিদায়', 'আশিস-গ্রহণ' ইত্যাদি কবিতা এবং 'কল্পনা' কাব্যের 'যাচনা', 'বিদায়', 'নরবিরহ', 'মানস-প্রতিমা', 'লজ্জিতা', 'সংকোচ', ইত্যাদি বিখ্যাত গান রচনা করেছেন। তার শাহজাদপুরে রচিত ছোটগল্পের মধ্যে 'পোষ্টমাস্টার', 'ছুটি', 'সমাপ্তি', 'অতিথি' ইত্যাদি বিখ্যাত। আর প্রবন্ধের মধ্যে 'ছেলে ভুলানো ছড়া', 'পঞ্চভূত', এর অংশবিশেষ এবং 'ছিন্নপত্র' ও ছিন্নপত্রাবলীর আটত্রিশটি পত্র রচনা করেছেন। এছাড়া তার 'বিসর্জন' নাটকও এখানে রচিত। সবচেয়ে বড় কথা, তার পরবর্তী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শাহজাদপুরের প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান।

Matrix BCS Series

ঠাকুর পরিবারে জমিদারি ভাগাভাগির ফলে শাহজাদপুরের জমিদারি চলে যায় রবীন্দ্রনাথের অন্য শরীকদের হাতে। তাই ১৮৯৬ সালে তিনি শেষ বারের মতো শাহজাদপুর থেকে চলে যান। এর পরে তিনি আর শাহজাদপুরে আসেননি। কিন্তু শাহজাদপুর ছিল রবীন্দ্রনাথের অত্যমত্ম প্রিয় এবং ভালোবাসার একটি স্থান। তার ভালোবাসার কথা তিনি তার বিভিন্ন লেখায় বিশেষ করে 'ছিন্নপত্র' ও 'ছিন্নপত্রাবলী'তে গভীর আবেগ এবং আমত্মরিকতার সাথে উল্লেখ করেছেন। ১৮৯৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর শাহজাদপুর থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, " এখানে (শাহজাদপুরে) যেমন আমার মনে লেখার ভাব ও ইচ্ছা আসে এমন কোথাও না।" (ছিন্নপত্র- পত্র সংখ্যা-১১৯) এছাড়াও অন্যান্য লেখাতেও শাহজাদপুর সম্পর্কে তার আবেগময় ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। তার মৃত্যুর এক বছর আগে ১৯৪০ সালে শাহজাদপুরের তৎকালীন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হরিদাস বসাকের চিঠির জবাবে তিনি লিখেছেন,'শাহজাদপুরের সাথে আমার বাহিরের যোগসূত্র যদিও বিচ্ছিন্ন তবুও অমত্মরের যোগ নিবিড়ভাবে আমার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। আমার প্রতি সেখানকার অধিবাসীদের শ্রদ্ধা এখনো যদি অক্ষুন্ন থাকে তবে আমি পুরস্কার বলে গণ্য করব" (শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ-মোহাম্মদ আনসারুজ্জামান)। শাহজাদপুরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই ভালবাসা একে দিয়েছে মর্যাদা ও গৌরবের একটা ভিন্ন মাত্রা। শাহজাদপুরও রবীন্দ্রনাথকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে হৃদয়ে লালন করছে। প্রতিদিন দেশ বিদেশ থেকে বহু দর্শনার্থী কবির স্মৃতিধন্য এই স্থানটি দর্শনে আসেন।

এছাড়া প্রতি বছর সরকারি উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের আয়োজনে তিন দিন ব্যাপী ব্যাপক অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে রবীন্দ্র জন্মজয়মত্মী পালিত হয়। এই জন্মজয়মত্মী অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। রবীন্দ্র-কাচারিবাড়ীর মিলনায়তনে কোনভাবেই স্থান সংকুলান হয় না। তাই একামত্ম প্রয়োজন দেখা দিয়েছে একটি রবীন্দ্র মুক্ত মঞ্চের। কাচারিবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে একটি মুক্তমঞ্চ নির্মাণের মতো যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। কাচারিবাড়ীর প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তা জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করার পরামর্শ সুধী মহলের। সাম্প্রতিকালে শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী দলমত নির্বিশেষে এখানকার সব মানুষের প্রাণের দাবীতে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য, আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নামে এখন পর্যমত্ম বাংলাদেশে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান আছে বলে জানা নেই।

হুরাসাগর নদী

আত্রাই-বড়াল এবং ফুলঝড় (বাঙ্গালী-করতোয়া)-এর সম্মিলিত স্রোতধারা। চলন বিলের পূর্বপ্রান্তে চাঁচকইর নামক স্থানে গুমানী নদী গুর নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে গুমানী নামে প্রবাহিত হয়। চাটমোহরের পূর্ব দিকে এসে এটি বড়াল-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে বড়াল (আত্রাই-বড়াল) নামে প্রবাহিত হয়েছে। চাটমোহর থেকে প্রায় ৪৮ কিমি পূর্ব-দক্ষিণে বাঘাবাড়ীর কাছে এই আত্রাই-বড়াল নদী তার বামতীরে ফুলঝড় (বাঙ্গালী-করতোয়া) নদীকে ধারণ করে এবং মিলিত প্রবাহ হুরাসাগর নাম ধারণ করে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। বেড়া পুলিশ

Matrix BCS Series

স্টেশনের কাছে হুরাসাগর তার ডান তীরে ইছামতি নদীর প্রবাহকে ধারণ করে যমুনা নদীতে পতিত হয়েছে। বাঘাবাড়ী থেকে কিছুটা ভাটিতে বেড়া বাজারের সামান্য উত্তর-পশ্চিমে একটি বিরাট বহুমুখী সেচ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলছে। এখানে একাধারে সেচ কাজের জন্য পানি হুরাসাগর থেকে নিয়ে ইছামতি নদী বা খালে দেওয়া হবে, যা এই সেচ প্রকল্পের প্রধান খাল হিসেবে ব্যবহার করা হবে। আবার বর্ষা মৌসুমে সেচ এলাকার অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করে হুরাসাগর নদীর মাধ্যমে যমুনায় প্রবাহিত করা হবে। ইছামতি থেকে নৌযানগুলির সরাসরি হুরাসাগরে যাওয়ার কোন সুবিধা ছিল না বিধায় একটি নেভিগেশন লক নির্মাণ করা হয়েছে, যার সাহায্যে দুই পার্শ্বের দুই নদীর পানির লেভেলে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ছোট-খাটো দেশী নৌকা এপার-ওপার করা যায়। বর্তমানে এই নদীর প্রবাহ খুবই কমে গেছে, শুকনা মৌসুমে পানি প্রায় একেবারেই থাকে না যা ভবিষ্যতে বেড়া সেচ প্রকল্পের সফল পরিচালনার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। অক্ষাংশ অনুযায়ী এ নদীর অবস্থান ২৪°৬৭´ পূর্ব এবং ৮৯°৬৭´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ।

পোতাজিয়া নবরত্ন মন্দিরঃ

মন্দিরের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব কর্ণারে প্রায় ৬মিটার উঁচু দু'টি দেয়াল এখনও দাঁড়িয়ে আছে। চুন সুরকী ও পাতলা ইট দ্বারা নির্মিত দেয়ালে পোড়ামাটির চিত্রফলক লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে মন্দিরের আশেপাশে বেশ কিছু ঘরবাড়ী নির্মিত হয়েছে। মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ দেখে ধারণা হয় এ'টি সপ্তদশ শতকে নির্মিত। বৃহত্তর পাবনা জেলার ইতিহাস গ্রন্থের লেখক রাধারমন শাহা এর মতে ১৭০০ সালে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের পক্ষে গোবিন্দ রাম কৃষ্ণবল্লব রায় এ মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন।

হাটিকুমরুল গ্রামের মন্দির সমূহঃ

সিরাজগঞ্জ মোড় থেকে ৩ কিলোমিটার উত্তরে উল্লাহপাড়া-বগুড়া মহাসড়কের ১ কিলোমিটার পূর্বদিকে হাটিকুমরুল গ্রামে ১টি নবরত্ন মন্দির, ২টি শিবমন্দির এবং ১টি দোচালা আকৃতির মন্দির আছে।

নবরত্ন মন্দিরঃ

হাটিকুমরুল গ্রামে অবস্থিত সবচেয়ে বড় মন্দিরটি দোলমঞ্চ বা নবরত্ন মন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরের উপরের রত্ন বা চূড়াগুলোর অধিকাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। দিনাজপুর জেলার কান্তনগর মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত দ্বিতল বিশিষ্ট এ মন্দিরের আয়তন ১৭ মিটার × ১৭ মিটার। মন্দিরের চারদিকে টানা বারান্দা বেষ্টিত একটি গর্ভগৃহ রয়েছে। বারান্দার বাইরের দিকে ৭টি এবং ভিতরের দিকে ৫টি খিলান প্রবেশপথ আছে। দ্বিতীয় তলায় বারান্দা নেই। দেয়াল ও স্তম্বগুলোর উপরে অতি সুন্দর পোড়ামাটির চিত্রফলক ছিল। বেশিরভাগ চিত্রফলকে ফুল ও লতাপাতার কাজ ছিল। চিত্রফলকগুলো অধিকাংশ নষ্ট হয়ে গেলেও কিছু কিছু ফলকচিত্র এখনও টিকে আছে। মন্দিরের ১ম ও ২য় তলায় ছাদের চারকোণে চারটি করে ৮(আট) টি এবং সর্বশেষ স্তরের উপর ১টি মোট ৯টি চূড়া বা রত্ন ছিল। তাই এটি নবরত্ন মন্দির নামে

Matrix BCS Series

পরিচিত। রত্ন বা চূড়াগুলো ধ্বংস হয়ে গেলেও কিছু কিছু নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। মন্দিরের ছাদ প্রান্ত আংশিক বাঁকানো।

হাটিকুমরুল নবরত্ন মন্দির

এ মন্দিরে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে কিছু পাঠ্যজাত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, নবাব মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলে রামনাথ ভাদুড়ী নামে জনৈক তহসীলদার খ্রিঃ ১৭০৪-১৭২৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এ'টি নির্মাণ করেছিলেন।
মন্দির সংলগ্ন পশ্চিম দিকে একটি মজে যাওয়া ছোট পুকুর আছে। স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে পুকুরে নাকি লোহার সিন্দুক রয়েছে এবং সেই সিন্দুক মন্দিরের তলদেশ থেকে লোহার শিকলে আবদ্ধ।

বড় শিবমন্দিরঃ

নবরত্ন মন্দির থেকে প্রায় ১৩০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা মজা পুকুরের পূর্ব পাশে মন্দিরটি অবস্থিত। বর্গাকারে নির্মিত মন্দিরের প্রতিটি বাহু ৫ মিটার এবং পূর্ব বাহুতে একটি মাত্র প্রবেশপথ আছে। প্রবেশপথের উভয় পাশে ও উপরে চমৎকার পোড়ামাটির চিত্রফলক রয়েছে। উপরের চিত্রফলকগুলো কিছু খোয়া গেলেও দু'পাশে এখনও বহু চিত্রফলক মন্দিরের শোভাবর্ধন করছে। মন্দিরটি রত্ন বা চূড়া আকৃতির ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং বেশ উঁচু। এ মন্দিরেও কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি, তবে নির্মাণ শৈলীর বিচারে মন্দিরটি নবরত্ন মন্দিরের সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রিঃ ১৭ শতকে নির্মিত বলে ধারণা করা যায়।

ছোট শিবমন্দিরঃ

নবরত্ন মন্দিরের ২০ মিটার উত্তর-পূর্ব পাশে ছোট আকৃতির একটি মন্দির আছে। বর্গাকারে নির্মিত মন্দিরের প্রতিটি বাহু ৩ মিটার। দক্ষিণ বাহুতে একটি মাত্র প্রবেশপথ রয়েছে। চুন সুরকী ও পাতলা ইট দ্বারা নির্মিত মন্দিরের ছাদ চূড়া আকৃতির এবং সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৮মিটার উঁচু। এ মন্দিরে পোড়ামাটির চিত্রফলক লক্ষ্য করা যায় না । মন্দিরটি খ্রি. ১৭ শতকে নির্মিত বলে ধারণা করা যায়।

দোচালা মন্দিরঃ

নবরত্ন মন্দিরের আনুমানিক ৫০ মিটার উত্তরে প্রায় ৬ মিটার × ৪ মিটার পরিমাপের আয়তাকার একটি বিচিত্র মন্দির রয়েছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মন্দিরের উপরে দোচালা ঘরের আকৃতিতে নির্মিত পাকা ছাদ আছে। বাঁকানো কার্ণিশ বিশিষ্ট এ মন্দিরটি দেখতে বড়। এ মন্দিরের গায়ে কোন কারুকার্য বা পোড়ামাটির চিত্রফলক নেই। মন্দিরে পূর্ব দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে একটি মাত্র প্রবেশ পথ আছে। মন্দিরটি চুন সুরকী ও পাতলা ইট দ্বারা নির্মিত এবং দেয়ালে চুন সুরকীর আস্তর রয়েছে। হাটিকুমরুল গ্রামে অবস্থিত অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় এ'টি বেশ অটুট অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় লোকজনের মতে অন্তপুরের মহিলাদের পূজা অর্চনার নিমিত্তে এ মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। এ মন্দিরের অদূরে পশ্চিম পাশে প্রাচীন ইটের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। এ ধ্বংসাবশেষটি মন্দির নির্মাতার আবাস বাটি/বাড়ি বলে

Matrix BCS Series

অনেকে মনে করেন। এ মন্দিরের কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে গঠণ প্রণালী ও স্থাপত্য শৈলীর আলোকে অনুমিত হয় যে, এটি উনবিংশ শতকের শেষভাগে নির্মিত হয়েছিল।

নদ-নদী

যমুনা নদীঃ সিরাজগঞ্জ জেলায় রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নদী। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে নদী যমুনা। উহার উপরেই অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমুখী সেতু।

হুরাসাগরঃ আত্রাই-বড়াল এবং ফুলজোড় (বাঙ্গালী-করতোয়া)এর সম্মিলিত স্রোতাধারা। চলন বিলের পূর্বপ্রান্তে চাঁচকইর নামক স্থানে গুমানী নদী গুর নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে গুমানী নামে প্রবাহিত হয়। চাটমোহরের পূর্ব দিকে এসে এটি বড়াল এর সঙ্গে মিলিত হয়ে বড়াল নামে প্রবাহিত হয়েছে। চাটমোহর থেকে প্রায় ৪৮কিমি পূর্ব দক্ষিণে বাঘাবাড়ীর কাছে এই আত্রাই বড়াল নদী তার বামতীরে ফুলঝড় নদীকে ধারণ করে এবং মিলিত প্রবাহ হুরাসাগর নাম ধারণ করে পূর্ব দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে ।

করতোয়া ফুলজোড় নদী

Facebook Page: Matrix BCS Series

Matrix BCS Series